বিবেকানন্দের
জীবন
ও
বিশ্ববাণী

অনুবাদক :

ঋষি দাস

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

দাম : ছয় টাকা

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানির পক্ষে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে
স্ট্রীট হইতে প্রাকাশিত ও ৩১ বাদুড় বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা, রূপবাণী প্রেস হইতে
শ্রীভোলানাথ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত।

"…মানব প্রকৃতির মহিমা ভুলিও না। আমরাই মহানতম বিধাতা।…খৃস্ট ও বুদ্ধের দল অসীম সোঽহং সমুদ্রের তরংগ মাত্র।…"

—বিবেকানন্দ

আমেরিকা, ১৮৯৫

প্রথম খণ্ড

বিবেকানন্দের জীবন

বিবেকানন্দের জীবন

সূচনা

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করিবার এবং তাঁহার চিন্তার বীজ বিশ্বময় বপন করিবার দায়িত্ব তাঁহার যে মহান শিষ্যের উপর পড়িয়াছিল, তিনি-ছিলেন দেহ ও মনের দিক হইতে রামকৃষ্ণের ঠিক বিপরীত।

দিব্যাত্মা রামকৃষ্ণ তাঁহার সমগ্র জীবন জগন্মাতার চরণতলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আশৈশব তিনি ছিলেন মহাদেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত; আত্মচেতনা জন্মিবার আগেই তাঁহার এই চেতনা জন্মিয়াছিল যে, তিনি মহাদেবীকে ভালো বাসিয়াছেন। মহাদেবীর সহিত পুনর্মিলনের চেষ্টায় তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া বহু বেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তবে তাহা ছিল মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো— সে-বেদনা বহনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে তাঁহার পবিত্র প্রেমের উপযুক্ত করিয়া তোলা। সকল জটিল দুর্গম অরণ্য-পথের প্রান্তে একাকী সেই মহাদেবীই ছিলেন বর্তমান। বহু রূপের মধ্যে তিনিই ছিলেন একাকী, সেই মহাদেবী—সেই বহুরূপিণী বিধাত্রী। রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি অন্যান্য সকল রূপকেও চিনিতে শিখিলেন, এই মহাদেবীর মধ্য দিয়াই তিনি আলিংগন করিলেন সমগ্র বিশ্বকে। বিশ্বানন্দের এই প্রশান্ত পূর্ণতার মধ্যেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইল। এই বিশ্বানন্দের বন্দনাই বীঠোফেন[১] ও শীলার[২] পাশ্চাত্ত্যের জন্য গাহিয়াছিলেন[৩]।

রামকৃষ্ণ কিন্তু এই বিশ্বানন্দকে বীঠোফেন ও শীলারের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বীঠোফেনের নিকট উহা ছিল বিবদমান বিশৃংখল মেঘমালার অবকাশে নীলাকাশের ক্ষণিক প্রকাশ মাত্র। কিন্তু ভারতীয় রাজহংস পরম হংস ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলির যবনিকা পার হইয়া চিরশাশ্বতের স্বচ্ছ সরোবরে আপনার সুবিশাল শুভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন।

১ বীঠোফেন—জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার।—অনু:

২ শীলার—জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও কবি।—অনু:

৩ এখানে বীঠোফেনের নবম সিম্ফনির কথা বলা হইতেছে। শীলার-রচিত 'আনন্দ বন্দনা' দিয়া এই সিম্ফনিটি শেষ হইয়াছে।—অনু:

তাঁহাকে অনুকরণ করিবার অধিকার তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যদেরও ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই বিবেকানন্দও তাঁহার সুবিশাল পক্ষে ভর করিয়া চকিতে কখনো কদাচিৎ মাত্র ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের মধ্যে এই ঊর্ধ্বলোকে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। তাই বিবেকানন্দের কথা ভাবিলে বারে বারে আমার বীঠোফেনের কথা মনে পড়ে। তিনি যে সময়টুকু এই প্রশান্তির বক্ষে বিরাজ করিতেন, তখন-ও তাঁহার তরণীর পালে সকল দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিয়া লাগিত। পৃথিবীর যুগব্যাপী দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁহার চারিদিকে ক্ষুধিত সামুদ্রিক পক্ষীর মতো অহরহ ডানা ঝাপটাইয়া বেড়াইত। দুর্বলতার নহে—শক্তির—আবেগ তাঁহার সিংহ হৃদয়ের মধ্যে উদ্বেল হইত। তিনি ছিলেন মূর্তিমান শক্তি; কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁহার বাণী। বীঠোফেনের মতো তাঁহার কাছেও সকল সদ্‌গুণের মূল ছিল কর্ম। নিষ্ক্রিয়তাই প্রাচ্যের স্কন্ধে গুরুভার হইয়া চাপিয়া বসিয়াছিল। তাই নিষ্ক্রিয়তার প্রতি তাঁহার ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা।। তাই ঘৃণা ভরে তিনি বলিয়াছিলেন :

"সর্বোপরি, শক্তিশালী হও! পৌরুষ লাভ করো! দুর্বৃত্ত যতোক্ষণ পৌরুষ ও শক্তির পরিচয় দেয়, ততোক্ষণ এমন কি তাহাকেও আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ, তাহার শক্তিই একদিন তাহাকে কুপথ ত্যাগ করিতে, এমন কি, সকল স্বার্থ বিসর্জন দিতে বাধ্য করিবে; এবং এই ভাবেই একদিন শক্তি তাহাকে সত্যের পথে ফিরাইয়া আনিবে।"[১]

বিবেকানন্দের দেহ ছিল মল্লযোদ্ধার মতো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। তাহা রামকৃষ্ণের কোমল ও ক্ষীণ দেহের ছিল ঠিক বিপরীত। বিবেকানন্দের ছিল সুদীর্ঘ দেহ (পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি)[২], প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, সুদৃঢ় গঠন, কর্মিষ্ঠ পেশল বাহু, শ্যামল চিক্কণ ত্বক্‌, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল[৩], আর অপূর্ব আয়ত পল্লবভারে অবনত ঘনকৃষ্ণ দুটি চক্ষু। তাঁহার চক্ষু

---

১ রাজপুতানার আলোয়ারে শিষ্যদের প্রতি, ১৮৯১।

২ তাঁহার ওজন ছিল ১৭০ পাউণ্ড। তিনি প্রথম বারে যখন আমেরিকা যান, তখন তাঁহার দেহের নির্ভুল মাপ 'ফ্রেনলজিক্যাল জার্নাল অব নিউ ইঅর্ক'-এ প্রকাশিত হয়। পরে তাহা "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন" দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩ ভারতীয়দের অপেক্ষা তাতারদের সংগেই তাঁহার চোয়ালের সাদৃশ্য ছিল অধিক। বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বড়াই করিতেন। "তাতাররা জাতির সুরা", একথা বলিতে তিনি ভালোবাসিতেন।

দেখিলে প্রাচীন সাহিত্যের সেই পদ্মপলাশের উপমা মনে পড়িত। বুদ্ধিতে, ব্যঞ্জনায়, পরিহাসে, করুণায় দৃপ্ত প্রখর ছিল সে চক্ষু; ভাবাবেগে ছিল তন্ময়; চেতনার গভীরে তাহা অবলীলায় অবগাহন করিত; রোষে হইয়া উঠিত অগ্নিবর্ষী; সে দৃষ্টির ইন্দ্রজাল হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার রাজকীয়তা; তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট। কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায়, কোথাও এমন কেহ তাঁহার পাশে আসেন নাই, যিনি তাঁহার নিকট নতশির না হইয়াছেন।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোতে কার্ডিন্যাল গিবন্‌স্ ধর্ম সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী সভায় ত্রিশ বৎসরের এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যুবক যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন সভায় অন্যান্য সভ্যগণের উপস্থিতির কথা মানুষে ভুলিয়া গেল। বিবেকানন্দের দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য, কমনীয় মাধুর্য এবং প্রশান্ত মহিমা, তাঁহার চক্ষের কৃষ্ণাভ দ্যুতি, তাঁহার প্রশান্ত গাম্ভীর্য এবং বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পর হইতে তাঁহার কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি[১] তাঁহার বর্ণবিদ্বেষী মার্কিন আংলো-স্যাক্‌সন শ্রোতাদেরও বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এবং ভারতবর্ষের এই সৈনিক দ্রষ্টার[২] চিন্তাধারা যুক্তরাষ্ট্রের বক্ষে গভীরভাবে রেখাপাত করিল[৩]।

তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন, ইহা কল্পনাও করা যায় না। তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আগেই আমি রামকৃষ্ণের একটি দিব্য দর্শনের বর্ণনা দিয়াছি[৪]। সেখানেও রামকৃষ্ণ তাঁহার এই প্রিয় শিষ্যের সংগে তাঁহার নিজের সম্পর্ককে এক মহর্ষির সংগে এক শিশুর সম্পর্কের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিবেকানন্দ নিজেকে কঠোরভাবে বিচার

---

১ তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল ভায়লনসেলো বাদ্যযন্ত্রের মতো। (একথা আমি মিস্ জোসেফিন ম্যাক্‌লেয়ডের মুখে শুনিয়াছি।) তাহাতে উত্থান-পতনের বৈপরীত্য ছিল না, ছিল গাম্ভীর্য, তবে তাহার ঝংকার সমগ্র সভা কক্ষে এবং সকল শ্রোতার হৃদয়ে ঝংকৃত হইত। তিনি তাঁহার শ্রোতার উপর একবার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে, এই তীব্র ধ্বনিকে কর্ণ ভেদ করিয়া আত্মা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন। এমা কাল্‌ভের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। এমা কাল্‌ভে বলেন, তিনি ছিলেন চমৎকার ‘ব্যারিটোন’, তাঁহার গলার স্বর ছিল চীনা গঙের আওয়াজের মতো।

২ তিনি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ। কায়স্থরা ক্ষত্রিয় বা সৈনিক শ্রেণীর অন্তর্গত।

৩ তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করিলে তাহা দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং তাঁহার অন্তরংগ ভক্তরূপে কয়েকজন আমেরিকানকে তিনি পান।

৪ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড (“রামকৃষ্ণের জীবন”) ১৯২-১৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিয়া সবিনয়ে এই সম্মান লইতে অস্বীকার করিলেও তাঁহার এই অস্বীকারের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। সকলে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মধ্যে ভগবৎ-প্রেরিত এক নেতার সাক্ষাৎ পাইতেন—তাঁহার মধ্যে নির্দেশ দিবার, পরিচালিত করিবার যে শক্তি নিহিত ছিল, তাহার চিহ্ন সকলের চোখেই সহজে ধরা পড়িত। হিমালয়ে সহসা এক পর্যটকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পর্যটক তাঁহাকে না চিনিলেও থমকিয়া দাঁড়ান এবং বলিয়া উঠেন :

"শিব !..."[১]

তাঁহার স্বনির্বাচিত দেবতা যেন তাঁহার ললাটে নিজের নামটি লিখিয়া দিয়াছিলেন !

কিন্তু তাঁহার ললাটের এই বিশাল উপলখণ্ডের উপর দিয়া বহু মানসিক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছিল। যে প্রশান্ত বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছ বিস্তারের উপর রামকৃষ্ণের মৃদু হাস্য চমকিত হইত, বিবেকানন্দ তাঁহার নিজের জীবনে তাহা কদাচিৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার অতিশক্তিশালী দেহ[২], তাঁহার অতি বিরাট মস্তিষ্ক আগে হইতেই তাঁহার বাত্যাব্যাকুলিত আত্মার রণক্ষেত্ররূপে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। সেখানে অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, স্বপ্ন ও কর্ম স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। তাঁহার জ্ঞান ও কর্মশক্তি এতোই অধিক ছিল যে, তাঁহার নিজের স্বভাবের এক অংশকে বা সত্যের এক অংশকে বিসর্জন দিয়া কোনোরূপ সংগতি-বিধান তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁহার এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার জন্য তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সে সংগ্রামে তাঁহার সাহস, এমন কি তাঁহার জীবনও নিঃশেষিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট জীবন ও সংগ্রামের অর্থ ছিল এক।[৩] তাঁহার জীবনের দিনগুলিও ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। রামকৃষ্ণের ও তাঁহার এই মহান্ শিষ্যের মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ষোলো বৎসর।...কিন্তু এই কয়েক বৎসরেই বিবেকানন্দ আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন।...চল্লিশ বৎসরেরও কম বয়সে এই মল্লবীর চিতাশয্যা গ্রহণ করেন।

---

১ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণী।

২ অবশ্য, অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মধ্যে বহুমূত্র রোগের আক্রমণ লক্ষিত হয় এবং বহুমূত্র রোগেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই হারকিউলিসের পার্শ্বে মৃত্যু সর্বদাই উপস্থিত ছিল।

৩ জীবনকে তিনি কি "পরিপার্শ্বের বিরুদ্ধে সত্তার প্রকাশের ও বিকাশের চেষ্টা" বলিয়া বর্ণনা করেন নাই? (এপ্রিল, ১৮৯১ : ক্ষেত্রীর মহারাজার সহিত সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু সে চিতাগ্নি আজও নির্বাপিত হয় নাই। প্রাচীন কালের ফিনিক্স পক্ষীর[১] মতোই তাহার চিতাভস্ম হইতে নূতন করিয়া ভারতের বিবেক—সেই ঐন্দ্রজালিক পক্ষী—উত্থিত হইয়াছে। উত্থিত হইয়াছে ভারতের ঐক্যে এবং তাহার মহান্ বাণীতে মানুষের বিশ্বাস। এই বাণীর কথা ভারতের প্রাচীন স্বপ্ন-দ্রষ্টারা বৈদিক যুগ হইতে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন; এই বাণীর হিসাব-নিকাশ আজ ভারতবাসীকে অবশিষ্ট মানব জাতির নিকট দিতে হইবে।

১ ফিনিক্স্ পক্ষী—পাশ্চাত্ত্য পুরাণে বর্ণিত পক্ষী। কথিত আছে, ফিনিক্স তাহার ভস্ম হইতে পুনর্জন্ম লাভ করে।—অনুঃ

পরিব্রাজক

ভ্রাম্যমান আত্মার প্রতি ধরিত্রীর আহ্বান

১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ক্রিস্‌মাসের রাত্রিতে যখন পরলোকগত গুরুদেবের পুণ্যস্মৃতি-উদ্বেলিত অশ্রুধারার মধ্যে আঁটপুরে নবপ্রচারক সংঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেদিনের সেই অতীন্দ্রিয় প্রহারার কথা আমি আমার বইএর প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি। কিন্তু রামকৃষ্ণের চিন্তাকে প্রাণময় কর্মে পরিণত করিতে তাহার পর আরো বহু মাস, বহু বৎসর লাগিয়া গেল।

সেজন্য একটি সেতু নির্মাণের প্রয়োজন ছিল এবং সেই সেতুনির্মাণ সম্পর্কে প্রথমে তাঁহারা তাঁহাদের মন স্থির করিতে পারিলেন না। একমাত্র যাঁহার মধ্যে এই সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও প্রতিভা বর্তমান ছিল, সেই নরেন,[১] তিনিও ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহাদের অন্যান্য সকলের

১ আমি পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে আমেরিকা যাইবার ঠিক আগে পর্যন্ত বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন নাই।

এ বিষয়ে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছি। বিবেকানন্দের নাম গ্রহণ সম্পর্কে একটি সুগভীর গবেষণা হইয়াছে; স্বামী অশোকানন্দ আমাকে সেই গবেষণার ফলাফল-গুলি ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছেন। বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আশ্রমিক শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দের সাক্ষ্য অনুসারে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রামকৃষ্ণ সকল সময়ে তাঁহাকে নরেন্দ্র বা সংক্ষেপে নরেন বলিয়া ডাকিতেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার কোনো কোনো শিষ্যকে সন্ন্যাস দিলেও তিনি কখনো তাঁহাদিগকে কোনরূপ আশ্রমিক নাম দেন নাই বা সেরূপ কোনো রীতিরও প্রচলন করেন নাই। তবে তিনি আদর করিয়া নরেনকে "কমলাক্ষ" নামে ডাকিতেন। কিন্তু এ নামও তিনি শীঘ্রই ছাড়িয়া ফেলেন। ভারত ভ্রমণ কালে আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন—কখনো বিবিদিশানন্দ, কখনো বা সচ্চিদানন্দ। আবার আমেরিকা যাইবার প্রাক্কালে যখন তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি কর্নেল অলকটের কাছে পরিচয়-পত্র আনিতে যান, তখন কর্নেল অলকট তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ নামেই জানিতেন। সচ্চিদানন্দ সম্পর্কে বন্ধুবান্ধবের কাছে সুপারিশ করা দূরে থাক, তিনি তাঁহার সম্পর্কে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা যান, তখন তাঁহার অন্যতম পরম বন্ধু ক্ষেত্রীর মহারাজা তাঁহাকে বিবেকানন্দ নামটি গ্রহণ করিতে বলেন। স্বামীজীর "বিচার-শক্তি"র কথা ভাবিয়াই এই নামটি নির্বাচিত হইয়াছিল। নরেন সম্ভবত সাময়িকভাবেই এই নামটি লইয়াছিলেন। কিন্তু এই নাম পরে,—এমন কি যদি তাঁহার ইচ্ছাও থাকে—তিনি ছাড়িতে পারে নাই। কারণ, অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই নামে তিনি ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় সুবিখ্যাত হইয়া উঠেন

অপক্ষো নরেনের মধ্যেই অনিশ্চয়তা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। ‘স্বপ্ন ও কর্মের দ্বন্দ্বে তিনি ক্ষতবিক্ষত, ছিন্নভিন্ন হইতেছিলেন। দুই তীরের ব্যবধান ঘুচাইবার জন্য সেতু নির্মাণ করিতে হইলে অপর তীরটিকে-ও আগে তাঁহার জানিবার প্রয়োজন ছিল। এই অপর তীরটি ছিল ভারত ও বর্তমানের বাস্তব জগৎ। কিন্তু তখনো কিছুই সুস্পষ্ট ছিল না; কেবল তাঁহার অশান্ত তরুণ হৃদয়ের মধ্যে একটি আসন্ন আদর্শ ও লক্ষ্য নিতান্ত নিষ্প্রভভাবে জ্বলিতেছিল। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র তেইশ বৎসর। কিন্তু কাজটি ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিরাট ও জটিল। এমন কি মানসিক ভাবেও এই কাজটি কেমন করিয়া করা সম্ভব? কাজটির আরম্ভই বা করা যায় কখন, কোথায়? এইরূপ ব্যাকুলতার মধ্যে তিনি চূড়ান্ত মুহূর্তটিকে কেবলই পিছাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের গোপন গভীরে ইহা লইয়া চিন্তা ও আলোচনা না করিয়া কি তাঁহার উপায় ছিল? সচেতনভাবে না হইলেও অবচেতনভাবে এই চিন্তা যে তাঁহার প্রকৃতিগত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া তাঁহার কৈশোর হইতে প্রতি রাত্রে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। তাঁহার এই প্রকৃতিগত দ্বন্দ্ব ছিল বিরুদ্ধ বাসনাগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব—একদিকে ছিল পৃথিবীকে পাইবার, জয় করিবার, শাসন করিবার বাসনা; অপর দিকে ছিল ভগবানকে পাইবার জন্য সকল পার্থিব বস্তুকেই বিসর্জন দিবার বাসনা।[১]

এই সংগ্রাম তাঁহার জীবনে নিরন্তর নূতন করিয়া বাধিতেছিল। এই বিজয়ী যোদ্ধা ভগবান ও পৃথিবী, উভকেই পাইতে চাহিয়াছিলেন—তিনি চাহিয়াছিলেন সকল কিছুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে, সকল কিছুকে পরিত্যাগ করিতে। তাঁহার শক্তিশালী দেহের ও মস্তিষ্কের উদ্‌বৃত্ত শক্তি স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার শক্তির এই আতিশয্যই একদিকে তাঁহার শক্তির দুর্নিবার স্রোতোধারাকে ভগবানের নদীপথে ভিন্ন অন্য কোনো পথে সীমাবদ্ধ করাকে, আবার অন্য দিকে মহা ঐক্যের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করাকে, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল।)তাঁহার এই দম্ভ ও ভালোবাসার, দুই সহজাত প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বন্দ্বের অবসান কিরূপে ঘটিতে পারিত? সেখানে একটি তৃতীয় উপাদানও উপস্থিত ছিল; সে উপাদান সম্পর্কে নরেন নিজে আগে সচেতন ছিলেন না; কিন্তু দ্রষ্টা রামকৃষ্ণের চক্ষু দূর হইতেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। যখন

১ নরেনের মানসিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তাঁহার স্বকথিত কাহিনী এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ("রামকৃষ্ণের জীবন") ২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই তরুণের মধ্যে এইরূপ বিরুদ্ধ শক্তিগুলির আলোড়ন চলিতেছিল এবং অন্যান্য সকলে যখন তাঁহার সম্পর্কে উদ্‌বেগ ও আশংকা প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন কিন্তু রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন :

"নরেন যেদিন দুঃখ-দারিদ্রের সংস্পর্শে আসিবে, সেদিন তাহার চরিত্রের এই দম্ভ অসীম করুণায় বিগলিত হইবে; তাহার সকল আত্মবিশ্বাস অপরের হতাশ ভীরু আত্মার মধ্যে সাহস ও বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার অস্ত্র হইয়া উঠিবে; তাহার কর্মের স্বাধীনতা বলিষ্ঠ আত্মজয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপরের চক্ষে অহমের[১] প্রকৃত মুক্ত প্রকাশরূপে দেখা দিবে।"

মানুষের দুঃখ-দারিদ্রের সহিত—সাধারণ ও অস্পষ্ট দুঃখ-দারিদ্র নহে—সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রত্যক্ষ দুঃখ-দারিদ্রের সহিত, তাঁহার পরমাত্মীয় ভারতবাসীর দুঃখ-দারিদ্রের সহিত তাঁহার এই মিলন ছিল ইস্পাতের সহিত অগ্নিশলাকার সংস্পর্শের মতো—সে সংস্পর্শ হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া সমগ্র আত্মায় আগুন ধরাইয়া দিল। মানুষের দুঃখ-বেদনাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সকল গর্ব, উচ্চাশা, প্রেম, বিশ্বাস, বিজ্ঞান, কর্ম, তাঁহার সকল শক্তি ও সকল কামনা মানুষের সেবায় একই সংগে নিয়োজিত হইল এবং সেগুলি একটিমাত্র অগ্নিশিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল : "আমি এমন একটি ধর্ম চাই, যাহা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাইবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দিবার, আমাদের চতুষ্পার্শ্বের সকল দুঃখ-বেদনাকে দূর করিবার শক্তি আনিয়া দিবে।...যদি ভগবানকে পাইতে চাও, তবে মানুষের সেবা করো।"[২]

কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পরেই কেবল তিনি লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আর্ত মানবতাকে—তাহার সকল সকরুণ নগ্নতার মধ্যে তাঁহার দেশমাতৃকাকে—স্বহস্তে ও স্বচক্ষে স্পর্শ ও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

১ অর্থাৎ দিব্যাত্মার (সারদানন্দ-রচিত "দিব্যভাব" হইতে গৃহীত)।

২ "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন", ২য় খণ্ড, ৭৩ পরিচ্ছেদ। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তী কথোপকথন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—"স্বামী বিবেকানন্দের জীবন" পুস্তক সম্পর্কে পরে আমি প্রায়ই উল্লেখ করিব। এই মহামূল্য পুস্তকখানি ভারতবর্ষে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে চারি খণ্ডে 'The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, 1914—1918,' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

এবার আমরা তাঁহার "ভ্রমণ-বর্ষগুলির"[১] তীর্থক্রমায় তাঁহার সহযাত্রী হইব।

* * *

বরানগরে প্রথম বৎসর প্রথম কয়েক মাস রামকৃষ্ণের শিষ্যরা পরস্পরের মানসিক উন্নতিসাধনে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তখনো তাঁহাদের কেহই মানুষের নিকট বাণী বহন করিবার উপযুক্ত হইলেন না। তাঁহারা অতীন্দ্রিয় সিদ্ধির সন্ধানে স্ব স্ব শক্তি নিয়োগ করিতে চাহিলেন; অন্তর্জীবনের আনন্দ তাঁহাদের দৃষ্টিকে বাহিরের প্রতি বিমুখ করিয়া রাখিল। অসীমের এই আকাঙ্ক্ষা নরেনের মধ্যেও ছিল। তবে সেই সংগে তিনি ইহাও জানিতেন যে, নিষ্ক্রিয় আত্মার পক্ষে এই আদিম আকর্ষণ অত্যন্ত বিপজ্জনক; এই আকর্ষণ পতনোন্মুখ প্রস্তরের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতোই ক্রিয়াশীল। নরেনের কাছে স্বপ্নে ও কর্মে কোনো পার্থক্য ছিল না। তাই তিনি রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগকে নিষ্ক্রিয় তন্দ্রাচ্ছন্ন ধ্যানের মধ্যে নিমগ্ন হইতে দিলেন না। তিনি এই আশ্রমিক বিজন বাসের দিনগুলিকে শ্রমসাধ্য শিক্ষার গুঞ্জনে ভরিয়া তুলিলেন। আশ্রমটি আধ্যাত্মিক শিক্ষার হাইস্কুলে পরিণত হইল। সতীর্থদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড়ো ছিলেন। তবু তাঁহার উচ্চতর জ্ঞান ও প্রতিভা প্রথম হইতে তাঁহাকেই তাঁহার সহযাত্রীদিগকে পথ দেখাইবার অধিকার দিল। সাধে কি, শেষ বিদায়ক্ষণে ঠাকুর নরেনকেই তাঁহার শেষ কথাগুলি বলিয়াছিলেন:

"ইহাদের দেখিস্।"[২]

এই নূতন শিক্ষালয় পরিচালনার ভার নরেন দৃঢ়হস্তে লইলেন এবং শিক্ষার্থীদিগকে ভগবৎ-চিন্তার আলস্য-বিলাসে গা ঢালিবার সুযোগ দিলেন না। তিনি সর্বদাই তাঁহাদিগকে সজাগ ও সতর্ক রাখিলেন এবং কঠোর হস্তে তাঁহাদের হৃদয়কে কর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে মানব মননের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি শুনাইলেন; কেমন করিয়া বিশ্বময় মানব মনের উদ্‌বর্তন ঘটিল, তাহাও ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন ও ধর্মবিষয়ক সমস্যাগুলির নীরস

১ এই কথাগুলি জার্মান কবি গ্যেটে-লিখিত বিখ্যাত পুস্তক "উইল্‌হেল্‌ম মাইস্টারের ভ্রমণ বর্ষগুলি" হইতে গৃহীত।

২ রামকৃষ্ণের অন্তিম মুহূর্তগুলি সম্পর্কে তাঁহার শিষ্য রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিকথা হইতে। এই স্মৃতিকথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'প্রাচ্যের বাণী' (The Message of the East) নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

নির্লিপ্ত আলোচনায় অংশ লইতে বাধ্য করিলেন, জাতি ও সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যে সীমাহীন মহাসত্যে সকল বিশেষ ও খণ্ডিত সত্য গিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহারই সুবিস্তৃত দিগন্তের দিকে তিনি তাঁহাদিগকে অক্লান্তভাবে আগাইয়া লইয়া চলিলেন।[১] আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের ফলে রামকৃষ্ণের প্রেমের বাণীর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল। অন্তরীক্ষে থাকিয়া ঠাকুর তাঁহাদের সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করিতে লাগিলেন। এইভাবে তাঁহারা তাঁহাদের মানসিক পরিশ্রমের ফসল বিশ্ব মানসের সেবায় নিয়োগ করিতে পারিলেন।

ইউরোপবাসীরা এশিয়াবাসীদিগকে গতিহীন ভাবিলে কি হইবে, ধার্মিক ভারতীয়দের প্রকৃতি ফরাসী নাগরিকদের মতো নহে, তাঁহারা একস্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। এমন কি যাঁহারা ধ্যানযোগে সাধনা করেন, তাঁহাদের রক্তেও গৃহহীন, বন্ধনহীন হইয়া অপরিচিত অপরিজ্ঞাত অবস্থায় বিশ্ব-ভ্রমণের পার্থিব প্রবৃত্তিটি বর্তমান থাকে। ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীরা হিন্দুদের ধর্ম জীবনে একটি বিশেষ নামে পরিচিত হন। নামটি হইল পরিব্রাজক। বরানগরের কয়েকজন সন্ন্যাসী শীঘ্র পরিব্রাজক হইতে চাহিলেন। সংঘ গঠনের প্রথম হইতেই তাঁহারা সকলে কখনো একত্রিত হইতে পারেন নাই। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ক্রিসমাসের সময় সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবসেও রামকৃষ্ণের দুইজন প্রধান শিষ্য—যোগানন্দ ও লাটু—উপস্থিত ছিলেন না। কেহ কেহ রামকৃষ্ণের বিধবা স্ত্রীর সহিত বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ—যেমন তরুণ সারদা—কোথায় যাইতেছেন সে বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ উধাও হইলেন। সংঘকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁহার উৎসাহ এবং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এইরূপ পলায়নের একটি বাসনা নরেনকেও

১ মানব জাতির গৌরবময় চিন্তাধারার সুবিস্তৃত পটভূমিকায় যিশু ও তাঁহার বাণীকে যে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমরা আবার লক্ষ্য করিব। এই হিন্দু সন্ন্যাসীরা "গুড ফ্রাইডে" উদ্‌যাপন করিতেন এবং সেণ্ট ফ্রান্সিসের স্তোত্রগুলি গাহিতেন। পাশ্চাত্ত্য ধর্ম সম্প্রদায়গুলির প্রতিষ্ঠাতা বিভিন্ন খৃস্টান সাধুদের সম্পর্কে নানা কথা নরেন তাঁহাদিগকে বলেন। তাঁহাদের বিছানার পাশে ভগবৎ গীতার সহিত The Imitation of Jesus Christ বইখানিও থাকিত। তবে তাঁহারা খৃস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার কথা কখনো ভাবেন নাই। তাঁহারা সকলেই চিরদিন অবিচলিত ভাবে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীই ছিলেন। তবে তাঁহারা তাঁহাদের ধর্মমতের মধ্যে অন্যান্য সকল ধর্মের সারাংশ গ্রহণ করেন। জোর্ডানের জল গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। ইহাতে যদি কোনো পশ্চিম দেশবাসী অনাচার লক্ষ্য করেন ও নাক সিটকান, তবে আমরা তাঁহাকে প্রশ্ন করিব, টাইবারের জলের সহিত প্যালেস্টাইনের জলের মিশ্রণ কি ইহা অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেয় ছিল?

দগ্ধ করিতে লাগিল। নবজাত সংঘের পক্ষে প্রয়োজন ছিল স্থানের স্থিরতা। কিন্তু এই প্রয়োজনের সংগে তাঁহার ভ্রমণোন্মুখ আত্মাকে কিভাবে খাপ খাওয়ানো সম্ভব ছিল? তাঁহার আত্মা যে আকাশের মহাসমুদ্রে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে—এই কপোতকুটিরের রুদ্ধ কোটরে তাঁহার শ্বাস যে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে! তাই স্থির হইল, অন্তত পক্ষে সংঘের একটি দলকে সর্বদাই বরানগরে থাকিতে হইবে; আর অন্যেরা "অরণ্যের ডাকে" সাড়া দিবেন। ইহাদের মধ্যে একমাত্র শশী-ই কখনো আশ্রম ত্যাগ করেন নাই। তিনি ছিলেন মঠের বিশ্বস্ত প্রহরী, মঠের সুস্থির কেন্দ্র; তিনি ছিলেন সেই পায়রাখোপের চাল, যেখানে ভবঘুরে পাখীর দল ভ্রমণ শেষে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেন[১]।

পলায়নের আহ্বানকে নরেন দুই বৎসর প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছিলেন। অল্প কিছু দিনের জন্য অন্যত্র গেলেও তিনি ১৮৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানত বরানগরেই ছিলেন। এবার তিনি হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তিনি নিঃসংগ ছিলেন না; তাঁহার সংগে একজন সংগী থাকিতেন। তাঁহার মধ্যে পলায়নের বাসনা অত্যন্ত তীব্র হওয়া সত্ত্বেও প্রথম আড়াই বছর তিনি প্রায়ই সহকর্মীদের ডাকে বা কোনো আকস্মিক প্রয়োজনে আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন। তারপর কিন্তু পলায়নের পবিত্র উন্মত্ততা তাঁহাকে যেন পাইয়া বসিল। যে ব্যাকুল বাসনাকে তিনি পাঁচ বৎসর চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সকল বাধাবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফাটিয়া পড়িল। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে তিনি একাকী, নিঃসংগ, নামহীন অবস্থায় দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে অজ্ঞাত ভিক্ষুকের মতো বাহির হইয়া পড়িলেন এবং কয়েক বৎসরের জন্য ভারতের মহা নিঃসীমতায় নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

কিন্তু এই উদ্‌ভ্রান্ত যাত্রীকে গোপন একটি যুক্তি সর্বদাই পরিচালিত

১ আমি আগেই বলিয়াছি, স্বাধীনচেতা রামকৃষ্ণ অন্যান্য গুরুর মতো তাঁহার শিষ্যদিগকে প্রচলিত প্রথা অনুসারে দীক্ষা দেন নাই। (সেজন্য পরে বিবেকানন্দকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল।) ১৮৮৮ বা ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে বিবেকানন্দ ও তাঁহার সতীর্থরা নিজেরা বরানগর আশ্রমে বিরজা হোম করিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী অশোকানন্দ আমাকে জানাইয়াছেন যে, ভারতে আর এক প্রকার সন্ন্যাস গ্রহণ রীতি প্রচলিত আছে। সাধারণত আনুষ্ঠানিক ভাবে যে সন্ন্যাস গৃহীত হয়, তাহার অপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠ। যদি কেহ জীবন সম্পর্কে গভীর বৈরাগ্য অনুভব করেন এবং ভগবৎ-পিপাসায় অধীর হন, তবে একাকী নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার আনুষ্ঠানিক দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। বরানগরের স্বাধীনচেতা সন্ন্যাসীদের পক্ষেও নিঃসন্দেহে তাহাই ঘটিয়াছিল।

করিতেছিল। "ভগবানের সাক্ষাৎ না পাইলে, কখনো তুমি ভগবানের সন্ধান করিতে না।"[১]—যে-সকল আত্মাকে প্রচ্ছন্ন বিধাতায় পাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে এই অমর কথাগুলি যতোখানি সত্য, অন্যত্র তেমনটি নহে। এই সকল আত্মার উপর যে মহান কর্তব্য ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহার গোপন তাৎপর্য কি, তাহা টানিয়া বাহির করিবার জন্যই তাঁহারা বিধাতার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন।

নরেনের কোনো সন্দেহ-ই ছিল না যে, একটি মহান কর্তব্য তাঁহার প্রতীক্ষায় আছে। একথা তাঁহার শক্তি ও প্রতিভা তাঁহার মনের মধ্যে কেবলই বলিতেছিল। সেই যুগের উন্মাদনা, তৎকালীন দুঃখ-বেদনা, তাঁহার চতুর্দিক হইতে উত্থিত নির্যাতিত ভারতের নীরব নিঃশব্দ আবেদন, ভারতের অতীত শক্তির সমারোহ ও তাহার অপূর্ণ ভবিষ্যৎ, ভারতীয়দের পতনের করুণ বৈপরীত্য, মৃত্যুর ও নবজন্মের, প্রেম ও নৈরাশ্যের দুঃসহ যাতনা—তাঁহার অন্তরকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কিন্তু কি সে কর্তব্য? কে তাঁহাকে তাহা বলিয়া দিবে? তাহা বলিয়া দিবার আগেই ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। আর যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ[২] কি তাহা বলিয়া দিতে পারেন? পারেন কেবল ভগবান। তবে তিনিই বলুন। কিন্তু তিনি নীরব কেন? নিরুত্তর কেন?

নরেন ভগবানের সন্ধানেই চলিলেন।

---

১ প্যাশ্কাল্।

[প্যাশ্কাল্—ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক।—অনুঃ।]

২ একজন মাত্র ছিলেন—গাজীপুরের পওহরি বাবা। এই সাধুকে ভারতের জ্ঞান-বৃদ্ধরা সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন। বারাণসীর নিকটে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এই মহর্ষির জন্ম হয়। তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন দ্রাবিড় ভাষা ও প্রাচীন বাংলা ভাষা তিনি জানিতেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করেন এবং পরে নির্জনে কৃচ্ছ্র সাধনে নিযুক্ত হন। তাঁহার নির্ভয় আত্মার প্রশান্তি, তাঁহার বলিষ্ঠ বিনয় তাঁহাকে পৃথিবীর সকল ভীতিপ্রদ বাস্তবতার সম্মুখীন হইতে শিক্ষা দিয়াছিল। এই শিক্ষার ফলেই একবার তাঁহাকে বিষাক্ত সাপে দংশন করিলে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, "ইহাকে আমার প্রেমময়ই পাঠাইয়াছেন।" তাই তাঁহার প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সকলেই আকৃষ্ট হন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সহিত দেখা করেন। এমন কি রামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই বিবেকানন্দও তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। (পওহরি রামকৃষ্ণকে পুণ্যাত্মা বলিয়া মানিতেন।) রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর নরেন যখন অনিশ্চয়তার মধ্যে দুলিতেছিলেন, তখন তিনি আবার তাঁহার সহিত দেখা করেন। তিনি রোজ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার শিষ্যত্ব প্রায় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি দীক্ষা লইতেও চাহিয়াছিলেন। আত্মার এক ব্যাকুল সংঘাত তাঁহার মধ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া চলিল। তিনি

হঠাৎ ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বারাণসী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হাথরাস ও হিমালয় পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণকালে যে সকল সতীর্থ তাঁহার সংগে ছিলেন বা তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন[১], তাঁহাদের বিবরণী হইতে ভিন্ন এই ভ্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তাঁহার পরবর্তী ভ্রমণগুলিও এইরূপ অজ্ঞাত থাকে। নরেন তাঁহার ধর্মমূলক এই অভিজ্ঞতা-গুলিকে গোপন রাখেন। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে বৃন্দাবন ছাড়িবার পর তাঁহার প্রথম তীর্থযাত্রাগুলির কালে ছোট রেল স্টেশন হাথরাসে তিনি নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই তাঁহার প্রথম শিষ্য করেন। কয়েক মুহূর্ত আগেও লোকটি তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি বিবেকানন্দের দৃষ্টির আকর্ষণ এড়াইতে পারিলেন না, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বিবেকানন্দের অনুসরণ করিলেন এবং চিরজীবন তাঁহার নিকট বিশ্বস্ত রহিলেন। ইঁহার নাম শরৎচন্দ্র গুপ্ত (ইনি সদানন্দ নাম গ্রহণ করেন)[২]। তাঁহারা ভিখারীর ছদ্মবেশে ঘুরিতে লাগিলেন; প্রায়ই বিতাড়িত হইলেন; অনেক সময় ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল; তাঁহারা জাতিভেদ মানিলেন না; এমন কি, অস্পৃশ্যদের হুঁকাতেও তামাক খাইলেন। সদানন্দ পীড়িত

রামকৃষ্ণ ও পওহরি বাবা, এই দুইজনের দুই রূপ ইন্দ্রিয়াতীত আকর্ষণের মধ্যে দুলিতে লাগিলেন। ভগবৎ-সমুদ্রে পৌঁছিবার যে তৃষ্ণা, পওহরি বাবা তাহা মিটাইতে পারিতেন। তাহাতে ব্যক্তিগত আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতে হয়; তাহাতে ফিরিবার কথা ভাবিবার বিন্দুমাত্র সুযোগ থাকে না। পার্থিব জীবন ও মানুষের সেবার পথ হইতে বিমুখ হইয়া তিনি যে দুঃসহ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, পওহরি বাবা সেই আততার অপনোদন করিতে পারিতেন। কারণ পওহরি বাবার মতে, মানুষ দৈহিক শক্তির সাহায্য না লইয়া কেবল আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারাই অপরের সেবা ও সহায়তা করিতে পারে। তাঁহার মতে, তীব্রতম সমাধিই হইল তীব্রতম কর্ম। কোন্ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁহার এই বাণীর ভয়ংকর আকর্ষণকে উপেক্ষা করিতে পারেন? নরেন প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া এই বাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু তিন সপ্তাহের প্রতি রাত্রেই রামকৃষ্ণের ধ্যান মূর্তি তাঁহাকে এ পথ হইতে বিরত করে। অবশেষে অন্তরলোকে তীব্রতম এক সংগ্রামের পর (এই সংগ্রামের ধারা সম্পর্কে বিবেকানন্দ কখনো কিছু প্রকাশ করেন নাই) তিনি চিরতরে তাঁহার পথ বাছিয়া লন। সে পথ হইল মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছেন সেই ভগবানের সেবার পথ।

১ সারদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, যোগানন্দ, তুরীয়ানন্দ, বিশেষত, অখণ্ডানন্দ। অখণ্ডানন্দই সর্বাপেক্ষা অধিক দিন তাঁহার সংগে ছিলেন।

২ [illegible] বিখ্যাত আমেরিকান শিষ্যা ভগিনী ক্রিস্টিনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা আমাকে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে ভগিনী ক্রিস্টিন এই ঘটনায় ও সদানন্দের চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের

হইয়া পড়িলে নরেন তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া বিপদ-সংকুল অরণ্য অতিক্রম করিলেন। তারপর তাঁহার পালা আসিল—তিনিও পীড়িত হইলেন। ফলে তাঁহারা উভয়ে বাধ্য হইয়া কলিকাতা ফিরিলেন।

প্রথম বারের এই পর্যটনকালেই বিবেকানন্দের সম্মুখে প্রাচীন ভারত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সেই সনাতন শাশ্বত ভারত, সেই বৈদিক ভারত, সেই ইতিবৃত্ত ও

সুন্দর একটি বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের নিকট হইতে সংগোপনে তিনি যে সকল সংবাদ আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সদানন্দ ছিলেন হাথরাসের তরুণ স্টেশন মাস্টার। তিনি নরেনকে ক্ষুধায় মুমূর্ষু অবস্থায় স্টেশনে আসিতে দেখেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতে বিমুগ্ধ হন। পরে সদানন্দ বলেন, "আমি ঐ ভয়ংকর চোখ দুটির পিছু লইলাম।" বিবেকানন্দ যখন বিদায় লইলেন তখন তিনিও চির জীবনের জন্য এই অতিথির সংগে বিদায় হইলেন।

এই দুই যুবকই ছিলেন শিল্পী ও কবি। সদানন্দ সুশিক্ষিত হইলেও তাঁহার কাছে বুদ্ধিবৃত্তির স্থান সর্বাগ্রে ছিল না। (সদানন্দ পারসিক ভাষা শিক্ষা করেন এবং সুফীবাদ কর্তৃক প্রভাবিত হন।) কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে বুদ্ধিবৃত্তির স্থানই ছিল সর্বাগ্রে। তবে বিবেকানন্দের মতো সদানন্দের-ও ছিল তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ; গ্রামাঞ্চলের দৃশ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার মতো বিবেকানন্দের এমন ভক্ত আর কেহই ছিল না। তাঁহার গুরুর সমস্ত সত্তা যেন তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি কেবল একবার চক্ষু মুদিয়া তাঁহার গুরুর চেহারা ও চালচলনের কথা ভাবিতেন, অমনি সংগে সংগে তাঁহার গুরুর সুগভীর ভাবে তিনি পূর্ণ হইয়া উঠিতেন। বিবেকানন্দ তাঁহাকে "আমার মানস-পুত্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।...সদানন্দ কুষ্ঠ রোগীর সেবা করিতেন, তাহাদিগকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিতেন; তিনি একবার একজন বসন্ত রোগীকে নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া-ছিলেন—তাহাতে যদি তাহার দেহের দুঃসহ দাহ কিছু প্রশমিত হয়। প্লেগের সময়ে যাঁহারা মিশনের ঝাড়ুদারবাহিনী গঠন করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী। তিনি অস্পৃশ্যদিগকে ভালোবাসিতেন এবং তাহাদের জীবনে অংশ লইতেন। অল্পবয়স্করা সকলে তাঁহার খুবই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার শেষ অসুখের সময় তাঁহার একদল ভক্ত পরম ভক্তিভরে তাঁহাকে জাগিয়া সর্বদা বসিয়া থাকিতেন—তাঁহারা নিজেদের নাম দিয়াছিলেন "সদানন্দের কুকুর"। তিনি তাঁহাদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সাধারণ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে দেন নাই—তিনি ছিলেন তাঁহাদের সাথী। তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আমি তোমাদের জন্য একটি মাত্র কাজ করিতে পারি—তোমাদিগকে স্বামীজীর কাছে লইয়া যাইতে পারি।" মাঝে মাঝে কঠোর হইতে পারিলেও তিনি সর্বদা আনন্দে ডগমগ করিতেন—তাঁহার নির্বাচিত নামটিও তাহাই বলে—এবং সেই আনন্দ তিনি তাঁহাদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেন। তাঁহারা চিরদিনই তাঁহার স্মৃতিকে তাই সাদরে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন।

এই সুদীর্ঘ টীকার জন্য আমার পাঠকরা আমাকে মাফ করিবেন। ইহাতে কাহিনীর সূত্র কতক পরিমাণে ছিন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্যের পুণ্যাত্মাদের জন্য ভারতের এই "ক্ষুদ্র পুষ্পটিকে" সযত্নে রক্ষিত করাকে আমি সাহিত্য শিল্পের প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এই পুষ্পটির চয়নের জন্য আমরা ভগিনী ক্রিস্টিনের নিকট ঋণী।

কিম্বদন্তীর গৌরবে মণ্ডিত অসংখ্য বীর ও অগণিত দেবতার ভারত, সেই দ্রাবিড়, আর্য ও মোগলের[১] মিলিত ভারত। প্রথম সংঘাতেই তিনি ভারত ও এশিয়ার আধ্যাত্মিক ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং এই [illegible] কথা তিনি তাঁহার বরানগরস্থ সতীর্থগণকে জানাইলেন।

১৮৮৯ খৃস্টাব্দে যখন তিনি গাজীপুরে দ্বিতীয় বার ভ্রমণ সারিয়া ফিরিলেন, তখন তিনি যেন "মানবতার বাণী"র কিছু আভাস বহিয়া আনিলেন—যে মানবতার বাণী পশ্চিমের নূতন গণতন্ত্রগুলিতে অজ্ঞাতে অন্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইতেছিল। প্রাচীন দৈব অধিকারের আদর্শ, যাহা পূর্বে একটিমাত্র ব্যক্তিকে অধিকার দিত, তাহা কেমন করিয়া পশ্চিম জগতে ক্রমশ শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলের অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, এবং কিভাবে মানবের অধ্যাত্ম শক্তি 'প্রকৃতির' ও 'পরম ঐক্যের' ঐশী ভাবকে উপলব্ধি করিতেছে, সে সম্পর্কেও তিনি তাঁহার সতীর্থদিগকে বলিলেন। ইউরোপে ও আমেরিকায় গণতন্ত্রের এই ভাবগুলি কিভাবে সফল হইয়াছে, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন এবং সেই ভাবগুলি যে ভারতে প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন, একথাও তিনি অবিলম্বে ঘোষণা করেন। এইভাবে প্রথম হইতেই তাঁহার মধ্যে এক স্বাধীন ও মহৎ চিত্তের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়—যে-চিত্ত সর্বসাধারণের মংগল এবং সর্বমানবের মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়া মানুষের মানসিক উন্নতি চায় ও সেজন্য চেষ্টা করে।

অতঃপর ১৮৮৯ ও ১৮৯০ খৃস্টাব্দে তিনি যখন কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদ ও গাজীপুর ভ্রমণে যান, তখন তাঁহার এই সার্বজনীন ধারণাটি আরো বিকাশ লাভ করে। গাজীপুরে কয়েকটি সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে, বৈদান্তিক চিন্তাধারা ও বর্তমান সমাজ চেতনার মধ্যে, পরমাত্মা ও অসংখ্য দেবদেবীর মধ্যে,—অসংখ্য দেবদেবীর ধারণা সকল ধর্মেরই "নিম্নস্তরে" বর্তমান থাকে; মানুষের দুর্বলতার জন্য সেগুলির প্রয়োজনও আছে; কারণ, সেগুলি অস্পষ্ট জ্ঞানের দিক হইতে সবই সত্য—এবং মানব চেতনা ধীরে ধীরে সত্তার যে ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত হয়, সেই ঊর্ধ্বলোক গমনের বিভিন্ন স্তর ও রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের পথে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।

এসব এখনো পর্যন্ত ক্ষণিক আলোকোদ্ভাস,—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্থূল পরিকল্পনা

---

১ আগ্রায় মোগল যুগের কীর্তির সমারোহ দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলেন। অযোধ্যা রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে ও বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে তিনি নূতন করিয়া বাঁচেন। হিমালয়ে নির্জনতায় গিয়া তিনি বেদের কথা নিবিড়ভাবে চিন্তা করেন।

ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু সেগুলি সবই তাঁহার মস্তিকে সঞ্চিত হইতেছিল এবং সেখানে পচন-ক্রিয়া চলিতেছিল। বরানগরে আশ্রমিক জীবনের নিত্য নিয়মিত কর্তব্য এবং সতীর্থদের সহিত আলাপ-আলোচনার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেও এই তরুণের হৃদয়ে একটি দুর্বার শক্তি ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইতেছিল। এই শক্তিকে আর ধরিয়া রাখা সম্ভব ছিল না। তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে, তাঁহার জীবনযাত্রা পদ্ধতি, তাঁহার নাম, তাঁহার দেহ, তাঁহার সকল নিগড়—নরেন বলিয়া যাহা কিছু ছিল—দূরে নিক্ষেপ করিতে এবং ভিন্নতর জীবন, ভিন্নতর নাম ও ভিন্নতর দেহের সাহায্যে যাহার মধ্যে তাঁহার মধ্যস্থিত নবজাত বিরাট পুরুষ স্বাধীনভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে পারে, এমন একটি ভিন্নতর সত্তার সৃজন করিতে, নবজন্ম লাভ করিতে, এই শক্তি কেবলই তাঁহাকে তাড়া দিতেছিল। এই নবজাতকই হইয়াছিলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু সূতিকা-গৃহের বস্ত্রাচ্ছাদনে এই নবজাতকের কণ্ঠরোধ হইতেছিল। তাই তিনি গার্গাঞ্চুয়ার[1] সেই বস্ত্রাচ্ছাদন ছিন্ন করিলেন।...ইহাকে আর তীর্থযাত্রার ডাক বলা চলে না। কারণ, তীর্থযাত্রীরা মানুষের কাছে বিদায় লইয়া ভগবানের অনুসরণ করেন। কিন্তু এই তরুণ যোদ্ধা শক্তির অব্যবহারের ফলে মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই এই সময় শক্তির উত্তেজনায় তিনি একটি কঠিন উক্তি করেন। তাঁহার ধর্মভীরু শিষ্যরা সেটিকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেনারসে তিনি বলেন :

"আমি যাইতেছি ; কিন্তু যতোদিন না আমি সমাজের উপর বোমার মতো ফাটিয়া পড়িতে পারি, যতোদিন সমাজকে অনুগত ভৃত্যের মতো আমার অনুসরণ করাইতে না পারি, ততোদিন আমি ফিরিব না।"

এই দম্ভ ও উচ্চাশার দানবকে তিনি কি ভাবে স্বহস্তে দমন করিয়া তাহাদিগকে অতীব বিনয় ভরে দীনহীনের সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। তবু দম্ভ ও উচ্চাশার যে বর্বর শক্তি তাঁহার শ্বাসরোধ করিতেছিল, তাহার কথা ভাবিয়া দেখিলেও আমরা কম আনন্দিত হই না। কারণ, তিনি শক্তির আধিক্যে ভুগিতেছিলেন ; এই শক্তির আধিক্য কেবলই তাঁহাকে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য প্ররোচিত করিতেছিল—তাঁহার মধ্যে বাস করিতেছিল একজন নেপোলিয়ান।

এই ভাবে ১৮৯০ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের গোড়াতেই তিনি তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত বরানগর আশ্রম ত্যাগ করিয়া, একবার কয়েক বৎসরের জন্য,

১ গার্গাঞ্চুয়া—রাবলে বর্ণিত কাহিনীর নায়ক।—অনুঃ

বাহির হইলেন। তাঁহার পক্ষ তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া গেল। প্রথমে তিনি তাঁহার এই দীর্ঘ যাত্রার জন্ত "মা-"র (রামকৃষ্ণের বিধবা পত্নীর) কাছে আশীর্বাদ আনিতে গেলেন। তিনি সকল বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া হিমালয়ের নির্জনতায় চলিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু সকল শ্রেয় বস্তুর মধ্যে নির্জনতাকে (ইহা মহাসম্পদ! ইহা সামাজিক জীবের মহাতংক!) আয়ত্ত করাই সর্বাপেক্ষা কঠিন। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, সকলেই বাধা দিবেন। (টলস্টয় ইহা জানিতেন। আস্তাপভোতে মৃত্যু-শয্যা গ্রহণের আগে তিনি ইহাকে কখনো আয়ত্ত করিতে পারেন নাই···।) সামাজিক জীবন ত্যাগ করিয়া যাঁহারা পলায়ন করেন, সামাজিক জীবন তাঁহাদের কাছে অনেক কিছুই দাবী করে আর সেই পলাতক যদি কোনো তরুণ বন্দী হন, তবে দাবীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া যায়। নরেন নিজের ও যাঁহারা তাঁহাকে ভালোবাসিতেন, তাঁহাদের বিনিময়ে এই সত্য আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার সতীর্থ সন্ন্যাসীরা তাঁহার সংগে যাইতে চাহিলেন। তাঁহাদের প্রায় সকলকেই নির্মমভাবে তিনি বিদায় দিলেন[১]। কিন্তু এই সংসার তাহার কথা তাঁহাকে ভুলিতে দিতে চাহিল না। তাঁহার ভগ্নীর মৃত্যু তাঁহার নির্জন-লোকে গিয়াও হানা দিল। তাঁহার ভগ্নী ছিলেন হৃদয়হীন সমাজের বেদীমূলে প্রদত্ত করুণ একটি বলি। ভগ্নীর কথা মনে পড়িতেই তাঁহার মনে পড়িল হিন্দু নারীর নিঃসহায় দুর্ভাগ্যের কথা, জাতির শোচনীয় সমস্যাগুলির কথা। এই সকল সমস্যা হইতে দূরে নির্লিপ্ত দর্শক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাও তাঁহার কাছে অপরাধ বলিয়া মনে হইল। পর পর কয়েকটি পারিপার্শ্বিক ঘটনা—সেগুলি পূর্ব হইতে নির্ধারিত ছিলও বলা চলে—"নির্জনতার আনন্দলোক, একমাত্র আনন্দ-লোক[২]" হইতে তাঁহাকে নিরন্তর বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। যখনই তাঁহার মনে হইল যে, এবার তিনি নির্জনতার আনন্দলোক আয়ত্ত করিয়াছেন, ঠিক তখনই, সেই মুহূর্তে হিমালয়ের নৈঃশব্দ হইতে তিনি মানবতার ধূলিধূসর কোলাহলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এইরূপ মানসিক অশান্তি এবং তৎসহ অনাহার ও

১ অখণ্ডানন্দ তাঁহার সহিত হিমালয়ে গিয়াছিলেন, সেখানে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। আলমোড়ায় সারদানন্দ ও কৃপানন্দের সহিত এবং ইহার অল্পদিন বাদে তুরীয়ানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা সকলেই নরেনের সংগে ছিলেন। ১৮৯১-এর জানুয়ারীর শেষাশেষি মীরাটে নরেন তাঁহাদের নিকট বিদায় লন। কিন্তু সস্নেহ উদ্বেগে তাঁহারা দিল্লী পর্যন্ত সংগে যান। ফলে নরেন ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্ত তাঁহাদিগকে আদেশ দেন।

২ "Beata Solitudo, Sola Beatitudo"—এই কথাগুলি আছে।—অনুঃ

শ্রান্তির ফলে হিমালয়ের পাদদেশে গংগাতীরে হৃষীকেশ ও রুদ্রপ্রয়াগে দুইবার তাঁহার কঠিন পীড়া হইল। তিনি ডিপথেরিয়ায় মরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। ফলে তাঁহার পক্ষে তাঁহার এই নিঃসংগ মহাযাত্রা সম্পন্ন করা আরো কঠিন হইয়া উঠিল।

যাহাই হউক, এই যাত্রা সুসম্পন্ন হইল। তিনি যদি মরিতেন—তবে তিনি পথেই মরিতেন, তাঁহার নিজের পথে—যে-পথ তাঁহাকে তাঁহার ভগবান দেখাইয়া দিয়াছিলেন। বন্ধুবান্ধবের বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও ১৮৯১ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি একাকী দিল্লী ত্যাগ করিলেন। এ ছিল এক মহাপ্রয়াণ। তিনি ডুবরির মতো ভারতের মহাসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভারতের মহাসমুদ্রই তাঁহার পথরেখাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। মহাসমুদ্রে ভাসমান অসংখ্য খড়কুটার মধ্যে, অপর শত শত সন্ন্যাসীর মধ্যে, তিনি একজন গৈরিকবাসপরিহিত সন্ন্যাসী মাত্র হইয়া রহিলেন—তাহার অধিক কিছুই না। কিন্তু প্রতিভার অনল তাঁহার চক্ষে জ্বলিতে লাগিল। সকল ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তিনি যে ছিলেন রাজপুত্র!

২

ভারত-তীর্থের যাত্রী

স্বাধীনতা ও সেবা—তাঁহার প্রকৃতিগত এই দুই সমস্যার যথাযথ সমাধান আপনা হইতেই মিলিল তাঁহার দুই বৎসরব্যাপী ভারত পরিক্রমায় এবং তৎপরে তিন বৎসরব্যাপী বিশ্ব-ভ্রমণে। (এই বিশ্ব-ভ্রমণ কি তাঁহার প্রাথমিক পরিকল্পনার অংশ ছিল?) তিনি অবিরাম একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংগে রহিলেন কেবল ভগবান। তাঁহার না রহিল কোনোরূপ জাতি বিচার, না রহিল কোনো গৃহ। তাঁহার জীবনে আর এমন একটি মুহূর্তও রহিল না, যখন তিনি গ্রামে ও নগরে, কি ধনী, কি দরিদ্র জীবিত নরনারীর দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্যায়-অবিচার, উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য হইতে দূরে থাকিতে পারিলেন। তিনি তাহাদের জীবনের সহিত একাকার হইয়া তাহাদেরই একজন হইয়া গেলেন। জীবনের মহাগ্রন্থ তাঁহার সম্মুখে বর্তমানের বেদনাক্লিষ্ট সকরুণ মুখখানি উন্মোচিত করিয়া ধরিল। তিনি দেখিলেন, মানুষের মধ্যে ভগবান কীভাবে সংগ্রাম করিতেছেন। তিনি শুনিলেন, ভারতের তথা বিশ্বের জনসাধারণ কীভাবে সাহায্যের প্রার্থনায় কাতর আর্তনাদ করিতেছে। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার মতো নব ইডিপাসের কর্তব্য কি—যে ইডিপাসের কর্তব্য ছিল স্ফিংসের হিংস্র চঞ্চুর কবল হইতে হয় থিবিসকে রক্ষা করা, নয় থিবিসের সংগে মৃত্যুকে বরণ করা। গ্রন্থশালার সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াও এই শিক্ষা তিনি পাইতেন না। (কারণ, গ্রন্থগুলি, যতোই হউক, সঞ্চয়ন মাত্র।) এমন কি, রামকৃষ্ণের প্রবল প্রেমের স্পর্শেও এই শিক্ষা তিনি আভাসে, অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে, যেন স্বপ্নের মধ্যেই, পাইয়াছিলেন।

"ভ্রমণ-বর্ষগুলি। শিক্ষালাভের বর্ষগুলি[১]।" কী অপূর্ব শিক্ষা!...তিনি কেবল দীন-দরিদ্রের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের জীবনের অংশ গ্রহণ করেন নাই; তিনি সকল প্রকার মানুষের সহিত সমান অবস্থায় থাকিয়া সকলের জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আজ তিনি ঘৃণিত লাঞ্ছিত ভিক্ষুক—কোনো অস্পৃশ্যের আশ্রয়ে রহিয়াছেন; কাল তিনি মহামান্য অতিথি—কোনো মহারাজা বা মহামাত্যের সহিত সমানভাবে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। আজ তিনি নিপীড়িতের বন্ধু, তাহার সেবা করিতেছেন। কাল তিনি ধনীর বিলাসের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের

১ গ্যেটে।

সুপ্ত হৃদয়ে জনসেবার চেতনা জাগাইয়া তুলিতেছেন। বিদ্বজ্জনের বিস্তার সহিত যেমন ছিল তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, জনসাধারণের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে যে গ্রাম্য ও নাগরিক অর্থনীতি, তাহার সম্পর্কেও তাঁহার ছিল তেমনি পরিপূর্ণ চেতনা। তিনি কেবলই শিখিতেছিলেন, শিখাইতেছিলেন, নিজেকে ধীরে ধীরে করিয়া তুলিতেছিলেন সমগ্র ভারতের বিবেক, ভারতের ঐক্য, ভারতের নিয়তি। এগুলি সমস্তই তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং বিশ্ব এগুলিকে বিবেকানন্দ রূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।)

তিনি রাজপুতানার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। এবং আলোয়ার (১৮৯১ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে মার্চ পর্যন্ত), জয়পুর, আজমীড়, ক্ষেত্রী, আমেদাবাদ ও কাথিয়াবাড় (সেপ্টেম্বরের শেষে), জুনাগড় ও গুজরাট, পোরবন্দর (এখানে আট-নয় মাস তিনি থাকেন), দ্বারকা, কাম্বে উপসাগরের তীরবর্তী মন্দিরময় শহর পলিতানা, বরোদা রাজ্য, খাণ্ডোয়া, বোম্বাই, পুণা, বেলগাঁও (১৮৯০এর অক্টোবর), মহীশূর রাজ্যের বাংগালোর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাংকুর রাজ্য, ত্রিবন্দরম্, মাদুরা—প্রভৃতি স্থানে তিনি পর্যটন করেন।···তিনি এই ত্রিকোণাকার মহাভূমির একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে—দক্ষিণ ভারতের বারাণসী, রামায়ণের রোম রামেশ্বরে ও দেবী-তীর্থ কন্যাকুমারিতে গিয়া উপস্থিত হন (১৮৯২-র শেষে)।

উত্তর হইতে দক্ষিণে সর্বত্রই ভারতের এই প্রাচীন ভূমি অসংখ্য দেব-দেবীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু সে দেব-দেবী অবিরাম অগণিত বাহুমালা একটি মাত্র ভগবানেই রূপায়িত হইয়াছে। দেহে ও মনে তাঁহাদের যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেন। সকল জাতির ও বিজাতির সকল মানুষের সহিত মিশিয়াও এই ঐক্যের কথা তিনি বুঝিতে পারেন। এই ঐক্য উপলব্ধি করিতে তিনি সকলকে শিক্ষা দেন। একে যাহাতে অন্যকে বুঝিতে পারে, সেজন্য তিনি একের বাণী অন্যের নিকট বহিয়া লইয়া যান—যাঁহারা অতিমানসিক শক্তির অধিকারী, যাঁহারা ভাবনার চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাঁহাদিগকে তিনি দেব-মূর্তিগুলিকে শ্রদ্ধা করিতে বলেন; যুবকদিগকে তিনি বেদ, পুরাণ, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদি পড়িতে এবং তাহার চেয়েও বেশি করিয়া বর্তমান মানুষকে বুঝিতে বলেন; এবং সকলকে তিনি বলেন, মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে ধর্মের আবেগে ভালোবাসিতে, তাহার মুক্তির জন্ত আকুল হইয়া আত্মবলি দিতে।

যাহা তিনি দেন, তাহার অপেক্ষা তিনি কম পান না। তাঁহার বিরাট মানস

একটি দিনের জন্যও তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত না করিয়া ছাড়ে না[১]। ভারতের ভূমিতে যে চিন্তার ধারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ও প্রোথিত ছিল, সেগুলিকে তিনি আত্মসাৎ করেন। কারণ, তাঁহার মনে হইয়াছিল, সেগুলির সবগুলির উৎসই এক। যে সকল গোঁড়া ব্যক্তি স্রোতহীন কর্দমাক্ত জলাশয়ে হাবুডুবু খাইতেছিলেন, তাঁহাদের অন্ধ ভক্তি হইতেও যেমন, ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারকগণ যাঁহারা তাঁহাদের শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও অতীন্দ্রিয়তার নিগূঢ় শক্তির নিঝরগুলিকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছিলেন, তাঁহাদের ভ্রান্ত যুক্তিবাদ হইতেও তেমনি বিবেকানন্দ দূরে রহিলেন এবং দূরে থাকিয়া তিনি চাহিলেন, এই সমগ্র মহাদেশময় আত্মার গভীরে যে জটিল জলধারা বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, তাহাকে নিষ্কাশিত করিয়া সংগতিময় ও সুসংরক্ষিত করিয়া তুলিতে।

তিনি তাহার অপেক্ষাও বেশি চাহিলেন।—"ইমিটেশন্ অব ক্রাইস্ট" গ্রন্থখানি সর্বদাই তাঁহার সংগে থাকিত এবং তিনি ভগবদ্ গীতার পাশাপাশিই যিশুর বাণী-গুলিকেও প্রচার করিলেন[২]; তিনি যুবকদিগকে মনোযোগের সহিত পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান পাঠ করিতে বলিলেন[৩]।

কিন্তু কেবল চিন্তার জগতেই তাঁহার মনের প্রসার হইল না। অন্যান্য মানুষ এবং তাহাদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্বন্ধেও তাঁহার মানসলোকে একটি বিপ্লব ঘটিল। যদি কোনো যুবকের মধ্যে দম্ভ এবং তৎসহ বুদ্ধিবৃত্তির অসহিষ্ণুতা ও যাহা কিছু শুদ্ধির উচ্চ আদর্শে উপনীত হইতে পারে নাই, তাহার প্রতি আভিজাত্যপূর্ণ ঘৃণা বর্তমান থাকে, তবে তাহা নরেন্দ্রের মধ্যেই ছিল :

"আমার বয়স যখন বিশ (এ কথা তিনি নিজেই বলিতেছেন), তখন আমার মধ্যে সহানুভূতি ও আপসের মনোভাব আদৌ ছিল না। সকল বিষয়েই ছিল

---

১ ক্ষেত্রীতে তিনি তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত বৈয়াকরণের শিষ্য হন। আমেদাবাদে তিনি মোসলেম ও জৈন সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর শপথ গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি পোরবন্দরে প্রায় ন' মাস থাকেন এবং শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের কাছে দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্য পড়েন; রাজসভার একজন পণ্ডিত বেদ অনুবাদ করিতেছিলেন, তাঁহার সহিতও তিনি কিছুদিন কিছুদিন কাজ করেন।

২ কিন্তু খৃস্টান মিশনারীদের পরধর্ম সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার বিষয়ে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সেজন্য তিনি তাঁহাদিগকে কখনো ক্ষমা করেন নাই। তিনি যিশুর কথা বলিতেন, যে-যিশু সকলকে বুকে টানিয়া লইতেন।

৩ তিনি যখন রাজপুতানার আলোয়ারে তাঁহার মহাযাত্রা শুরু করেন (১৮৯১-র ফেব্রুয়ারি হইতে মার্চ), তখন তিনি ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় সুনির্দিষ্টতা, সুস্পষ্টতা ও বিজ্ঞানসম্মত

আমার বাড়াবাড়ি। কলিকাতায় রাস্তার যে ফুটপাতে থিয়েটার থাকিত, সেই ফুটপাত দিয়াও আমি চলিতাম না[১]।"

কিন্তু যখন তিনি তীর্থযাত্রার প্রথম কয়েক মাসে জয়পুরের নিকটে ক্ষেত্রীর মহারাজার বাড়িতে ছিলেন (এপ্রিল, ১৮৯১), তখন এক নর্তকী নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে বিনীত হইতে শিখাইয়াছিল। নর্তকী আসিতেই ঘৃণাভরে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজা তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। নর্তকী গাহিলেন :

"প্রভু! মেরে অবগুণ চিত ন ধরো।
সম-দরশী হ্যায় নাম তিহারো, চাহো তো পার করো।"[২]

নরেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই ছোট্ট গানটিতে যে অটল বিশ্বাস ছিল, তাহা চিরজীবনে জন্য তাঁহার উপর ছাপ রাখিয়া গেল। বহু বছর পরেও যখন একথা তাঁহার মনে পড়িত, তিনি অভিভূত হইয়া পড়িতেন।

একে একে তাঁহার কুসংস্কারগুলি কাটিল। এমন কি, যেগুলির মূল অতি গভীরে নিহিত বলিয়া তিনি ভাবিতেন, সেগুলিও গেল। হিমালয়ে তিনি তিব্বতীয়দের সহিত থাকিতেন। তিব্বতীয় স্ত্রীরা একই সংগে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করে। তিনি যে পরিবারে ছিলেন, সে পরিবারের একটি মেয়ে ছয় ভাইয়ের স্ত্রী ছিল। তিনি নবীন উৎসাহে তাহাদিগকে তাহাদের এই দুর্নীতির কথা বুঝাইতে গেলেন। তাহারা জবাব দিল : "একটি মেয়েকে একার জন্য রাখা! কী স্বার্থপরতা!" পর্বতের পাদদেশে সত্য ও শিখরদেশে বিভ্রান্তি!… পরিপার্শ্ব ভেদে যে নীতির পার্থক্য ঘটে, তাহা নরেন্দ্র উপলব্ধি করিলেন—অন্তত পক্ষে সেই সকল নীতির, যেগুলির পশ্চাতে ঐতিহ্যের বিরাট অনুমোদন থাকে। কেবল তাহাই নহে, প্যাশক্যালের মতো তিনি কোনো জাতির বা যুগের বিচারকালে সেই জাতির ও সেই যুগের মানদণ্ডকেই গ্রহণ করিলেন।

রীতির অভাবের নিন্দা করেন। তিনি পাশ্চাত্ত্যের সহিত এ বিষয়ে তুলনা করিয়া দেখান। তিনি চাহিয়াছিলেন, ভারতবাসীরা পাশ্চাত্ত্য রীতিতে উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং তাহা হইলে হিন্দু ঐতিহাসিকগণের একটি তরুণ সম্প্রদায় ভারতের অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন। তাহাতে সত্যকার জাতীয় শিক্ষা হইবে। তাহাতে প্রকৃত জাতীয় চেতনা জাগিবে।

১ ১৮৯৬ সালের ৬ই জুলাই তারিখে লেখা পত্র। তিনি আরো বলেন : "তেত্রিশ বছর বয়সে আমি গণিকাদের সংগে একই গৃহে বাস করিতে পারিতাম।"

২ বৈষ্ণব কবি সুরদাসের কবিতা হইতে।

তিনি অতি নীচ জাতীয় চোরের সাহচর্যে-ও আসিলেন। তিনি এমন কি নিষ্ঠুর দস্যুদের দেখিয়াও বলিলেন, "ইহারা পাপী; তবে ইহাদের মধ্যেও পুণ্যার্জনের শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে[১]।" সর্বত্রই তিনি নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের সহিত মিশিয়া তাহাদের দৈন্য ও লাঞ্ছনার অংশ গ্রহণ করিলেন। মধ্য ভারতে তিনি কিছুদিন একটি পতিত মেথর পরিবারে বাস করেন। এই সকল মানুষ, যাহারা সমাজের নিচে নত হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিক সম্পদের সন্ধান পাইলেন; তাহাদের দুঃখদৈন্য তাঁহার শ্বাসরোধ করিল। তাহা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন:

"ওরে আমার দেশ! আমার দেশ!..."

নিজের বুক চাপড়াইয়া তিনি নিজেকে প্রশ্ন করিলেন, "আমরা সন্ন্যাসী, আমরা নাকি ভগবানের ভক্ত, আমরা এই অগণিত মানুষের জন্য কি করিয়াছি?"

রামকৃষ্ণের রূঢ় কথাগুলি তাঁহার মনে পড়িল:

"খালি পেটে ধর্ম হয় না।"

ধর্মের আত্মসর্বস্ব দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিল। তিনি ধর্মের প্রথম কর্তব্য ঘোষণা করিলেন: "দীনদুঃখীর যত্ন করো, তাহাদের উন্নতি করো।"[২] এই কর্তব্য তিনি কি ধনী, কি রাজকর্মচারী, কি রাজা-মহারাজা, সকলের উপর ন্যস্ত করিলেন:

"আপনাদের মধ্যে কি এমন কেহ নাই যিনি অপরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন? বেদান্ত পাঠ ও ধ্যানের সাধনা ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখুন! এ দেহ অপরের সেবায় উৎসর্গ করুন। তাহা হইলেই জানিব, আপনারা বৃথা আমার কাছে আসেন নাই।"[৩]

পরবর্তী কালে একদিন এই কথাগুলির মধ্যে-ও তাঁহার মর্মস্পর্শী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়াছিল:

"সর্বজীবের সমষ্টি যে ভগবান, একমাত্র সেই ভগবানেই আমি বিশ্বাস করি। সকল জাতির যাহার দুর্বৃত্ত, দরিদ্র, নিপীড়িত তাহারাই আমার ভগবান। এই

১ এক দস্যু পওহরি বাবার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। পরে তাহার অনুতাপ হয় এবং সে সন্ন্যাসী হইয়া যায়। এই দস্যুর সহিত বিবেকানন্দের দেখা হইয়াছিল।

২ ৭ম পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পাদটীক. দ্রষ্টব্য।

৩ এই কথাগুলি তিনি পরে বলিলেও ইহাতে তাঁহার যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই সময়েরই।

ভগবানের জন্ম আমি বারে বারে জন্মিতে চাই; জন্ম জন্ম দুঃখ পাইলে-ও আমার দুঃখ নাই!..."

এই সময়ে, ১৮৯২ খৃস্টাব্দে, ভারতময় তিনি যে দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমগ্র মন ব্যাপ্ত করিয়া রহিল, সেখানে আর কোনো চিন্তার বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। ভারতের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ইহা তাঁহার অনুসরণ করিল, যেমন করিয়া ব্যাঘ্র তাহার শিকারের অনুসরণ করে। নিদ্রাহীন রজনীতে ইহা তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিল। কুমারিকা অন্তরীপে ইহা তাঁহাকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন তিনি ইহার কবলেই তাঁহার দেহ ও আত্মাকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি দুঃস্থ মানবের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

কিন্তু কিভাবে তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন? তাঁহার না আছে সংগতি, না আছে সময়। দু-এক জন রাজা মহারাজার বা সদিচ্ছাপ্রণোদিত দু-চার জন লোকের দান দিয়া এই আশু প্রয়োজনের এক-সহস্রাংশের দাবী হয়তো মিটিতে পারে। কিন্তু ভারত তাহার পংগু অবস্থা হইতে উঠিয়া সার্বজনীন মংগলের জন্য সংঘদ্ধ হইবার আগেই ভারতের ধ্বংস সম্পূর্ণ হইবে। তিনি মহাসমুদ্রের পানে তাকাইলেন, তাকাইলেন মহাসমুদ্র পারের দেশগুলির দিকে। সমস্ত বিশ্বের কাছে তিনি আবেদন করিবেন। ভারতকে যে সমগ্র বিশ্বের চাই। ভারতের সুস্থ জীবন ও মৃত্যুর সহিত সমস্ত বিশ্ব জড়াইয়া আছে। মিশর, ক্যালডিয়া প্রভৃতি দেশগুলির মতো ভারতের মহা মানস সম্পদ-ও কি বিলুপ্ত হইবে? মিশর ও ক্যালডিয়াকে আজ মৃত্তিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সেখানে তো ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন আর কিছু-ই অবশিষ্ট নাই; চিরতরে সেগুলির আত্মার মৃত্যু হইয়াছে।... এই নিঃসংগ মনস্বীর মনে ভারতের পক্ষ হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার কাছে আবেদন পাঠাইবার কথা ক্রমেই দানা বাঁধিয়া উঠিল। সম্ভবত ১৮৯১-র শেষাশেষি জুনাগড় ও পোরবন্দর ভ্রমণের মধ্যবর্তী সময়েই তিনি একথা প্রথমে ভাবেন। পোরবন্দরে তিনি ফরাসী ভাষা শিখিতেছিলেন; সেখানে একজন পণ্ডিত তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণে যাইতে বলেন, বলেন যে, সেখানে তাঁহার চিন্তাগুলি তাঁহার নিজের দেশের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা পাইবে। তিনি বলেন:

"যাও, ঝঞ্ঝার বেগে উহাকে আক্রমণ কর এবং অধিকার করিয়া ফিরিয়া এস!"

১৮৯২ খৃস্টাব্দের শরৎকালের গোড়াতেই খাণ্ডোয়াতে তিনি শোনেন যে, পর বৎসর চিকাগোতে একটি ধর্ম সম্মিলন হবে। শুনিয়াই তাঁহার মনে হয়, উহাতে কি ভাবে অংশ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সেই সংগে ঐ পরিকল্পনাকে কার্যকরী

করিবার মতো কোনো ব্যবস্থা ইহতেও তিনি বিরত থাকেন এবং ভারত ভ্রমণের মহাব্রত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এজন্য কোনো আর্থিক সাহায্য লইতে-ও অস্বীকার করেন। অক্টোবরের শেষে তিনি বাংগালোরের মহারাজার নিকট সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, ভারতের অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশ-গুলিকে অনুরোধ করিবেন এবং উহার বিনিময়ে তিনি ভারতের বেদান্তের বাণী পশ্চিম দেশগুলিতে পৌছাইয়া দিবেন। ১৮৯২-এর শেষভাগে এ বিষয়ে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেন।

ঐ সময় তিনি ভারতের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন—সেখান হইতে রামায়ণে বর্ণিত দেবতা হনুমান লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন, সেখানে। কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন আমাদের মতোই মানুষ; তিনি দেবতার মনের কথা বুঝিতেন না। তিনি পায়ে হাঁটিয়া বিশাল ভারতভূমি পরিক্রম করিয়াছেন, দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তাঁহার দেহ ভারতের মহাদেহের সংস্পর্শে আসিয়াছে; তিনি ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছেন; নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও শ্রদ্ধাহীন মানুষের হাতে পাইয়াছেন নির্যাতন। যখন তিনি কুমারিকা দ্বীপে গিয়া পৌছিলেন, তখন তিনি ক্লান্ত, কপর্দকশূন্য। এই তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করিবার জন্য নৌকায় চড়িয়া যাইবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নৌকার ভাড়া দিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তাই তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং রাজহংসের মতো সন্তরণ করিয়া মকর-সংকুল সমুদ্র হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এইভাবে তীর্থ ভ্রমণের ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। তিনি যেন পর্বত শিখরে দাঁড়াইয়া সমস্ত ভারত ভূমি সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিলেন। ভারত ভ্রমণ-কালে যে সকল চিন্তা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, সেগুলি উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘ দুই বৎসর কাল তিনি যেন উত্তপ্ত কটাহের মধ্যে বাস করিতে-ছিলেন, উত্তাপে দগ্ধ হইতেছিলেন, "জ্বলন্ত আত্মাকে" বহন করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন "ঝড়, ছিলেন ঝঞ্ঝা।"[১] পুরাকালে অপরাধীদিগকে জলস্রোতে ফেলিয়া দিয়া শাস্তি দেওয়া হইত। বিবেকানন্দ তাঁহার স্বকীয় সঞ্চিত শক্তির প্রপাতের মধ্যে নিমজ্জিত হইলেন; প্লাবনে তাঁহার সত্তার প্রাচীরগুলি ধ্বসিয়া পড়িল।[২] মৃত্তিকার এই সীমান্তে আসিয়া তিনি একটি মিনারে আরোহণ করেন; মিনারের

১ ১৮৯২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অভেদানন্দ বরোদা রাজ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; তিনি তাঁহার এই বর্ণনা দেন।

২ "আমি এক দুর্বার শক্তি অনুভব করি। মনে হয়, আমি বিস্ফোরণের মতো ফাটিয়া পড়িব। আমার মধ্যে এতো শক্তি আছে যে, আমার মনে হয়, আমি সমগ্র পৃথিবীকে আমূল বদলাইতে পারিব।"

বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার সম্মুখে বিশ্ব আপনাকে যেন মেলিয়ে ধরিল; পদতলে গর্জমান সমুদ্রের মতোই তাঁহার রক্তস্রোত কর্ণমূলে ধ্বনিত হইতে লাগিল; তাঁহার মনে হইল, তিনি নিচে পড়িয়া যাইবেন। তাঁহার মধ্যে দেবতাদের যে ব্যাকুল বিক্ষোভ চলিতেছিল, ইহাই হইল তাহার চূড়ান্ত আক্রমণ। সংগ্রাম যখন শেষ হইল, তখন তিনি জয়ী হইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার পথের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্য তিনি বাছিয়া লইয়াছেন।

তিনি ভারতের মহাভূমিতে সাঁতার দিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং দক্ষিণ হইতে চলিলেন উত্তরে। পায়ে হাঁটিয়া রামনাড ও পণ্ডিচেরি পার হইয়া পৌঁছিলেন মাদ্রাজে। এখানেই তিনি ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের প্রথম কয়েক সপ্তাহে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন যে তিনি পশ্চিম দেশে প্রচার ভ্রমণে যাইবেন।[১] তাঁহার খ্যাতি ইতিপূর্বেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মাদ্রাজে তিনি দুইবার থাকেন; তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে থাকে। এই মাদ্রাজেই তিনি তাঁহার ভক্ত শিষ্যের সর্বপ্রথম দলটি গড়িয়া তোলেন। এই শিষ্যরা তাঁহার কাছে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে কখনো পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি চলিয়া যাইবার পর তাঁহারা তাঁহাকে পত্র দিয়া, বিশ্বাস দিয়া ক্রমাগত সাহায্য করিতে থাকেন। তিনিও দূর দেশে থাকিয়া তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিয়া যান। তাঁহার জ্বলন্ত ভারত প্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে ব্যাকুল প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তোলে; তাঁহাদের উৎসাহে, আগ্রহে তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা বহু গুণে বাড়িয়া যায়। সকল প্রকার ব্যক্তিগত মোক্ষ সন্ধানের বিরুদ্ধে তিনি প্রচার চালাইতে থাকেন। তিনি বলেন, সর্বসাধারণের মুক্তি সাধন করিতে হইবে, মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে আবার জাগ্রত করিয়া সেগুলিকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতে হইবে।......

"সময় আসিয়াছে। ঋষিদের বিশ্বাস আবার প্রাণময় হইয়া উঠিবে, আপনার মধ্য হইতে আপনি আত্মপ্রকাশ করিবে।"

সমুদ্রযাত্রা করিবার জন্য রাজামহারাজারা ও ব্যাংকের মালিকরা তাঁহাকে টাকা দিতে চাহিলেন; কিন্তু সে টাকা তিনি লইলেন না। তাঁহার শিষ্যরা অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে প্রধানত মধ্যবিত্তের কাছেই আবেদন করিতে বলিলেন। কারণ,

১ ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি হায়দরাবাদে যে বক্তৃতা দেন, তাহার নাম ছিল "*My Mission to the West.*"

"আমি জনসাধারণ ও দীন-দুঃখীর পক্ষ হইতে যাইতেছি।"

তাঁহার তীর্থ পরিক্রমার শুরুতে তিনি যেমন 'মা'-র আশীর্বাদ লইয়াছিলেন, এই দূরতর যাত্রার সময়ে-ও তেমনি করিলেন। 'মা' তাঁহাকে সেই সংগে রামকৃষ্ণের আশীর্বাদও দিলেন। রামকৃষ্ণ 'মা'-কে স্বপ্নে তাঁহার প্রিয় শিষ্যের জন্য আশীর্বাদ পাঠাইয়াছিলেন।

বিদেশে-যাত্রা সম্পর্কে নরেন তাঁহার গুরুভাইদের কিছু জানাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। (তিনি নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধ্যানশীল, নীড়ের উষ্ণতায় অভ্যস্ত আত্মা খৃস্টান দেশে প্রচার ভ্রমণ ও জনসেবার কথা শুনিলে আঁতকাইয়া উঠিবে; অপরের কথা ভুলিয়া যাঁহারা নিজেদের মোক্ষ চিন্তায় নিযুক্ত আছন, এইরূপ চিন্তায় তাঁহাদের আত্মার পুণ্য প্রশান্তি বিনষ্ট হইবে।) কিন্তু তাঁহার যাত্রার প্রায় প্রাক্‌কালেই বোম্বাইএর নিকটে আবু রোড স্টেশনে দুই সতীর্থ ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সংগে তাঁহার হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদিগকে তিনি মর্মস্পর্শী আবেগের সহিত জানাইলেন, ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্যের আহ্বানকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহাই তাঁহাকে বিদেশে যাইতে বাধ্য করিতেছে। তাঁহার সে উক্তি বরানগরে পৌছিল এবং এক আলোড়নের সৃষ্টি করিল।[১]

"আমি সমস্ত ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি।...কিন্তু, ভাই, সর্বত্রই অমি জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া আকুল হইয়াছি, চোখের জল বাধা মানে নাই! আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, প্রথমে ইহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর না করিয়া ইহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইয়া কোনো লাভ হইবে না। এই কারণেই—জনসাধারণের মুক্তির অন্যতর উপায়ের সন্ধানেই—আমি এখন আমেরিকা চলিয়াছি।"[২]

১ তবে বরানগরের সন্ন্যাসীরা যে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেন, মনে হয় না। এমন কি আমেরিকা হইতে তাঁহার সগৌরবে ফিরিয়া আসার পরও প্রয়োজন হইলে ব্যক্তিগত জীবনের ধ্যান ধারণাকে গৌণ করিয়া বা বিসর্জন দিয়া যে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, তাঁহার এই যুক্তি তাঁহারা সহজে স্বীকার করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ ফিরিয়া আসিয়া নরেনের কথাগুলি বলিলে কেবলমাত্র একা অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর) ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে ক্ষেত্রীতে গিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সর্বসাধারণের শিক্ষার কাজে মন দেন।

২ "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন" (Life of the Swami Vivekananda) মহা গ্রন্থে উদ্ধৃত এই কথাগুলি তুরীয়ানন্দের স্মৃতিকথায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। তুরীয়ানন্দের স্মৃতিকথাগুলি স্বামী

তিনি ক্ষেত্রীতে গেলে তাঁহার বন্ধু ক্ষেত্রীর মহারাজা তাঁহার দেওয়ানকে সংগে দিয়া তাঁহাকে বোম্বাই-এ পৌছাইয়া দেন। বোম্বাই হইতেই বিবেকানন্দ জাহাজে চড়েন। এই যাত্রার সময় হইতেই তিনি লাল রেশমের পোশাক এবং

জ্ঞানেশ্বরানন্দ লিখিয়া লন এবং ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি তারিখে "দি মর্ণিং স্টার" পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ আবু পাহাড়ের নির্জনতায় গিয়া কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছিলেন। নরেনের সংগে দেখা হইবে, এমন প্রত্যাশা তাঁহারা করেন নাই। বিদেশ-যাত্রার কয়েক সপ্তাহ আগে আবু রোড স্টেশনে তাঁহার সংগে তাঁহাদের দেখা হয়। নরেন তাঁহাদিগকে তাঁহার পরিকল্পনা ও দ্বিধাবোধ সম্পর্কে বলেন এবং জানান যে, তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁহার উদ্দেশ্য পূরণের উপায়রূপেই ভগবান এই ধর্ম সম্মিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি কথার সুর তুরীয়ানন্দের মনে পড়ে।

নরেন বলিয়া উঠেন, "হরি ভাই! তোমাদের এই তথাকথিত ধর্মটাকে আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

রক্তের দ্রুত প্লাবনে তাঁহার মুখ রাঙা হইয়া উঠে। তাঁহার সমগ্র সত্তায় বিষাদ ও আকুল আবেগের একটি গভীর প্রকাশ ঘটে। তিনি তাঁহার একখানি কম্পিত হাত বুকের উপর রাখিয়া বলেন:

"আমার মনটা কিন্তু আরো অনেক, অনেক বড়ো হইয়াছে। আমি (অপরের দুঃখ বেদনা) অনুভব করিতে শিখিয়াছি। বিশ্বাস করো, বড়ো বেদনার সংগেই আমি অনুভব করিতেছি।"

আবেগে নরেনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইলে তিনি নীরব হন। তাঁহার দুই গণ্ড দিয়া অশ্রু অনর্গল বহিতে থাকে।

এই বর্ণনা দিতে গিয়া তুরীয়ানন্দ নিজেও অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন; তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া যায়। তিনি বলেন:

"যখন এই সকরুণ কথাগুলি শুনিতেছিলাম, স্বামীজীর সেই সমুন্নত বেদনা লক্ষ্য করিতেছিলাম, কল্পনা করিতেই পারো, তখন আমার সমগ্র চেতনায় কি ঘটিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, এ কি বুদ্ধেরই অনুভূতি ও বাণী নহে? মনে পড়িল, নরেন যখন বোধি বৃক্ষের তলে বসিয়া ধ্যান করিবার জন্য বোধ গয়ায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব যেন তাঁহার দেহে প্রবেশ করিলেন।...আমি স্পষ্টই দেখিলাম, সমগ্র মানব জাতির দুঃখবেদনা তাঁহার স্পন্দমান অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিয়াছে।"

তুরীয়ানন্দ আবেগভরে বলিয়া চলিলেন, "বিবেকানন্দের মধ্যে অনুভবের যে দুর্নিবার শক্তি বর্তমান ছিল, অন্ততপক্ষে তাহার একাংশও যিনি অনুভব করিতে না পারিবেন, তিনি কখনো কোনোমতে বিবেকানন্দকে বুঝিতে পারিবেন না।"

তুরীয়ানন্দ অনুরূপ আর একটি ঘটনার বর্ণনা দেন। তাহা বিবেকানন্দের আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর—সম্ভবত কলিকাতা বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়িতে ঘটিয়াছিল। তুরীয়ানন্দ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গেরুয়া পাগড়ী ব্যবহার করিতে থাকেন। এই সময়েই তিনি বিবেকানন্দ নামটি গ্রহণ করেন—যে বিবেকানন্দ নাম তিনি পৃথিবীর উপর ন্যস্ত করিতে যাইতেছিলেন।[১]

"আমি তাঁহার সংগে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, তিনি বারান্দায় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো পায়চারি করিতেছেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, আমাকে লক্ষ্য করিলেন না।...মীরাবাঈএর একটি বিখ্যাত গান গুনগুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। অশ্রুতে তাঁহার দুই চক্ষু ভরিয়া গেল। তিনি থামিয়া আলিসার উপর ভর দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হইল। তিনি গাহিতে লাগিলেন। বার বার করিয়া বলিলেন:

'ওরে আমার দুখের কথা কেউ বোঝে না।'

আবার বলিলেন, 'দুখ যে পেয়েছে, দুখ কি সে-ই বোঝে।'

একটি তীরের মতো তাঁহার কণ্ঠস্বর আমাকে বিদ্ধ করিল। তাঁহার দুঃখের কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না।...তারপর যেন চকিতে বুঝিলাম। তাঁহার মধ্যে যে করুণা তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিতেছিল, তাহারই রক্তধারা তাঁহার চোখের জল হইয়া প্রায়ই বিগলিত হইত। দুনিয়ার লোকে তাহা জানিত না।"

অতঃপর তুরীয়ানন্দ তাঁহার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন:

"এই যে রক্তধারা অশ্রুধারা হইয়া বিগলিত হইয়াছিল, তাহা কি ব্যর্থ হইয়াছে মনে করেন? দেশের জন্য পরিত্যক্ত তাঁহার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু, তাঁহার শক্তিমান হৃদয়ের প্রতিটি উদ্দীপ্ত উচ্চারিত ধ্বনি অসংখ্য বীরের জন্মদান করিবে। এই বীরের দল তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম দিয়া পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিবেন।"

১ এই নামের উৎপত্তি সম্পর্কে পূর্বেই বলিয়াছি। নামটি প্রথমে ক্ষেত্রীর মহারাজাই দেন। ভারত ভ্রমণ কালে নরেন ইচ্ছামতো এতো নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তিনি সাধারণত লোকচক্ষে ধরা পড়িতেন না। তাঁহার সহিত অনেকেরই দেখা হইত, তিনি যে কে, তাঁহারা বুঝিতে বুঝিতে পারিতেন না। ১৮৯২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুণাতে বিখ্যাত মনীষী ও ভারতীয় নেতা তিলক প্রথমে তাঁহাকে সাধারণ ভবঘুরে ভাবিয়া উপহাস করিতে থাকেন, কিন্তু পরে তাঁহার প্রদত্ত উত্তরগুলিতে বিপুল জ্ঞান ও বিরাট হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া যান। নরেন সেখানে দশ দিন থাকেন। কিন্তু তিলক তাঁহার প্রকৃত নাম জানিতে পারেন নাই। পরে আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর বিবেকানন্দের বর্ণনা ও প্রশস্তি যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছিল, কেবলমাত্র তখনই তাঁহার গৃহের সেই অজ্ঞাতনামা অতিথিকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন।

ধর্ম সম্মিলন ও পশ্চিমের পথে মহাযাত্রা

এই যাত্রা ছিল সত্যই বিস্ময়কর এক অভিযান। তরুণ সন্ন্যাসী চক্ষু মুদিয়া কেবল আকস্মিকের উপর নির্ভর করিয়াই চলিলেন। তিনি অস্পষ্টভাবে শুনিয়াছিলেন, আমেরিকার কোথাও কোনো এক সময়ে একটি ধর্ম সম্মিলন হইতেছে এবং তিনি সেই ধর্ম সম্মিলনে যাওয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বা তাঁহারা শিষ্যরা, কিম্বা ভারতীয় বন্ধুরা, ছাত্ররা, পণ্ডিতরা, রাজা-মহারাজারা, মহামাত্যরা, কেহই একটু কষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর লন নাই। সম্মিলনের তারিখ বা সম্মিলনে কিভাবে প্রবেশ করা যায়, সে সব ব্যাপারও তিনি কিছুই জানিতেন না। কোনোরূপ পরিচয়পত্রও তিনি সংগে লইলেন না। যেন যথাসময়ে—ভগবানের নির্ধারিত সময়ে—সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেই হইবে, এমন একটি স্থির বিশ্বাস লইয়া তিনি সোজা আগাইয়া চলিলেন। জাহাজে ক্ষেত্রীর মহারাজা তাঁহার জন্য টিকিট এবং তাঁহার বহু আপত্তি সত্ত্বেও, তাঁহার বাগ্মিতার মতোই নিষ্কর্মা আমেরিকানদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে, এমন সুন্দর একটি পোশাক আনিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই জলবায়ু বা রীতিনীতির কথা বিন্দুমাত্রও ভাবিলেন না। ফলে জাঁকজমকপূর্ণ এই ভারতীয় পরিচ্ছদে কানাডায় গিয়া পৌঁছার আগেই বিবেকানন্দ শীতে প্রায় জমাট হইয়া গেলেন।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে বোম্বাই হইতে রওনা হইয়া তিনি সিংহল, পেনাং, সিংগাপুর ও হংকং-এর পথে আগাইয়া চলিলেন। তারপর গেলেন ক্যাণ্টন ও নাগাসাকি। সেখান হইতে ওসাকা, কিওটো ও টোকিও দেখিয়া স্থলপথে গেলেন ইওকোহামা। সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলির উপর প্রচীন ভারতের ধর্মগত প্রভাব এবং এশিয়ার আধ্যাত্মিক ঐক্য সম্পর্কে তাঁহার ধারণাকে—তাঁহার বিশ্বাসকে—দৃঢ় করিতে পারে, এমন সমস্ত কিছুই চীন ও জাপানের সর্বত্রই তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল।[১] সেই সংগে তাঁহার মাতৃভুমি যে সকল ব্যাধিতে

১ তিনি প্রথম বৌদ্ধ সম্রাটের নামে উৎসর্গীকৃত চীনা মন্দিরগুলিতে গিয়া প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইলেন। জাপানের অনেক মন্দিরেও তিনি তাহাই লক্ষ্য করিলেন—দেখিলেন, প্রাচীন বাংলা হরফে সংস্কৃত মন্ত্র খোদাই করা আছে।

ভুগিতেছে, সেগুলির চিন্তা কখনো তাঁহার মন হইতে গেল না। জাপান যে উন্নতি করিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ক্ষতটা পুনরায় বাড়িয়া গেল।

তিনি ইওকোহামা হইতে গেলেন ভাংকুভার। সেখান হইতে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে যেন নিজের অজ্ঞাতেই চলিলেন ট্রেনযোগে চিকাগোর পথে। সারা পথে তাঁহার ছিন্ন পক্ষের চিহ্ন ছড়াইয়া রহিল—পালক-সংগ্রহকারীদের শ্যেন দৃষ্টি তিনি এড়াইতে পারিলেন না, বহু দূর হইতে-ও সহজেই তিনি চোখে পড়িলেন! চিকাগোর বিশ্ব প্রদর্শনীতে প্রথমে তিনি বিস্ময়-বিহ্বল বিরাট এক শিশুর মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সকল কিছুই তাঁহার কাছে নূতন লাগিল। তিনি বিস্মিত বিমূঢ় হইয়া গেলেন। পাশ্চত্ত্য জগতের এই শক্তি, সম্পদ ও উদ্ভাবনী প্রতিভার কথা তিনি কখনো কল্পনাও করেন নাই। চাঞ্চল্য ও কোলাহলের উন্মত্ততায়, সমগ্র ইউরোপীয়-মার্কিন (বিশেষভাবে মার্কিন) যন্ত্রিকতায় নিপীড়িত গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিদের অপেক্ষা প্রাণ-প্রাচুর্য ও শক্তির আবেদনে মুগ্ধ হইবার মতো অধিকতর প্রবণতা ছিল বিবেকানন্দের। তাই তিনি ইহার মধ্যে, অন্ততপক্ষে প্রথমে, কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন না; তিনি ইহার উন্মাদনায় আত্মসমর্পণ করিলেন; শিশুর সারল্যে তিনি প্রথমে ইহাকে গ্রহণ করিলেন; তাঁহার প্রশংসমান আনন্দের আর সীমা রহিল না। বারো দিন তিনি এই নূতন পৃথিবীকে সাগ্রহে দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিলেন। চিকাগোতে পৌছিবার কয়েক দিন বাদে তিনি প্রদর্শনীর অনুসন্ধান দফ্‌তরে যাইবেন স্থির করিলেন।...কিন্তু তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! তিনি জানিলেন, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের আগে ধর্ম সম্মিলন শুরু হইবে না—এবং প্রতিনিধি হিসাবে নাম লিখাইবার সময়ও অনেক আগেই ফুরাইয়া গিয়াছে; কেবল তাহাই নহে, সরকারী পরিচয়পত্র না থাকিলে নাম লেখানো-ও চলিবে না। সেরূপ কোনো পরিচয়-পত্র তাঁহার সংগে ছিল না। তিনি ছিলেন অজ্ঞাত; কোনো অনুমোদিত দলের নিকট হইতে সুপারিশ-ও তিনি লইয়া আসেন নাই; টাকা-পয়সা-ও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; যে টাকা আছে, তাহাতে সম্মিলনের শুরু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলিবে না।...তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি সাহায্যের জন্য মাদ্রাজে তাঁহার বন্ধুদের কাছে 'কেব্‌ল্‌' পাঠাইলেন এবং একটি সরকারী ধর্ম প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চাহিয়া আবেদন করিলেন। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের মার্জনা নাই। তাই প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তা জাবাব দিলেন:

"মরুক, শয়তান শীতে মরুক!"

শয়তান কিন্তু মরিল না বা হাল ছাড়িল না। সে নিজেকে নিয়তির হাতে ছাড়িয়া দিল। অবশিষ্ট যে কয়েক ডলার সংগে ছিল, তাহা জমাইয়া রাখিয়া বিবেকানন্দ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন না। তিনি তাহা খরচ করিয়া বোস্টনে গেলেন। ভাগ্য তাঁহার সাহায় হইল। নিজেকে কিভাবে সহায্য করিতে হয়, তাহা যাহারা জানে, ভাগ্য তাহাদিগকে চিরদিনই সাহায্য করে। বিবেকান্দের মতো কোনো লোক কখনো লোকের নজরে না পড়িয়া পারেন না; তাই অপরিচিত অবস্থাতে-ও তিনি অকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোস্টন যাইবার সময়ে ট্রেনে তাঁহার চেহারা ও কথাবার্তা এক সহযাত্রীকে মুগ্ধ করিল। সহযাত্রী ছিলেন মাসাচুসেটসের এক ধনী ভদ্র মহিলা। তিনি বিবেকান্দকে নানা প্রশ্ন করিবার পর তাঁহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে ভদ্রমহিলা তাঁহাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীস-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জে. এচ. রাইটের সংগে পরিচয় করাইয়া দিলেন। অধ্যাপক রাইট অবিলম্বে এই তরুণ ভারতীয়ের প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে সকল দিক দিয়া সাহায্য করিতে চাহিলেন। ধর্ম সম্মিলনে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য তিনি বিবেকানন্দকে বলিতে লাগিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি কমিটির প্রেসিডেন্টের কাছে লিখিলেন। তিনি এই কপর্দকশূন্য তীর্থকংরকে চিকাগো যাইবার জন্য রেলের টিকিট কাটিয়া দিলেন এবং তাঁহার থাকিবার জায়গা ঠিক করিয়া দেওয়ার জন্য কমিটির কাছে সুপারিশ করিয়া কয়েকটি চিঠি-ও লিখিয়া করিয়া দিলেন। এক কথায়, বিবেকান্দের বাধাগুলি দূর হইল।

বিবেকানন্দ চিকাগোতে ফিরিয়া আসিলেন। ট্রেন পৌঁছিতে অনেক রাত হইল। তাই কি করিবেন্ না করিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না; কমিটির ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছেন; এখন কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। কালা আদমি বলিয়া কেহ তাঁহাকে খোঁজ-খবর দেওয়া-ও প্রয়োজন বোধ করিল না। স্টেশনের এক কোণে একটা বিরাট খালি বাক্স পড়িয়াছিল, তাহাতে শুইয়াই তিনি রাত কাটাইয়া দিলেন। সকালে তিনি সন্ন্যাসী হিসাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে পথের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু এ এমন এক শহর, যেখানে টাকা রোজগারের হাজারো পন্থা আছে। কেবল একটি পথ নাই—সে পথ সেন্ট ফ্রান্সিসের পথ, ভগবৎ ভবঘুরেদের পথ। কয়েকটি বাড়ি হইতে তিনি রূঢ় ভাবে বিতাড়িত হইলেন। কোনো কোনো বাড়িতে চাকর দিয়া তাঁহাকে অপমান করা

হইল। অনেক বাড়িতে লোকে তাঁহার মুখের উপর সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অনেকক্ষণ ঘুরিবার পর তিনি ক্লান্ত হইয়া পথে বসিয়া পড়িলেন। পথের ওপারের একটি জানালা হইতে এক ভদ্রমহিলা তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ধর্ম সম্মিলনে প্রেরিত কোনো প্রতিনিধি কিনা। তাঁহাকে ভিতরে ডাকা হইল। এইভাবে নিয়তি তাঁহাকে এমন একজনের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিল, যিনি পরে তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বস্ত আমেরিকান ভক্তদের মধ্যে একজন হইয়া উঠিয়াছিলেন।[১] বিশ্রাম করিবার পরে বিবেকানন্দকে সম্মিলনের কার্যালয়ে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তিনি প্রতিনিধি হিসাবে সানন্দে গৃহীত হইলেন এবং প্রাচ্য হইতে প্রত্যাগত অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

তাঁহার এই দুঃসাহসী অভিযান প্রায় বিপদের মধ্যেই শেষ হইতে বসিয়াছিল। অকস্মাৎ তিনি বন্দরে পৌঁছিলেন। কিন্তু বিশ্রামের জন্য নহে—কাজ তাঁহাকে ডাকিতেছে। ভাগ্য যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। এখন চাই পুরুষকার! কাল যিনি অজ্ঞাত ছিলেন, ভিক্ষুক ছিলেন, কালা আদমি বলিয়া এই শহরের লোকের কাছে ঘৃণিত ছিলেন—আজ তিনি তাঁহার প্রথম দৃষ্টিপাতেই সার্বভৌম প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিলেন।

*   *   *   *

১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার ধর্ম সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইল। মধ্যস্থলে কার্ডিন্যাল গিবন্‌স্ বসিয়া আছেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণে বামে বিভিন্ন দলে বসিয়াছেন প্রাচ্য হইতে আগত প্রতিনিধিরা। বিবেকানন্দের পুরাতন বন্ধু ও ব্রাহ্ম সমাজের কর্তা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার[২] বোম্বাই-এর নগরকরের সহিত ভারতীয় আস্তিকদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন; সিংহল হইতে বৌদ্ধদের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন ধর্মপাল; জৈনদের প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিয়াছেন গান্ধী[৩]; থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিয়াছেন চক্রবর্তী ও তৎসহ অ্যানী বেসাণ্ট। বিবেকানন্দ কাহারও প্রতিনিধিত্ব

১ মিসেস জি. ডাবলিউ. হেল।

২ প্রথম খণ্ড "রামকৃষ্ণের জীবন" পুস্তকে "ঐক্য সাধক" শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩ ইনি আমাদের এম. কে. গান্ধী নহেন। প্রায় এই সময়ে এম. কে. গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় নামিতেছেন। তবে তাঁহার পরিবারের সহিত জৈনদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। ধর্ম-সম্মিলনে যে গান্ধী গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এম. কে. গান্ধীর দূর সম্পর্ক থাকিতেও পারে।

করিতে আসেন নাই—আবার সকলেরই প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিয়াছেন। তিনি কোনো সম্প্রদায়ের নহে—তিনি সমস্ত ভারতের। হাজার হাজার সমবেত দর্শকের দৃষ্টি তাই সকলের মধ্যে এই তরুণ সন্ন্যাসীর উপরেই নিবদ্ধ হইল।[১] তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল, সমুন্নত দেহ, মহার্ঘ্য পরিচ্ছদ[২] সমস্ত কিছুই তাঁহার ভাবাবেগ ঢাকিয়া রাখিল। তবে তিনি উহা লুকাইতেও চাহিলেন না। এই ধারণের সভায় এই তিনি সর্বপ্রথম বলিতে আসিয়াছেন। একে একে প্রতিনিধিরা নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়া সভায় সংক্ষেপে বক্তৃতা করিলেন। বিবেকানন্দের পালা আসিলে তিনি-ও উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা চলিল সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা[৩]।

তাঁহার সে ভাষণ ছিল যেন লেলিহান অগ্নিশিখা। নিষ্প্রাণ তত্ত্বালোচনার ধূসর প্রান্তরে তাহা সমবেত মানুষের অগণিত আত্মায় আগুন ধরাইয়া দিল।

"আমার মার্কিন ভাই ও বোনেরা!" বক্তৃতার গোড়ার এই কথাগুলি উচ্চারিত হইতে না হইতেই শত শত দর্শক আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করতালি দিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম সম্মিলনের রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণের প্রত্যাশিত ভাষাতে বলিতে শুরু করিলেন। পুনরায় সভা স্তব্ধ হইল। তিনি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীনতম ধর্ম-সম্প্রদায়ের—বৈদিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের—নামে পৃথিবীর তরুণতম জাতিকে অভিনন্দন জানাইলেন। তিনি হিন্দু ধর্মকে অন্যান্য ধর্মের জননীরূপে উপস্থিত করিলেন—যে হিন্দু ধর্ম দুইটি শিক্ষা দিয়াছে:

"পরস্পরকে বোঝ! পরস্পরকে গ্রহণ কর!"

অতঃপর তিনি শাস্ত্র হইতে দুইটি সুন্দর উদ্ধৃতি দিলেন:

"যে কোনো রূপেই হোক, আমার কাছে যেই আসে, আমি তাহারই নিকট যাই।"

"মানুষ নানা পথেই আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সকল পথেরই শেষে আছি আমি।"

১ আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি ইহার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়।

২ লাল পোশাকটি কমলা রঙের দড়ি দিয়া কোমরে আঁটিয়া বাঁধা ছিল। মাথায় ছিল হলদে রঙের বিরাট পাগড়ি। ফলে তাঁহার কুচকুচে কালো চুল, গায়ের শ্যামল রঙ, কালো চোখ এবং লাল ঠোঁট—এগুলি আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। (সংবাদপত্রে প্রদত্ত বর্ণনা।)

৩ সেই সংগে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য সবাই লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। কিন্তু বিবেকানন্দ পূর্ব হইতে কোনোরূপ প্রস্তুত না হইয়াই বক্তৃতা দেন।

অন্যান্য বক্তারা-ও প্রত্যেকে ভগবানের কথা বলিয়াছিলেন—কিন্তু সে ভগবান ছিলেন তাঁহাদের নিজের নিজের সম্প্রদায়ের ভগবান। কিন্তু বিবেকানন্দ—একা বিবেকানন্দ—সকলের ভগবানের কথা বলিলেন, সকলের ভগবানকে বিশ্ব সত্তায় মিলাইয়া দিলেন। এ ছিল রামকৃষ্ণের নিঃশ্বাস, সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাহা তাঁহার মহান্ শিষ্যের মুখ দিয়া নির্গত হইল। ধর্ম সম্মিলন এই তরুণ বাগ্মীকে অভিনন্দন জানাইল।

পরবর্তী কয়েকদিনে তিনি আবার প্রায় দশ-বারো বার বক্তৃতা দিলেন।[১] বর্বরদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বস্তু পূজা হইতে আধুনিকতম বিজ্ঞানের উদারপন্থী সৃজনশীল মতবাদগুলি পর্যন্ত মানব মনের সকল প্রকার বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইয়া স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে যে বিশ্ব ধর্ম রহিয়াছে, সে সম্পর্কে তাঁহার মতবাদের কথা তিনি বারে বারে বলিলেন। প্রতিবারেই তিনি নূতন নূতন যুক্তি দিলেন; প্রতিবারেই তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তায় কোনোরূপ পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি সকল বিশ্বাস ও মতবাদকে মিলিত করিয়া সেগুলির মধ্যে এক অপূর্ব সংগতি আনিলেন; প্রত্যেকটি আশা ও আদর্শ যাহাতে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে

১ সম্মিলনের সাধারণ সভায় এবং সম্মিলনের বৈজ্ঞানিক বিভাগগুলির অধিবেশনে উভয়ত্রই। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে তিনি প্রধানত বলেন:

(১) ১৫ই সেপ্টেম্বর:—'আমাদের মতবিরোধ কেন?' (তিনি বিভিন্ন ধর্মের আত্মসর্বস্ব সংকীর্ণতার কথা বলেন। উহার ফলেই ধর্মান্ধতা দেখা দেয়।)

(২) ২০শে সেপ্টেম্বর:—'ধর্মসাধনই ভারতের আশু প্রয়োজন নহে।' (আশু প্রয়োজন রুটি। তাই মুমূর্ষু ভারতবাসীকে সাহায্য করার জন্য তিনি আবেদন করেন।)

(৩ ও ৪) ২২শে সেপ্টেম্বর:—'গোঁড়া হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত দর্শন।' 'ভারতের বর্তমান বিভিন্ন ধর্ম।'

(৫) ২৫শে সেপ্টেম্বর:—'হিন্দুধর্মের সারকথা।'

(৬) ২৬শে সেপ্টেম্বর:—'বৌদ্ধ ধর্ম—হিন্দু ধর্মের পরিণত রূপ।'

আরো চারটি বক্তৃতা।

কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি হইল:

(১১) ১৯শে সেপ্টেম্বর:—হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা। কংগ্রেসে তিনিই একাকী কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নহে, সমগ্র হিন্দু ধর্মের পক্ষ হইতেই প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। আমরা পরে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা কালে এ বিষয়ে আবার আলোচনা করিব।

(১২) ২৭শে সেপ্টেম্বর:—সম্মিলনের শেষ অধিবেশনে অভিভাষণ।

বিকাশ ও পরিণতি লাভ করিতে পারে, তিনি সে বিষয়েই সাহায্য করিলেন[১]। মানুষের মধ্যে ভগবানের শক্তি আছে এবং মানুষের ক্রমবিকাশের ক্ষমতার কোনো সীমা নাই, তিনি এই একমাত্র মতবাদ প্রচার করিলেন।

"এই ধরণের একটি ধর্ম দেন, দেখিবেন, সকল দেশ আপনার অনুসরণ করিবে। অশোকের ধর্ম সঙ্গীতি ছিল বৌদ্ধ ধর্ম সভা।[২] আকবরের ইবাদতখানা[৩] যদিও অনেকখানি এই উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল—তাহা ছিল ধর্মের বৈঠক। সকল ধর্মের মধ্যেই যে ভগবান আছেন, এই কথা পৃথিবীর সকল দেশের কাছে ঘোষণা করিবার দায়িত্ব সংরক্ষিত হইয়া আছে আমেরিকার জন্য।

"যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, যিনি জরথুস্ত্রপন্থীদের অহুর মাজদা, যিনি বৌদ্ধদের বুদ্ধ, যিনি ইহুদিদের জিহোভা, যিনি খৃস্টানদের স্বর্গীয় পিতা, তিনি, সেই ভগবান আপনাদের শক্তি দেন।[৪] খৃস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না, হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খৃস্টান হইতে হইবে না। প্রত্যেকে অপরের অন্যান্য আলোক অধিগত করিবেন, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইবেন না, বিকাশের নিজস্ব মূলনীতি অনুসারে সকলে বিকাশ লাভ করিবেন। ধর্ম সম্মিলন প্রমাণ করিয়াছে যে, পবিত্রতা, শুদ্ধি ও মহানুভবতা কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের একার সম্পত্তি নহে, প্রমাণ করিয়াছে যে, প্রত্যেক ধর্মরীতিই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারীর জন্ম দিয়াছে। প্রতিরোধ সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় লিখিত থাকিবে, 'সাহায্য করো, সংগ্রাম করো না,' লিখিত থাকিবে, 'গ্রহণ করো, ধ্বংস করো না,' লিখিত থাকিবে, 'চাই—মতানৈক্য নহে - মতৈক্য ও শান্তি।"[৫]

এই মহান্ কথাগুলির ফল হইল বিরাট। সম্মিলনে সরকারী ভাবে যে সকল

১ কিন্তু এই তরুণ হিন্দু নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার আদর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেন। তিনি হিন্দু ধর্মের মূল দিকগুলিকে তাহার অধঃপতিত দিকগুলি হইতে পৃথক ও পুনরুজ্জীবিত করিয়া সার্বজনীন ধর্মরূপে উপস্থিত করেন।

২ পাটলিপুত্রের ধর্মসংগীতি। ২৫৩ খৃস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ পণ্ডিতদের লইয়া এক সভা করেন।

৩ ষোড়শ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট আকবর (১৫৫৬–১৬০৫) ইসলাম ত্যাগ করিয়া একটি সংগ্রহপন্থী যুক্তিবাদের প্রবর্তন করেন। উহা হিন্দু, জৈন, মুসলমান, পার্শী এবং এমন কি খৃস্টানদের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রের ধর্ম হইয়া উঠে।

৪ 'হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা' (১৯শে সেপ্টেম্বর)।

৫ শেষ অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণ (২৭শে সেপ্টেম্বর)।

প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ডিঙাইয়া এই কথাগুলি সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হইল এবং অন্যান্য ধর্মের লোকের কাছেও আবেদন করিল। বিবেকানন্দের খ্যাতি অচিরে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, সারা ভারতবর্ষ তাহাতে উপকৃত হইল। মার্কিন সংবাদপত্রগুলি তাঁহাকে "ধর্ম সম্মিলনে আগত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ" বলিয়া স্বীকার করিল। বলিল, "তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার পর ভারতেব ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা যে কিরূপ নির্বুদ্ধিতার কাজ, তাহা আমরা অনুভব করিলাম।"[১]

এই ধরণের স্বীকৃতি যে খৃস্টান ধর্মপ্রচারকগণের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইল না, তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। বিবেকানন্দের সাফল্য তাই তাঁহাদের মধ্যে তিক্ত বিদ্বেষের সৃষ্টি করিল। এই বিদ্বেষ অত্যন্ত অসম্মানজনক অস্ত্রসমূহ ব্যবহার করিতে-ও কুণ্ঠিত হইল না। তাঁহার সাফল্য কোনো কোনো হিন্দু প্রতিনিধির ঈর্ষাকে-ও তীক্ষ্ণতব করিল। তাঁহাবা দেখিলেন, নামহীন, গোত্রহীন এক "পর্যটক সন্ন্যাসীব" পাশে তাহারা ম্লান হইয়া গিযাছেন। থিওজফিকে বিবেকানন্দ স্নেহাই দেন নাই। তাই বিশেষভাবে তাঁহাবা তাঁহাকে কখনো ক্ষমা কবিলেন না।[২]

কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁহাব মহিমাব এই অরুণোদয়ের মুহূর্তে নিজের দীপ্তিব ঔজ্জ্বল্যে সকল তিমিবকে বিনাশ করিলেন। তখন তাঁহাকেই সকলে গ্রহণ করিল।

* * * *

তিনি জয়ী হইয়া কি ভাবিলেন ? তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই পর্যটক সন্ন্যাসী দেখিলেন, তাঁহার নিঃসঙ্গ, স্বাধীন ভগবৎ-জীবন শেষ হইল। তাঁহার এই বেদনায়

---

১ 'দি নিউ ইঅর্ক হেরাল্ড' পত্রিকা। 'দি বোস্টন ইভনিং পোস্ট' পত্রিকা বলেন যে, "সম্মিলনের তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।" তিনি মঞ্চে উঠিলেই দর্শকরা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিতেন। সম্মিলনে দর্শকদের উৎসাহে ভাটা পড়িতে দেখিলে তাঁহাদিগকে শেষ পর্যন্ত বসাইয়া রাখিবার জন্য বলা হইত যে, বিবেকানন্দ শেষে বক্তৃতা করিবেন।

২ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া বিবেকানন্দ মাদ্রাজে "আমার অভিযানের পরিকল্পনা" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন ; তাহাতে তাঁহাকে যাঁহারা আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া ধরেন এবং থিওজফিক্যাল্ সোসাইটি সম্পর্কে তাঁহার ধারণা কি, তাহা তিনি তীক্ষ্ণভাবেই প্রকাশ করেন। পাঠক কাউণ্ট কেইজেবলিং-লিখিত "দার্শনিকের ভ্রমণপঞ্জী" পুস্তকখানি দেখিতে পারেন। উহাতে থিওজফিক্যাল্ সোসাইটির প্রধান কার্যালয় এডিয়ার সম্পর্কে যে পরিচ্ছেদ আছে, তাহাতে অতুলনীয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত লেখক সোসাইটির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

কোন্ প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি না সমবেদনা অনুভব করিয়া পারেন ? তিনি নিজেই ইহা চাহিয়াছিলেন···কিম্বা বলা চলে, যে অজ্ঞাত শক্তি তাঁহাকে এই লক্ষ্যের নির্দেশ দিয়াছিল, সেই শক্তি তাঁহাকে দিয়া ইহা চাওয়াইয়াছিল।···কিন্তু তাঁহার অন্তরে আর একটি সুর অনবরত ধ্বনিত হইতেছিল : "ত্যাগ করো ! ভগবানের মধ্যে বাঁচো !" একটিকে আংশিকভাবে ত্যাগ না করিয়া অপরটির দাবী মিটানো তাঁহার পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই এই ঝঞ্ঝা-ব্যাকুল দুরন্ত প্রতিভা সাময়িকভাবে কয়েকটি সংকটের সম্মুখীন হইলেন ; যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেলেন। এই যন্ত্রণাকে স্বতবিরুদ্ধ মনে হইলে-ও ইহা ছিল প্রকৃত পক্ষে যুক্তিপূর্ণ। একাগ্রমনা ব্যক্তিরা কখনো ইহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন না। কেবল একটি মাত্র চিন্তাই তাঁহাদের মস্তিষ্কে থাকে, তাঁহারা তাঁহাদের দৈন্যকেই একটি অপরিহার্য গুণে পরিণত করিয়া ফেলেন। সংগতি সাধনের প্রয়াসে অতি-সমৃদ্ধ আত্মার এই শক্তিমান সকরুণ সংগ্রামগুলিকে তাঁহারা হয় বিভ্রান্তি, নয় ভণ্ডামি মনে করেন। বিবেকানন্দকে চিরদিন এই ধরণের কদর্থের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, হইতে হইবে-ও। তাঁহার উন্নত আত্মচেতনা এই সকল কদর্থের কখনো কোনো উত্তর দিতে চেষ্টা করে নাই।

কিন্তু এই সময়ে যে জটিলতার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা কেবল মানসিকই ছিল না। তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিতও জড়িত ছিল। তাঁহার সাফল্যের আগের মতোই তাঁহার সাফল্যের পরে-ও (পরে সম্ভবত আরো বেশি) তাঁহার কাজ কঠিন হইয়া উঠিল। দারিদ্র্য তাঁহাকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। এবার তাঁহার ঐশ্বর্যের কবলিত হইবার বিপদ দেখা দিল। আমেরিকার হামবড়ামি ভাব তাঁহার উপর চাপিয়া বসিল এবং প্রথমেই বিলাসব্যসন তাঁহার প্রায় শ্বাসরোধ করিল। অর্থের এই অতি-প্রাচুর্যে বিবেকানন্দ এমন কি শারীরিক অস্বস্তি-ও অনুভব করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে তাঁহার শয়ন কক্ষে তিনি নৈরাশ্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন ; ক্ষুধায় মুমূর্ষু মানুষের কথা ভাবিয়া মাটিতে গড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন :

"মাগো ! আমার দেশের লোক যখন অনাহারে পড়িয়া আছে, তখন আমি এই সুনাম লইয়া কি করিব ?"

এই সময়ে একটি "বক্তৃতা পরিষদ" তাঁহাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বে ও মধ্য-পশ্চিমে, চিকাগো, ইওয়া, দে মোয়ান, সেন্ট লুইস্, মিনিয়াপলিস, ডেট্রইট, বোস্টন, কেম্ব্রিজ, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, নিউ ইঅর্ক প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা ভ্রমণে

যাইতে বলিল। হতভাগ্য দেশের সেবার জন্ম এবং ধনী পৃষ্ঠপোষকদের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্ম তিনি তাহাতেই রাজী হন। কিন্তু ব্যবস্থাটি বিপজ্জনক বলিয়া শীঘ্রই প্রতিপন্ন হইল। কেননা, আমেরিকান জনসাধারণের সম্মুখে ধূপধুনা জ্বালাইয়া তিনি অন্যান্য বক্তাদের মতো করতালি ও অর্থ পাইতে যাইতেছেন, একথা ভাবাও যে ছিল ভুল !···

এই তরুণ প্রজাতন্ত্রের দুর্জয় শক্তি সম্পর্কে তাহার যে আকর্ষণ ও প্রশংসার মনোভাবটি প্রথমে ছিল, তাহা-ও মিলাইয়া গেল। ইহারা নিজেদিগকে মানব জাতির সেরা অংশ বলিয়া ভাবে। ইহাদের সহিত যাহাদের চিন্তার, বিশ্বাসের ও জীবনযাত্রার মিল নাই, তাহাদের সম্পর্কে ইহাদের যে নৃশংসতা, অমানুষিকতা, মানসিক ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, বিরাট মূর্খতা ও প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতা আছে, তাহার সহিত প্রায় সংগে সংগেই বিবেকানন্দের যুদ্ধ বাধিল।···তাঁহার আর ধৈর্য রহিল না। তিনি কিছুই গোপন করিলেন না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বভাবসিদ্ধ হিংসা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের কলঙ্ককালিমাগুলিকে তিনি তুলিয়া ধরিলেন। তিনি একবার বোস্টনে বক্তৃতা দিতে যান। সেদিন তাঁহার একটি অতি প্রিয় বিষয়বস্তু[১] লইয়া বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। কিন্তু শ্রোতার আসনে অর্থলিপ্সু ভণ্ড নিষ্ঠুর মানুষদের ভীড় দেখিয়া ঘৃণায় তিনি সংকুচিত হইলেন; তাঁহার পবিত্র হৃদয়-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিতে চাহিলেন না। তিনি হঠাৎ তাঁহার বক্তৃতার বিষয়-বস্তু বদলাইলেন এবং এই হিংস্র পশুর দল যে-সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সভ্যতাকে প্রচণ্ডভাবে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।[২] ফলে ভয়ানক কেলেংকারির সৃষ্টি হইল। শত শত লোক চেঁচাইতে চেঁচাইতে হল হইতে বাহির হইয়া গেল এবং সংবাদপত্রগুলি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

নকল খৃস্টান ধর্ম এবং ধর্মের ভণ্ডামির বিরুদ্ধেই বিশেষভাবে তাঁহার রোষ ফাটিয়া পড়িল।

১ রামকৃষ্ণ

২ আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রেষ্ঠ হিন্দু কবির সম্বন্ধেও অনুরূপ একটি ঘটনার কথা আমি শুনিয়াছি। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো এক সভায় তাঁহাকে তাঁহার অত্যন্ত একটি প্রিয় বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। সে বিষয়ে শ্রোতারা অর্থ সাহায্য করিতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শ্রোতাদিগকে দেখিয়াই তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগকে এবং তাহাদের শ্বাসরোধকারী বস্তুবাদী সভ্যতাকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিলেন। ফলে কাজটির সাফল্য নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই তাহা পণ্ড করিয়া দিলেন।

"তোমরা যতোই আস্ফালন কর, কোথায় তোমাদের খৃস্টান ধর্ম তরবারির বিনা সাহায্যে সফল হইয়াছে? তোমাদের ধর্ম এমন যে, তাহা বিলাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে। আমি এখানে আসিয়া যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহা সমস্তই ভণ্ডামি মাত্র। তোমাদের এই ঐশ্বর্য খৃস্ট হইতেই আসিয়াছে বটে! যাহারা খৃস্টের নাম লয়, তাহারা অর্থ সঞ্চয় করা ছাড়া আর কিছুই করে না। তোমাদের এখানে মাথা রাখিবার মতো একখানা পাথরও খৃস্টের কপালে জুটিবে না!... তোমরা খৃস্টান নও! তোমরা খৃস্টান হও!"

তাঁহার ঘৃণাপূর্ণ এই উপদেশের উত্তররূপে আক্রোশ ফাটিয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত হইতে সর্বদাই পাদরীরা তাঁহার পিছু লইল, তাঁহাকে গালাগালি করিল, তাঁহার নামে অভিযোগ আনিল। এমন কি, তাহারা ভারতে এবং আমেরিকায় বিবেকানন্দের জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে নানারূপ নিন্দা ছড়াইতে লাগিল।[১] বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলির কোনো কোনো হিন্দু প্রতিনিধিও কম গেলেন না। বিবেকানন্দের বিরাট সাফল্যে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা খৃস্টান মিশনারিদল কর্তৃক প্রচারিত হীন অভিযোগগুলিকে রটাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করিলেন না। আবার এই সকল ঈর্ষাতুর হিন্দু প্রতিনিধিরা[২] যে সকল অস্ত্রের যোগান দিলেন, খৃস্টান মিশনারিরা-ও তাহা কাজে লাগাইল। আমেরিকায় এই মুক্তাত্মা ভারতীয় সন্ন্যাসী গোঁড়া হিন্দু ধর্মের কড়া নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতেছেন না বলিয়া তাহারা হাস্যকর উৎসাহের সহিত তাঁহার নিন্দা করিল।[৩] ভারতে গোঁড়া হিন্দুরা ইহা লইয়া যে আলোড়নের তরংগ তুলিয়াছিল, তাহার ফেনার আভাস তিনি তাঁহার আতংকগ্রস্ত শিষ্যদের পত্র হইতে পাইলেন।

১ বলাই বাহুল্য যে, তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশগুলির চিরাচরিত অভিযোগ, ফুসলাইবার অভিযোগ আনিল। এক নোংরা পাদরি রটাইয়া দিল যে, তিনি মিচিগানের গভর্ণর কর্তৃক কর্মচ্যুতা এক পরিচারিকার প্রতি অশোভন ব্যবহার করিয়াছেন। গভর্ণরের স্ত্রী প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখিতে বাধ্য হইলেন (মার্চ, ১৮৯৫)। কিন্তু এই হীন মিথ্যা প্রচারে যে ক্ষতি হইল, কোনো প্রতিবাদেই তাহা পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না।

২ আমেরিকায় বিবেকানন্দ বেদান্তের যে সকল ব্যাখ্যা করেন, তাহার কোনো কোনোটিকে কোনো কোনো ব্রাহ্ম ধর্ম নিন্দা বলিয়া মনে করেন। বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে একটি অদ্ভুত দল গড়িয়া উঠে। এই দলে প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারীরা, থিওজফিস্টরা এবং ব্রাহ্ম সমাজের কিছু কিছু লোক থাকেন।

৩ প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি গো-মাংস খাইয়াছেন। কেবল কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিলেই নীতির ও ভগবানের দিক হইতে নির্দোষ হওয়া যায় এবং সেগুলি না মানিলেই যতো মহাপাপ হয়,

কিন্তু বিপুল ঘৃণাভরে তিনি সে তরংগ যাহারা তাঁহার মুখের উপর ছিটাইবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাদেরই মুখের উপর ফিরাইয়া দিলেন।[১]

তাঁহার অন্যতম মার্কিন শিষ্য, স্বামী কৃপানন্দ[২] একটি চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রে বিবেকানন্দের অশান্তির কথা স্মরণ করিয়া বলেন :

"আমেরিকা ছিল তথাকথিত ধর্মের ভয়াবহতায় পরিপূর্ণ। অস্বাভাবিকের জন্য, ইন্দ্রজালের জন্য, ব্যতিক্রমের জন্য একটি অসুস্থ পিপাসা আমেরিকাকে পাইয়া বসিয়াছিল। এক অর্থহীন বিশ্বাসপ্রবণতা হইতে ভূত, প্রেত, মহাত্মা, নকল পয়গম্বর প্রভৃতির শত শত প্রতিষ্ঠান চারিদিকে গজাইয়া উঠিয়াছিল; সকল দেশের সকল রকমের লোক আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। ফলে, বিবেকানন্দের কাছে আমেরিকা ঘৃণ্য ও দুঃসহ হইয়া উঠিল। তিনি প্রথমেই এই 'ওজিয়ান আস্তাবল' সাফ্ করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিলেন।"

এই ধরণের কুসংস্কারকে বিবেকানন্দ ঘৃণা করিতেন। ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য, এই দুই ব্রত ছাড়া অন্য কিছুকে তিনি অলঙ্ঘ্য বলিয়া মানিতেন না। বাকী বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণ বুদ্ধিতে তিনি একথা মানিতেন যে, লোকে যখন যে দেশে থাকে, তখন তাহার সেই দেশের রীতি-নীতি মানিয়া চলা উচিত।

১ স্বামীজী বিধর্মীদের সহিত এক টেবিলে বসিয়া অখাদ্য খান, একথা শুনিয়া তাঁহার ভারতীয় অনেক শিষ্য ঘাবড়াইয়া যান এবং লজ্জা পাইয়া স্বামীজীকে তিরস্কার করেন। স্বামীজী তাহার জবাবে বলেন :

"তোমরা কি বলিতে চাও যে, কেবল শিক্ষিত হিন্দু সমাজে যেসব জাতিভেদে বিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিষ্ঠুর, ভণ্ড, নাস্তিক কাপুরুষকে দেখা যায়, আমি তাহাদেরই একজন হইয়া বাঁচিতে ও মরিতে জন্মিয়াছি? আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। কাপুরুষদের সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই।...আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমস্ত পৃথিবীর।...কোন্ দেশ আমার উপর বিশেষভাবে অধিকার দাবী করিতে পারে? কোন্ জাতির গোলাম আমি?...আমার পশ্চাতে আমি মানুষ, দেবতা বা শয়তানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এক শক্তিকে দেখিতে পাই। আমি কাহারও সাহায্য চাহি না। আমিই সমস্ত জীবনে অপরকে সাহায্য করিয়া আসিতেছি।..."

(১৮৯৫ খৃস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে প্যারি হইতে তাঁহার ভারতীয় শিষ্যদের কাছে লিখিত পত্র।)

২ লেওন ল্যান্সবের্গ দীক্ষার সময়ে এই নাম গ্রহণ করেন। তিনি এক রুশ ইহুদি পরিবারে জন্মিয়াছিলেন, পরে আমেরিকার নাগরিক হন। তিনি নিউ ইঅর্কের একটি বড় কাগজের অংশীদার ছিলেন। বিবেকানন্দ প্রথমে যেসব পাশ্চাত্ত্য শিষ্য করেন, তিনি তাঁহাদের একজন। আমি পরে তাঁহার সম্বন্ধে বলিব।

আমি যে চিঠির সংক্ষিপ্তসার এখানে দিয়াছি, তাহা ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে মাদ্রাজের "ব্রহ্মবাদিন্" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

যে সকল নিষ্কর্মা, ভণ্ড এবং সুযোগ- ও সুবিধা-লোভীর দল তাঁহার প্রথম বক্তৃতা-গুলিতে ভীড় করিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি জাহান্নামে পাঠাইলেন। নানা ধরণের লোকে নানা ভাবে তাঁহার পেছনে লাগিল; কেহ দলে লইতে চাহিল, কেহ লোভ দেখাইল, কেহ ভয় দেখাইল, কেহ বা শাসাইয়া চিঠি লিখিল। বিবেকানন্দের মতো কোনো ব্যক্তির উপর সেগুলির ফল কি হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার উপর কাহারও সামান্যতম প্রাধান্যও তিনি সহ্য করিবেন না। কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনো সম্প্রদায়ে যোগ দেওয়ার সকল প্রস্তাবই তনি বাতিল করিয়া দিলেন। তাঁহাকে কাজে লাগাইবার জন্য যে সব জোট হইল, সেগুলির বিরুদ্ধেও তিনি বিনা আপসে একাধিকবার প্রকাশ্য সংগ্রামে নামিলেন।

আমেরিকার সম্মান রক্ষার্থে এখনই এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিবেকানন্দের নৈতিক অনমনীয়তা, তাঁহার বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, তাঁহার নির্ভীক বিশ্বস্ততা চারিদিক হইতে তাঁহার সমর্থক ও ভক্তের একটি সুনির্বাচিত দলকে আকৃষ্ট করিল। এই দলটিই তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের প্রথম দল এবং ইঁহারাই তাঁহার মানবিকতার পুনরুজ্জীবনের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় কর্মী।

৪

বিবেকানন্দের প্রথম আগমন-কালে আমেরিকা

এশিয়ার আধ্যাত্মিকতার অ্যাংলো-স্যাক্সন পূর্বাচার্যগণ : এমার্স্‌ন, থরো, ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান

উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু চিন্তাধারার অনুপ্রবেশের ফলে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে, আমেরিকান চিন্তাধারা কিরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে খুবই কৌতূহল হয়। কারণ আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে মানস ও ধর্মগত যে অদ্ভুত মনোভাব দেখা যায়, যাহা ইউরোপবাসীদের কাছে এতোই দুর্বোধ্য লাগে, তাহার পশ্চাতে যে হিন্দু চিন্তাধারার প্রচুর দান রহিয়াছে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমেরিকার এই মানস ও ধর্মগত মনোভাবের মধ্যে অ্যাংলো-স্যাক্সন শুচিবাদ, ইয়াংকি কর্মপ্রবণ আশাবাদ, ব্যবহারবাদ, "বিজ্ঞানবাদ" এবং তথাকথিত বেদান্তবাদের সংমিশ্রণ হইয়াছে। কোনো ঐতিহাসিককে আন্তরিকভাবে এই প্রশ্ন লইয়া গবেষণা করিতে দেখা যাইবে কিনা জানি না। তথাপি ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, ইহা আমাদের সভ্যতার ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই সমস্যা সমাধান করিবার মতো সম্বল আমার নাই; তবে অন্ততপক্ষে ইহার কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে ইংগিত আমি দিতে পারি।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানত যাঁহারা হিন্দু চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এমার্স্‌ন[১] একজন। এমার্স্‌ন ইহা করিতে গিয়া থরো কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

এই প্রভাব সম্পর্কে পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রবণতা ছিল। ১৮৩০ খৃস্টাব্দ হইতে তাঁহার "জার্নাল"-এ এই ধরণের লেখা প্রকাশিত হইতে থাকে এবং সেগুলির টীকায় তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করেন। তিনি ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিখ্যাত বক্তৃতা দেন, তাহাতে আত্মা, ব্রহ্ম বা মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন, এই ধরণের একটি বিশ্বাসের কথা বলেন। ফলে, একটি

১ এ প্রসংগে আমার নিকট ১৯১১-র "হার্ভার্ড থিওলজিক্যাল রিভিউ"-তে প্রকাশিত হিন্দু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র-লিখিত "ভারতীয়ের দৃষ্টিতে এমার্স্‌ন" প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আমি তাহা পড়িতে পাই নাই।

কেলেংকারির সৃষ্টি হয়। তবে একথাও সত্য যে উহাতে তিনি—তাঁহার নিজের এবং তাঁহার জাতির বৈশিষ্ট্য—একটি কঠোর নৈতিক বা নীতিবাদী ব্যাখ্যা জুড়িয়া দেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের পূর্ণতা ছিল "ন্যায়" যোগের আনন্দময় উপলব্ধির মধ্যে; কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের মিলনের মধ্যে।[১] লেখায় বা পড়ায় এমার্সনের বড়ো একটা রীতি ছিল না। ক্যাবট তাঁহার সম্পর্কে লিখিত স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, এমার্সন কোনো উদ্ধৃতি বা সংক্ষিপ্তসার পাইলেই সহজে সন্তুষ্ট হইতেন এবং সাধারণত প্রামাণ্য গ্রন্থাদির সাহায্য লইতেন না। কিন্তু থরো অক্লান্তভাবে পড়িতে পারিতেন; এবং ১৮৩৭ হইতে ১৮৬২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এমার্সনের প্রতিবেশী। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে এমার্সন লিখেন যে, থরো তাঁহাকে তাঁহার "কংকর্ড ও মেরিম্যাক্ নদীবক্ষে এক সপ্তাহ" হইতে কতকগুলি অংশ পড়িয়া শোনান। এই রচনাটি ("সোমবার" অংশ) ছিল গীতার এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ কাব্য ও দর্শনের একটি সোৎসাহ প্রশস্তি। চীনা, হিন্দু, পারসিক, হিব্রু, এশিয়ার বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রগুলির "সম্মিলিত বাইবেল" রচনা করিয়া তাহাকে "পৃথিবীর শেষ সীমান্ত পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবার" কথা থরো বলেন এবং তিনি তাঁহার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন—প্রাচ্যের আলো—*Ex Oriente Lux.*[২] কল্পনা করা যাইতে পারে, এই কথাগুলি

১ "মানুষ যদি অন্তরে ন্যায়বান হয়, তবে সে ভগবান হইয়া উঠে: ভগবানের নিরাপত্তা, ভগবানের অমর্ত্যতা, ভগবানের মহিমা সেই মানুষের মধ্যে ন্যায়ের সংগে প্রবেশ করে।...কারণ, সকল সত্তাই একই আধ্যাত্মিকতা হইতে প্রেম, ন্যায়, সংযম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে উৎপন্ন হয়। সেগুলি যেন মহাসমুদ্র, বিভিন্ন উপকূলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই শ্রেষ্ঠ নিয়মটি উপলব্ধি করিলেই আমাদের মনে এমন একটি ভাবের উদয় হয়, যাহাকে আমরা ধর্মভাব বলি, যাহা আমাদের মধ্যে পরম আনন্দের সৃষ্টি করে। সম্মোহিত ও পরিচালিত করিবার শক্তি ইহার বিস্ময়কর। ইহা যেন পার্বত্য বায়ু।...ইহা আকাশ ও পর্বতকে শান্ত সমাহিত করে। ইহা যেন নক্ষত্রের নীরব গান।..."

(১৮৩৮ খৃস্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে কেমব্রিজ (যুক্তরাষ্ট্র) ডিভিনিটি কলেজের উর্ধ্বতন শ্রেণীতে প্রদত্ত ভাষণ।)

২ থরো এগুলি কোথায় পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন: ১৮৪০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত গীতার ফরাসী অনুবাদ; ইহার অনুবাদক নিশ্চয় ব্যাঁরনুফ; তবে থরো তাঁহার নাম করেন নাই; আরো উল্লেখযোগ্য হইল চার্লস্ উইলকিন্সের গীতার ইংরেজি অনুবাদ; তাহা ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস-লিখিত একটি ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। এই বিজয়ী বীর (হেস্টিংস) ভারতবর্ষ শাসন করিলেও বেদভূমি ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতাকে স্বীকার করিয়া লন এবং তাহার নিকট মাথা নত করেন। ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেণ্টের কাছে গীতার এই অনুবাদ সম্পর্কে "সুপারিশ" করেন এবং ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। ভূমিকায় তিনি

এমার্সনের উপর বৃথাই বর্ষিত হয় নাই এবং থরোর "এশিয়াবাদ" এমার্সন পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

এই সময় এমার্সন-প্রতিষ্ঠিত "ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল ক্লাব" পুরাদমে চলিতেছিল। ১৮৪০ খৃস্টাব্দের পর এই ক্লাবের "দি ডায়াল" ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচ্য ভাষাগুলি হইতে অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছিল। মার্কিন হাইপাসিয়া মার্গারেট ফুলারের সাহায্যে এমার্সন তখন এই পত্রিকার সম্পাদনা করিতেছিলেন। ভারতীয় চিন্তাধারা তাঁহার মধ্যে যে আবেগ অনুভূতির সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা খুবই প্রবল ছিল। কেননা, ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁহার "ব্রহ্ম" কবিতার মতো সুন্দর ও সুগভীর একটি বৈদান্তিক কবিতা রচনা করেন।[১]

লেখেন যে, "যখন ভারতে বৃটিশ শাসন বহুদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, যখন ইহার শক্তি ও সম্পদের কথা মানুষের মনেও থাকিবে না, তখনও ভারতীয় দর্শনের রচয়িতারা বাঁচিয়া থাকিবেন।" থরো অন্যান্য কতকগুলি হিন্দু গ্রন্থেরও উল্লেখ করেন। যেমন, কালিদাসের "শকুন্তলা"। তিনি খুব উৎসাহের সহিত মনুর উল্লেখ করেন। তিনি উইলিয়াম জোন্স্-এর অনুবাদে এগুলি পড়িয়াছিলেন। তাঁহার Wheel's Journey ১৮৩৯ খৃস্টাব্দ হইতে লিখিত হইয়া ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এই বিশদ বিবরণীর জন্য আমি মিস ইথেল সিজুইকের নিকট ঋণী। তিনি সেলিঅল কলেজের মাস্টার এবং স্বার্থমোর কলেজের (পেন্সিল্ভানিয়া) অধ্যাপক গর্ডারের সাহায্যে দয়া করিয়া এই খোঁজ-খবরগুলি আমাকে দিয়াছেন। আমি এখানে তাঁহাদের মূল্যবান সাহায্যের জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

Far or forgot to me is near;
Shadow and sunlight are the same;
The vanish'd gods to me appear;
And one to me are shame and fame.

They reckon ill who leave me out;
When me they fly, I am the wings;
I am the doubter and the doubt,
And I am the hymn the Brahmin sings.

The strong gods pine for my abode,
And pine in vain the sacred Seven;

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৮৪৮ খৃস্টাব্দের আগে ইউরোপে যে আদর্শবাদী অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি একটি আদর্শবাদের উন্মাদনা এবং মানসগত পুনরুজ্জীবনের সংকট কালের মধ্য দিয়া ঐ সময়ে নিউ ইংল্যাণ্ড অগ্রসর হইতেছিল।[১] (তবে ঐ আদর্শবাদের উপাদান ছিল ভিন্নতর; অল্পতর অনুশীলন, অধিকতর বলিষ্ঠতা এবং প্রকৃতির সহিত অসীম ঘনিষ্ঠতা।) জর্জ রিপ্লির নৈরাজ্যবাদী ব্রুক্ফার্ম (১৮৪০ হইতে ১৮৪৭-এর মধ্যে) বা ১৮৪০ খৃস্টাব্দের বোস্টন শহরে "ফ্রেণ্ডস্ অব ইউনিভার্সাল প্রগ্রেস" দলের উত্তেজিত সমাবেশ, এগুলির ফলে বিভিন্ন মতের নরনারী একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হন। তাঁহাদের সকলের মধ্যে আদিম শক্তির আগুন জ্বলিতেছিল; কোন্ সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা না জানিলেও তাঁহারা সকলেই অতীত মিথ্যার বন্ধন খসাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। কেননা, সত্যকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, এইরূপ একটি বিশ্বাস না থাকিলে কোনো মানব-সমাজ কখনো বাঁচিতে পারে না।[২] কিন্তু দুঃখের বিষয়,

But thou, meek lover of good!
Find me and turn thy back on heaven.

আমার দুই বন্ধু ওয়াল্ডো ফ্র্যাংক্ এবং ভ্যান্ উইক ব্রুক্স্ আমাকে কতকগুলি মূল্যবান বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে বিখ্যাত বিশপ রেজিন্যাল্ড হেবারের ভাগিনেয় ইংরেজ টমাস কমনডেলি কংকর্ডে যান। সেখানে তাঁহার সহিত এই মনীষীদের পরিচয় হয়। তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার পর থরোকে ৪৪ খণ্ডে প্রাচ্য দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থের একটি সংকলন পাঠাইয়া দেন। থরো বলেন, এই বইগুলির কোনোটি আমেরিকায় পাওয়া একান্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। এমার্সনের "ব্রহ্ম" কবিতাটিকে ভারতীয় চিন্তাধারার প্লাবন-রস-পুষ্ট বৃক্ষের পুষ্প বলা চলে।

১ বিভিন্ন জাতিগত প্রকাশভংগীর মধ্য দিয়া মানবাত্মার কিরূপ মিলন ও মিশ্রণ ঘটে, ইহা তাহার হাজারো দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি মাত্র। ফলে, ইতিহাস পড়িবার সময় আমার প্রায়ই মনে হয়, ইহা যেন একই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন ঋতুকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছে। এই ধারণা ধীরে ধীরে আমার মনে পরিপক্ক হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে যে, কোনো বিশেষ দেশ, জাতি বা শ্রেণীর উদ্বর্তন এবং তাহাদের সংগ্রামের সমস্ত নিয়মই মানব জাতির বৃহত্তর উদ্বর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোনো মহত্তর বিশ্বব্যাপী নিয়মের অধীনে চলে।

২ জন মর্লে তাঁহার এমার্সন সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রবন্ধে এই মানসিক উন্মাদনার কালের একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহাকে শ্যাফ্‌টস্‌বেরি "উৎসাহের উন্মত্ততা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা ১৮২০ হইতে ১৮৪৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে নিউ ইংল্যাণ্ডকে পাগল করিয়া দিয়াছিল।

সম্প্রতি "বুকম্যান"-এ (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে হেরল্ড ডি- ক্যারি প্রধানত এই অদ্ভুত ব্রুকফার্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই মানসিক ও সামাজিক আন্দোলনের বিপ্লবী স্বরূপটি তিনি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান। ইহা "বলশেভিকবাদ" এইরূপ একটি ধারণা শাসক ও

পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমেরিকা যে সত্যকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সহিত এই মধুযামিনীর উদার প্রত্যাশার কোনো সাদৃশ্য নাই। সত্য তখনো পরিপক্ক হয় নাই; সত্যকে যাঁহারা চয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন আরো অপরিপক্ক। যাহাই হউক, উন্নত আদর্শ বা উন্নত ভাবের অভাবেই যে ইহা ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু ঐ সকল উন্নত ভাব ও আদর্শকে অত্যন্ত বেশি মিশাইয়া ফেলা হইয়াছিল; সেগুলিকে সুস্থভাবে পরিপাক করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, তাহা না দিয়াই সেগুলিকে অতি দ্রুত পরিপাকের চেষ্টা চলিয়াছিল। গৃহ যুদ্ধের পরে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে জাতীয় জীবনে আকস্মিক আঘাত লাগে; এবং একটি অসুস্থ ত্বরা আধুনিক সভ্যতার উন্মত্ত ছন্দে পরিণত হয়। ফলে, আমেরিকার মানস-সত্তা দীর্ঘকালের জন্য তাহার ভারসাম্য হারায়। যাহাই হউক, কংকর্ডের অগ্রদূতরা, এমার্সন ও থরো, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কি বীজ বপন করেন, তাহা সন্ধান করা খুব দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু তাঁহাদের সেই শস্য হইতে "মন-চিকিৎসা" এবং মিসেস বেকার এডি-র অনুচররা কী অদ্ভুত খাদ্যই না প্রস্তুত করিয়াছেন!

তাঁহারা, কম-বেশি ইচ্ছা করিয়া, এমার্সনের আদর্শবাদনিঃসৃত ভারতীয় উপাদানগুলিকে ব্যবহার করিয়াছেন।[১] কিন্তু তাঁহারা সেগুলিকে উপযোগবাদের (Utilitarianism) ও একপ্রকার অতীন্দ্রিয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের নিষ্প্রাণ স্তরে

ধনিক শ্রেণীর মহলে দেখা দেয়। ইহার মধ্যে একটি ভয়ংকর ক্ষিপ্ততা আত্মপ্রকাশ করে। শাসক ও ধনিক শ্রেণীর লোকেরা এজন্য এমার্সনকে আক্রমণ করিতে থাকেন, প্রধানত তাঁহাকেই এই বিদ্রোহের মনোভাবের জন্য দায়ী করেন। এমার্সন এবং তাঁহার বন্ধুরা এই সময় যে সাহসের পরিচয় দেন, তাহা এখনকার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। থরো এবং থিওডোর পার্কার এই আইনগত মিথ্যাগুলিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত দেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হইতেছিল (১৮৪৭ খৃস্টাব্দে মার্কিন সরকার মেক্‌সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন), তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করেন।

১ মন-চিকিৎসা সম্পর্কে উইলিয়াম জেম্‌স্ বলেন: "উহা এই উপাদানগুলি দিয়া প্রস্তুত: বাইবেলে কথিত খৃস্টের চারিটি জীবনী, বার্কলি ও এমার্সনের আদর্শবাদ, পর পর কতিপয় জীবনের মধ্য দিয়া আত্মার উৎকর্ষের নীতি সহ প্রেততত্ত্ব, আশাবাদী ও বিকৃত বিবর্তনবাদ এবং বিভিন্ন ভারতীয় ধর্ম।"

শার্ল্ বদুয়াঁ বলেন, ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের পর উহার উপর ফরাসী সম্মোহন বিদ্যার বিভিন্ন রূপকে চাপাইয়া দেওয়া হয়। তিনি সেই সঙ্গে ইহা-ও লক্ষ্য করেন যে, বিনিময়ে কু-ও উপকৃত হন; কারণ, তিনি বিশেষত আমেরিকার বিকৃত অতীন্দ্রিয়বাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ইংরেজি শিখেন এবং উহাকে সরলতম ও সর্বাপেক্ষা যুক্তিবাদী, প্রত্যক্ষবাদী একটি রূপ দেন।

নামাইয়া আনিয়াছেন। এই উপযোগবাদ কেবল আশু লাভের দিকেই লক্ষ্য রাখে; এই অতীন্দ্রিয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এক ভয়ংকর বিশ্বাসপরায়ণতার উপর নির্ভর করিয়া উঠিয়াছে, যে বিশ্বাসপরায়ণতা "খৃস্টান বিজ্ঞানকে"[১] তাহার গর্বিত তথাকথিত বৈজ্ঞানিকতা এবং তথাকথিত খৃস্টান ধার্মিকতার দিকগুলি দিয়াছে।

কিন্তু এগুলির সকলের সাধারণ উৎস সন্ধান করিতে হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে মেস্‌মারের চুম্বকবাদে, এবং তাহা হইতে এই দুর্বোধ্য শক্তিমান্ ব্যক্তিত্ব কি কি উপাদানে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (তুলনীয়: ঝানে রচিত "মেদিকাসিঅঁ শাইকলঝিক" ১ম খণ্ড, আলকাঁ, ১৯১৯) "খৃস্টান বিজ্ঞান" সম্পর্কে মিসেস এডি তাঁহার বাইবেল "সায়েন্স অ্যাণ্ড হেল্‌থ্" গ্রন্থে হিন্দু বেদান্তবাদের সহিত ইহার কতিপয় মূল ভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল দর্শন ও ধর্ম সংক্রান্ত শব্দাবলী জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে:

"Me or I. The Divine Principle, the Spirit, the Soul......Eternal Mind. There is only one Me or Us, only one Principle or Mind, which governs all things......Everything reflects or refracts in God's Creation one unique Mind; and everything which does not reflect this unique Mind is false and a cheat......"

"God—the great I am...Principle, Spirit, Soul, Life, Truth, Love, all substance, intelligence."

এইগুলি কোথা হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহা মিসেস এডি স্বীকার করিতে চান নাই মনে হয়। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার নূতন সংস্করণগুলিতে নীরব রহিয়াছেন। তিনি বেদান্ত দর্শন হইতে উদ্‌ধৃতি দেন। রামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ বলেন যে, "সায়েন্স ও হেল্‌থ্"-এর ২৪-তম সংস্করণটি বেদান্ত হইতে চারটি উদ্‌ধৃতি দিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, সেগুলি পরে তুলিয়া দেওয়া হয়। ঐ পরিচ্ছেদে মিসেস এডি ভগবৎ গীতার লণ্ডনে ১৮৮৫ ও নিউ ইঅর্কে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত চার্লস্ উইলকিন্‌সের অনুবাদ হইতে উদ্‌ধৃতি দেন। পরে ঐ সকল উদ্‌ধৃতি বই হইতে বাদ দেওয়া হয়: ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে কেবল দুই-একটি প্রচ্ছন্ন ইংগিতমাত্র থাকে। অসতর্ক পাঠকদের খাতিরে গোপন করিবার এই ধরণের চেষ্টা ঐগুলির গুরুত্বকে এক প্রকারে স্বীকার করা মাত্র। ("প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার মার্চ, ১৯২৮ সংখ্যায় ম্যাদেলিন আর. হার্ডিং-রচিত একটি প্রবন্ধ তুলনীয়।)

অবশেষে, মন-চিকিৎসা সম্পর্কে হোরেসিও ডাব্লিউ. ড্রেসার, হেন্‌রি শুড, এবং আর. ডাব্লিউ. ট্রাইন-রচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলিতে-ও ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ঐ প্রবন্ধগুলির রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, অর্থাৎ বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে, হওয়ায় ঐগুলির উপর বিবেকানন্দের প্রচুর প্রভাব থাকিতে পারে। তাঁহারা যৌগিক সাধনার সকল নিয়ম এবং উহার পশ্চাতে যে বিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা সম্পার্কে একমত। ফরাসী পাঠকরা উইলিয়াম জেম্‌স্ রচিত *Varieties of Religious Experiences* পুস্তকে কতকগুলি উদ্‌ধৃতি পাইবেন। (ফ্রাংক আবোজিতের ফরাসী অনুবাদ, ১৯০৬, ৪৮০–১০২ পৃষ্ঠা।)

১ এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, "খৃস্টান বিজ্ঞান" নামটি মিসেস এডির আগে ডক্টর কুইম্‌বি কর্তৃক

এই মতবাদগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি লক্ষণ দেখা যায়, সেটি হইল বিকৃত আশাবাদ—যে আশাবাদ মন্দকে অস্বীকার করিয়া, কিম্বা বলা চলে, একেবারে বাদ দিয়া মন্দের সমস্যার সমাধান করে। "মন্দ বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং চোখ ফিরাইয়া থাকা যাক!"

এই ধরণের একটি মানসিক দৃষ্টিভংগী এমার্সনের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। তিনি সম্ভব হইলে প্রায়ই ব্যাধি ও মৃত্যুর বিষয়গুলিকে বাদ দিতেন। তিনি ছায়াকে ঘৃণা করিতেন। "আলোকে শ্রদ্ধা করো!" কিন্তু ইহা ছিল ভীতিকে শ্রদ্ধা করা। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ছিল; তাই তিনি সূর্যকে আড়াল করিতে শুরু করেন। এই দিক হইতে তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে অতীব ঘনিষ্ঠভাবেই অনুসরণ করিয়াছেন। কর্মের জন্য এইরূপ আশাবাদের প্রয়োজন ছিল, একথা বলিলে হয়তো অত্যুক্তি হইবে না। কোনো মানুষের বা কোনো জাতির কর্মশক্তি, যাহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোনো অবস্থার উপর নির্ভর করে, আমি তাহাতে বিশ্বাস রাখি না। মার্গারেট ফুলারের এই উক্তিটি আমার খুব ভালো লাগে: "আমি বিশ্বকে গ্রহণ করিয়াছি।" কিন্তু কেহ গ্রহণ করুক কি না করুক, প্রথমে একান্ত প্রয়োজন হইল ইহাকে দেখা এবং ইহাকে সমগ্রভাবে দেখা। আমরা শীঘ্রই বিবেকানন্দকে তাঁহার ইংরাজ শিষ্যদের উদ্দেশে বলিতে শুনিব: "যেমন মাধুর্য ও আনন্দের মধ্যে, তেমনি মন্দ, ভয়, দুঃখ ও বঞ্চনার মধ্যেও মাকে চিনিতে শেখো।" ঠিক এইভাবেই হাস্যময় রামকৃষ্ণ তাঁহার প্রেম ও আনন্দের স্বপ্নলোক হইতে দেখিতেন যে, কেবল "মঙ্গল" দিয়াই "শক্তিকে"—যে শক্তির পদতলে প্রতিদিন হাজার হাজার নিরপরাধ বলি-প্রদত্ত হইতেছে—সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা যায় না, এবং একথা তিনি "মঙ্গলময় ভগবানের" প্রচারকদিগকে স্মরণ কারাইয়া দিতেন। এইখানেই হইল ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের সহিত অ্যাংলো-স্যাক্সন আশাবাদের প্রচণ্ড পার্থক্য। তাঁহারা "বাস্তবতার" সম্মুখীন হইতেন, সে বাস্তবতাকে তাঁহারা, যেমন ভারতে, আলিংগন করিতেন, কিংবা, যেমন গ্রীসে, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পদানত করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের কাছে কর্ম কখনো জ্ঞানের রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু আমেরিকার জ্ঞানকে কর্মের সেবার জন্য পোষ

ব্যবহৃত হয়। ডক্টর কুইম্‌বি মিসেস এডির কয়েক বছর আগে (১৮৬৩-র কাছাকাছি সময়ে) 'খৃস্ট বিজ্ঞান', 'খৃস্টান বিজ্ঞান', 'দৈব বিজ্ঞান' ও 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞান' নামে অনুরূপ একটি মতবাদের প্রবর্তন করেন। কুইম্‌বির পাণ্ডুলিপিগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি মিসেস্ এডির উপর কুইম্‌বির প্রভাবকে প্রমাণিত করে।

মানানো হইয়াছে, তাহাকে সোনার জুরিদার টুপী ও কোর্তা পরাইয়া টুপীর উপর লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে : প্রাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্‌ বা প্রয়োগবাদ।[১] বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তি যে এই ধরণের পোশাক পছন্দ করিবেন না, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়; কারণ, এই ধরণের পোশাকের তলাতেই মহান, মুক্ত, সার্বভৌম ভারতীয় বেদান্তের জারজের দল আত্মগোপন করিয়া থাকে।[২]

কিন্তু এই সকল জীবন্ত মনুষ্যপালের ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া ছিলেন এক মৃত অতিকায় দানব।[৩] ইহাদের অনুষ্ঠানের হিম কাচ ভেদ করিয়া সত্তার সূর্যের যে বিবর্ণ আলো আসিয়া পড়িত, তাহার অপেক্ষা ঐ অতিকায় দানবের ছায়া ছিল হাজার গুণে বেশি উষ্ণ। তিনি বিবেকানন্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন।······কেমন করিয়া বিবেকানন্দ সে-হস্ত গ্রহণ করিলেন না?··· কিম্বা বরং বলা উচিত (কেননা, আমরা জানি, পরে বিবেকানন্দ ভারতে

---

১ দুর্বল যুদ্ধোত্তর ইউরোপে এইরূপ নৈতিক লক্ষণগুলি দুর্ভাগ্যবশত প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চলিয়াছে। এই নৈতিক শৈথিল্যের সর্বাপেক্ষা মন্দ দিকটি হইল এই যে, ইহা নিজের বাস্তবতা এবং সৃজনক্ষমতা সম্পর্কে আস্ফালন করে।

২ প্রথমবারে বিবেকানন্দের যুক্তরাষ্ট্রে থাকা-কালে মিসেস এডি মেটাফিজিক্যাল কলেজ অব মাসাচুসেট্‌স্‌ শিক্ষালয়টি খুলেন। এই কলেজে তিনি সাত বছরে চার হাজারের-ও বেশি ছাত্রকে শিক্ষা দেন। এই কলেজ সাময়িকভাবে (১৮৮৯-র অক্টোবরে) বন্ধ থাকে। ঐ সময় মিসেস এডি তাঁহার ১৮৯১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত "সায়েন্স অ্যাণ্ড হেল্‌থ" রচনা করেন। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে পুনরায় মিসেস এডির তত্ত্বাবধানে কলেজটি খোলা হয়।

মন-চিকিৎসার প্রসার বাড়িতেছিল এবং তাহা নূতন চিন্তার সৃষ্টি করিতেছিল। গোঁড়া ক্যাথলিক মতের কাছে মুক্তিবাদী প্রোটেস্ট্যান্ট মত যেমন, এই নূতন চিন্তা-ও ছিল 'খৃস্টান বিজ্ঞানে'র কাছে তেমনি।

থিওজফিক্যাল সোসাইটির দুইজন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে (প্রতিষ্ঠা-কাল ১৮৭৫) একজন, কর্ণেল অল্‌কট ছিলেন আমেরিকান। তিনি ভারতে এবং অন্যত্র কাজ করিয়া যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দেন। আমি আগেই বলিয়াছি, তাঁহার কাজের সংগে প্রায়ই বিবেকানন্দের কাজের সংঘর্ষ বাধিত।

তখন আমেরিকার ধর্মীয় অবচেতনায় যে সকল স্রোতের জোয়ার আসিয়াছিল, আমি কেবল সেগুলির তিনটি প্রধান স্রোতের কথা বলিয়াছি। তৎসহ পুনর্জাগরণবাদ-ও (পুনর্জাগরণের ধর্ম) ছিল। সেগুলি সমস্ত অবচেতনের শক্তিসমূহের নিকট আত্মসমর্পণের পথেই অগ্রসর হইতেছিল। ঐ সময় মায়ার্স (১৮৮৬ এবং ১৯০৫-এর মধ্যে) জ্ঞান ও অবচেতন জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আত্মিক মতবাদ গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

একটি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। কাদা ও আগুন।

৩ আগেই হুইটম্যানের মৃত্যু হইয়াছিল। হুইটম্যান ছাড়া-ও ঐ সময় আর একজন ছিলেন,

হুইটম্যানের "লীভস্ অব গ্রাস" বা "তৃণদল" গ্রন্থখানি পড়েন), কেমন করিয়া বিবেকানন্দের জীবনীকাররা, সতর্কতা ও সংবাদ সম্পর্কে তাঁহাদের যতোই দৈন্য থাক, তাঁহাদের কাহিনী হইতে আত্মা-ব্রহ্মের ভারতীয় দূতের সহিত অহমের মহাকবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের সাক্ষাতের এমন মনোরম ঘটনাটিকে বাদ দিলেন ?

সেই সবে মাত্র, ১৮৯২ খৃস্টাব্দের ২৬ শে মার্চ তারিখে ফিলাডেলফিয়ার শ্রমিক-অধ্যুষিত উপকণ্ঠ ক্যামডেনের কাছে হুইটম্যানের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সৎকার অনুষ্ঠানের—অখৃস্টান বলিয়া বর্ণিত হইলে-ও তাহা ছিল খাঁটি ভারতীয় সার্বজনীনতা[১]—গৌরবময় স্মৃতি তখনো আকাশে বাতাসে রণিত হইতেছিল। হুইটম্যানের একাধিক অন্তরংগ বন্ধু বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বিখ্যাত সংশয়বাদী, বাস্তববাদী লেখক রবার্ট ইংগারসল[২], যিনি কবির প্রতি বিদায়ের শেষ ভাষণ দেন, তাঁহার সহিত বিবেকানন্দের এমন কি বন্ধুত্ব-ও

যাঁহার হুইটম্যানের মতোই ভারতীয় মানসিকার সহিত সমান সম্পর্ক ছিল। তিনি এডগার অ্যালেন পো। তিনি হুইটম্যানের অপেক্ষা কোনো অংশে খাটো ছিলেন না। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার "ইউরেকা"র মধ্যে উপনিষদের সহিত সম্পর্কিত চিন্তাধারা লক্ষিত হয়। ওয়াল্ডো ফ্র্যাংকের মতো আরো অনেকের ধারণা এই যে, ভ্রমণকালে (ইহা প্রায় নিঃসন্দেহ যে, খুব অল্প বয়সেই তিনি রাশিয়ায় গিয়াছিলেন) ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু সমসাময়িক চিন্তাধারার উপর "ইউরেকা" প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিছুদিন হুইটম্যান পো-র সহিত এক সংগে কাজ করিলে-ও ('ব্রডওয়ে জার্নাল্'-এ এবং 'ডেমক্রেটিক রিভিউ'তে) তিনি সম্ভবত পো-র সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার প্রতি ভিতর হইতে একটি বিরূপ ভাব অনুভব করিতেন এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে চেষ্টা করিবার পর তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠতাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। (১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ৫৬ বৎসর বয়সে, তিনি পো-র স্মৃতিস্তম্ভ উদ্‌বোধন করিবার জন্য বাল্টিমোর যান।) পো তাঁহার কালে একক ও নিঃসংগ ছিলেন।

১ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে মানবতার বাইবেল হইতে কতিপয় শ্রেষ্ঠ উক্তি পড়া হইতেছিল : "এখানে কনফুসিয়াসের, গৌতম বুদ্ধের, যিশু খৃস্টের, কোরানের, ইশাইয়ার, জনের, জেন্দাভেস্তার এবং প্লেটোর বাণীগুলি রহিয়াছে।"

২ শব সৎকারকালীন ভাষণে ইংগারসল "জীবন স্তোত্রের" অপূর্ব সংগীতকার এই কবির কথা এবং "যে মাতা এই কবিকে তাঁহার চুম্বন ও আলিংগন দিয়াছিলেন", তাঁহার কথা বলেন। ইংগারসল প্রকৃতিকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। হুইটম্যানের কবিতাগুলি এই মায়ের কথায় পরিপূর্ণ এবং মাঝে মাঝে এই মা প্রকৃতিরূপে আছেন—"The great, savage, silent Mother, accepting all". অনেক সময় তিনি আমেরিকারূপে-ও আছেন—"the redoubtable mother the great mother, Thou Mother with equal children." কিন্তু যে-কোনো বিরাট বস্তুর সহিত এই শব্দটি জড়িত হউক না কেন, ইহাতে সর্বদাই একটি সার্বভৌম সত্তার ভাব আছে এবং উহার

হইয়াছিল। বিবেকানন্দ একাধিকবার তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে[১] বিতর্ক-ও করিয়াছিলেন; সুতরাং বিবেকানন্দ হুইটম্যানের কথা শুনেন নাই, ইহা অসম্ভব।

হুইটম্যান সম্পর্কে বহু দেশেই বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছে এবং সেগুলির মধ্য দিয়া তিনি সুপরিচিত হইয়াছেন। তথাপি এখানে তাঁহার ধর্মাত্মক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণী দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি। কেননা, তাঁহার রচনার এই দিকটাতেই সর্বাপেক্ষা কম আলেকপাত করা হইয়াছে—অথচ এই দিকটাতেই তাঁহার চিন্তার সারবস্তুটি রহিয়াছে।

ইহার মধ্যে কিছুই প্রচ্ছন্ন নাই। হুইটম্যান তাঁহার নগ্নতাকে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার মতবাদটি তাঁহার "লীভ্‌স্‌ অব গ্রাসের" মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং বিশেষভাবে তাঁহার "স্টার্টিং ফ্রম পমানক"[২] কবিতার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সংহত হইয়াছে। অথচ এই করিতাটি তাঁহার "সং অব মিসেল্‌ফ্‌" কবিতার আওতায় চাপা পড়িয়াছে। উহাকে পুনরায় পুরোভাগে স্থাপন করা উচিত। হুইটম্যান নিজে-ও তাঁহার নিজের সম্পাদিত শেষ সংস্করণে উহাকে গোড়াতেই, "ইন্‌স্‌ক্রুপ্‌শন্‌" কবিতার ঠিক পরেই, স্থান দিয়াছেন।[৫] তিনি "স্টার্টিং ফ্রম পমানক" কবিতায় কি বলেন?

সুগভীর সুর ভারতীয় ভাবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়; সেগুলি সর্বদাই দৃশ্যমান্ বিধাতার সহিত জড়িত থাকে, যে বিধাতার উপর সকল প্রাণসত্তাই নির্ভর করিতেছে।

১ তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক প্রকাশিত *The Life of the Swami Vivekananda* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে কতিপয় সাক্ষাতের কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এবং শুধু এই মন্তব্য করা হইয়াছে যে, আমেরিকান চিন্তাধারার সর্বাপেক্ষা স্বাধীন ও প্রগতিশীলদের মহলেও যে বিবেকানন্দের গতিবিধি ছিল, এগুলি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। বন্ধুভাবে একটি আলোচনা প্রসংগে ইংগারসল বিবেকানন্দকে বিচক্ষণতা অবলম্বন করিতে বলেন। তিনি আমেরিকার গোপন ধর্মান্ধতা সম্পর্কে,—যে-ধর্মান্ধতাকে এখনো নির্মূল করা সম্ভব হয় নাই—বিবেকানন্দকে সতর্ক হইতে বলেন। তিনি বলেন, চল্লিশ বছর আগে হইলে, ভারতীয় বৈদান্তিককে পোড়াইয়া, এবং তাহার কিছুদিন পরে হইলে ইট-পাটকেল ছুঁড়িয়া, মারিবার ভয় ছিল।

২ 'পমানক' কবিতাটি প্রথম তিন সংস্করণে (১৮৫৫, ১৮৫৬ এবং ১৮৬০–৬১ খৃস্টাব্দে) ছিল না। চতুর্থ সংস্করণের (১৮৬৭) আগে ইহা স্থান পায় নাই। কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে ইহা গ্রন্থের গোড়াতেই স্থান পাইয়াছে। আমার বন্ধু লুসিয়েন প্রাইস আমাকে দেখাইয়াছেন যে, "লীভ্‌স্‌ অব গ্রাসের" প্রথম সংস্করণে "সং অব মিসেল্‌ফ্‌" কবিতাটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে ইহা প্রথমে যে নগ্নতর ও প্রচণ্ডতর রূপে লিখিত হইয়াছিল, সেইরূপেই রহিয়াছে। তাহা মনের উপর সুস্পষ্টভাবে রেখাপাত করে। "মহান বাণীর" মধ্যে যাহা কিছু বলিষ্ঠ ও শৌর্যপূর্ণ থাকে, তাহাই উহাতে

"আমি একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করি।......
......বলি, সমস্ত পৃথিবী, আকাশের সকল তারা
এরা রয়েছে ধর্মের জন্যেই।......
জেনো, পৃথিবীতে কেবল এক মহত্তর ধর্মের বীজ
বপন করার জন্যে-ই।
আমি গান গাই।
তোমরা আমার সংগে দুই মহত্ত্বের অংশ নাও,
উঠুক তৃতীয় এক মহত্ত্ব,
সর্বগ্রাহী, আরো জ্যোতির্ময়।
ভালোবাসার মহত্ত্ব, গণতন্ত্রের মহত্ত্ব,
আর মহত্ত্ব ধর্মের।"

(প্রথম মহত্ত্ব দুইটি নিম্ন স্তরের। তৃতীয় মহত্ত্বটির মধ্যে সে মহত্ত্ব দুইটি-ও রহিয়াছে; তৃতীয় মহত্ত্বটিই উহাদিগকে পরিচালিত করে। তবে হুইটম্যানের টীকাকারদের মনে প্রথম মহত্ত্ব দুইটি তৃতীয় মহত্ত্বটিকে এমন ম্লান করিয়া দিল কেন?)

কি সে ধর্ম, যাহা হুইটম্যানের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়াছিল, কি সে ধর্ম, যাহা তাঁহার জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার অরুচি সত্ত্বে-ও তাঁহাকে দেশে দেশে বক্তৃতা-যোগে ধর্ম প্রচারের কথা ভাবাইয়াছিল?[১] এই ধর্ম একটি মাত্র কথার মধ্যে সংক্ষেপে নিহিত আছে। শব্দটি হইল "আইডেন্‌টিটি" বা "একত্ব।" এই শব্দটিতে আশ্চর্য রকমের একটি ভারতীয় স্বর কানে বাজে। এই শব্দটি হুইটম্যানের সমস্ত রচনার মধ্যেই ছড়াইয়া আছে। ইহা তাঁহার প্রায় সমস্ত কবিতাতেই চোখে পড়ে।[২]

সংক্ষেপে প্রখর স্পষ্টতায় পরিস্ফুট রহিয়াছে। (উইলিয়াম স্লোন কেনেডি-রচিত *The Fight of a Book in the World* দ্রষ্টব্য)।

১ তাঁহার কবিতা প্রকাশের পূর্বে ও পরে তিনি একথা ভাবেন।

২ Starting from Paumanok, Song of Myself, Calamus, Crossing Brooklyn Ferry, A Song of Joys, Drum Taps, To Think of Time, ইত্যাদিতে।

শব্দটি দুইটি প্রায়-পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে: (১) অধিকতর সচরাচর অর্থে: অব্যবহিত ঐক্যবোধ; (২) চিরন্তন যাত্রা ও রূপান্তরের পথে অহমের চিরস্থায়িত্ব। আমার মনে হয়, এই পরবর্তী অর্থটিই তাঁহার ব্যাধি ও বার্ধক্যের দিনগুলিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

হইয়াছিল। বিবেকানন্দ একাধিকবার তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে[১] বিতর্ক-ও করিয়াছিলেন; সুতরাং বিবেকানন্দ হুইটম্যানের কথা শুনেন নাই, ইহা অসম্ভব।

হুইটম্যান সম্পর্কে বহু দেশেই বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছে এবং সেগুলির মধ্য দিয়া তিনি সুপরিচিত হইয়াছেন। তথাপি এখানে তাঁহার ধর্মাত্মক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণী দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি। কেননা, তাঁহার রচনার এই দিকটাতেই সর্বাপেক্ষা কম আলেকপাত করা হইয়াছে—অথচ এই দিকটাতেই তাঁহার চিন্তার সারবস্তুটি রহিয়াছে।

ইহার মধ্যে কিছুই প্রচ্ছন্ন নাই। হুইটম্যান তাঁহার নগ্নতাকে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার মতবাদটি তাঁহার "লীভ্‌স্ অব গ্রাসের" মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং বিশেষভাবে তাঁহার "স্টার্টিং ফ্রম পমানক"[২] কবিতার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সংহত হইয়াছে। অথচ এই করিতাটি তাঁহার "সং অব মিসেল্‌ফ্" কবিতার আওতায় চাপা পড়িয়াছে। উহাকে পুনরায় পুরোভাগে স্থাপন করা উচিত। হুইটম্যান নিজে-ও তাঁহার নিজের সম্পাদিত শেষ সংস্করণে উহাকে গোড়াতেই, "ইন্‌স্‌ক্রুপ্‌শন্" কবিতার ঠিক পরেই, স্থান দিয়াছেন।[৫] তিনি "স্টার্টিং ফ্রম পমানক" কবিতায় কি বলেন?

সুগভীর সুর ভারতীয় ভাবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়; সেগুলি সর্বদাই দৃশ্যমান্ বিধাতার সহিত জড়িত থাকে, যে বিধাতার উপর সকল প্রাণসত্তাই নির্ভর করিতেছে।

১ তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক প্রকাশিত *The Life of the Swami Vivekananda* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে কতিপয় সাক্ষাতের কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এবং শুধু এই মন্তব্য করা হইয়াছে যে, আমেরিকান চিন্তাধারার সর্বাপেক্ষা স্বাধীন ও প্রগতিশীলদের মহলেও যে বিবেকানন্দের গতিবিধি ছিল, এগুলি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। বন্ধুভাবে একটি আলোচনা প্রসংগে ইংগারসল বিবেকানন্দকে বিচক্ষণতা অবলম্বন করিতে বলেন। তিনি আমেরিকার গোপন ধর্মান্ধতা সম্পর্কে,—যে-ধর্মান্ধতাকে এখনো নির্মূল করা সম্ভব হয় নাই—বিবেকানন্দকে সতর্ক হইতে বলেন। তিনি বলেন, চল্লিশ বছর আগে হইলে, ভারতীয় বৈদান্তিককে পোড়াইয়া, এবং তাহার কিছুদিন পরে হইলে ইট-পাটকেল ছুঁড়িয়া, মারিবার ভয় ছিল।

২ 'পমানক' কবিতাটি প্রথম তিন সংস্করণে (১৮৫৫, ১৮৫৬ এবং ১৮৬০-৬১ খ্রস্টাব্দে) ছিল না। চতুর্থ সংস্করণের (১৮৬৭) আগে ইহা স্থান পায় নাই। কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে ইহা গ্রন্থের গোড়াতেই স্থান পাইয়াছে। আমার বন্ধু লুসিয়েন প্রাইস আমাকে দেখাইয়াছেন যে, "লীভ্‌স্ অব গ্রাসের" প্রথম সংস্করণে "সং অব মিসেল্‌ফ্" কবিতাটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে ইহা প্রথমে যে নগ্নতর ও প্রচণ্ডতর রূপে লিখিত হইয়াছিল, সেইরূপেই রহিয়াছে। তাহা মনের উপর সুস্পষ্টভাবে রেখাপাত করে। "মহান বাণীর" মধ্যে যাহা কিছু বলিষ্ঠ ও শৌর্যপূর্ণ থাকে, তাহাই উহাতে

"আমি একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করি।......
......বলি, সমস্ত পৃথিবী, আকাশের সকল তারা
এরা রয়েছে ধর্মের জন্যেই।......
জেনো, পৃথিবীতে কেবল এক মহত্তর ধর্মের বীজ
বপন করার জন্যে-ই।
আমি গান গাই।
তোমরা আমার সংগে দুই মহত্ত্বের অংশ নাও,
উঠুক তৃতীয় এক মহত্ত্ব,
সর্বগ্রাহী, আরো জ্যোতির্ময়।
ভালোবাসার মহত্ত্ব, গণতন্ত্রের মহত্ত্ব,
আর মহত্ত্ব ধর্মের।"

(প্রথম মহত্ত্ব দুইটি নিম্ন স্তরের। তৃতীয় মহত্ত্বটির মধ্যে সে মহত্ত্ব দুইটি-ও রহিয়াছে; তৃতীয় মহত্ত্বটিই উহাদিগকে পরিচালিত করে। তবে হুইটম্যানের টীকাকারদের মনে প্রথম মহত্ত্ব দুইটি তৃতীয় মহত্ত্বটিকে এমন ম্লান করিয়া দিল কেন?)

কি সে ধর্ম, যাহা হুইটম্যানের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়াছিল, কি সে ধর্ম, যাহা তাঁহার জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার অরুচি সত্ত্বে-ও তাঁহাকে দেশে দেশে বক্তৃতা-যোগে ধর্ম প্রচারের কথা ভাবাইয়াছিল?[১] এই ধর্ম একটি মাত্র কথার মধ্যে সংক্ষেপে নিহিত আছে। শব্দটি হইল "আইডেন্‌টিটি" বা "একত্ব।" এই শব্দটিতে আশ্চর্য রকমের একটি ভারতীয় সুর কানে বাজে। এই শব্দটি হুইটম্যানের সমস্ত রচনার মধ্যেই ছড়াইয়া আছে। ইহা তাঁহার প্রায় সমস্ত কবিতাতেই চোখে পড়ে।[২]

সংক্ষেপে প্রখর স্পষ্টতায় পরিস্ফুট রহিয়াছে। (উইলিয়াম স্লোন কেনেডি-রচিত *The Fight of a Book in the World* দ্রষ্টব্য)।

১ তাঁহার কবিতা প্রকাশের পূর্বে ও পরে তিনি একথা ভাবেন।

২ Starting from Paumanok, Song of Myself, Calamus, Crossing Brooklyn Ferry, A Song of Joys, Drum Taps, To Think of Time, ইত্যাদিতে।

শব্দটি দুইটি প্রায়-পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে: (১) অধিকতর সচরাচর অর্থে; অব্যবহিত ঐক্যবোধ; (২) চিরন্তন যাত্রা ও রূপান্তরের পথে অহমের চিরস্থায়িত্ব। আমার মনে হয়, এই পরবর্তী অর্থটিই তাঁহার ব্যাধি ও বার্ধক্যের দিনগুলিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

প্রতিটি মুহূর্তে জীবনের প্রতিটি রূপের সংগে একাত্ময়। আশু ঐক্যবোধ। প্রতিটি অণুকণার চিরন্তনতা সম্পর্কে সুনিশ্চয়তা।

এই বিশ্বাস হুইটম্যান কেমন করিয়া পাইলেন?

সম্ভবত লব্ধ কোনো জ্ঞান হইতে; সম্ভবত প্রাপ্ত কোনো আঘাতের অভিজ্ঞতা হইতে; সম্ভবত আধ্যাত্মিক কোনো সংকটজাত আলোক লাভ হইতে—বয়স ত্রিশ হইবার কিছুদিন বাদে, নিউ অর্লিয়েন্স ভ্রমণ কালে[১] তাঁহার মধ্যে আবেগ-অনুভূতির যে অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে। এই অভিজ্ঞতার কথা প্রায় অজ্ঞাতই রহিয়াছে।

ভারতীয় চিন্তাধারা সংক্রান্ত কিছু পড়িয়া তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এমনটি সম্ভব নহে। ১৮৫৬ সালের নভেম্বরে যখন থরো তাঁহাকে বলিতে আসিলেন যে, "লীভ্‌স্ অব গ্রাস" (১৮৫৫ খৃস্টাব্দের জুলাইএ প্রথম প্রকাশিত হয়; পরে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়) পড়িয়া তাঁহার প্রাচ্য দেশীয় কবিতাগুলির

আমি যদি এখানে হুইটম্যান সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি আলোচনা করিতে যাই, তবে তিনি জীবনে যে-সকল আঘাত পাইয়াছেন, এবং যে সকল আঘাতের কথা তাঁহার ঘোষিত আশাবাদের ফলে লোকে সহজে সন্দেহ করে না, সেগুলির ফলে তাঁহার চিন্তাধারার কিরূপ ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। অবশ্য, ঐ চিন্তাধারায় মূলত যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। Whispers of Heavenly Death নামক সংকলন গ্রন্থে তাঁহার Hours of Despair কবিতা দ্রষ্টব্য। তারপর সেই দুর্জয় মানস সত্তা, জীবনে যাহা যথেষ্ট পরিমাণে পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই, তাহা মৃত্যুর মধ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। তখন "জ্ঞাত" জীবন "অজ্ঞাতের" দ্বারা সম্পূর্ণ হইল। তখন "দিন" "অদিনে" নূতন আলোক আনিয়া দিল। (To Think of Time: Night on the Prairies দ্রষ্টব্য।) সেই অন্যতম সংগীত, যাহ'কে নিজের অজ্ঞানতার জন্য ইতিপূর্বে তিনি চিনিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার কানে ধ্বনিত হইল। অবশেষে, জীবিতের অপেক্ষা মৃত আরো জীবন্ত হইয়া উঠিল—হইয়া উঠিল "একমাত্র জীবিত, একমাত্র বাস্তব"—(haply the only living, only real)। (*Pensive and Falterig* দ্রষ্টব্য।)

"আমি ভাবি না যে, "জীবন" সব কিছু দিতে পারে।......কিন্তু বিশ্বাস করি, "স্বর্গীয় মৃত্যুর" মধ্যেই সব কিছু মিলে।" (*Assurances* দ্রষ্টব্য)।

"যতোদিন আমি অ-দিনকে (non-day) দেখি নাই, ততোদিন আমি দিনকে সুন্দরতম ভাবিতেছিলাম।...ও! এখন দেখিতেছি, দিনের মতোই জীবন-ও আমাকে সব কিছু দেখাইতে পারে নাই—আমি দেখিতেছি, মৃত্যু আমাকে কি দেখাইবে, তাহার জন্য আমাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।" ("Night on the Prairies" দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু তাঁহার "Identity"-র বা "চিরন্তন একের" ভিত্তিতে কোনো পরিবর্তন আসে নাই।

১ বাক্-রচিত "ওয়াল্ট হুইটম্যান" দ্রষ্টব্য।

কথা মনে পড়িতেছে এবং প্রশ্ন করিলেন যে, সেগুলির সহিত হুইটম্যানের পরিচয় আছে কিনা, তখন হুইটম্যান দৃঢ়তার সহিত জবাব দিলেন, "না!" হুইটম্যানের কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই। হুইটম্যান বই খুব কমই পড়িতেন। তিনি গ্রন্থাগারগুলিকে এবং সেখানে গিয়া যাঁহারা ভীড় করেন, তাঁহাদিগকে পছন্দ করিতেন না। তাঁহার চিন্তাধারার সহিত এশিয়ার চিন্তাধারার যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা কংকর্ডের ক্ষুদ্র মহলে এতো সুস্পষ্ট হইলেও, তিনি তাহার সত্যতা প্রমাণ করিয়া দেখিবার মতো কোনো কৌতূহলই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেখান নাই। তিনি ভারত সম্পর্কে যখনই কোনো উল্লেখ করিতেন, তখন তাহা এতোই আবছা ও অস্পষ্টভাবে করিতেন যে, তাহা হইতে তাঁহার অজ্ঞতা সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ-ই থাকিত না[১]।

তাই নিজের বাহিরে না গিয়া—যে-নিজের শতকরা একশত ভাগই ছিল আমেরিকান—কেমন করিয়া তিনি নিজেকে নিজের একেবারে অজ্ঞাতে বেদান্তের চিন্তাধারার সহিত জড়িত করিলেন, তাহা আবিষ্কার করিতে আরো কৌতূহল হয়। (কারণ, বৈদান্তিক চিন্তাধারার সহিত হুইটম্যানের চিন্তাধারার যে সাদৃশ্য আছে, তাহা এমার্সন হইতে শুরু করিয়া এমার্সনের দলের কাহারো দৃষ্টি এড়ায় নাই। এমার্সনের সুন্দর একটি উক্তি আছে, তাহা যথেষ্ট সুপরিচিত নহে। তিনি বলিয়াছিলেন: " 'লীভ্স্ অব গ্রাস'কে 'ভগবৎ গীতা' ও 'দি নিউ ইঅর্ক হেরাল্ডের' সংমিশ্রণ মনে হয়।")

কথাটা হয়তো হেঁয়ালি মনে হইবে, তাহা হইলে-ও হুইটম্যান তাঁহার নিজের জাতির, এবং তাঁহার নিজের ধর্মীয় জীবনের গভীরতা হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার পরিবার ছিল বামপন্থী কোয়েকারদের দলে; তাঁহারা স্বাধীনচেতা এলিয়াস হিক্‌স্‌কে কেন্দ্র করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়াছিলেন।

১ দুই-একবার তিনি "মায়া" (ক্যালামাস: the basis of all metaphysics), "অবতার" (সং অব কেয়ারওএল), "নির্বাণ" ('স্যাণ্ড্স্ অ্যাট্ সেভেনটি', 'টুইলাইট') কথাগুলি ব্যবহার করেন। কিন্তু সেগুলিতে তিনি জ্ঞানের পরিচয় দেন নাই: "mist, nirvana, repose and night, forgetfulness."

"প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" নামটি রূপক এবং একেবারে অপ্রত্যাশিত অর্থে ব্যবহৃত হইলে-ও উহাতে নিম্নলিখিত অতি সাধারণ একটি কবিতা-কলির অপেক্ষা ভারতীয় চিন্তাধারার অধিক কোনো পরিচয় মিলে না: "Old occult Brahma, interminably far back, the tender and junior Buddha......"

জীবনের শেষভাগে হুইটম্যান এলিয়াস হিক্‌সের নামে একটি পুস্তিকা উৎসর্গ করেন। হিক্‌স্ ছিলেন ধর্মে এক মহান্ ব্যষ্টিবাদী; ছিলেন সকল ধর্ম সম্প্রদায় ও ধর্মমত হইতে মুক্ত; তাঁহার কাছে ধর্ম ছিল কেবল অন্তরতর জ্যোতি, "গোপন, নীরব মহানন্দ।"[১]

হুইটম্যানের এইরূপ একটি নৈতিক মনোভাব তাঁহার শৈশব হইতেই তাঁহার মধ্যে অতীন্দ্রিয় নিবিশের অভ্যাসকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। তখন তাঁহার সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ছিল না; তবে তাঁহার জীবনের সকল প্রকার অনুভূতির মধ্য দিয়াই নিবিষ্টতা ঝরিয়া পড়িত। এই অদ্ভুত তরুণ প্রতিভার শান্তি ছিল না। তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে ছিল সর্বগ্রাসী একটি গ্রহণ-ক্ষমতা; ফলে তিনি সাধারণ মানুষের মতো কেবল বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে আনন্দ ও বেদনার শস্য সংগ্রহ করিতেন না, তিনি যাহা কিছু দেখিতেন, তাহার সংগেই সেই মুহূর্তেই তন্ময় হইয়া যাইতেন। তিনি তাঁহার মনের এই বিরল দিকটি সম্পর্কে তাঁহার "অটাম রিভিউলেট্‌স্" নামক সুন্দর কবিতায় বর্ণনা দিয়াছেন:

"There was a child went forth……
And the first object he looked upon, that
object he became.
And that object became part of him for the day
or a certain part of the day,
Or for many years or stretching cycles of years.……"

সমস্ত বিশ্ব যে তাঁহার নিকট বস্তু নহে, ব্যক্তি—সে ব্যক্তি তিনিই—এই সিদ্ধান্তে তিনি চিন্তার অপেক্ষা সহজ বোধ-শক্তির দ্বারাই উপনীত হইয়াছিলেন।

তিনি "গ্রীটিং টু দি ওয়ার্ল্ডে'র" মধ্যে হিন্দু এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবদৈন্য আরো বেশি।

তাঁহার একটি মাত্র রচনা যাহার প্রেরণার উৎস এশিয়ার চিন্তাধারার মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইল তাঁহার বাহাত্তর বছর বয়সে প্রকাশিত শেষ সংকলন Good-bye My Fancy (1891) পুস্তকের "The Persian Lesson" কবিতাটি। সেখানে তিনি সুফীবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এই সকল অতি প্রচলিত সত্যের কথা শুনিবার জন্য তাঁহার পারস্যে দৌড়িবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

১ ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের ৩১শে মে তারিখের একটি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে বৃদ্ধ কবি হুইটম্যান আবার বলেন: "Following the impulse of the spirit—*for* I am quite half of Quaker stock."

যখন তিনি অকস্মাৎ ত্রিশ ও চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যবর্তী সময়ে, যাহা তাঁহার কাছে পুনর্জন্ম বলিয়া মনে হইয়াছিল (সম্ভবত ১৮৫১-১৮৫২-র কাছাকাছি সময়ে), তাহার বিবরণী লিখিলেন, তখন তাহার ঝলকানি তাঁহার চোখ ধাঁধাইয়া দিল, তখন তাহা আসিল একটি আনন্দ-উচ্ছ্বসিত আঘাতের মতো। তিনি বলিলেন :

Oh ! the joy of my soul leaning pois'd on itself
receiving identity through materials···
My soul vibrated back to me from them.[১]

তাঁহার মনে হইল যে, "তিনি এই সর্বপ্রথম জাগিয়া উঠিলেন, এবং ইতিপূর্বে যাহা কিছুই ঘটিয়াছে, তাহা একটি জঘন্য স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না[২]।"

অবশেষে তিনি এমার্সনের কতিপয় বক্তৃতা বা আলোচনা[৩] শুনিলেন এবং সেগুলি তাঁহার বোধশক্তিকে এমন ভাবে বুদ্ধিগত করিয়া তুলিল যে, তাহা হইতে ভাবের ফসল ফলিল—হোক সে ফসল যতোই অসম্পূর্ণ, যতোই অসংবদ্ধ। বুদ্ধিগত যুক্তি এবং অধিবিদ্যাগত গঠন[৪] সম্পর্কে হুইটম্যান চিরদিনই উদাসীন ছিলেন। ফলে তাঁহার সমগ্র চিন্তাধারা তাঁহাকে অনিবার্যভাবে বর্তমান মুহূর্তে এবং কতক পরিমাণ আলোকোদ্‌ভাসের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিত এবং সেগুলি হইতেই জাগিয়া উঠিত স্থান

১ A Song of Joy.

২ Camden Edition, III, 287

৩ ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে হুইটম্যান বলেন যে, তিনি ১৮৫৫-র আগে এমার্সনের লেখা পড়েন নাই। কিন্তু ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে তিনি অকুণ্ঠভাবে এমার্সনকে লিখিয়াছেন যে, এমার্সন হইলেন আমার "নব মহাদেশের" কলাম্বাস এবং তিনি নিজে উহার অনুপ্রাণিত পর্যটক। "আপনিই ইহার উপকূলগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন।···" কিন্তু এখানে একটি অপরটিকে অস্বীকার করে না। এই আবিষ্কার সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, উহা এমার্সনের পক্ষে কলাম্বাসের বুদ্ধি-চালিত আমেরিকা-আবিষ্কারের মতো হইয়াছিল ; যদিও বহু শতাব্দী আগে নরওয়েজিয়ানরা জাহাজে করিয়া এই মহাদেশের উপকূল ধরিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, অথচ সমুদ্র যাত্রার চিহ্ন রূপে কোথাও কোনো খুঁটি তাঁহারা গাড়েন নাই। তরুণ হুইটম্যানের অবস্থাটা ছিল নরওয়েজিয়ান নাবিকদের মতোই।

৪ "আমার বাতায়নে একটি সুন্দর প্রভাত আমাকে পুঁথিগত অধিবিদ্যার অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি দেয়।" ("সং অব মিসেল্‌ফ্‌" কবিতা।)

এবং "ক্যালামাস" কবিতার সেই সুন্দর কথাগুলি : "Of the terrible doubt of appearances." এই "ভয়ংকর সংশয়ের" মধ্যে সমস্ত কিছুই ঘূর্ণিত হইতেছে। সকল ভাব, সকল যুক্তি সেখানে বিফল, সেখানে সেগুলি কিছুই প্রমাণ করিতে পারে না ; বন্ধুর হাতের স্পর্শ ব্যতীত কিছুই সেখানে স্থির নিশ্চয়তাকে প্রকাশ করে না : "a hold of thy hand has completely satisfied me."

ও কালের একটি নিঃসীমতা। এইভাবে অবিলম্বে তিনি একই সময়ে বিভিন্ন বস্তুকে পৃথকভাবে ও সমগ্রভাবে,—সমগ্র বিশ্বময় প্রতিটি অণু, প্রতিটি জীবন যেভাবে উদ্ঘাটিত হইতেছে, সেইভাবে—অনুভব করিতেন, আলিংগন করিতেন, সাদরে গ্রহণ করিতেন। ভক্তিযোগীরা মুহূর্তে উপলব্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন, এবং তাহাকে আয়ত্ত করিয়া জীবনের দৈনন্দিন কর্ম ও চিন্তার মধ্যে ব্যবহার করিবার জন্য নামিয়া আসেন ; ভক্তিযোগীদের সমাধির এই উন্মত্ত আনন্দময়তার সহিত উহার পার্থক্য কি[১] ?

সুতরাং বিবেকানন্দের আগমনের বহু পূর্বেই আমেরিকার যে বেদান্ত সম্পর্কে একটি প্রবণতা ছিল, ইহা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। বাস্তবিক পক্ষে, ইহা মানবাত্মার প্রণবতা, ইহা সকল কাল ও দেশের মধ্যেই রহিয়াছে। ভারতীয় বৈদান্তিকরা বিশ্বাস করিতে চাহিলে-ও, উহা কোনো একটিমাত্র দেশের মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। অন্যপক্ষে, উহার ক্রমবিকাশ বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন আদর্শের ও বিভিন্ন প্রথার মধ্যে, যাহার উপর তাহাদের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, বিভিন্নরূপে ঘটিয়াছে —কোথাও উহা সাহায্য পাইয়াছে, কোথাও বা উহা ব্যাহত হইয়াছে। বলা চলে যে, যাঁহাদেরই মধ্যে সৃজনী শক্তির স্ফুলিংগ রহিয়াছে, তাঁহাদের মনের মধ্যেই এইরূপ একটি প্রবণতা সুপ্ত আছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য ; তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ব কেবল প্রতিফলিত হয় না (নিষ্প্রাণ কাচের মধ্যে যেমনটি হয়), তাঁহাদের মধ্যে তাহা জীবন্ত হইয়া উঠে। হৃদয় যাঁহাকে প্রতিটি পার্থিব স্পন্দনে অনুভব করে, সেই প্রচ্ছন্ন সত্তাকে, তাঁহাকে 'মা' এই অন্যতম নামে অভিহিত করিলে বলা চলে, 'মা'-র সহিত উন্মাদনাময় মিলনে বীঠোফেনের মধ্যেও সংকট দেখা দিয়াছিল ; আমি সেগুলির বর্ণনা আগেই করিয়াছি। তাহা ছাড়া, উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে, বিশেষত ওয়ার্ডস্বার্থ ও শেলীর যুগের ইংরেজ কবিদের মধ্যে, এইরূপ জ্যোতির চকিত প্রকাশ প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হুটম্যানের মতো অন্য কোনো পাশ্চাত্ত্য কবির মধ্যে উহা এমন সবল ও সচেতনভাবে বর্তমান ছিল না। হুইটম্যান সমস্ত বিক্ষিপ্ত শিখাগুলিকে একত্রিত করিয়াছিলেন ; তাঁহার সহজ অনুভূতিকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত

১ হুইটম্যান যে পরম আনন্দময় অবস্থার মধ্যে তাঁহার কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে মিস্ হেলেন প্রাইস তাঁহার স্মৃতিকথায় তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। (উহা বাক্ তাঁহার "হুইটম্যান" পুস্তকে ২৬-৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।)

করিয়াছিলেন; সে বিশ্বাস ছিল তাঁহার স্বজাতিতে বিশ্বাস, বিশ্বের প্রতি বিশ্বাস, সমগ্র মানব জাতিতে বিশ্বাস।

কিন্তু ইহা কী আশ্চর্য যে, এই বিশ্বাসকে বিবেকানন্দের মুখামুখি আনিয়া ধরা হইল না! ধরা হইলে তিনি কি এই অপ্রত্যাশিত সাদৃশ্যগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন না:—"লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া" অবিরাম "পুনর্জন্মের[১]" মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মার সেই যাত্রার কথা—একথা হুইটম্যান বারে বারে বলিতেন, জোরের সংগেই বলিতেন; তাঁহার পূর্ববর্তী জীবনগুলির প্রত্যেকটির লাভ-লোকসানের

১ How can the real body ever die and be buried? Of your real body—it will pass to future spheres, carrying what has accrued to it from the moment of birth to that of death." (*Starting from Paumanok*).

"The journey of the soul, not life alone, but death, many deaths I wish to sing." (*Debris on the Shore*).

তাঁহার "সং অব মিসেল্‌ফ্" কবিতার মধ্যে "from the summit of the Summits of the staircase"-এ এক অপূর্ব শোভাময় দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে:—"Far away at the bottom, enormous original Negation." তারপর আত্মার যাত্রা, সেই যুগ-চক্র (the cycle of ages), যে চক্রপথে, যাহাই ঘটুক, একদিন লক্ষ্যে পৌঁছিব, এই স্থির নিশ্চয়তার সংগে আনাগোনা চলে—"From one shore to another, rowing, rowing like cheerful boatmen."

"Whether I arrive at the end of to-day, or in a hundred thousand years or in ten millions of years."

"To Think of Time" কবিতা হইতে:

"Something long preparing and formless is arrived and form'd in you,
You are henceforth secure, whatever comes or goes.
The law of promotion and transformation cannot be eluded."

"অটাম্ রিভিউলেট্স্" কাব্যগ্রন্থের "সং অব প্রুডেন্স" কবিতাটি হিন্দু ধর্মের কর্মসংক্রান্ত নিয়ম অনুসারে প্রমাণ করিয়া দেখায় যে, "every move affects the births to come." কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাতে "business", "investments for the future" কথাগুলি আসিয়া পড়িয়াছে। (কিন্তু যদি ভালো কিছু 'investment for the future' থাকে, তাহা হইল দান ও ব্যক্তিগত শক্তি।).

সম্ভবত এই কবিতাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল "From Noon to the Starry Night" সংকলনের "Faces" কবিতাটি। এই কবিতায় মুহূর্তের "মুখের" মতো অতি দীন মুখগুলি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। পরে সেগুলি স্তরের পর স্তরে অপসারিত হয় এবং অবশেষে সেই মহিমান্বিত মুখমণ্ডলটি আত্মপ্রকাশ করে:

"Do you suppose I could be content with all, if I thought them their own finale?...

খতিয়ান; তাঁহার সেই আত্মা-ব্রহ্মের কথা—যে দ্বৈত দেবতার একটি অপরের[১] নিকট মাথা নত করে না; মায়াজালের কথা—যে জালকে তিনি ছিন্ন করিয়াছিলেন[২], যে জালের বিস্তারিত অবকাশের মধ্য দিয়া দেবতার জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত: "Thou orb of many orbs. Thou seething principle, Thou well-kept latent germ, Thou centre[৩]" কথাগুলি; সেই সর্বজনের গৌরবময় সংগীত[৪], যে সংগীতের মধ্যে সকল ধর্মের, সকল বিশ্বাসের, সকল অবিশ্বাসের, এমন কি বিশ্বের সকল আত্মার অবিশ্বাসের, বিরুদ্ধতাগুলি সংগতি-লাভ করিয়া মিলিত হইয়াছিল, যে মিলনের আদর্শকেই ভারতে রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন[৫], এবং তাঁহার নিজের সেই বাণী—"সমস্তই

I shall look again a score or two of ages."

অবশেষে, তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্‌কালে তিনি বলেন: "I receive now again of my many translations, from my avatars ascending, while others doubtless await me." (Songs of Parting হইতে Farewell কবিতা)।

১ "The Me myself...I believe in you, my soul, the other I am must not abase to you...and you must not be abased to the other......" (*Song of Myself*).

২ তাঁহার অনুরক্ত বন্ধু ও'কনর তাঁহার বর্ণনা করিয়া বলেন: "এই মানুষটি তাঁহার সকল ছদ্মবেশ ও মায়াজালকে ছিন্ন করিয়া দূরে সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং অতি সাধারণ বস্তুর মধ্যে-ও যে ঐশী অর্থ রহিয়াছে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন!" (বাজ-রচিত "হুইটম্যান" ১২৪-৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

৩ Inscriptions কবিতা (To the Old Cause). উহা কি কোনো বৈদিক সংহিতা হইতে সংগৃহীত হইতে পারিত না?

৪ *Birds of Passage* দ্রষ্টব্য

৫ "I do not despise you priests, all time, the world over,
My faith is the greatest of faiths and the least of faiths.
Enclosing worship, ancient and modern cults, and all
Between ancient and modern......
Peace be to you sceptics, despairing shades...
Among you I can take my place just as well as amongs others..."

(*Song of Myself*).

"I believe materialism is true and spiritualism is true..."

(*Birds of Passage*-এ *With Antecedents* দ্রষ্টব্য)।

সত্য !"[১] আর ইহা-ও কি সত্য নহে যে, এমন কি ব্যক্তিগত কতকগুলি দিক হইতে-ও তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল ? যেমন, সেই সমুচ্চ অহংকার, যাহা নিজেকে ভগবানের সহিত তুলনা করে[২] ; সেই "বিশ্রামের শত্রু" মহান ক্ষত্রিয়ের সংগ্রামী মনোবৃত্তি ; সেই সমর-প্রীতি, যে সমর-প্রীতি বিপদ বা মৃত্যুকে ভয় করে না, বিপদ ও মৃত্যুকে ভীমা ভয়ংকরীর পূজা বলিয়া মনে করে[৩]। বিপদ ও মৃত্যু যে ভীমা

রামকৃষ্ণের মতোই হুইটম্যান তাঁহার উপর কোনো মতবাদ বা নূতন সম্প্রদায়কে চড়াইয়া দিবার সকল চেষ্টারই প্রতিবাদ করেন। ঐ একই সংকলনে তিনি প্রতিবাদ জানান :

"I charge that there be no theory or school founded out of me.
I charge you to leave all free, as I have left all free."

(*Myself and Mine*)

সর্বোপরি, তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মতোই কোনো প্রকার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, এবং বাহিরের কোনো উপায় দ্বারা অনুষ্ঠিত সামাজিক কর্মের প্রতি বিরাগ দেখান। (এচ. ট্রবেলের সহিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : *With Walt Whitman in Camden* পুস্তক, ১০৩ ও ২১৬ পৃষ্ঠা।) তিনি যে একমাত্র সংস্কার চাহিয়াছিলেন, তাহা ছিল অন্তরতর সংস্কার : "Let each man, of whatever class or situation, cultivate and enrich humanity !"

১ *From Noon to Starry Night* সংকলনে :

"All is Truth...
I see that there are really...no lies after all...
And that each thing exactly represents itself and what has preceded it."

২ "Nothing, not God, is greater to one than one's self is...
I, who am curious about each, am not curious about God...
Nor do I understand who there can be more wonderful than myself...
Why should I wish to see God better than this day ? •
In the faces of men and women I see God, and in my own face
in the glass."

(*Song of Myself*).

"It is not the earth, it is not America who is so great.
It is I who am great or to be great...
The whole theory of the universe is directed unerringly to
one single individual—namely to you."

(*By Blue Ontario's Shore*).

৩ I am the enemy of repose and give the others like for like,
My words are made of dangerous weapons, full of death.
I am born of the same elements from which war is born."

(*Drum-Taps*).

ভয়ংকরীর পূজা, এই ব্যাখ্যাটি স্বপ্নাচ্ছন্নের ন্যায় হিমালয় ভ্রমণ কালে বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে সংগোপনে যে মহান্ কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়[১]।

বিবেকানন্দ হুইটম্যানের মধ্যে কি অপছন্দ করিতেন, তাহা-ও এই সংগে আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সেটি হইল—"দি নিউ ইঅর্ক হেরাল্ড" পত্রিকার সহিত গীতার এক হাস্যকর সংমিশ্রণ। তাঁহার অধিবিদ্যা বিষয়ক সাংবাদিকতা, তাঁহার অভিধান হইতে সংগৃহীত স্বল্পপরিমাণ দোকানদারসুলভ জ্ঞান—তাঁহার সগুম্ফ নার্সিসাস্-প্রীতি, তাঁহার নিজের ও নিজের জাতি সম্পর্কে বিস্ময়কর আত্মতৃপ্তি—তাঁহার গণতান্ত্রিক মার্কিনবাদ ও তাঁহার শিশুসুলভ দর্প ও ফাঁপা গ্রাম্যতা এবং সর্বদা নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা—এগুলি এই মহান ভারতীয়ের মনে নিশ্চয় অভিজাত একটি ঘৃণার উদ্রেক করিত। 'দি নিউ ইঅর্ক হেরাল্ডের' সহিত গীতার হাস্যকর সংমিশ্রণটা এমার্সনের মধ্যে-ও মৃদু হাস্যের সঞ্চার করিয়াছিল। বিশেষত, "অধিবিদ্যা", প্রেততত্ত্ব এবং প্রেতলোকের সহিত যোগা-যোগ প্রভৃতি নিষিদ্ধ আনন্দের সহিত হুইটম্যানের আদর্শবাদ যে আপনের খেলা খেলিতেছি[২], বিবেকানন্দ তাহা কখনো সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু এইরূপ মতদ্বৈধ ঘটিলে-ও বিবেকানন্দের মতো আকর্ষণময় আত্মার প্রতি আকৃষ্ট হইতে এই শক্তিমান প্রেমিককে কেহই বিরত করিতে পারিত না। এবং, বস্তুতপক্ষে, পরে তাঁহাদের মিলন-ও ঘটিয়াছিল; কারণ, আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে, ভারতে

---

১ "I take you specially to be mine, your terrible rude forms.
(Mother, bend down, bend close to me your face.)
I know not what these plots, and wars, and determents are for.
I know not the fruition of the success, but I know that through
war and crime your work goes on."

(*By Blue Ontario's Shore*).

২ তাঁহার শেষ বয়সের অন্যতম কবিতা *Continuities* (*Sands at Seventy* সংকলন হইতে) রচনার প্রেরণা তিনি একটি প্রেতের সহিত আলাপের ফলে পাইয়াছিলেন (তিনি নিজে এইরূপ বলেন)। মৃতরা সত্যসত্যই জীবিতদের মতো ফিরিয়া আসে, এইরূপ একটি দৃঢ় ধারণা তাঁহার ছিল এবং সেই ধারণার কথা তিনি বারে বারে বলিয়াছেন:

"The living look upon the corpse with their eyesight,
But without eyesight lingers a different living and looks
curiously on the corpse." (*To Think of Time*).

বিবেকানন্দ "লীভ্‌স্ অব গ্রাস" পড়িয়াছিলেন এবং হুইটম্যানকে "আমেরিকার সন্ন্যাসী"[১] আখ্যা দিয়াছিলেন, এবং এইরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহাদের একই উত্তরাধিকার। তবে ইহাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমেরিকায় অবস্থান কাল শেষ হইবার আগে পর্যন্ত বিবেকানন্দের নিকট তাঁহাদের এই সম্পর্কের কথা অনাবিষ্কৃত ছিল? কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার শিষ্যরা এই সম্পর্কের কোনো উল্লেখই বিশদভাবে প্রকাশ করেন নাই।

ব্যাপারটি আসলে যাহাই হউক, ভারতীয় চিন্তাকে মন দিয়া শুনিতে আমেরিকা যে প্রস্তুত আছে, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য হুইটম্যানের আত্মা সেখানে উপস্থিত ছিল। তাঁহার আত্মা আমেরিকার অগ্রদূত হইয়া কাজ করিতেছিল। ক্যামডেনের এই বৃদ্ধ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা গম্ভীর কণ্ঠে ভারতের আগমন ঘোষণা করিয়াছিলেন:

"Living beings, identities, now doubtless near us in the air that we know not of." (*Starting from Paumanok*).

"বাস্তবিক দেহ" এবং "মলমূত্রময় দেহ" সম্পর্কে তাঁহার একটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল:

"The corpse you will leave will be but excrementitious.
(But) yourself spiritual bodily, that is eternal...
will surely escape."

(*Whispers of Heavenly Death* সংকলনের *To One Shortly to Die* কবিতা তুলনীয়।)

"Myself discharging my excrementitious body to be burned, or render'd to
powder or buried.
My real body doubtless left to me for other spheres."

(*A Song of Joy*).

১ তাঁহার শিষ্যগণ রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ Life of the Swami Vivekananda, ৩য় খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের শেষাশেষি আমেরিকা হইতে ফিরিবার অল্প দিন বাদে লাহোরে তিনি তীর্থরাম গোস্বামীর পাঠাগারে "লীভস্ অব গ্রাস" এক কপি হাতে পান। (তীর্থরাম গোস্বামী ঐ সময়ে লাহোরে একটি কলেজে অংকের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি স্বামী রামতীর্থ নামে আমেরিকা যান।) বিবেকানন্দ বইখানি পড়িবার বা আবার পড়িবার জন্য (বিবরণীতে প্রদত্ত কথাগুলি হইতে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না) লইয়া যাইতে চান। এই বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, "তিনি হুইটম্যানকে 'আমেরিকার সন্ন্যাসী' নামে অভিহিত করিতেন।" তবে এই মতামত ঐ তারিখের পূর্বের কি পরের, তাহা স্থির করা যায় না।

"To us, my city......
The Originatress comes,
The nest of languages, the bequeather of poems,
the race of old......
The race of Brahma comes."[১]

তিনি ভারতের তীর্থযাত্রীর প্রতি দুই বাহু প্রসারিত করেন এবং "গণতন্ত্রের নাভিস্থল" আমেরিকার হাতে তাঁহাকে তুলিয়া দেন:

"The past is also stored in thee......
Thou carriest great companions.
Venerable priestly Asia sails this day with thee."[২]

সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, এই অজ্ঞাত অতিথিকে আমেরিকার পক্ষ হইতে যাঁহাদের চিন্তাধারা সেদিন সম্মানিত করিয়াছিল, তাঁহাদের পুরোভাগে হুইটম্যানকে স্থাপন না করিয়া বিবেকানন্দের ভারতীয় জীবনীকারগণ একটি শোচনীয় ত্রুটি করিয়াছেন।

আমরা হুইটম্যানকে বিবেকানন্দের পাশে উপযুক্ত স্থান দিব। কিন্তু সেই সংগে আমেরিকায় হুইটম্যানের প্রভাবকে যাহাতে অতিরঞ্জিত করা না হয়, সে বিষয়ে-ও আমরা সতর্ক হইব। "En-Masse" বা সমগ্রতার[৩] এই মহাকবি ম্যাস (Mass) বা জনসাধারণকে জয় করিতে পারেন নাই। আমেরিকান গণতন্ত্রের এই মহান্ সূত্রকার জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য থাকিয়াই মারা গিয়াছেন; আমেরিকার গণতন্ত্রীরা-ও তাঁহাকে একরকম লক্ষ্যই করেন নাই। কেবলমাত্র কয়েকজন সুনির্বাচিত শিল্পী এবং অসাধারণ ব্যক্তির একটি ক্ষুদ্র দল "দিব্য সাধারণের"

১ A Broadway Pageant.

২ *Thou Mother with Thy Equal Brood.*

৩ "One's-Self I sing, a simple separate person,
Yet utter the word Democratic, the word En-masse."

পুস্তকটির প্রারম্ভে *Inscriptions*-এর প্রথমে এই কথাগুলি আছে।

"And mine (my word), a word of the modern, the word En-masse.
A word of faith that never balks..."

(*Song of Myself*).

(Divine Average)[১] এই সংগীতকারকে ভালোবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন। এই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাও সম্ভবত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অপেক্ষা ইংলণ্ডেই অধিক পাইয়াছিলেন।

সত্যকার অগ্রদূতদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। জনসাধারণ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করে নাই বলিয়া তাঁহারা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব কম করিয়াছেন, একথা ভাবিবার কোনো কারণ নাই। জনসাধারণের মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি সংহত ও প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁহাদের মধ্যে তাহাই অসময়ে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহারা সেই শক্তির কথা ঘোষণা করিয়াছেন; আগে হউক, পিছে হউক, সেই শক্তি প্রকাশ লাভ করিবেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় জনসাধারণের সমুদ্রের গভীরে যে ঘুমন্ত আত্মা গোপন ছিল, হুইটম্যানের প্রতিভা ছিল তাহারই সংকেত। সে আত্মা তখনো সুপ্ত ছিল—তাহা এখনো জাগ্রত হয় নাই।

১ "O, such themes,—equalities, O Divine average!"

(*Starting from Paumanok*).

তিনি ঘোষণা করেন, "Liberty and the divine average." (*From Noon to Starry Night* সংকলনের *And Walk These Broad Majestic Days of Peace.*)

এবং তাঁহার শেষ কথা তাঁহার *Good-bye my Fancy* কবিতার মধ্যে ঘোষণা করেন:

"I chant the common bulk, the general average horde."

৫

আমেরিকায় প্রচার

যে সকল আধ্যাত্মিক প্রকাশের কথা আমি এখন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিলাম (পাশ্চাত্ত্যের নূতন আত্মার ভাবী ঐতিহাসিকগণের উপর এ বিষয়ে গভীর ভাবে গবেষণা করিবার ভার রহিল), সেগুলির সবটুকু হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, অর্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাধারায় যে ভাবে কাজ চলিতেছিল, তাহার ফলে পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য যে কোনো দেশের অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রই বিবেকানন্দকে গ্রহণ করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি প্রচার শুরু করিতে না করিতেই তাঁহার বাণীর জন্য তৃষ্ণার্ত নর-নারী তাঁহার চারিদিকে ভীড় করিয়া আসিল। তাহারা চারিদিক হইতে আসিল। আসিল ক্লাব হইতে, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, আসিলেন অকপট শুদ্ধচেতা খৃস্টানরা, আসিলেন অকপট স্বাধীনচেতা মনীষীরা, আসিল সংশয়বাদীরা। বিবেকানন্দকে যাহা বিস্মিত করিল—আজও আমাদিগকে যাহা বিস্মিত করে—তাহা হইল পৃথিবীর এই নবীন ও প্রবীণ অংশে ভবিষ্যতের আশা ও আশংকার পাশাপশি আছে অত্যন্ত অশুভ শক্তি, সত্যের জন্য প্রচণ্ড তৃষ্ণার পাশাপাশি আছে মিথ্যা ও অপরের প্রতি পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য ও স্বর্ণের অপবিত্র পূজা, শিশুসুলভ আন্তরিকতার পাশাপাশি আছে সংকীর্ণ হাতুড়ে বুদ্ধি। বিবেকানন্দের চরিত্রে যে রোষ-প্রবণতা ছিল, তাহার ফলে মাঝে মাঝে তাঁহার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিত। কিন্তু তবু বিরাগ ও সহানুভূতির মধ্যে একটি সমতা রক্ষা করিবার মতো মহত্ত্ব তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল; অ্যাংলো-স্যাক্সন আমেরিকার মধ্যে যে গুণ ও সত্যকার শক্তি বর্তমান ছিল, তাহা সর্বদাই তিনি দেখিতে পাইতেন।

বাস্তবিক, এখানে তাঁহার কাজ ইউরোপের অপেক্ষা অধিকতর স্থায়িত্ব লাভ করিলেও পরে তিনি ইংলণ্ডে যেমনটি অনুভব করিয়াছিলেন, এখানে তাঁহার পায়ের তলার মাটিকে তিনি তেমন দৃঢ় বলিয়া অনুভব করেন নাই। কিন্তু আমেরিকায় শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু ছিল, বিবেকানন্দ তাহাকেই শ্রদ্ধার সহিত নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াছেন, বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্বদেশবাসীর নিকট প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তরূপে

তাহাকে তুলিয়া ধরিয়াছেন—যেমন, আমেরিকার অর্থনীতি, শিল্প-ব্যবস্থা, জনশিক্ষা, যাদুঘর ও কলালয়গুলি, বিজ্ঞানের প্রগতি, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজ। শেষোক্ত বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে মহৎ প্রচেষ্টা করিয়াছে এবং জনহিতকর কার্যের জন্য সেখানের জনসাধারণ যে ভাবে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তাহার সহিত নিজের দেশের লোকদের সমাজ-হিতকর কাজের প্রতি ঔদাসীন্যের তুলনা করিতে গিয়া তাঁহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিত। কারণ, পাশ্চাত্যের কঠিন দম্ভের উপর কশাঘাত করিবার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকিলেও পাশ্চাত্ত্যের সমাজহিতকর কার্যের প্রচণ্ড দৃষ্টান্তের সম্মুখে ভারতকে নত করিতে তিনি আরো বেশী প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি স্ত্রীলোকদের একটি আদর্শ কারাগার দেখিতে যান; সেখানে অপরাধীদের সহিত সদয় ব্যবহার করা হইত; ইহার সহিত তিনি নিজেদিগকে সাহায্য করিতে অসমর্থ গরীব ও দুর্বলের প্রতি ভারতীয়দের ঔদাসীন্য তুলনা করিয়া বলিয়া উঠেন: "কশাইয়ের দল!" তিনি বলেন, "পৃথিবীব কোনো ধর্মই হিন্দু ধর্মের মতো এমন উচ্চ কণ্ঠে মানুষের মর্যাদার কথা বলে নাই; এবং পৃথিবীর কোনো ধর্মই হিন্দু ধর্মের মত এমন ভাবে দীন-দুঃখীকে পদদলিত করে নাই; ধর্মের দোষ কি, যতো দোষ ভণ্ডামির।"

তাই তিনি ভারতের তরুণদিগকে অনুরোধ করিতে, উৎসাহিত করিতে, ব্যস্ত ও বিরক্ত করিতে কখনো ক্ষান্ত হন নাই।

"তরুণরা! তোমরা কোমর বাঁধো!······ভগবান এ জন্যই আমাকে ডাকিয়াছেন।···তোমাদের মধ্যে, নত-নিপীড়িতের মধ্যে, বিশ্বস্তদের মধ্যেই আশা রহিয়াছে।···দীনদুঃখীর কথা ভাবো; সাহায্যের সন্ধান করো—সাহায্যে মিলিবে। এই বোঝা বুকে লইয়া, এই চিন্তা মাথায় লইয়া আমি বারো বছর ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত ধনী ও বড়োলোকদের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি। তারপর রক্তাক্ত হৃদয়ে আমি অর্ধ পৃথিবী অতিক্রম করিয়া সাহয্যের সন্ধানে এই অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে আসিয়াছি।···ভগবান···সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে শীতে ও অনাহারে যদি মারিয়া যাই, তবু তোমাদের উপর আমি এই সহানুভূতিকে এবং এই দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচারিতের জন্য সংগ্রামকে ন্যস্ত করিয়া যাইব। এই যে ত্রিশ কোটি মানুষ রাত্রিদিন নীচের দিকে চলিয়াছে, তাহাদের জন্য ভগবানের চরণতলে নিজেদিগকে লুটাইয়া দাও, তাহাদের জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করো! ভগবানের জয় হইবে, আমরা সফল হইব। শত শত মানুষ

সংগ্রাম করিয়া জীবন দিবে, শত শত মানুষ আসিয়া তাহাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে। চাই বিশ্বাস—চাই সহানুভূতি। জীবন কিছুই নয়, মৃত্যু কিছুই নয়··· ভগবানের জয় হইবেই—অগ্রসর হও—ভগবানই আমাদের সেনানায়ক। কে জীবন দিল, তাহা দেখিবার জন্য পিছনে তাকাইও না—চলো, কেবল অগ্রসর হও।"

আমেরিকার মহৎ সমাজহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিবেকানন্দ এই পত্রটি লিখিয়াছিলেন। এই পত্রটির শেষে যে আশার সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি যেমন খৃস্টান ধর্মের তার্ত্যুফ্‌দিগকে[১] কশাঘাত করিতেন, তেমনি তিনি খৃস্টান ধর্মের সেই পবিত্র প্রেমের নিঃশ্বাস অন্যদের অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে অনুভব করিতেন এবং খৃস্টান ধর্মকে তাহার আন্তরিকতায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেন।

"আমি এখানে মেরী মাতার পুত্রের বংশধরগণের মধ্যে আসিয়াছি; প্রভু যিশু আমাকে সাহায্য করিবেন।"[২]

না, ধর্মের বেড়া তাঁহাকে চিন্তিত করিবে, এমন মনুষ তিনি ছিলেন না। তিনি মহান্ সত্য উচ্চারিত করিয়াছিলেন[৩]:

"কোনো একটি ধর্মের মধ্যে জন্মানো ভালো, কিন্তু কোনো একটি ধর্মের মধ্যে মরা—সে ভয়ংকর।"

খৃস্টান ও হিন্দু ধর্মের গোঁড়ারা তাহাদের স্ব স্ব ধর্মকে আগলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, যাহাতে সেখানে কোনো বিধর্মী না ঢুকিয়া পড়ে। তাহারা বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে কলরব তুলিল। তাহার উত্তরে বিবেকানন্দ বলেন:

"তাহারা হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃস্টান তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না। যাহারাই ভগবানকে ভালোবাসে, তাহারাই আমার সেবা পাইবার অধিকারী।··· তোমার আগুনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ো।···তোমার যদি বিশ্বাস থাকে, তবে সমস্তই তোমার কাছে আসিয়া পৌঁছিবে।···ভারতের যে সব অগণিত মানুষ দারিদ্র্যের

১ তার্ত্যুফ্‌—ফরাসী নাট্যকার মলেয়ার-রচিত নাটকে চিত্রিত ভণ্ড ধার্মিকের বিখ্যাত চরিত্র।—অনুঃ।

২ The Life of the Swami Vivekananda, ৭৭ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ধর্ম সম্মিলন শুরু হইবার আগে আমেরিকায় থাকার গোড়ার দিকে লিখিত চিঠি।

তিনি *The Immitation of Christ* গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তাহার একটি ভূমিকা লেখেন।

৩ লণ্ডনে, ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে।

এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অত্যাচারের তলায় পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতেছে, এসো, আমরা রাত্রিদিন তাহাদের জন্য প্রার্থনা করি।...আমি অধিবিদ্যার তাত্ত্বিক নহি, আমি দার্শনিক নহি, না, আমি সাধু-সন্তও নহি। আমি দীনদুঃখী মানুষ, আমি দীন-দুঃখী মানুষকে ভালোবাসি।...ভারতের যে বিশ কোটি নরনারী দারিদ্র্যের ও অজ্ঞানতার গভীর গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছে, কে তাহাদের কথা ভাবে? এই দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধারের কি পথ আছে?...কে তাহাদিগকে আলো দিবে?...এই জনসাধারণই তোমাদের ভগবান হইয়া উঠুক।... আমি তাঁহাকেই মহাত্মা বলিব, যাঁহার হৃদয় দীন-দুঃখীর জন্য রক্তাক্ত হইবে। যতোদিন কোটি কোটি মানুষ অনাহারে ও অজ্ঞানতায় থাকিবে, ততোদিন প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব—কারণ, তাহারা দরিদ্রের পয়সায় নিজেদের শিক্ষিত করিয়াছে, অথচ দরিদ্রের প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই।"...১

এবং এই ভাবে তিনি তাঁহার প্রাথমিক লক্ষ্যের কথা একটি দিনের জন্যও ভুলেন নাই। তিনি যখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত, উত্তর হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে ভারত পরিক্রম করিতেছিলেন, তখনো তাঁহাকে এই লক্ষ্যই তাহার দুই দংষ্ট্রা দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল। এই লক্ষ্য হইল তাঁহার দেশবাসীকে, তাহাদের দেহ ও আত্মাকে, (প্রথমে দেহকে: প্রথমে চাই অন্ন!) রক্ষা করিতে হইবে, এই কাজে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য সমস্ত পৃথিবীকে আগাইয়া আনিতে হইবে। ক্রমেই তিনি তাঁহার আবেদনের পরিধি প্রসারিত করিবেন এবং অবশেষে তাহা সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণের, সমগ্র পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের, সমগ্র পৃথিবীর নিপীড়িতদের জন্য আবেদনে পরিণত হইবে। দাও এবং লও। উপর হইতে করুণা করিয়া দানের হস্ত প্রসারিত করিবার কথা বন্ধ করো! চাই সাম্য! যে গ্রহণ করে, সে দেয়-ও; তবে যতোখানি লয়, তাহার অপেক্ষা বেশি—বেশি না হইলেও—ততোখানি দেয়। যে জীবন লয়, সে জীবন দেয়, সে ভগবানকে দেয়। কারণ, ভারতের এই ছিন্নবস্ত্র, মুমূর্ষু দরিদ্র জনসাধারণই ভগবান। যুগ যুগ ধরিয়া যে নিপীড়ন ও অত্যাচারের নিষ্পেষণ এই মানুষগুলির উপর চলিয়াছে, তাহার ফলে সেই শাশ্বত সনাতন আত্মার সুরা প্রস্তুত হইয়াছে, প্রবাহিত হইয়াছে, সঞ্চিত হইয়াছে। গ্রহণ করো! পান করো! তাহারা বাইবেলের ভাষায় বলিতে পারে:

১ The Life of Swami Vivekananda, ৮৩ পরিচ্ছেদ। ১৮৯৪-৯৫-এর কাছাকাছি সময়ে তাঁহার ভারতীয় শিষ্যগণের নিকট লিখিত পত্র।

"কারণ, ইহাই আমার শোণিত।" তাহারাই হইল সকল দেশের সকল জাতির যিশু।

এবং এই ভাবে বিবেকানন্দের সম্মুখে কাজ ছিল দুইটি: পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা যে অর্থ ও সামগ্রী অর্জন করিয়াছে তাহা ভারতে লইয়া আসা; এবং ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদকে পাশ্চাত্ত্য জগতে লইয়া যাওয়া। একটি বিশ্বস্ত বিনিময়; একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পারস্পরিক সহায়তা।

তিনি কেবল পাশ্চাত্ত্যের বস্তুগত সামগ্রীর কথাই ভাবিতেছিলেন না। সেই সংগে তিনি সামাজিক ও নৈতিক সামগ্রীগুলির কথাও ভাবিতেছিলেন। তাঁহার মধ্য হইতে মানবাত্মার যে ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এইমাত্র আমরা পড়িলাম। সকল আত্মমর্যাদাশীল জাতিই, এমন কি তাহারা যাহাদিগকে শাস্তি দিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের প্রতিও এইরূপ করুণা দেখাইতে বাধ্য। একই গাড়িতে চড়িবার জন্য কোটিপতি এবং সাধারণ শ্রমিকে গুঁতাগুঁতি করিবার দৃশ্যের মধ্যে যে আপাতঃদৃষ্ট গণতান্ত্রিক সাম্য রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি প্রশংসায় ও আবেগ-অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং ইহাকে তিনি প্রাপ্যেরও অধিক মর্যাদা দিয়াছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, যাহারা একবার পড়ে, তাহাদিগকে এই যন্ত্র কিরূপ নির্দয়-ভাবে নিষ্পেষণ করে।[১] তাই তিনি ভারতের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার হিংস্র অসাম্যকেই আরো তিক্তভাবে অনুভব করিলেন:

লিখিলেন, "ভারত যেদিন ম্লেচ্ছ কথাটি বাহির করিয়া অপরের সহিত যোগাযোগ ছিন্ন করিয়াছে, সেদিনই তাহার মৃত্যু নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।"

পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রের অনুকরণে "হিন্দুদিগকে পারস্পারিক সাহায্য ও গুণগ্রাহিতা

১ পরে তাঁহার চক্ষু খোলে। দ্বিতীয় বার আমেরিকা ভ্রমণ কালে তিনি ইহার মুখোস টানিয়া ফেলেন: জাতির, ধর্মের ও গাত্রবর্ণের দম্ভ এবং অন্যান্য সামাজিক অপরাধ তাঁহার সম্মুখে এমন নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। তিনি ধর্মসম্মিলনে ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার সুন্দর ভাষণে বলিয়াছিলেন: "ধন্য কলাম্বিয়া, তুমি মুক্তির মাতৃভূমি! তুমিই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছ, কারণ, তুমি কখনো তোমার প্রতিবেশীর রক্তে হস্ত রঞ্জিত কর নাই।..." কিন্তু পরে তিনি ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বগ্রাসিতাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত কথাগুলি তিনি মিস্ ম্যাক্‌লেয়ডকে বলিয়াছিলেন, মিস্ ম্যাক্‌লেয়ড আমাকে বলিয়াছেন: "তাহা হইলে আমেরিকা-ও এই রকম! তাহা হইলে আমেরিকা আমাকে আমার কাজ সম্পন্ন করিতে (অর্থাৎ পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী ঘটাইতে) সাহায্য করিবে না!"

শিক্ষা দিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের" সর্বপ্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি প্রচার করিলেন।[১]

মার্কিন নারীরা এমন অধিক সংখ্যায় যে উচ্চস্তরের মনস্বিতা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বাধীনতার এমন সদ্‌ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি তাহারও প্রশংসা করিলেন। তিনি ভারতীয় নারীদের রুদ্ধ জীবনের সহিত মার্কিন নারীদের স্বাধীনতার তুলনা করিলেন এবং তাঁহার একজন মৃতা ভগিনীর অজ্ঞাত বেদনার স্মৃতি নারীদের মুক্তির জন্য তাঁহার কাজকে সহজ ও সানন্দ করিয়া তুলিল।[২]

এই দিকগুলিতে[৩] পশ্চিমের সামাজিক শ্রেষ্ঠতার কথা বলিতে তাঁহার কোনোরূপ জাতিদর্পে বাধিল না। কারণ, তিনি চাহিয়াছিলেন, এগুলি হইতে তাঁহার জাতি উপকৃত হউক।

কিন্তু তাঁহার দর্প তাঁহাকে সমান বিনিময়ের ভিত্তিতে ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করিতে দিল না। তিনি সুস্পষ্টভাবেই জানিতেন, পাশ্চাত্ত্য জগৎ তাহার নিজের কর্মশক্তি ও ব্যবহারিক যুক্তির জালে বন্দী হইয়াছে এবং তাহার নিকট তিনি আধ্যাত্মিক মুক্তি, মানুষের মধ্যে ভগবৎলাভের যে চাবিকাঠি রহিয়াছে, যাহা নিঃস্বতম ভারতীয়েরও আয়ত্তে রহিয়াছে—তাহা লইয়া আসিয়াছেন। তিনি আমেরিকায় মানুষের শক্তিতে যে বিশ্বাসকে বিকাশলাভ করিতে দেখিয়াছিলেন, তাহাই ছিল তাঁহার পদক্ষেপ, তাঁহার আক্রমণের বিষয়। কোনো কোনো ইউরোপীয় খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমনটি হইয়াছে, তিনি সেভাবে এই বিশ্বাসকে হ্রাস করিতে চান নাই। তাঁহার শক্তি এই বিশ্বাসের মধ্যে একটি সুজাতা কনিষ্ঠাকেই লক্ষ্য করিয়াছে—নব সূর্যালোকে যে কনিষ্ঠার চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছে, যে কনিষ্ঠা একটি ভয়াবহ গহ্বরের প্রান্ত ধরিয়া দ্রুত অসতর্ক পদে অন্ধের মতো অগ্রসর হইতেছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, এই কনিষ্ঠাকে দৃষ্টিদান করিবার, তাহাকে হাত ধরিয়া জীবনের তীরে যেখান হইতে ভগবানকে দেখা যায়, সেখানে পৌছাইয়া দিবার ভার তাঁহার উপরই পড়িয়াছে।

১ পূর্বোক্ত পত্র (১৮৯৪-১৮৯৫)।

২ প্রথম বারের পর্যটনে তিনি বক্তৃতা দিয়া যে অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি হিন্দু বিধবাদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন। হিন্দু নারীদের মানসিক নবজীবন লাভের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য পশ্চিমদেশীয় কিছু শিক্ষককে ভারতে পাঠাইবার কথা শীঘ্রই তাঁহার মনে দানা বাঁধিয়া উঠে।

৩ "আধ্যাত্মিকতায় আমেরিকানরা আমাদের অনেক নীচে। কিন্তু তাহাদের সমাজব্যবস্থা আমাদেরঅপেক্ষা অনেক উচ্চতর।" (মাদ্রাজে তাঁহার শিষ্যগণকে লিখিত পত্র।)

*   *   *

তাই আমেরিকায় তিনি আধ্যাত্মিকতার এই সুবিশাল অকর্ষিত ভূমিতে বেদান্তের বীজ বপন করিবার এবং তাহাকে রামকৃষ্ণের সলিলে সিক্ত করিবার উদ্দেশ্যে পর পর কতিপয় প্রচার অভিযান করেন। আমেরিকার যুক্তিবাদিতার পক্ষে উপযোগী হইবে, এমন কিছু অংশ তিনি নিজে বেদান্ত হইতে বাছিয়া লন। তিনি রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখকে সন্তর্পণে এড়াইয়া চলেন। এড়াইয়া যাইবার কারণ ছিল তাঁহার আবেগময় ভালোবাসার সলজ্জ দিকটা। তিনি যখন তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শিষ্যদের[১] কাছে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা করিবেন স্থির করিতেন, তখনও তিনি তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন। তাঁহারা যেন এ বিষয়ে জনসাধারণের নিকট আলাপ না করেন।

আমেরিকার বক্তৃতা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে তিনি শীঘ্রই নিজেকে মুক্ত করিলেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা তাহাদের সুবিধামত প্রচার-ভ্রমণের একটি সূচী প্রস্তুত করিত; এবং তিনি যেন সার্কাসের খেলোয়াড়, এইভাবে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া তাঁহাকে বিব্রত ও নিজেদের লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিত।[২] ১৮৯৪ সালে ডেট্রইটে তিনি ছয় সপ্তাহ ছিলেন। এখানেই তিনি নিয়ম মাফিক বক্তৃতা দেওয়ার এই দুর্বহ ভার হইতে নিজেকে মুক্ত করেন। ইহাতে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি

---

১ ১৮৯৫ সালের জুন মাসে সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে তিনি সম্ভবত আমেরিকায় সর্বপ্রথম তাঁহার সুনির্বাচিত একদল শ্রোতার কাছে রামকৃষ্ণের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন। এবং ১৮৯৬-এর ২৪-শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নিউ ইয়র্কে "My Master" নামে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়া তাঁহার বক্তৃতাবলী শেষ করেন। এমন কি, তখন-ও তিনি উহা প্রকাশ করিতে রাজী হন না। তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিলে তিনি কেন রাজী হন নাই, তাহা লইয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি আবেগময় বিনয়ের সহিত বলেন:

"আমি ঠাকুরের উপর সুবিচার করিতে পারি নাই, তাই উহা প্রকাশ করিতে দিই নাই। ঠাকুর কোনদিন কিছুকে বা কাহাকেও নিন্দা করেন নাই। কিন্তু আমি যখন তাঁহার কথা বলিতেছিলাম, তখন আমি আমেরিকাকে তাহার ডলার-পূজার মনোবৃত্তির জন্য নিন্দা করিতেছিলাম। সেদিনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি এখন-ও তাঁহার কথা বলিবার উপযুক্ত হই নাই।" (১৯২৩-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির "বেদান্ত কেশরী"-তে প্রকাশিত জনৈক শিষ্যের স্মৃতিকথা হইতে।)

২ আমার হাতে একটি বিজ্ঞাপনের পুস্তিকা রহিয়াছে, তাহার শিরোনামায় বড় বড় হরফে তাঁহাকে "বক্তৃতা মঞ্চের অন্যতম অতিমানব" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রতিকৃতির সহিত চারটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া আছে, তাহাতে তাঁহার চারটি প্রধান গুণের উল্লেখ আছে: "দেবদত্ত শক্তিতে শক্তিমান বাগ্মী; তাঁহার জাতির আদর্শের প্রতিনিধি; ইংরেজি ভাষার অধিকারী;

হইলে-ও তিনি বন্ধু-বান্ধবকে এই চুক্তি বাতিল করিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন।[১] এই ডেট্রইটেই তিনি একজনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, যিনি ভগিনী নিবেদিতা (মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্) ছাড়া তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণের সকলের অপেক্ষা তাঁহার চিন্তার অধিকতর সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন—তিনি (মিস্ গ্রীনস্ টাইডেল) পরে ভগিনী ক্রিস্টিন নাম গ্রহণ করেন।

১৮৯৪ খৃস্টাব্দের শীতের প্রারম্ভেই তিনি ডেট্রইট হইতে নিউ ইঅর্কে ফিরিয়া আসেন। প্রথমে তাঁহাকে তাঁহার একদল ধনী বন্ধু একচেটিয়া করিয়া লন; এই ধনী বন্ধুরা তাঁহার বাণীর অপেক্ষা তাঁহার মধ্যে যুগোপযোগী যে মানুষটি ছিল, তাহার সম্বন্ধেই অতি কৌতূহলী ছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ বেশি ধরা-বাঁধা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি স্বাধীনভাবে একাকী থাকিতে চাহিতেন। এই ধরণের ঘোড়দৌড়-ও আর তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না। কারণ, এই ধরণের ঘোরদৌড়ে স্থায়ী কিছুই হইতেছিল না; তিনি একদল শিষ্য লইয়া একটি অবৈতনিকভাবে শিক্ষাদনের ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। ধনী বন্ধুরা তাঁহাকে টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু সেই সংগে তাঁহারা দুরূহ কতকগুলি শর্ত দিলেন: তাঁহারা চাহিলেন তিনি কেবল "ঠিক লোকের" সমাজ ছাড়া অন্য কাহার-ও সহিত মিশিতে পারিবেন না। তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন:

"শিব! শিব! কোনো বিরাট কাজ ধনীরা করিয়াছে, এমনটি কখনো দেখা গিয়াছে কি? হৃদয় ও মস্তিষ্কই সৃষ্টি করে—টাকার থলে করে না![২]........."

কয়েকজন ভক্ত এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছাত্র এই কাজের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। একটি "অবাঞ্ছিত" মহলে কয়েকটি নোংরা ঘর ভাড়া লওয়া হইল।

তিনি "বিশ্ব মেলা সম্মিলনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই ঘোষণায় তাঁহার মানসিক ও শারীরিক গুণাবলীর বর্ণনায় ত্রুটি হয় নাই—বিশেষত শারীরিক বর্ণনায়; তাঁহার চেহারা, ভাবভঙ্গী, উচ্চতা, চামড়ার রং, পোশাক—সেই সংগে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাক্ষ্য-ও রহিয়াছে। কোনো শক্তিশালী হস্তী বা কোনো পেটেন্ট ঔষধের বর্ণনা-ও এইভাবে দেওয়া যাইত।

১ ঐ সময় হইতে তিনি একাকী এক শহর হইতে অন্য শহরে ঘুরিয়া বেড়ান এবং সপ্তাহে বারো-চৌদ্দটি করিয়া বক্তৃতা দিতে থাকেন। বৎসরান্তে দেখা যায়, তিনি অতলান্তিকের তীর হইতে মিসিসিপি পর্যন্ত অঞ্চলের সমস্ত বড় শহরগুলিই পর্যটন করিয়াছেন।

২ ভগিনী ক্রিস্টিন: 'অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা'।

ঘরগুলিতে আসবাব-পত্র ছিল না। যে যেখানে পারিত বসিত তিনি মেঝেতে বসিতেন, দশ-বারো জন দাঁড়াইয়া থাকিত। পরে সিঁড়ির মুখের দরজাটা খুলিয়া দেওয়ার দরকার হইল; কারণ লোকে সিঁড়িতে ও সিঁড়ির নীচে জমা হইতে লাগিল। শীঘ্রই বিবেকানন্দ অপেক্ষাকৃত বড়ো কোনো বাড়িতে উঠিয়া যাইবার কথা ভাবিলেন। তিনি প্রথম বারের পাঠ দেন ১৮৯৫-এর ফেব্রুয়ারি হইতে জুন পর্যন্ত এবং ইহাতে তিনি উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন। প্রতিদিন তিনি নির্বাচিত কয়েকজন শিষ্যকে রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের যুগ্ম রীতির সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন।[১] প্রথম রীতিটি বিশেষভাবে অধিকতর মনো-দৈহিক; উহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মনের বশীভূত করিয়া জীবনী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সংহত করিবার চেষ্টা করা হয়; উহাতে অন্তর্তর স্রোতসমূহের উপর নীরবতাকে এমনভাবে আরোপ করা হয় যে, আত্মার সুস্পষ্ট ধ্বনি ভিন্ন অন্য কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। আর দ্বিতীয় রীতিটি হইল বিশুদ্ধ বুদ্ধির রীতি, উহা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সগোত্র; উহাতে 'বিশ্ব নিয়মের' সহিত, 'বিশুদ্ধ বাস্তবতার' সহিত, আত্মাকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়। উহা 'বিজ্ঞান-ধর্ম'।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দের জুন মাসের কাছাকাছি সময়ে তিনি তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'রাজযোগ' রচনা শেষ করেন। ঐ বইখানি মিস্ এস. ই. ওয়াল্ডোর (পরে ভগিনী হরিদাসী) নামে উৎসর্গ করা হয়। রাজযোগ উইলিয়াম জেম্সের মতো মার্কিন দেহতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরে উহা হইয়া টলস্টয় উৎসাহী হইয়া উঠেন।[২] এই খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে পুনরায় আমি এই অতীন্দ্রিয় রীতি এবং তৎসহ অন্যান্য প্রধান যোগগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিব। আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রাপ্তির আশায় আমেরিকাবাসীরা এই রীতির ব্যবহারিক দিকটির উপর জোর দেন; ফলে, এই রীতি আমেরিকাবাসীকে এতো আকৃষ্ট করে।

১ এই অন্তরতর সংযম কোনোদিন কেবল ভারতীয়দেরই একচেটিয়া ছিল না। পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ খৃস্টান অতীন্দ্রিয়বাদীরাও ইহা জানিতেন এবং ইহার অনুশীলন করিতেন। বিবেকানন্দ-ও তাহা জানিতেন এবং প্রায়ই তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দিতেন। কিন্তু কেবল ভারতবর্ষই বহু শতাব্দীর পরীক্ষা-প্রতিপরীক্ষার দ্বারা উহাকে অনুশীলনের একটি সুনিয়মিত বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছে এবং মত ও ধর্মনির্বিশেষে সকলকে দিয়াছে।

২ আমার "টলস্টয়ের জীবন" পুস্তকের সাম্প্রতিক সংস্করণে প্রযুক্ত নূতন পরিচ্ছেদ: "টলস্টয়ের ডাকে এশিয়ার সাড়া" দ্রষ্টব্য। টলস্টয় বিবেকানন্দের রাজযোগের ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক সংস্করণ পাঠ করেন। সেই সংগে বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণের নামে উৎসর্গীকৃত এবং মাদ্রাজ হইতে ১৯০৫ সালে বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত একটি পুস্তক-ও টলস্টয় পাঠ করেন।

আমেরিকা এক অতিকায় দানব, যে দানবের মস্তিষ্ক শিশুর মস্তিষ্কের অপেক্ষা পরিণতি লাভ করে নাই। তাই আমেরিকাবাসীরা সাধারণত নিজেদের সুবিধামত কাজে লাগাইতে পারেন, এমন কোনো ভাব বা চিন্তা সম্পর্কেই কৌতূহলী হইয়া উঠেন। অধিবিদ্যা ও ধর্মকে তাঁহারা কৃত্রিম প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন ; শক্তি, সম্পদ ও স্বাস্থ্য—ঐহিক সাম্রাজ্য—আয়ত্ত করাই সেগুলির উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। ইহাই বিবেকানন্দকে সর্বাপেক্ষা আঘাত দিল। কারণ, সত্যকার আধ্যাত্মিক হিন্দু প্রতিভাদের নিকট আধ্যাত্মিকতাই ছিল লক্ষ্য—এই আধ্যাত্মিকতাকে অধিগত করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; যাহারা ঐহিক সম্পদ আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার শক্তির সন্ধানে এই আধ্যাত্মিকতাকে কাজে লাগাইতে চায়, তাহাদিগকে তাঁহারা কখনো মার্জনা করেন না। বিবেকানন্দ যাহা অমার্জনীয় অপরাধ মনে করিতেন, তাহার নিন্দায় তিনি বিশেষভাবে তিক্ত হইয়া উঠিতেন। কিন্তু সম্ভবত বলা চলে, "শয়তানকে লোভ না দেখানোই" ছিল ভালো; মার্কিন বুদ্ধিজীবীদিগকে প্রথমে অন্য পথে পরিচালিত করিলেই ভালো হইত। বিবেকানন্দ-ও খুব সম্ভব ইহা নিজে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; কারণ, পরবর্তী শীতকালে তিনি অন্য যোগ সম্পর্কেই শিক্ষা দেন। এই সময়ে তখনো তিনি পরীক্ষা চালাইতেছিলেন। এই তরুণ প্রতিভা অন্য জাতির লোকের উপর তাঁহার ক্ষমতা কিরূপ রহিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন ; সেই শক্তি কিভাবে ব্যবহার করা উচিত, তাহা তখনও তিনি স্থির করেন নাই।

ভগিনী ক্রিস্টিনের সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায়, ইহার ঠিক পরেই (১৮৯৫ খৃস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে) যখন তিনি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে তাঁহার সুনির্বাচিত ভক্তদের লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত করিয়া ফেলেন।[১] সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে বনের ধারে এক পাহাড়ের উপর একটি জমিদারি বিবেকানন্দকে তাঁহার বেদান্ত ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেখানেই তাঁহার দশ-বারো জন সুনির্বাচিত শিষ্য একত্রিত হন। সেণ্ট জন-কথিত যিশুর জীবন ও বাণী পাঠ করিয়া বিবেকানন্দ তাঁহার আলোচনা শুরু করেন। সাত সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত তিনি কেবল ভারতীয় শাস্ত্রই ব্যাখ্যা করেন না, সেই সঙ্গে তিনি এই যে সকল আত্মার ভার

১ থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলি সম্পর্কে ভগিনী ক্রিস্টিনের "অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায়" অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য ও সংবাদ রহিয়াছে।

তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শৌর্য ও শক্তি—"স্বাধীনতা", "সাহস", "কৌমার্য", "আত্মাবমাননার অপরাধ" ইত্যাদি বিষয়ে চেতনা জাগাইয়া তুলিতে চাহিলেন। (বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ইহাই ছিল শিক্ষার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিক।) স্বাধীনতা, সাহস, কৌমার্য, আত্মাবমাননার অপরাধ—এইগুলি ছিল তাঁহার আলোচনার কতিপয় বিষয়বস্তু।

তিনি অভয়ানন্দকে লেখেন: "ব্যক্তিত্বই আমার লক্ষ্য। ব্যক্তিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার অপেক্ষা আর কোনো উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আমার নাই।"[১]

তিনি আবার বলেন:

"আমি যদি আমার জীবনে একটি মাত্র ব্যক্তিকেও স্বাধীনতা লাভ করিতে সাহায্য করিতে পারি, তবেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।"

রামকৃষ্ণের সহজ অনুভূতিলব্ধ রীতির অনুসরণ করিয়া তিনি কখনো অন্যান্য বাগ্মী ও প্রচারকদের মতো জনসাধারণ নামে যে একটি অস্পষ্ট বস্তু রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যে কিছুই বলেন নাই; তিনি যখন বলিতেন, মনে হইত প্রত্যেক শ্রোতাকে তিনি পৃথকভাবে বলিতেছেন। কারণ, তাঁহার মতে, "একটি ব্যক্তির মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব নিহিত আছে।"[২] বিশ্বের আদিম কেন্দ্রবিন্দুটি রহিয়াছে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে। বিবেকানন্দ একটি শক্তিমান সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিলে-ও তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত[৩] মূলত সন্ন্যাসীই ছিলেন। তাই তিনি সন্ন্যাসীর —ভগবৎ-ভক্ত স্বাধীন মানুষের—জন্ম দিতে চাহিয়াছিলেন। তাই কয়েকজন সুনির্বাচিত মানুষকে মুক্ত করিয়া তোলা এবং পরে তাহাদিগকে দিয়া মুক্তির বীজ ছড়ানো, এই ছিল আমেরিকায় তাঁহার সচেতন ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে, কয়েকজন পশ্চিম দেশীয় শিষ্য তাঁহার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তিনি তাঁহাদের কয়েক জনকে দীক্ষিত করিলেন।[৪] কিন্তু পরে বোঝা

১ ১৮৯৫-এর শরৎকাল।

২ ১৮৯০ খৃস্টাব্দে তাঁহার ভারত-ভ্রমণের প্রারম্ভে একটি নদীতীরে এক বটবৃক্ষের তলে তাঁহার অবাবেশ হয়। তখন তিনি স্থূল এবং সূক্ষ্মের—বিশ্ব এবং পরমাণুর একত্ব উপলব্ধি করেন।

৩ একটি প্রমুক্ত জীবনের কামনা তাঁহাকে অহরহ দহন করিতেছিল। "আমার সেই ছিন্ন বস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্নের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিতেছে।…" (জানুয়ারি, ১৮৯৫)

তাঁহার সেই সুন্দর "সন্ন্যাসীর গান"-টির তারিখ-ও ঐ বৎসরের, ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের, মাঝামাঝি।

৪ ভগিনী ক্রিস্টিন এই প্রথম মার্কিন শিষ্যদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কতিপয় সরল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েকজন বিবেকানন্দকে হতাশ করেন। অথচ, ইহাই তাঁহাদের কাছে আশা করা গিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন:—আমেরিকায় নাগরিকত্ব-প্রাপ্ত

গেল যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্নতর শ্রেণীর মানুষ। রামকৃষ্ণের মতো বিবেকানন্দের সেই শ্যেন দৃষ্টি ছিল না। রামকৃষ্ণ প্রথম দৃষ্টিতেই মানুষের আত্মার গভীরে নির্ভুল ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেন এবং তাহাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ অনাবৃত করিয়া তাহাদের নগ্ন রূপ প্রত্যক্ষ করিতেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁহার চলার পথে শস্য এবং শস্যের খোসা দুই-ই সংগ্রহ করিলেন। তিনি ইহা জানিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন যে, কালের কুলাতে শস্যগুলি সংগৃহীত হইবে এবং শস্যের খোসাগুলি বাতাসে উড়িয়া যাইবে। তবে ইহাদের মধ্য হইতে তিনি কয়েকজন ভক্ত শিষ্যকেও পাইয়াছিলেন। ভগিনী ক্রিস্টিনকে বাদ দিলে তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন একজন ইংরেজ তরুণ—জে. জে. গুডুইন। গুডুইন বিবেকানন্দের জন্য তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের শেষ হইতে তিনি বিবেকানন্দের স্বয়ংনিযুক্ত সেক্রেটারী হইয়া উঠেন। স্বামীজী তাঁহাকে তাঁহার

ফরাসী মহিলা মারি-লুইস্, ইনি অভয়ানন্দ নাম গ্রহণ করেন এবং নিউ ইঅর্কের সমাজতন্ত্রী মহলে সুপরিচিতা হন ; লেওন ল্যান্সবের্গ (কৃপানন্দ), ইনি এক রাশিয়ান ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিউ ইঅর্কে সাংবাদিক হিসাবে খুব শক্তির পরিচয় দেন ; বৃদ্ধা অভিনেত্রী স্টেলা, ইনি রাজযোগের মধ্যে যৌবনের উৎস সন্ধান করেন ; বৃদ্ধ ডক্টর ওয়াইট ও তাঁহার অ্যান্টিগোন মিস্ রুথ এলিস্—ইঁহারা উভয়েই আধ্যাত্মিকতার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তারপর বিবেকানন্দের প্রথম শ্রেণীর শিষ্য ও বন্ধুগণ :—ব্রুকলিনের মিস্ এস্. ই. ওয়াল্‌ডো (ইনি পরে হরিদাসী নাম গ্রহণ করেন) ; বিবেকানন্দের প্রথম বক্তৃতাগুলি ইনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ; ইঁহাকে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে বিবেকানন্দ রাজযোগের তত্ত্ব ও অনুশীলন শিখাইয়াছিলেন। এণ্ডার্সনের অন্যতম বন্ধু ও বিখ্যাত নরোয়েজিয়ান শিল্পীর পত্নী মিসেস্ ওল্ বুল্ ; ইনি বিবেকানন্দের কাজের জন্য মুক্তহস্তে দান করেন। মিসেস্ জোসেফিন্ ম্যাক্‌লেয়ড, তাঁহার স্মৃতিকথার জন্য তাঁহার কাছে আমি প্রচুর পরিমাণে ঋণী রহিয়াছি। নিউ ইঅর্কের মিস্টার ও মিসেস লেগেট, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট—আমেরিকায় আগমন-কালে বিবেকানন্দ তাঁহাকে ভগবৎ-প্রেরিত বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন। সর্বশেষে আসেন বিবেকানন্দের মনের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তিনী যিনি—যিশুর পদতলে প্রশান্ত মেরীর মতো—মিস্ গ্রীন্‌স্ টাইডেল (ভগিনী ক্রিস্টিন)। তাঁহার গুরুদেবের মানস-সম্পদগুলি যখন শ্রুতিগোচর শব্দের স্রোতে অনর্গল ঝরিয়া পড়িত, তখন ইনিই সেগুলিকে সংগ্রহ ও সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মেইনের উপকূলে গ্রীন্‌স্ একারে কয়েকদিন বিবেকানন্দ ক্রিস্টিনের সম্মুখে তাঁহার নিজের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং সেগুলির সমাধান সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া দেখেন ও আপনার মনে সেগুলি বলিয়া যান ; ক্রিস্টিনের উপস্থিতি তিনি লক্ষ্য-ও করেন না। অবশেষে ক্রিস্টিন যখন চুপিচুপি তাঁহাকে তাঁহার বিচারের স্বতবিরুদ্ধতায় বিস্মিত হইয়াছেন জানান, তখন বিবেকানন্দ বলেন : "বুঝিতে পারিলে না ? আমি সশব্দে চিন্তা করিতেছিলাম।"

বিবেকানন্দ তাঁহার নিজের সন্তুষ্টির জন্যই তাঁহার ভিতরের বিতর্কগুলিকে শব্দে প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন।

সেগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তাঁহার এই অভিমত তিনি বহুবার বহু প্রসংগে প্রকাশ করেন।[১]

তাহা ছাড়া, তাঁহার মতো মনের পক্ষে চিরতরে শাস্ত্রবাক্যে বদ্ধ কোনো ধর্মকে, সে ধর্ম যে কোনো রূপেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। তাঁহার ধর্ম হইবে গতিশীল। তাহা যদি মুহূর্তের জন্য থামে, তবে তাহার হইবে মৃত্যু। তাঁহার সার্বজনীন ভাবটি সর্বদাই গতিময় ছিল। সে ভাবকে উর্বর করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের নিত্য নিরন্তর মিলনের—যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কোনো বিশেষ মতবাদের বা কোনো বিশেষ কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য ছিল সজীব ও সচল। বেদান্ত সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে মানুষ ও ভাবধারার মধ্যে অবিরাম আদান-প্রদান ঘটিতে পারে, সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা। ইহার ফলে চিন্তার রক্ত-চলাচল সুস্থ ও সুনিয়মিত হইবে এবং মানব সমাজের সমস্ত দেহকে সিক্ত-স্নাত করাইবে।

১ কিন্তু আমি এই সংগে ইহা-ও বলিব যে, তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া আবার নূতন করিয়া তাঁহার জাতির পৌরাণিক রূপগুলির সৌন্দর্য ও জীবন্ত সত্যময়তাকে অনুভব করেন এবং সেগুলিকে কোনো পূর্বপরিকল্পিত চিন্তার পক্ষে সহজ ও সরল করিবার জন্য বিসর্জন দিতে পারেন না। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সরাসরি চাপেই সম্ভবত এইরূপ সহজ ও সরল করিবার মনোভাবটি আমেরিকায় তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল। তাই এখন হইতে তিনি কোনো কিছুকে ত্যাগ না করিয়া সকল কিছুর মধ্যে সংগতি বিধানের কথা ভাবিতে থাকেন।

ভারত ও ইউরোপের মিলন

নিউ ইঅর্কের বিশুদ্ধ রৌদ্রদীপ্ত আকাশের নীচে এবং বৈদ্যুতিক আবহাওয়ার মধ্যে বিবেকানন্দের কর্ম-প্রতিভা একটি মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার চারিদিকের উত্থিত কর্মকোলাহলের মধ্যে তিনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। চিন্তায়, রচনায় ও আবেগময় বাগ্মিতায় তাঁহার শক্তির যে পরিমাণ ব্যয় ঘটিল, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিল। তিনি জনতার মধ্যে আলোকিত আধ্যাত্মিকতার[১] বীজ বপন করিয়া সেই জনতা হইতে যখন বাহিরে আসিতেন, তখন "একটি নির্জন কোণের" জন্য এবং, "সেখানে শুইয়া মরিতে পাই-বার" জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনি যে রোগে একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, সেই রোগে ইতিপূর্বেই তাঁহার দেহ ক্ষয় হইতেছিল। এইভাবে অতি-পরিশ্রমের ফলে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন সংক্ষিপ্ততর হইতে লাগিল। এই রোগ হইতে তিনি কখনো সারিয়া উঠিতে পারেন নাই।[২] এবং প্রায় এই সময়েই তিনি মৃত্যুর আগমন অনুভব করিতে থাকেন। তিনি বলেন:

"আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

১ প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলেই বলেন যে, এই সকল সভায় তাঁহার শক্তি ভয়ানকভাবে ব্যয়িত হইত; এই শক্তি তিনি বৈদ্যুতিক শক্তির স্ফুরণের মতো জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেন। অনেক শ্রোতা ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন এবং যেন কোনো আকস্মিক স্নায়বিক আঘাত পাইয়াছেন, এইভাবে দু-চার দিন বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইতেন। ভগিনী ক্রিস্টিন বলেন: "তাঁহার শক্তি মানুষকে প্রচণ্ডরূপে অভিভূত করিয়া ফেলিত।" লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিল "বৈদ্যুতিক বাগ্মী"। আমেরিকায় তাঁহার শেষ অবস্থানকালে তিনি প্রতি সপ্তাহে প্রায় সতেরটি বক্তৃতা এবং দিনে দুইটি করিয়া ঘরোয়া পাঠ দিতেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি কোনোরূপ নীরস বা পূর্ব হইতে প্রস্তুত প্রবন্ধমাত্র ছিল না। তাঁহার প্রত্যেকটি চিন্তা ছিল আবেগে ভরা, তাঁহার প্রত্যেকটি শব্দে ছিল গভীর বিশ্বাসের প্রকাশ। তাঁহার প্রত্যেকটি বক্তৃতা ছিল নির্ঝরধারার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার।

২ বহুমূত্র রোগের প্রথম লক্ষণগুলি তাঁহার মধ্যে তাঁহার কৈশোরেই, যখন তাঁহার বয়স সতেরো-আঠারো, তখনই দেখা দেয়। (এই রোগেই তিনি তাঁহার বয়স চল্লিশ হওয়ার আগেই মারা যান।)

তিনি ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া রোগে বারে বারে মারাত্মকভাবে পীড়িত হন। একবার তীর্থভ্রমণ কালে ডিফ্‌থিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার ভারত পরিক্রমার কালে দুই বৎসর ধরিয়া তিনি অর্ধাশনে ও অর্ধোলংগ অবস্থায় অত্যধিক পথ ভ্রমণ করিয়া শক্তির অপচয়

কিন্তু তাঁহার মহান লক্ষ্য তাঁহাকে বারে বারে ফিরাইয়া আনে।

ইউরোপ ভ্রমণে গেলে হয়তো তিনি কিছুটা বিশ্রাম পাইবেন, এরূপ মনে করা হইল। কিন্তু তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই নিজেকে ব্যয় করিলেন। ১৮৯৫-এর সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত, ১৮৯৬-এর এপ্রিল হইতে জুলাই-এর শেষ পর্যন্ত, এবং ১৮৯৬-এর অক্টোবর হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন বার তিনি ইংল্যাণ্ডে ছিলেন।[১]

আমেরিকার অপেক্ষা ইংল্যাণ্ড তাঁহার উপর এমন কি আরো গভীরভাবে, আরো অপ্রত্যাশিতভাবে রেখাপাত করিল। আমেরিকার বিরুদ্ধে নিশ্চয় তাঁহার কোনো অভিযোগ ছিল না কেননা, আমেরিকায় তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হইলে-ও, বা আমেরিকার হামবড়ামির দিকটাকে এড়াইয়া চলিতে বাধ্য হইলেও, সেখানে তিনি অতি সূক্ষ্ম সহানুভূতিশীল[২] কয়েকজন একান্ত অনুরক্ত সাহায্যকারীর এবং বপনযোগ্য একটি উর্বর অকর্ষিত ক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

কিন্তু ইউরোপে পদার্পণ করিবার মুহূর্ত হইতেই তিনি এক সম্পূর্ণ ভিন্নতর মানসিক আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস লইলেন। এখানে কোনো তরুণ জাতির নিজের ইচ্ছাশক্তিকে ফাঁপাইয়া দেখিবার মতো শূন্যগর্ভ ও অসভ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না—যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে তাহারা বিশ্বজয়ের শিশুসুলভ ও অসুস্থ কোনো গোপন উপায় আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় শক্তির যোগকে—রাজযোগকে—ব্যবহার করিতে বা বিকৃত করিতে চাহিবে। এখানে সহস্র বৎসরের চিন্তার শ্রম ভারতের বাণীগুলিতে—যে বাণীগুলি অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দের কাছে ছিল মূল বাণী—জ্ঞানের উপায়ে,

করেন; তিনি কয়েকবার খাড়াভাবে মূর্ছিত হইয়াও পড়েন। তারপর তাঁহার উপর আমেরিকায় অত্যধিক কাজের চাপ পড়ে।

১ লণ্ডনে যাইবার আগে তিনি ১৮৯৫-এর আগস্ট মাসে প্যারিসে আসেন। কিন্তু এই প্রথম বারে তিনি প্যারিসকে চকিতের জন্য একবার মাত্র দেখেন (তিনি যাদুঘরগুলি, গির্জাগুলি এবং নেপলিয়ানের সমাধি মন্দির পরিদর্শন করেন।) ইহাতে ফরাসী জাতিকে একটি শক্তিমান শিল্পীর জাতি বলিয়াই মনে হয়। পাঁচ বছর বাদে ১৯০০ খৃস্টাব্দের জুলাই হইতে অকটোবর পর্যন্ত সময়ে তিনি ধীরে-সুস্থে ফ্রান্স পরিদর্শন করেন। আমরা পরে আবার এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

২ ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের শেষভাগে "ভারতীয় নারীর আদর্শ" সম্পর্কে একটি বক্তৃতার শেষে তিনি তাঁহার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বোস্টনের মহিলারা ক্রিসমাসের সময় তাঁহার মায়ের কাছে একটি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। সহানুভূতির অন্যতম প্রকাশরূপে উহা তাঁহাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

জ্ঞান-যোগে, গিয়া সরাসরি উপনীত হইল। ফলে ইউরোপের নিকট জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিবেকানন্দকে আর গোড়া হইতে শুরু করিতে হইল না। কেননা, ইউরোপ উহাকে বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার সহিত বিচার করিতে সক্ষম হইল।

যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। যেমন, অধ্যাপক রাইট, দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স্,[১] বিখ্যাত বৈদ্যুতবিদ্ নিকলাস

১ মিসেস ওল বুল-ই বিবেকানন্দ ও উইলিয়াম জেমসের সাক্ষাৎ ঘটান। উইলিয়াম জেম্‌স্ তরুণ স্বামীজীকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠান এবং বিবেকানন্দের রাজযোগ বিষয়ে শিক্ষাদান অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেন। তিনি নাকি রাজযোগ অভ্যাস-ও করেন।

উইলিয়াম জেমসের উপর বিবেকানন্দের প্রভাব পড়িয়াছিল, একথা বিবেকানন্দের শিষ্যরা বিশ্বাস করিতে চান। তাঁহারা বেদান্তের মধ্যে একবাদী (monist) দর্শনের সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ ও চূড়ান্ত রূপকে এবং বিবেকানন্দের মধ্যে বেদান্ত প্রচারকদের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিকে লক্ষ্য করেন এবং মার্কিন দর্শন (প্রয়োগবাদ) হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দেখান। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, উইলিয়াম জেম্‌স্ ঐ সকল মতবাদকে নিজেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পর্যবেক্ষক ছিলেন এবং পর্যবেক্ষণের রীতিকে কখনো পরিত্যাগ করেন নাই। "ধর্মীয় অভিজ্ঞতা" সম্পর্কে তিনি প্রথম শ্রেণীর শক্তির অধিকারী না হইলে-ও (তিনি নিজে একথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন), তিনি এ বিষয়ে একটি বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন। [মূল পুস্তকখানি ১৯০২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে নিউ ইঅর্কে *The Varieties of Religious Exprience* নামে প্রকাশিত হয়। তিনি ইহার মধ্যে ১৯০১ ও ১৯০২ সালে এডিনবরায় প্রদত্ত দুইটি ধারাবাহিক বক্তৃতাকে পুনরায় স্থান দেন।] এই পুস্তকের রচনার পশ্চাতে যে অপ্রত্যক্ষভাবে হইলেও বিবেকানন্দের দান ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু জেম্‌স্ তাঁহাকে অন্যান্য অনেকের সহিত দৃষ্টান্ত হিসাবে "অতীন্দ্রিয়বাদ" সম্পর্কে লিখিত দশম পরিচ্ছেদে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন; তারপর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদীদের সহিত দুইবার উল্লেখ করিয়াছেন এবং অবশেষে সকল দেশের ও সকল কালের অতীন্দ্রিয়বাদীদের সাক্ষ্যের, উপসংহাররূপে তাঁহাকে স্থান দিয়াছেন ও এইভাবে তাঁহাকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। *Practical Vedanta* এবং The Real and the Apparent Man দ্রষ্টব্য)।

অবশ্য, ইহা মনে হয় না যে, স্বামীজীর অভিজ্ঞতাকে তিনি যতোখানি কাজে লাগাইতে পারিতেন, জেম্‌স্ ততোখানি লাগাইয়াছিলেন। ইহাও মনে হয় না যে, স্বামীজী তাঁহাকে নিজের চিন্তার উৎসটিকে—রামকৃষ্ণকে—অনাবৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। (জেম্‌স্ অসতর্কভাবে ও প্রসংগক্রমে ম্যাক্সমুলারের ক্ষুদ্র পুস্তকখানি হইতে তাঁহাকে উদ্‌ধৃত করেন।) জেমসের বইখানির গুরুত্ব হইল এই যে, উহাকে চৌরাস্তার মোড় বলিয়া মনে হয়—যে চৌরাস্তায় অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বছর হইতে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দিক হইতে বলিষ্ঠ আক্রমণের ফলে ফাটল ধরাইয়া দিয়াছে। এই চৌরাস্তাটি ছিল—মায়ার্স প্রবর্তিত 'অবচেতন', মোটামুটিভাবে খাড়া করা 'আপেক্ষিকবাদ', 'খৃস্টান বিজ্ঞান', ও বিবেকানন্দের বেদান্ত। পাশ্চাত্য

টেলসা,[১] (টেলসা তাঁহার সম্পর্কে সহানুভূতিপূর্ণ কৌতূহল প্রকাশ করেন)।[২] কিন্তু তাঁহারা সাধারণত হিন্দু অধিবিদ্যাগত চিন্তা ও কল্পনার ক্ষেত্রে কাঁচা শিক্ষানবীশ-মাত্র ছিলেন, তাঁহাদের সকল কিছুই শিখিবার প্রয়োজন ছিল ; তাঁহারা ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের গ্রাজুয়েটদের মতো।

কিন্তু ইউরোপে আসিয়া বিবেকানন্দকে ম্যাক্স্‌মুলার, পল্‌ ডিউসেন প্রভৃতির মতো বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্‌দের সম্মুখে সমকক্ষ হিসাবে দাঁড়াইতে হইল। পাশ্চাত্ত্যের দর্শন ও ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, তাহার ধৈর্যশীল প্রতিভা এবং অকৃত্রিম সাধুতার সকল দিক হইতেই বিবেকানন্দের নিকট আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি এই শ্রেষ্ঠতায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণ আদৌ সচেতন ছিলেন না। তিনি নিজে-ও এ পর্যন্ত এ-বিষয়ে অজ্ঞই ছিলেন। বিবেকানন্দ এই শ্রেষ্ঠতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সুন্দর একটি সাক্ষ্য রাখিয়া যান।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডে আসিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে এক নূতন আবেগের সঞ্চার হইল। তিনি শত্রু হিসাবে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইংল্যাণ্ড তাঁহাকে জয় করিয়া লইল। ভারতে ফিরিয়া একথা তিনি অপূর্ব বিশ্বস্ততার সহিত ঘোষণা করেন :

"আমি ইংরেজদের প্রতি যেরূপ ঘৃণা লইয়া ইংল্যাণ্ডের মাটিতে নামিয়াছিলাম, কোনো জাতির প্রতি সেরূপ কোনো ঘৃণা মনে লইয়া আর কেহ কোথাও নামে

চিন্তাধারার মোড় ফিরিবার সময় আসিয়াছে, আসিয়াছে নূতন নূতন জগৎ আবিষ্কারের পূর্বক্ষণ। এই প্রচণ্ড আক্রমণে বিবেকানন্দ-ও তাঁহার সুনির্দিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু ইহার পূর্বে অন্যরা, এমন কি পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা, এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ইতিপূর্বে ক্যালিফর্নিয়ায় অধ্যাপক স্টারবাক যে গবেষণা করেন, তাহা (The Psychology of Religion) এবং তাঁহার ধর্মীয় প্রমাণ প্রয়োগের সুপ্রচুর সংগ্রহই উইলিয়াম জেম্‌সকে এই পুস্তক রচনায় বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয়ের অপেক্ষাও অধিকতর পরিমাণে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল।

১ বিশ্বের গঠন সংক্রান্ত সাংখ্য মতবাদ এবং বস্তু ও শক্তি সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদগুলির সহিত তাহার সম্পর্ক কি, সে বিষয়ে আলোচনাই বিশেষভাবে নিকলাস টেলসাকে বিস্মিত করে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

২ নিউ ইয়র্কে বিবেকানন্দের সহিত পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদেরও সাক্ষাৎ হয়, যেমন—সার উইলিয়াম টমসন (পরে লর্ড কেল্‌ভিন) এবং অধ্যাপক হেল্‌মহোল্‌জ্‌। তবে ইঁহারা ইউরোপীয়ান ; বৈদ্যুতিক শক্তি সম্মিলন ঘটায় ফলে দৈবক্রমে আমেরিকায় আসিয়াছিলেন।

নাই।···কিন্তু আজ আমি ইংরেজদিগকে যতোখানি ভালোবাসি, তেমনটি আপনারা কেহই বাসেন না।"

এবং ইংল্যাণ্ড হইতে আমেরিকায় এক শিষ্যের নিকট লিখিত এক পত্রে (৮ই অক্টোবর ১৮৯৬) তিনি বলেন :

"ইংরেজদের সম্পর্কে আমার ধারণা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে।"[১]

তিনি এক "বীরের জাতি"কে আবিষ্কার করিলেন : ধীর ও সাহসী···সত্যকার ক্ষত্রিয়ের জাতি!···তাহারা তাহাদের মনোভাবকে প্রকাশ করিতে নয়—গোপন করিতেই শিক্ষা পায়। তাহাদের বাহিরে দুঃসাহসের এক বিরাট সৌধ থাকিলেও, তাহাদের অন্তরের গভীরে থাকে অনুভূতির গোপন নির্ঝর। তুমি যদি সেই নির্ঝরে কেমন করিয়া পৌঁছিতে হয় জানিতে পারো, তবে তাহারা চিরদিনের জন্য তোমার বন্ধু হইবে। কোনো ইংরেজের মাথার মধ্যে কোনো ভাবকে একবার ঢুকাইয়া দিলে, তাহা আর কখনও বাহিরে আসিবে না; ইংরেজ জাতির প্রচণ্ড কর্ম-শক্তি সে ভাবকে অঙ্কুরিত ও ফলপ্রসূ করিবে।···দাসত্ব না করিয়াও কেমন করিয়া অনুগত হইতে হয়, তাহার গোপন কৌশলটি তাহারা আয়ত্ত করিয়াছে।—তাহারা আয়ত্ত করিয়াছে মহান্ নিয়মানুগত্যের সহিত মহান্ মুক্তিকে।[২]

ঈর্ষা করিবার মতো একটি জাতি! যাহাদিগকে সে পীড়ন করিতেছে, তাহারাও তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হয়। এমন কি যাঁহারা তাহার পদানত জাতির বহ্নিমান বিবেকের ন্যায়, যাঁহারা ঐ জাতিকে জাগ্রত করিতে চান—রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তিরা—তাঁহারা-ও এই বিজয়ী জাতির মহত্ত্বকে, এবং সম্ভবত তাহার সহিত বিশ্বস্ত সহযোগিতার উপযোগিতাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যদি কখনো কোনো অবস্থায় তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বিজেতা পরিবর্তন করিতে হয়, তবে তাঁহারা আর অন্য কোনো বিজেতাকেই বাছিয়া লইবেন না। বৃটেন ভারতের প্রতি ভয়াবহ অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, তাহা সত্ত্বে-ও মনে হয়, ভারতীয় ভাবধারার বিকাশের

---

১ তিনি ঈষৎ শ্লেষের সহিত ইহা-ও বলেন :

"আমি এমন কি শ্রেষ্ঠ শক্তিমান্ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে-ও ভগবৎ শক্তিকে লক্ষ্য করিতে শুরু করিয়াছি। আমার মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছি, যে অবস্থায় আমি শয়তানকে-ও ভালোবাসিতে পারিব—যদি শয়তান বলিয়া কিছু থাকে।" (৬ই জুলাই, ১৮৯৬)

২ আমি এই অনুচ্ছেদটি ১৮৯৬-এর একটি পত্রে এবং কলিকাতার প্রদত্ত একটি বিখ্যাত বক্তৃতা হইতে রচনা করিতেছি।

যতোখানি সুযোগ ও সুবিধা ব্রিটেন দিয়াছে, ততোখানি সুযোগ-সুবিধা সমগ্র পাশ্চাত্ত্যের (পাশ্চাত্ত্য বলিতে আমি সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাকে-ও বুঝাইতেছি) অন্য কোনো জাতি দিতে পারিত না।

বিবেকানন্দ বৃটেনের প্রতি অনুরক্ত হইলে-ও তিনি ভারতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা মুহূর্তের জন্য-ও ভুলেন নাই। তিনি ভারতের আধ্যা[illegible] [illegible]ন্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইংল্যাণ্ডের মহত্বকে ব্যবহার করিতে চাহিলেন।

"বৃটিশ সাম্রাজ্যের শত ত্রুটি থাকিলে-ও কে[illegible] [illegible]রের যন্ত্র হিসাবে তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি আমার চিন্তাগুলিকে [illegible] [illegible]ক্রম চাই। তাহা হইলে সেগুলি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ি[illegible] [illegible]ল। তিনি সর্বদাই নিপীড়িতদের মধ্য হইতেই আসিয়াছে (যেমন, ইহুদি [illegible] হইতে)।" [illegible] ও [illegible] ভারতের জনসাধারণ [illegible] অস্পৃশ্য-ই ছিলেন।

তিনি যখন প্রথমবার লণ্ডনে যান, তখন তিনি মাদ্রাজে তাঁহার এক শিষ্যকে লেখেন:

"ইংল্যাণ্ডে আমার কাজ সত্যই সুন্দর হইয়াছে।"[1]

তিনি অচিরে সফল হইলেন। সংবাদপত্রগুলি তাঁহার খুবই প্রশংসা করিল। বিবেকানন্দের নৈতিক ব্যক্তিত্বের সহিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় আবির্ভাবগুলির—কেবল রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার ভারতীয় পূর্বাচার্যদের নয়—বুদ্ধ এবং খৃস্টের-ও তুলনা করা হইল।[2] সম্ভ্রান্ত মহলে-ও তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন; এমন কি গির্জার কর্তারাও তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন।

তিনি যখন দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ডে যান, তখন তিনি বেদান্ত শিখাইবার জন্য নিয়মিত ক্লাশ করিতে থাকেন।[3] এবং এখানের শ্রোতারা যে বুদ্ধিমান, এ বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া তিনি মানসিক যোগ—জ্ঞান যোগ—দিয়াই পাঠ শুরু করেন। তাহা ছাড়া, তিনি পিকাডেলি পিক্‌চার গ্যালারিতে, প্রিন্সেস্ হলে, বিভিন্ন ক্লাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অ্যানী বেসান্তের বাড়িতে এবং ঘরোয়া বৈঠকে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। আমেরিকান জনসাধারণের যে পল্লবগ্রাহী বিমুগ্ধতা ছিল, সে তুলনায়

---

১ ১৮৯৬-এর ৬-ই জুলাই মিস্টার ফ্রান্সিস লেগেটকে।

২ দি স্ট্যাণ্ডার্ড, দি লণ্ডন ডেলী ক্রনিক্‌ল্। তৎসহ 'দি ওয়েস্ট মিনস্টার গেজেটে' প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকার-ও দ্রষ্টব্য।

৩ প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি করিয়া ক্লাশ; শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রকাশ্য আলোচনার জন্য একটি অতিরিক্ত ক্লাশ।

ইংরেজ শ্রোতাদের মধ্যে তিনি একটি গুরুত্ববোধ লক্ষ্য করিলেন। আমেরিকানদের মতো ইহাদের চাকচিক্য নাই; ইহারা আরো রক্ষণশীল; ইহারা সহজে সমর্থন করেন না; কিন্তু যখন করেন, তখন পুরাপুরিই করেন। বিবেকানন্দ এখানে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন, ইহাদিকে অধিকতর বিশ্বাস করিলেন। দূষিত দৃষ্টি হইতে যাঁহাকে তিনি সর্বদা সন্তর্পণে আড়ালে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রিয়তম গুরুদেব রামকৃষ্ণের কথা-ও বলিলেন। আবেগপূর্ণ বিনয়ের সহিত বলিলেন, "তিনি যাহা, তাহার সবটুকু-ই ঐ একমাত্র উৎসমূল হইতে আসিয়াছে।...তাঁহার নিজের চিন্তা বলিয়া কণামাত্র কিছু নাই।"...তিনি রামকৃষ্ণকে "অধুনাতন পৃথিবীর ধর্মীয় জীবনের নির্ঝর" বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

রামকৃষ্ণই তাঁহাকে ম্যাক্‌স্‌মুলারের সান্নিধ্যে আনিয়া দিলেন। এই বৃদ্ধ ভারত-তাত্ত্বিকের তরুণ মন হিন্দুর ধর্মগত আত্মার প্রতিটি স্পন্দনকে সজীব আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিত। প্রাচীন কালের মেগাইএর[১] মতো তিনি ইতিপূর্বেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, রামকৃষ্ণ হইলেন পূর্বাকাশের উদীয়মান নক্ষত্র।[২] এই নূতন অবতারের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকে তিনি দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। ম্যাক্‌স্‌মুলারের অনুরোধে বিবেকানন্দ তাঁহাকে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়া দেন। এই স্মৃতিকথা রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকে ম্যাক্‌স্‌মুলার পরে ব্যবহার করেন।[৩] অক্‌স্‌ফোর্ডের এই যাদুকর, যিনি তাঁহার দূরবেক্ষণাগার হইতে বাংলার আকাশ-পথে এই মহান রাজহংসের[৪] সন্তরণ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি-ও বিবেকানন্দকে কম আকর্ষণ করিলেন না। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে বিবেকানন্দ তাঁহার গৃহে আমন্ত্রিত হইলেন; ভারতের এই তরুণ সন্ন্যাসী ইউরোপের বৃদ্ধ ঋষিকে নমস্কার জানাইলেন এবং তাঁহাকে ভারতের মানস-মূর্তি, প্রাচীন ঋষিদের অবতার বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন: স্মরণ করাইয়া দিলেন, বৈদিক ভারতের সুপ্রাচীন যুগে

১ মেগাই—প্রাচীন পারস্যের পুরোহিতরা।—অনুঃ

২ "দি নাইনটিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরী" পত্রিকায় "একজন সত্যকার মহাত্মা" শীর্ষক প্রবন্ধে।

৩ বিবেকানন্দ সারদানন্দকে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে বলেন।

৪ "পরমহংস।"

তিনি বারে বারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—"তিনি সেই আত্মা, যে আত্মা প্রতিদিন ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করিতেছে।[১]..."

* * * * *

ইংল্যাণ্ড তাঁহাকে আরো কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপহার দিল। আজীবন বন্ধুত্বের রূপে সে উপহারগুলি আসিল: জে. জে. গুডউইন, মার্গারেট নোবল্, এবং মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার।

প্রথম জনের কথা ইতিপূর্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি। নিউ ইঅর্কে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের শেষে তাঁহার সহিত বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী-প্রদত্ত পাঠগুলি নির্ভুলভাবে লিখিয়া রাখিবার জন্য একজন স্টেনোগ্রাফারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যথেষ্ট লেখা-পড়া জানেন, এমন কাহাকেও সহজে পাওয়া সহজ ছিল না। ইংল্যাণ্ড হইতে পৌছিবার অব্যবহিত পরেই তরুণ গুডউইন এই কাজে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে এক পক্ষ কাল পরীক্ষা করিয়া দেখার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু পক্ষ কাল শেষ হইবার আগেই তিনি যে চিন্তাগুলিকে লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, সেগুলি হইতে আলোক লাভ করিলেন এবং সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া স্বামীজীর কাজে নিযুক্ত হইলেন; তিনি পারিশ্রমিক লইতে অস্বীকার করিলেন, দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, স্বামীজী যেখানে গেলেন, তিনি-ও সংগে সংগে সেখানে চলিলেন এবং স্বামীজীর প্রতি সর্বদা সজাগ সস্নেহ দৃষ্টি রাখিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্যের ব্রত লইলেন। তিনি স্বামীজীকে তাঁহার নিজের জীবন দান করিলেন—সত্যই, জীবন দান করা অর্থে যাহা বোঝায়। কারণ, বিবেকানন্দের সহিত তিনি ভারতে আসেন; বিবেকানন্দই তাঁহার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও স্বদেশ হইয়া উঠিয়াছিলেন; বিবেকানন্দের মত-ই তাঁহার মত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং ভারতেই অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।[২]

মার্গারেট নোবল্-ও সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সেণ্ট ক্লারার সহিত সেণ্ট ফ্রান্সিসের নাম যেমন জড়িত আছে, তেমনি তাঁহার দীক্ষাকালীন

১ তিনি উৎসাহ ভরে তাঁহার ভারতীয় পত্রিকা "দি ব্রহ্মবাদিন্"-এর জন্য ১৮৯৬-এর ৬ই মে তারিখে অবিলম্বে লেখেন: "আমার নিজের জন্মভূমির জন্য এই ভালোবাসার এক শতাংশ-ও যদি আমার থাকিত।...তিনি পঞ্চাশ বৎসর কিম্বা তাহার-ও অধিক কাল ধরিয়া ভারতীয় চিন্তার জগতে বাস ও বিচরণ করিয়াছেন।...(ইহা) তাঁহার সমগ্র সত্তাকে রঞ্জিত করিয়াছে।...তিনি বেদান্তের সংগীতের সত্যকার আত্মাটিকে ধরিতে পারিয়াছেন।...জহুরিই জহর চেনে।..."

২ ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ২-রা জুন তারিখে।

গৃহীত "ভগিনী নিবেদিতা" নামটি তাঁহার প্রিয় গুরুদেবের নামের সহিত চিরদিন জড়িত থাকিবে। অবশ্য, ইহা সত্য যে, রাজসিক বিবেকানন্দের মধ্যে পভেরেলো-র[১] সেই বিনতি ছিল না। বিবেকানন্দ কাহাকে-ও গ্রহণ করিবার আগে তাঁহাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করিতেন।[২] মিস নোব্‌ল্‌ ছিলেন লণ্ডনের একটি বিদ্যালয়ের তরুণী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। বিবেকানন্দ তাঁহার বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন, এবং অবিলম্বে মিস নোব্‌ল্‌ তাঁহার জাদু-শক্তিতে মুগ্ধ হন।[৩] তবে ইহার বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘদিন সংগ্রাম করিতে থাকেন। প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে যাঁহারা বিবেকানন্দের কাছে আসিয়া বলিতেন, "সত্যি তাই স্বামীজী,...কিন্তু...", মিস নোব্‌ল্‌-ও ছিলেন তাঁহাদেরই একজন।

মিস নোব্‌ল্‌ সর্বদাই প্রতিবাদ করিতেন, প্রতিরোধ করিতেন। যে সব ইংরেজকে সহজে জয় করা যায় না, কিন্তু একবার জয় করিলে চিরদিনের জন্য বিশ্বস্ত হইয়া থাকেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের একজন: বিবেকানন্দ নিজেই বলিয়াছেন:

১ "পভেরেলো" বা গরীব মানুষটি—এই বিশেষণ আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে।—অনু:

২ কিন্তু নিবেদিতার ভালোবাসা এমন গভীর ছিল যে, যে-রূঢ়তা একদিন তাঁহার কাছে ভয়াবহ নৈরাশ্য রূপে আসিয়াছিল, তাহার কোনো স্মৃতিকেই তিনি আর রাখেন নাই। মধুর স্মৃতিগুলিকেই কেবল তিনি মনে রাখিয়াছিলেন। মিস্ ম্যাকলেয়ড আমাদিগকে জানান যে, "আমি নিবেদিতাকে বলিলাম: 'স্বামীজী মূর্তিমান শক্তি।' নিবেদিতা জবাবে বলেন: 'স্বামীজী মূর্তিমান স্নেহ।' আমি বলিলাম: 'আমি তাহা কখনো অনুভব করি নাই।' 'কারণ, সে-রূপ তোমাকে স্বামীজী দেখান নাই।' প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি এবং কোন্ পথে সে ভগবৎ লাভ করিতে পারে, সেই অনুসারেই স্বামীজী তাহার সহিত ব্যবহার করিতেন।"

৩ তিনি তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিগুলি ধীরে ধীরে মনে আনেন:

"সময়টা ছিল নভেম্বর মাসের এক রবিবারের শীতের বিকাল। জায়গাটা ছিল ওয়েস্ট এণ্ডের একটি বৈঠকখানা।...স্বামীজী বসিয়াছিলেন। শ্রোতারা তাঁহার সম্মুখে অর্ধচন্দ্রাকারে বসিয়াছিল এবং তাঁহার পেছনে একটি চুল্লী জ্বলিতেছিল। গোধূলি শেষ হইয়া অন্ধকার নামিল।...তিনি এমন ভাবে আমাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন, মনে হইতেছিল তিনি যেন বহু দূর দেশ হইতে আমাদের জন্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন। তিনি মাঝে মাঝে 'শিব! শিব!' বলিয়া উঠিতেছিলেন; তাঁহার দৃষ্টিতে সমুন্নত একটি ভাবের সহিত নম্রতার অপূর্ব সংমিশ্রণ হইয়াছিল।...(নিবেদিতা তাঁহার দৃষ্টির সহিত সিস্টাইন ম্যাডোনা চিত্রের শিশুর দৃষ্টির তুলনা করেন।)...স্বামীজী সংস্কৃত শ্লোক গাহিয়া শুনাইলেন।" এবং নিবেদিতা একমনে তাঁহার গান শুনিতে লাগিলেন; গ্রেগরির সুন্দর গানগুলির কথা তাঁহার মনে পড়িল।

"তাহার মতো বিশ্বস্ত আর কেহই নাই।"

স্বামীজীর হাতে নিজের ভাগ্যকে তুলিয়া দিতে যখন তিনি সংকল্প করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল আটাশ। স্বামীজী তাঁহাকে ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগের জন্য ভারতে আনাইলেন।[১] স্বামীজী তাঁহাকে হিন্দু হইতে—"হিন্দুর মতো চিন্তা করিতে, হিন্দুর মতো ভাবিতে, হিন্দুর মতো আচার-ব্যবহার অভ্যাস করিতে, এমন কি তাঁহার অতীতের কথা বিস্মৃত হইতে" বাধ্য করিলেন। মিস নোব্‌ল্ ব্রহ্মচর্যের ব্রত লইলেন; তিনিই ছিলেন প্রথম পাশ্চাত্ত্য নারী যিনি ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহীত হইলেন। আমরা আবার তাঁহাকে বিবেকানন্দের পাশে দেখিব। বিবেকান্দের সহিত তাঁহার কথোপকথনগুলিকে তিনি সযত্নে রাখিয়া গিয়াছেন[২]; পাশ্চাত্ত্য জগতে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বকে তিনি যতোখানি জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, ততোখানি আর কেহ করে নাই।

মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ারের বন্ধুত্বটি-ও এইরূপ ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ ছিল। মিস্টার সেভিয়ার ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল উনপঞ্চাশ। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী, উভয়েই ধর্মচিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন; বিবেকানন্দের ভাব, ভাষা ও ব্যক্তিত্ব তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। মিস্ ম্যাক্‌লেয়ড আমাকে বলিয়াছিলেন:

"বিবেকানন্দের একটি বক্তৃতা শুনিয়া বাহির হইয়া আসিবার সময় মিস্টার

১ ১৮৯৮ খ্রস্টাব্দের জানুয়ারির শেষে।

২ কলিকাতা উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভগিনী নিবেদিতা-রচিত *Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda.*

নিবেদিতা তাঁহার গুরুর উদ্দেশে তাঁহার যে প্রধান রচনাটি উৎসর্গ করেন, তাহা হইল ১৯১০ সালে লংম্যান্‌স্ গ্রীন অ্যাণ্ড কোম্পানি হইতে প্রকাশিত *The Master as I Saw Him being pages from the life of the Swami Vivekananda by his disciple, Nivedita.*

পাশ্চাত্ত্যে ভারতের ধর্মীয় চিন্তাধারা, পৌরাণিক কাহিনী-কিম্বদন্তী এবং সামাজিক জীবনকে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত করিয়া তুলিবার জন্য নিবেদিতা অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। কতকগুলি হইতে তিনি তাঁহার প্রাপ্য খ্যাতি পাইয়াছেন, সেগুলি হইল: *The web of Indian Life*; *Kali the Mother*; *Cardle Tales of Hinduism* (হিন্দু পুরাণের সুন্দর কয়েকটি গল্প; গল্পগুলিকে কবিত্বময় করিয়া জনসাধারণের উপযোগী ভংগীতে বলা হইয়াছে); *Myths of the Indo-Aryan Race*, ইত্যাদি।

সেভিয়ার আমাকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি এই যুবককে জানো? তাঁহাকে যেমন মনে হয়, তিনি কি তেমন?' 'হ্যাঁ।' 'যদি তাহা হয়, তবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া ভগবানের সন্ধান করা উচিত।' তিনি বাড়ি ফিরিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলেন, 'তুমি কি আমাকে স্বামীজীর শিষ্য হইতে দিবে?' স্ত্রী বলিলেন, 'হ্যাঁ, দিব।' তারপর তিনি-ও স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি আমাকে স্বামীজীর শিষ্যা হইতে দিবে?' স্বামী সস্নেহ রসিকতার সহিত উত্তর দিলেন, 'কি জানি।...' "

তাঁহাদের যে সামান্য টাকাকড়ি ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাঁহারা বিবেকানন্দের সংগে বাহির হইলেন। এই পুরাতন বন্ধুরা নিজেদের সম্বন্ধে যতোখানি উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন বিবেকানন্দ; তাই তিনি তাঁহার কাজে তাঁহাদিগকে যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিতে দিলেন না, তাঁহাদিগকে কিছু টাকাকড়ি নিজেদের জন্য রাখিতে বাধ্য করিলেন। তাঁহারা স্বামীজীকে নিজের সন্তানের মতো দেখিতে লাগিলেন এবং, আমরা দেখিব, তাঁহারা নিরাকার ভগবানের উপাসনার জন্য 'অদ্বৈত আশ্রম' গড়িয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। বিবেকানন্দ হিমালয় ভ্রমণ কালে এই আশ্রম গড়িয়া তুলিবার কথা ভাবিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মধ্যে অদ্বৈতবাদই বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৯০১ খৃস্টাব্দে তাঁহার স্বহস্তে গঠিত এই আশ্রমে মিস্টার সেভিয়ারের মৃত্যু হয়। স্বামীর এবং স্বামীজীর, উভয়ের মৃত্যুর পরেও মিসেস সেভিয়ার জীবিত ছিলেন। তিনিই এক-মাত্র ইউরোপীয় মহিলা, যিনি প্রায় পনের বছরের জন্য, এই সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে বছরের বহুদিন যাতায়াতের কোনো উপায়ই থাকে না, শিশুদের শিক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন।

মিস্ ম্যাক্লেয়ড তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার একঘেঁয়ে লাগে না?" তিনি জবাবে শুধু বলিয়াছিলেন, "আমি তাঁহার (বিবেকানন্দের) কথা ভাবি।"

ভারতীয়দের মধ্যে কেবল বিবেকানন্দই যে ইংল্যাণ্ডে এমন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। হিন্দুরা চিরদিনই ইংরেজদের মধ্যে তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বিশ্বস্ত শিষ্য ও সহায়কদের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে পিয়ার্সন কিংবা গান্ধীর কাছে এণ্ড্রুজ বা 'মীরাবাই' কি ছিলেন, তাহা সবাই জানেন।......পরে, যখন স্বাধীন ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাছে কতোখানি নিপীড়ন পাইয়াছে এবং কতোখানি বন্ধুত্ব পাইয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ

করিবে, তখন অন্যায়ের দিকে তার বেশি হইলেও এই সকল পবিত্র বন্ধুত্বের বন্ধন তাহাকে অন্যায় অবিচারের দিকেও সহজে ঝুঁকিতে দিবে না।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডে বিবেকানন্দের বাণী গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিলেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যেমনটি করিয়াছিলেন, সেভাবে সেখানে কিছু প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন নাই। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে রামকৃষ্ণ মিশন সংখ্যায় ও আয়তনে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার একজন আমেরিকান শিষ্য আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের মানসিক উন্নতির মানের কথা বিবেকানন্দ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং সেজন্য যেরূপ উন্নততর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হিন্দু প্রচারকের প্রয়োজন ছিল, বরানগরের সতীর্থদের মধ্যে তেমনটি খুব অল্পই ছিলেন।[১] উক্ত শিষ্যের এই উক্তি কি বিশ্বাস করিব? কিন্তু আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে বিবেকানন্দ যে ভয়াবহ ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন, সে কথাটি-ও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তিনি এই জগৎ ও কর্মের বন্ধন সম্পর্কে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশ্রামের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার দেহের অন্তরালে যে অমঙ্গল কীটের ন্যায় তাঁহাকে রাত্রিদিন দংশন করিতেছিল, তাহা তাঁহাকে সকল কিছু হইতে দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি নূতন কিছু গড়িতে অস্বীকার করিতেন, বলিতেন, তিনি সংগঠক নহেন। তিনি ১৮৯৬-এর ২৩শে আগস্ট তারিখে লেখেন[২]:

"আমি কাজ আরম্ভ করিয়াছি; অন্যেরা উহা শেষ করুক। দেখিতে পাইতেছি, কোনো কাজ চালাইবার জন্য আমাকে ধন-সম্পত্তি সাময়িকভাবে স্পর্শ করিতে হইয়াছে।[৩] এখন আমার বিশ্বাস, আমার যাহা করিবার, তাহা আমি করিয়াছি। আমার আর বেদান্ত সম্বন্ধে, বা দুনিয়ার কোনো দর্শন সম্বন্ধে, বা এমন কি কোনো কাজ সম্পর্কে কোনোরূপ উৎসাহ নাই।...এমন কি ইহার ধর্মগত উপযোগিতাটাও আমার নিকট বিস্বাদ হইয়া উঠিতেছে।...আমি আর এই নরকের মধ্যে, এই সংসারের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহি না।"

১ তবে তাঁহাদের মধ্যে একজনকে, সারদানন্দকে, তিনি লণ্ডনে আনাইয়াছিলেন (এপ্রিল, ১৮৯৬) এবং পরে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন। দার্শনিক বিষয়ে সারদানন্দের মস্তিষ্ক খুবই উন্নত ছিল; তিনি ইউরোপীয় অধিবিদ্যাবিদ্‌দের সহিত এ-বিষয়ে বিচার-বিতর্ক করিতে সমর্থ ছিলেন। সারদানন্দের স্থলে অভেদানন্দ লণ্ডনে আসেন (অক্টোবর, ১৮৯৬), তিনি-ও সসম্মানে গৃহীত হন।

২ লুসার্ন থেকে।

৩ টাকা-পয়সার ব্যাপারে তাঁহারও রামকৃষ্ণের মতো একটি দৈহিক বিতৃষ্ণা ছিল।

করুণ আর্তনাদ! যে-ব্যাধি তাঁহাকে পলে পলে ক্ষয় করিতেছিল, তাঁহার ভয়াবহ অবসাদের কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই এই করুণ আর্তনাদের তীব্রতা অনুভব করিবেন। অন্য সময়ে আবার তাঁহার মধ্যে উহা অত্যুৎসাহের সঞ্চার করিত। তখন সমগ্র বিশ্বকে তাঁহার নিকট শিশু ভগবানের যুক্তিহীন আনন্দময় ক্রীড়নক বলিয়া মনে হইত।[১] কিন্তু তাঁহার কি আনন্দে, কি দুঃখে, সকল সময়ই একটি নির্লিপ্তির ভাব বর্তমান ছিল। জগৎ তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছে, ঘুড়ির সুতা ছিঁড়িতে শুরু করিয়াছে।[২]

* * * * *

তাঁহার স্নেহশীল বন্ধুরা তাঁহাকে সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য সুইজারল্যাণ্ডে লইয়া গেলেন। বিবেকানন্দ সেখানে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্ম কালের বেশির ভাগই অতিবাহিত করিলেন।[৩] এখানকার বরফের ঠাণ্ডা হাওয়া, জলপ্রপাত এবং পাহাড়-পর্বত তাঁহাকে হিমালয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিল।[৪] এখানে তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেকখানি উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। এখানেই আল্‌পস্ পর্বতের পাদ-দেশে মণ্ট ব্লাংক্ ও ছোট সেণ্ট বার্নার্ডের মাঝখানে একটি গ্রামে তিনি হিমালয়ে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের শিষ্যদের মিলন-স্থান হিসাবে একটি মঠ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন। মিস্টার ও মিসেস্ সেভিয়ার

১ ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের ৬-ই জুলাই তারিখে মিস্টার ফ্রান্সিস লেগেটকে লেখা পত্র দ্রষ্টব্য। একটি উন্মুক্ত আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে এই পত্র শেষ হইয়াছে:

"আমি যেদিন জন্মিয়াছিলাম, সেদিন ধন্য হউক। 'তিনি' (প্রেমময় ভগবান) লীলাময়; আমি তাঁহার লীলার সাথী। এই দুনিয়ায় না আছে যুক্তি, না আছে ছন্দ। কোন্ যুক্তিই বা তাঁহাকে বাঁধিতে পারে? তিনি লীলাময়, তাঁহার খেলার আগাগোড়াই হাসি-কান্নার খেলা! কি মজা, কি আনন্দ!... এই দুনিয়ার খেলার মাঠে ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের যেন তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন! কাহাকে প্রশংসা করিবে, কাহাকে তিরস্কার করিবে?...তাঁহার না আছে মাথা, না আছে বুদ্ধি। তিনি আমাদের মাথায় একটু বুদ্ধি ঢুকাইয়া দিয়া আমাদিগকে লইয়া তামাসা করিতেছেন। এবার কিন্তু আর তামাসা চলিবে না।...দু-একটা জিনিস আমি শিখিয়াছি। জ্ঞান ও যুক্তি-তর্কের উপরে আছে অনুভূতি, 'প্রেম', 'প্রেমময়'। সেই রসে পেয়ালা পূর্ণ কর, আমরা আনন্দে পাগল হইব।"

২ প্রথম খণ্ডে উদ্‌ধৃত রামকৃষ্ণের রূপক গল্পটি তুলনীয়।

৩ জেনেভা, মঁতয়্যো, শিলন, শামুনিগ, সেণ্ট বার্নার্ড, লুসার্ন, রিগি, জেরমা, শাফহাউসেন প্রভৃতি স্থানে।

৪ তিনি সুইজারল্যাণ্ডের কৃষকদের জীবন ও আচার-ব্যবহারের সংগে উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের লোকদের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এইরূপ দাবীও করেন।

তাঁহার সংগে ছিলেন। তাঁহারা বিবেকানন্দের এই ভাবটিকে কখনো ভুলিতে দেন নাই : উহাই তাঁহাদের জীবনের কর্তব্য হইয়া উঠে।

তাঁহার এই পার্বত্য বিশ্রামাগারে তাঁহার কাছে অধ্যাপক পল ডিউসেনের নিকট হইতে একটি পত্র আসিল। পল ডিউসেন তাঁহাকে কিয়েলে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। পল ডিউসেনের সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ সুইজারল্যাণ্ডে থাকার সময় কমাইলেন এবং হাইডেলবের্গ, কব্‌লেন্‌ৎস্‌, কোলোন ও বার্লিনের পথে অগ্রসর হইলেন। কারণ, জার্মানিকে অন্ততপক্ষে এক বার দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। তিনি জার্মানির বস্তুসম্পদ এবং বিরাট সংস্কৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। আমি ইতিপূর্বেই শোপেনহাউয়ের গেসেলশাফ্‌টের বর্ষপঞ্জীতে কিয়েলে শোপেনহাউয়ের সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার বর্ণনা করিয়াছি।[১] পল ডিউসেন বেদান্তের মধ্যে কেবল "সত্যের সন্ধানে মানব প্রতিভার মহান ও মহিমান্বিত সৃষ্টিকেই" লক্ষ্য করেন নাই; তিনি উহার মধ্যে "বিশুদ্ধ নীতির সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমর্থনকে এবং জীবন ও মৃত্যুর বেদনায় সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ সান্ত্বনাকে" প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।[২] সুতরাং তাঁহার মতো একজন বৈদান্তিকের কাছে যেমনটি প্রত্যাশা করা গিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই বিবেকানন্দ তাঁহার নিকট আন্তরিক অভ্যর্থনা পাইলেন এবং তাঁহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিল।

বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং গভীর জ্ঞান পল ডিউসেনকে মুগ্ধ করিলেও, তাঁহার 'জার্নালে'র সংক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি হইতে বোঝা যায় না যে, তিনি এই তরুণের মহান্ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বিবেকানন্দের দেহ বাহির হইতে বলিষ্ঠ ও আনন্দময় মনে হইলেও তাঁহার হৃদয় জনসাধারণের দুঃখে পরিপূর্ণ এবং তাঁহার দেহ মৃত্যুর দংশনে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই বিবেকানন্দের গভীরে যে বিয়োগান্ত করুণ একটি দিক প্রচ্ছন্ন ছিল, বিশেষভাবে তাহা পল ডিউসেন কল্পনাও করেন নাই। এই জার্মান

১ শ্রীমতী সেভিয়ারের স্মৃতিকথা এবং বিখ্যাত *Life of the Swami Vivekananda* গ্রন্থে সংগৃহীত বিবরণী হইতে।

২ ডিউসেন কর্তৃক রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ভারতীয় শাখার অধিবেশনে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বোম্বাই-এ প্রদত্ত বক্তৃতা। তিনি বিবেকানন্দকে এই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দেন।

মহাজ্ঞানী ও দ্রষ্টা, যিনি ভারতের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে বিবেকানন্দ নিজেকে সুখী মনে করিতেছিলেন। তাই ডিউসেন বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিলেন একটি বিশ্রাম, কৃতজ্ঞ অবকাশ ও আনন্দের মুহূর্তে। এই কৃতজ্ঞতা বিবেকানন্দের মনে কখনো ম্লান হয় নাই ; কিয়েলের দিনগুলির কথা তাঁহার স্মৃতিতে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া ছিল। হামবুর্গ, আমস্টারডাম ও লণ্ডনে যখন ডিউসেন তাঁহার সংগে ছিলেন, সেই দিনগুলির কথাও বিবেকানন্দ কখনো ভুলেন নাই।[১] " দ ব্রহ্মবাদি " পত্রিকায় লিখিত একটি মহান প্রবন্ধে বিবেকানন্দ এই দিনগুলির স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। পরে তিনি এই প্রবন্ধে তাঁহার শিষ্যগণকে শ্রেষ্ঠ ইউরোপবাসীদের নিকট ভারতবাসীদের ঋণের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। ভারতবর্ষ নিজেকে যতোখানি জানিয়াছে, তাহার অপেক্ষাও এই শ্রেষ্ঠ ইউরোপবাসীগণ তাহাকে অনেক বেশি করিয়া জানিয়াছেন, ভালোবাসিয়াছেন। ···ভারতবাসীরা দুই জন শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয়, ম্যাক্স্‌মুলার ও পল ডিউসেনের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

আবার তিনি দুই মাস ইংল্যাণ্ডে কাটান। ঐ সময় তিনি আবার ম্যাক্স্‌মুলারের সংগে, এডোয়ার্ড কার্পেণ্টারের সংগে, এবং ফ্রেডেরিক মায়ার্স ও ক্যানন উইলবারফোর্সের সংগে সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় তিনি বেদান্ত,—মায়া ও অদ্বৈত বিষয়ে হিন্দু মতবাদ কি, সে সম্পর্কে নূতন করিয়া বক্তৃতা দেন।[২] কিন্তু ইউরোপে তাঁহার থাকার দিনগুলি ফুরাইয়া আসিতেছিল। ভারতের কণ্ঠস্বর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য ডাকিতেছিল। ঘরের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। মাত্র তিন সপ্তাহ পূর্বে যিনি নৈরাশ্যে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া বসিয়াছিলেন, কোন নূতন বন্ধন আর তিনি সৃষ্টি করিবেন না,[৩] বলিয়াছিলেন, জীবন ও কর্মের ঘানি হইতে

১ মিসেস সেভিয়ার বলেন, ডিউসেন হামবুর্গে বিবেকানন্দের সহিত আবার সাক্ষাৎ করেন ; সেখান হইতে তাঁহারা একত্রে হল্যাণ্ডে যান, তিন দিন আমস্টারডামে থাকেন, তারপর লণ্ডনে যান ; লণ্ডনে দুই সপ্তাহকাল প্রতিদিন তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইত। ঐ সময়ে বিবেকানন্দ আবার অক্স্‌ফোর্ডে ম্যাক্স্‌মুলারের সহিত দেখা করেন। "এইরূপে এই তিন মহামনস্বী পরস্পরের সহিত আলাপ করিতেছিলেন।"

২ ইহা লক্ষণীয় যে, শেষ বক্তৃতার শেষ কথাটি তিনি অদ্বৈত বেদান্ত সম্পর্কেই নিয়োগ করেন। (১০ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬)।

৩ "আমি পরিবারের বন্ধন—কঠিন লৌহের বন্ধন ত্যাগ করিয়াছি।···আমি ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের স্বর্ণশৃঙ্খল-ও পরিব না। আমি বায়ুর মতো মুক্ত ; সর্বদা আমাকে বায়ুর মতো মুক্ত থাকিতে হইবে।

পলাইতে পারিলেই তিনি বাঁচেন, তিনিই আবেগ ও উৎসাহভরে এই ঘানিতে নিজেকে নিক্ষেপ করিলেন এবং স্বহস্তে তিনিই নিজেকে এই ঘানিতে জুড়িয়া দিলেন। বিদায় লইবার কালে তিনি তাঁহার ইংরেজ বন্ধুদিগকে বলিলেন :

"এই দেহ হইতে মুক্তি পাওয়াকে, এই দেহকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করাকে আমি এমনকি মঙ্গলও মনে করিতে পারি। কিন্তু আমি কখনো মানুষকে সাহায্য করা বন্ধ করিতে পারি না।"

এই জন্মে এবং ভবিষ্যতে জন্মে জন্মে কাজ আর সেবার জন্য চাই পুনর্জন্ম। হ্যাঁ, বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিরা "এই নরকেই" ফিরিয়া আসিতে বাধ্য! কারণ, তাঁহাদের জীবনের সমগ্র যুক্তি ও উদ্দেশ্যই হইল এই নরকাগ্নির সহিত যুঝিবার জন্য, এই নরকাগ্নি হইতে বিপন্নদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কেবল ফিরিয়া আসা, অবিরাম ফিরিয়া আসা। কারণ, অপরকে রক্ষা করিবার জন্য দগ্ধ হওয়াই তাঁহাদের নিয়তি।

তিনি ১৮৯৬-এর ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেন এবং ডোভার, ক্যালে ও মণ্ট চেনিসের পথে ইতালিতে আসেন এবং সেখানে অল্পদিন থাকিয়া তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করেন। তিনি মিলানে গিয়া দা ভিঞ্চি-রচিত 'শেষ নৈশ ভোজ' ছবিখানির প্রতি শ্রদ্ধা জানান; রোম তাঁহাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে, রোমকে তিনি তাঁহার কল্পনায় দিল্লীর পাশাপাশি স্থান দেন। তিনি পদে পদে ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠানের[১] সহিত হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হন। অনুষ্ঠানগুলির সমারোহ তাঁহার মনে রেখাপাত করে। সেগুলির রূপকগত সৌন্দর্য এবং তাঁহার সহযাত্রী ইংরেজদের মনে সেগুলির অনুভূতিশীল সংবেদনকে তিনি সমর্থন করেন। প্রথম যুগের খৃস্টানদের এবং যে সকল খৃস্টান হত্যাকাণ্ডে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি তাঁহাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। শিশু যিশু এবং

আমার কথা যদি বলো তো, আমি প্রায় অবসর লইয়াছি। জগতে আমার যাহা করিবার আমি করিয়াছি।..."

এই কথাগুলি তিনি লুসার্নে ১৮৯৬-এর ২৩শে আগস্ট তারিখে লেখেন। তখন তাঁহাকে কর্মের আবর্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনা হইয়াছে—যে কর্মের আবর্তে তিনি প্রায় তলাইয়া যাইতেছিলেন। তবে সুইজারল্যাণ্ডের বায়ু তখনো তাঁহার শক্তি ফিরাইয়া দেয় নাই।

১ যাজকদের শিখা, ক্রুশের চিহ্ন, ধূপ ও গান : সমস্ত কিছুই তাঁহাকে ভারতের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। হোলি স্যাক্রামেণ্টের মধ্যে তিনি বৈদিক প্রসাদের—দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নৈবেদ্যের,—যাহা অবিলম্বে খাওয়া হইত—রূপান্তর লক্ষ্য করেন।

কুমারী মেরীমাতার মূর্তিগুলির প্রতি ইতালির জনসাধারণের সস্নেহ শ্রদ্ধা তাঁহাকে মুগ্ধ করে।[১] তাঁহাদের কথা তাঁহার চিরদিনই মনে ছিল। ভারতবর্ষ এবং আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে যে সকল কথা আমি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলিতে-ও তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তিনি যখন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন, তখন তিনি এক পাহাড়ের উপর একটি ছোট উপাসনা-মন্দিরে আসেন। সেখানে তিনি ফুল তুলিয়া মিসেস সেভিয়ারের হাত দিয়া মেরীর পায়ে দেন, বলেন: "ইনি-ও 'মা'।"

পরে তাঁহার কোন এক শিষ্য খেয়ালবশত তাঁহাকে ম্যাডনার মূর্তি আনিয়া দেন ও মূর্তিকে আশীর্বাদ করিতে বলেন। বিবেকানন্দ শ্রদ্ধায় নত হইয়া আশীর্বাদ করিতে অস্বীকার করেন এবং ভক্তিভরে শিশু যিশুর মূর্তির পা ছুঁইয়া বলেন:

"আমি পারিলে চোখের জল দিয়া নয়, বুকের রক্ত দিয়া তাঁহার পা ধুয়াইয়া দিতাম।"

সত্যই ইহা বলা যায় যে, তিনি খৃস্টের যতোখানি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, ততোখানি আর কেহই ছিল না।[২] ভগবান ও মানুষের মধ্যে এই মহান মধ্যস্থ যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে-ও মধ্যস্থ ছিলেন। কারণ, প্রাচ্য তাঁহাকে নিজের বলিয়া স্বীকার

১ তিনি ক্রিস্‌মাস্ উৎসবের সময় রোমে ছিলেন। তিনি ক্রিস্‌মাসের পূর্বদিন সান্তা মারিয়া দ্'আরা চিলিতে শিশুদের বাঁধানো পূজা দেখেন।

২ কৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের অপেক্ষা যিশুর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে বিবেকানন্দ যে অধিকতর নিশ্চিত ছিলেন, এমন নহে; বৎসরের শেষ রাত্রিতে জাহাজে বিবেকানন্দ একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। খৃস্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব যাঁহারা অস্বীকার করেন, এই স্বপ্নটি তাঁহাদের কৌতূহলের উদ্রেক করিতে পারে। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন: একজন বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এই জায়গাটার উপর নজর রাখিও। এখানেই খৃস্টান ধর্মের জন্ম হইয়াছিল। আমি চিকিৎসক এসেনেসদের একজন; আমরা এখানে বাস করিতাম। আমরা যে সত্য ও ভাব প্রচার করিতাম, সেগুলিকে আমরা যিশুর বাণী বলিয়াই প্রচার করিতাম। কিন্তু মানুষ যিশু কখনো জন্মেন নাই। এই স্থানটি খুঁড়িলে সে সম্পর্কে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে।" এই সময়ে (তখন মধ্য রাত্রি) বিবেকানন্দের ঘুম ভাঙিয়া গেল; তিনি একজন খালাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন কোথায়? খালাসী বলিলেন, এখন ক্রীট দ্বীপ হইতে জাহাজ পঞ্চাশ মাইল দূরে রহিয়াছে। সেদিনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যিশুর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে কখনো সন্দেহ করেন নাই: তবে রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের মতো ধর্মীয় তীব্রতাসম্পন্ন কোনো মনের কাছে ভগবানের ঐতিহাসিক বাস্তবতা তাঁহার সকল বাস্তবতার মধ্যে ক্ষুদ্রতম ছিল। জাতির আত্মার ফসল যে ভগবান, তিনি একজন কুমারীর গর্ভের ফসল অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব। ভগবানের প্রক্ষিপ্ত অগ্নির বীজ নিশ্চিততর ভাবে তাঁহার মধ্যে-ই নিহিত থাকে।

করিয়া লইয়াছিল—সেকথা বিবেকানন্দ যতোখানি স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেন, ততোখানি স্পষ্টভাবে আর কেহই করেন নাই। এই প্রাচ্য হইতেই বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন।

জাহাজে ইউরোপ হইতে ভারতে ফিরিবার কালে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 'দুই' জগতের এই ঐশী বন্ধনের কথা প্রায়ই ভাবিতে থাকেন। কিন্তু ইহাই একমাত্র বন্ধন ছিল না। যে সকল নির্লিপ্ত মহা মহা পণ্ডিত বিনা সাহায্যে, প্রদর্শকের বিনা নির্দেশে, এই প্রাচীনতম জ্ঞানের পথে,—বিশুদ্ধ ভারতীয় মানসলোকের পথে,—অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা-ও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন। স্বামীজীর জ্বলন্ত কথাগুলির সংস্পর্শে প্রাচীন ও নবীন দুই জগতেরই জনসাধারণের মধ্য হইতে আধ্যাত্মিকতার শিখা অপ্রত্যাশিতভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিশুদ্ধ অকপট আত্মার মধ্য দিয়া এক উদার আত্মবিশ্বাস ও মানসিক সম্পদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। (বিশ্ব-বিজয়ী নবীন প্রতীচ্য সম্পর্কে-ও কি তিনি একথা না ভাবিতেন! তাহার যুক্তির তরবারি ও জুলুমের কঠিন লৌহ মুষ্টির কথাই কি কেবল তাঁহার মনে পড়িত!) কতকগুলি সৎ বন্ধু, কতকগুলি ভালোবাসার ভৃত্য, তিনি পাইয়াছিলেন। তাহা-দিগকে তিনি নিজের পিছু পিছু লইয়া চলিলেন। (তাঁহাদের মধ্যে দুই জন, সেভিয়ার দম্পতি, তাঁহার সংগে একই জাহাজে ছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিবার জন্য ইউরোপকে, তাঁহাদের সমস্ত অতীতকে, ত্যাগ করিয়া চলিলেন।…)

বাস্তবিক, তিনি যখন তাঁহার চার বছরের এই দীর্ঘ তীর্থযাত্রার ফলাফল এবং ভারতীয় জনসাধারণের জন্য যে সম্পদ তিনি আহরণ করিয়া আনিলেন, তাহা হিসাব করিয়া দেখেন, তখন এই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যকে, আত্মার সম্পদকে ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কম উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ভারতের দারিদ্র্য দূর করাই কি আশু প্রয়োজন ছিল না? ধ্বংসের কবল হইতে ভারতের জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য তিনি যে আশু সাহায্য লাভের জন্য গিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যের পৈশাচিক সম্পদের ক্ষেত্র হইতে যে এক মুষ্টি শস্যের জন্য তিনি গিয়াছিলেন, তাঁহার দেশ ও জাতির দৈহিক ও মানসিক পুনর্গঠনের জন্য যে আর্থিক সাহয্যে তাঁহার প্রয়োজন ছিল, তাহা কি তিনি লইয়া আসিতেছিলেন? না; সেদিক হইতে তাঁহার যাত্রা ব্যর্থ হইয়াছিল।[১] আবার এক নূতন ভিত্তিতে তাঁহাকে কাজ শুরু

১ দুই বৎসর বাদে, ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে-ও তাঁহার মধ্যে মাঝে মাঝে প্রবল নৈরাশ্য দেখা যায়।

করিতে হইবে। কেবল ভারতই ভারতকে বাঁচাইতে পারে। সুস্থতা ভিতর হইতেই আসিবে।

এই বিরাট দায়িত্ব পালনের ভার তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। মৃত্যু-লাঞ্ছিত এই তরুণ বীরকে তাঁহার পাশ্চাত্ত্য যাত্রা একটি জিনিস দিয়াছিল, যাহা তাঁহার পূর্বে ছিল না—কর্তৃত্বাধিকার। তাঁহার এই মহান্ দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তৃত্বাধিকারের প্রয়োজন ছিল।

কারণ, তাঁহার সকল সাফল্য, সকল গৌরব সত্ত্বে-ও ভারতের ঐহিক পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রিশ কোটি টাকা তাঁহার জুটিল না। কিন্তু এই সময় তিনি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যে, আমরা সাফল্য দেখিবার জন্য জন্মি নাই :

"বিশ্রাম চাহি না। কাজ করিতে করিতেই মরিব। জীবন একটি যুদ্ধ। আমাকে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিতে ও মরিতে দাও।"

৭

ভারতে প্রত্যাবর্তন

ধর্ম সম্মিলনে বিবেকানন্দের সাফল্যের সংবাদ ভারতে পৌছিতে বিলম্ব হইল। কিন্তু যখন পৌছিল, তখন আনন্দ ও জাতীয় গর্বের এক বিস্ফোরণ ঘটিল। সংবাদটি ছাড়াইয়া পড়িল সমস্ত দেশময়। বরানগরের সন্ন্যাসীরা ছয় মাস যাবৎ এ সম্পর্কে কিছুই শুনেন নাই; তাঁহাদের এক ভাই যে চিকাগোর বিজয়ী-বীর সে সম্পর্কে তাঁহাদের কোনো ধারণাই ছিল না। বিবেকানন্দ একটি পত্রে সেকথা তাঁহাদিগকে জানাইলেন। তাঁহাদের উল্লাসে মধ্যে রামকৃষ্ণের সেই পুরাতন ভবিষ্যৎ বাণী মনে পড়িল: "নরেন দুনিয়াকে তাহার ভিত শুদ্ধ নাড়া দিবে।" রাজা, পণ্ডিত, সাধারণ মানুষ সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। ভারত তাহার বিজয়ী বীর প্রতিনিধিকে অভিনন্দিত করিল। উত্তেজনা মাদ্রাজে ও বাংলা দেশে সর্বোচ্চ শিখরে উঠিল—তাহাদের গ্রীষ্মপ্রধান কল্পনায় আগুন ধরিয়া গেল। চিকাগো সম্মিলনের এক বৎসর বাদে, ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার টাউন হলে এক সভা হইল। সেই সভায় দেশবাসীর ও হিন্দু ধর্মের সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহারা বিবেকানন্দকে অভিনন্দন এবং আমেরিকার জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানাইতে সমবেত হইলেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সহ এক সুদীর্ঘ পত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হইল। কোন কোন রাজনীতিক দল বিবেকানন্দের কাজকে নিজেদের কাজে লাগাইতে চাহিলেন; কিন্তু বিবেকানন্দকে এ বিষয় সতর্ক করিয়া দিলে জোরের সংগে তিনি ইহার প্রতিবাদ করিলেন। নিঃস্বার্থ নহে, এমন কোনো আন্দোলনের সহিত নিজেকে জড়িত করিতে রাজী হইলেন না।[১]

"সাফল্যে বা অসাফল্যে আমার কিছু আসে যায় না।...আমি আমার আন্দোলনকে বিশুদ্ধ রাখিব। যদি রাখিতে না পারি, তবে আন্দোলন চাহি না।"

১ "আমার কোনো রচনা বা উক্তির সহিত মিথ্যা করিয়া যেন রাজনীতিক অর্থ জড়িত করা না হয়। উহা নির্বুদ্ধিতা মাত্র!" (সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪)

"রাজনীতির সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই। আমি রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। জগতে ভগবান এবং সত্যই হইল একমাত্র নীতি। আর সমস্তই অর্থহীন।" (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫)

তাঁহার পূর্বাচার্য কেশবচন্দ্র সেন-ও রাজনীতি এবং নিজের কাজের মধ্যে অনুরূপ একটি পার্থক্য রাখিয়াছিলেন। (১৮৮৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে 'হিন্দু পেট্রিঅট' কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁহার মাদ্রাজের তরুণ শিষ্যদের সহিত যোগসূত্র হারান নাই; তিনি অবিরাম তাঁহাদিগকে উদ্দীপনা ও প্রেরণাময় পত্র লিখিতেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা ভগবানের এক সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হইবেন—যে সৈন্যবাহিনী আমরণ দরিদ্র ও বিশ্বাসী থাকিবে।...

"আমরা, ভাই, দরিদ্র; আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা কেউ-কেটা নই। সবার উপরে যিনি আছেন, তিনি চিরদিন আমাদের মতো মানুষকে দিয়াই কাজ করাইয়া লইয়াছেন।"

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলিতে আগে হইতে তাঁহাদের অভিযানের, "ভারতের জনসাধারণকে জাগ্রত করিবার একমাত্র কর্তব্যের" এবং সে কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে সমস্ত ব্যক্তিগত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার এবং আনুগত্যের মনোবৃত্তি গড়িয়া তুলিবার, অপরের জন্য সমবেত ভাবে কাজ করিতে শিখিবার অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহারা কতোখানি অগ্রসর হইলেন দূর হইতে তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন; বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের "দি ব্রহ্মবাদিন্" পত্রিকা প্রকাশের জন্য, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার পতাকা উড়াইবার জন্য, তিনি তাঁহাদিগকে টাকা পাঠাইয়া দেন। তাঁহার উপর ক্লান্তির যে বোঝা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহা সত্ত্বে-ও, তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সময় যতোই ঘনাইয়া আসিয়াছিল, ততোই ভারতের উদ্দেশ্যে লিখিত তাহার পত্রগুলি শঙ্খ নিনাদের মতো শুনাইতেছিল:

"অনেক বড়ো কাজ করিবার আছে।...ভয় পাইও না! সাহস করো।... আমি শীঘ্রই ভারতে আসিব এবং যাহা করিবার তাহা শুরু করিতে চেষ্টা করিব। তোমরা সাহসের সহিত কাজ করিয়া যাও! ভয় নাই, ভগবান তোমাদের পিছনে আছেন।"...

তিনি প্রথমে মাদ্রাজ ও কলিকাতায় দুটি এবং পরে বোম্বাই ও এলাহাবাদে আরো দুটি প্রধান কার্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা ঘোষণা করিয়াছিলেন। যে প্রেম ও সেবা একদা ভারত ও বিশ্ব জয় করিবে, সেই সার্বজনীন প্রেম ও সেবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের চারিদিকে তাঁহার গুরুভাইদিগকে, তাঁহার শিষ্যদিগকে, এবং তাঁহার পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সহকারীদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

তাই তিনি ভারতে আসিয়া তাঁহার আদেশের জন্য প্রস্তুত একটি বাহিনী দেখিতে পাইবেন, এমন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো আশা করেন নাই যে, যে জাহাজে করিয়া তাহাদের পাশ্চাত্ত্যবিজয়ী বীর ফিরিয়া আসিতেছেন,

৭

ভারতে প্রত্যাবর্তন

ধর্ম সম্মিলনে বিবেকানন্দের সাফল্যের সংবাদ ভারতে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল। কিন্তু যখন পৌঁছিল, তখন আনন্দ ও জাতীয় গর্বের এক বিস্ফোরণ ঘটিল। সংবাদটি ছাড়াইয়া পড়িল সমস্ত দেশময়। বরানগরের সন্ন্যাসীরা ছয় মাস যাবৎ এ সম্পর্কে কিছুই শুনেন নাই; তাঁহাদের এক ভাই যে চিকাগোর বিজয়ী-বীর সে সম্পর্কে তাঁহাদের কোনো ধারণাই ছিল না। বিবেকানন্দ একটি পত্রে সেকথা তাঁহাদিগকে জানাইলেন। তাঁহাদের উল্লাসে মধ্যে রামকৃষ্ণের সেই পুরাতন ভবিষ্যৎ বাণী মনে পড়িল: "নরেন দুনিয়াকে তাহার ভিত শুদ্ধ নাড়া দিবে।" রাজা, পণ্ডিত, সাধারণ মানুষ সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। ভারত তাহার বিজয়ী বীর প্রতিনিধিকে অভিনন্দিত করিল। উত্তেজনা মাদ্রাজে ও বাংলা দেশে সর্বোচ্চ শিখরে উঠিল—তাহাদের গ্রীষ্মপ্রধান কল্পনায় আগুন ধরিয়া গেল। চিকাগো সম্মিলনের এক বৎসর বাদে, ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার টাউন হলে এক সভা হইল। সেই সভায় দেশবাসীর ও হিন্দু ধর্মের সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহারা বিবেকানন্দকে অভিনন্দন এবং আমেরিকার জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানাইতে সমবেত হইলেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সহ এক সুদীর্ঘ পত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হইল। কোন কোন রাজনীতিক দল বিবেকানন্দের কাজকে নিজেদের কাজে লাগাইতে চাহিলেন; কিন্তু বিবেকানন্দকে এ বিষয় সতর্ক করিয়া দিলে জোরের সংগে তিনি ইহার প্রতিবাদ করিলেন। নিঃস্বার্থ নহে, এমন কোনো আন্দোলনের সহিত নিজেকে জড়িত করিতে রাজী হইলেন না।[১]

"সাফল্যে বা অসাফল্যে আমার কিছু আসে যায় না।···আমি আমার আন্দোলনকে বিশুদ্ধ রাখিব। যদি রাখিতে না পারি, তবে আন্দোলন চাহি না।"

১ "আমার কোনো রচনা বা উক্তির সহিত মিথ্যা করিয়া যেন রাজনীতিক অর্থ জড়িত করা না হয়। উহা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।" (সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪)

"রাজনীতির সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই। আমি রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। জগতে ভগবান এবং সত্যই হইল একমাত্র নীতি। · আর সমস্তই অর্থহীন।" (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫)

তাঁহার পূর্বাচার্য কেশবচন্দ্র সেন-ও রাজনীতি এবং নিজের কাজের মধ্যে অনুরূপ একটি পার্থক্য রাখিয়াছিলেন। (১৮৮৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে 'হিন্দু পেট্রিঅট' কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁহার মাদ্রাজের তরুণ শিষ্যদের সহিত যোগসূত্র হারান নাই; তিনি অবিরাম তাঁহাদিগকে উদ্দীপনা ও প্রেরণাময় পত্র লিখিতেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা ভগবানের এক সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হইবেন—যে সৈন্যবাহিনী আমরণ দরিদ্র ও বিশ্বাসী থাকিবে।...

"আমরা, ভাই, দরিদ্র; আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা কেউ-কেটা নই। সবার উপরে যিনি আছেন, তিনি চিরদিন আমাদের মতো মানুষকে দিয়াই কাজ করাইয়া লইয়াছেন।"

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলিতে আগে হইতে তাঁহাদের অভিযানের, "ভারতের জনসাধরণকে জাগ্রত করিবার এক-মাত্র কর্তব্যের" এবং সে কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে সমস্ত ব্যক্তিগত শক্তিকে কেন্দ্রী-ভূত করিবার এবং আনুগত্যের মনোবৃত্তি গড়িয়া তুলিবার, অপরের জন্য সমবেত ভাবে কাজ করিতে শিখিবার অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহারা কতোখানি অগ্রসর হইলেন দূর হইতে তিনি তাহা লক্ষ্য করিতে-ছিলেন; বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের "দি ব্রহ্মবাদিন্" পত্রিকা প্রকাশের জন্য, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার পতাকা উড়াইবার জন্য, তিনি তাঁহাদিগকে টাকা পাঠাইয়া দেন। তাঁহার উপর ক্লান্তির যে বোঝা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহা সত্ত্বে-ও, তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সময় যতোই ঘনাইয়া আসিয়াছিল, ততোই ভারতের উদ্দেশ্যে লিখিত তাহার পত্রগুলি শঙ্খ নিনাদের মতো শুনাইতেছিল:

"অনেক বড়ো কাজ করিবার আছে।...ভয় পাইও না! সাহস করো।... আমি শীঘ্রই ভারতে আসিব এবং যাহা করিবার তাহা শুরু করিতে চেষ্টা করিব। তোমরা সাহসের সহিত কাজ করিয়া যাও! ভয় নাই, ভগবান তোমাদের পিছনে আছেন।"...

তিনি প্রথমে মাদ্রাজ ও কলিকাতায় দুটি এবং পরে বোম্বাই ও এলাহাবাদে আরো দুটি প্রধান কার্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা ঘোষণা করিয়াছিলেন। যে প্রেম ও সেবা একদা ভারত ও বিশ্ব জয় করিবে, সেই সার্বজনীন প্রেম ও সেবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের চারিদিকে তাঁহার গুরুভাইদিগকে, তাঁহার শিষ্যদিগকে, এবং তাঁহার পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সহকারীদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

তাই তিনি ভারতে আসিয়া তাঁহার আদেশের জন্য প্রস্তুত একটি বাহিনী দেখিতে পাইবেন, এমন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো আশা করেন নাই যে, যে জাহাজে করিয়া তাহাদের পাশ্চাত্ত্যবিজয়ী বীর ফিরিয়া আসিতেছেন,

তাহার প্রতীক্ষায় সমগ্র জাতি—ভারতের জনসাধারণ—বসিয়া থাকিবে। বিজয় তোরণ রচিত হইয়াছে, পথ ও গৃহগুলি সজ্জিত হইয়াছে। আনন্দ-উচ্ছ্বাস এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেকে তাঁহার আগমনের বিলম্ব সহিতে পারিল না; তিনি সিংহলে জাহাজ হইতে যখন নামিবেন তখন তাঁহাকে প্রথমে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য দলে দলে লোক দক্ষিণ ভারতের পথে ছুটিতে লাগিল।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে তিনি যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন কলম্বোর ঘাটে অগণিত মানুষের আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। দলে দলে মানুষ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। পুরোভাগে পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। মন্ত্রপাঠ চলিল। পথ পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া গেল। চারিদিকে গঙ্গাজল ও গোলাপ জল ছড়ানো হইল। গৃহগুলির সম্মুখে ধূপ ও ধুনা পুড়িতে লাগিল। ধনী দরিদ্র হাজার হাজার মানুষ তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্ঘ বহিয়া আনিল।

দক্ষিণ হইতে উত্তরের পথে[১] তিনি পুনরায় ভারত পরিক্রম করিলেন। আগে এই পথে তিনি ভিখারীর বেশে গিয়াছিলেন; আজ তিনি চলিলেন বিজয়ীর বেশে, তাঁহার সংগে চলিল মানুষের অগণিত এক উন্মত্ত জনতা। রাজারা তাঁহার সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার রথের রজ্জু ধরিলেন।[২] কামান গর্জিয়া উঠিল; দলে দলে চলিল হস্তী; চলিল উষ্ট্র। জুড়াস ম্যাকাবিয়াসের[৩] বিজয় সংগীত ধ্বনিত হইল।[৪]

যুদ্ধ হইতে যেমন, বিজয় উৎসব হইতে তেমনি, পলাইবার মানুষ ছিলেন না বিবেকানন্দ। তিনি ভাবিলেন, এ সম্মান তাঁহাকে করা হইতেছে না, করা হইতেছে তাঁহার আদর্শকে, বিত্তহীন, নামহীন, গৃহহীন, ভগবান ছাড়া সম্বলহীন এক সন্ন্যাসীকে আজ জাতি যে অভ্যর্থনা জানাইতেছে, তাহার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্য সভায় জোর দিলেন। তাঁহার পবিত্র দায়িত্বকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবার জন্য তিনি শক্তি সংগ্রহ করিলেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ, তাঁহার জীবনী-

১ কলম্বো, কাণ্ডী, অনুরাধাপুর, জাফ্‌না, পাম্বান, রামেশ্বরম্‌, রামনাড, মাদুরা, ত্রিচিনপল্লী, কুম্ভকোণাম্‌, মাদ্রাজ—এবং সেখান হইতে সমুদ্র পথে কলিকাতায়। কুম্ভকোণাম্‌ একটি ছোট রেল স্টেশন। সেখানে ট্রেণ থামাইবার জন্য শত শত লোক খোলা মাঠে রেল রাস্তার উপর শুইয়া ছিল।

২ রামনাডের রাজা।

৩ গ্রীক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন-নায়ক।—অনুঃ

৪ হ্যান্‌ডেল্‌ হইতে গৃহীত একটি সমবেত সংগীত।

শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল শুশ্রূষার। কিন্তু কোথায় সে শুশ্রূষা, তিনি অতিমানবিকভাবে তাঁহার শক্তি ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত যাত্রা পথে তিনি বক্তৃতার পর বক্তৃতায় বাতাসে বাণীর বীজ উড়াইয়া চলিলেন। এমন সুন্দর, এমন দৃপ্ত বক্তৃতা ভারত ইতিপূর্বে আর শোনে নাই। সমস্ত দেশ রোমাঞ্চিত হইল। আমি এখানে একটু থামিব, কারণ, এগুলিতেই তাঁহার প্রতিভা উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিল। তিনি পশ্চিম দেশে ধর্ম-যুদ্ধ শেষ করিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের সহিত সুদীর্ঘ সংস্পর্শের ফলে তিনি ভারতের ব্যক্তিত্বকে গভীরতরভাবে অনুভব করিতে পারিলেন। এবং ভারতের সহিত তুলনা করিয়া তিনি পাশ্চাত্ত্যের বলিষ্ঠ ও বহুবিচিত্র ব্যক্তিত্বকে যথাযথ মূল্য দিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে, উভয়ে উভয়ের পরিপূরক, উভয়ে উভয়ের সহিত মিলনের পবিত্র বাণীর প্রতীক্ষায় আছে, সে মিলন-পথের উদ্বোধন তিনিই করিবেন।

* * * * *

কলম্বোতে তাঁহার বক্তৃতাগুলি ('পবিত্রভূমি ভারত', 'বেদান্ত দর্শন') মানুষকে অভিভূত করিল। অনুরাধাপুরে তিনি একটি বট বৃক্ষের তলে ধর্মান্ধ বৌদ্ধ জনতার প্রতিরোধ সত্ত্বে-ও 'সার্বজনীন ধর্মের' বাণী প্রচার করিলেন। রামেশ্বরমে তিনি জনসাধারণের কাছে যে বক্তৃতা দিলেন, তাহা খৃস্টের বাণীর মতোই শুনাইল। "দরিদ্র, রুগ্ণ ও দুর্বলের মধ্যে যে 'শিব' আছেন, তাঁহারই পূজা কর!"

এই বাণী শুনিয়া ধর্মপ্রাণ রাজা দুই হাতে পাগলের মতো দান করিতে লাগিলেন।[১] কিন্তু বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলি মাদ্রাজের জন্য-ই রক্ষিত ছিল। এক প্রকার সমুন্নত আগ্রহের মধ্যে মাদ্রাজ তাঁহার জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। মাদ্রাজ তাঁহার জন্য সতেরটি বিজয় তোরণ রচনা করিয়াছিল, তাঁহাকে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ভাষায় চব্বিশটি মানপত্র দিয়াছিল,[২]

১ পরদিন তিনি হাজার হাজার দরিদ্রকে খাওয়াইলেন এবং একটি বিজয়-স্তম্ভ নির্মাণ আরম্ভ করিলেন।

২ ভারতীয় মানপত্রগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের পৃষ্ঠপোষক ক্ষেত্রীর মহারাজার নিকট হইতেও একটি আসিয়াছিল। ভারতীয় মানপত্রগুলি ছাড়া ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা হইতে-ও বহু মানপত্র আসিয়াছিল। আমেরিকার মানপত্রে উইলিয়াম জেম্স্ এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের স্বাক্ষর ছিল। ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন হইতে যে পত্র পাঠানো হইয়াছিল, তাহাতে এইভাবে উদ্দেশ করা হয়—"মহান আর্য পরিবারের আমাদের ভারতীয় ভ্রাতাদের প্রতি।"

এবং তাঁহার আগমনে সমস্ত কাজ-কর্ম বন্ধ রাখিয়াছিল—নয় দিন ধরিয়া চলিয়াছিল আনন্দ-মুখরিত উৎসব।

জনসাধারণের এই উন্মত্ত প্রত্যাশার প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁহার "ভারতের প্রতি বাণী" ঘোষণা করিলেন। সে ঘোষণা ছিল শঙ্খধ্বনির মতো ; সে শঙ্খধ্বনি রামচন্দ্র, শিব ও কৃষ্ণের দেশকে পুনরায় জাগ্রত হইতে আহ্বান করিল, তাহার শৌর্যশীল মানস-সত্তাকে, তাহার অমর আত্মাকে সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হইতে বলিল। তিনিই ছিলেন সেনাপতি। তিনি তাঁহার 'অভিযানের পরিকল্পনা'[১] ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন এবং জনসাধারণকে সমগ্রভাবে উত্থিত হইতে আহ্বান করিলেন :

"হে আমার ভারত ! জাগ্রত হও ! কোথায় তোমার জীবনী শক্তি ? সে শক্তি তোমার অমর আত্মায়।…

"প্রত্যেক ব্যক্তির মতোই প্রত্যেক জাতির জীবনেও একটি করিয়া মূল সুর থাকে। তাহাই সে জাতির প্রধান ও কেন্দ্রীয় সুর ; তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য সুর আসে এবং সুর-সংগতি গড়িয়া তোলে ;…যদি কোনো জাতি তাহার এই জাতীয় প্রাণশক্তিকে—যে প্রাণশক্তি বিভিন্ন দেশের মধ্য হইতে আসিয়া তাহার নিজস্ব হইয়া উঠিয়াছে,—ছুঁড়িয়া ফেলিতে চায়, তবে সে জাতির মৃত্যু অনিবার্য।… কোনো কোনো জাতির প্রাণশক্তি থাকে তাহার রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে, যেমন ইংল্যাণ্ড। কোনো জাতির বা প্রাণশক্তি থাকে তাহার শিল্প শক্তির মধ্যে ; কোনো জাতির বা থাকে অন্য কিছুর মধ্যে। ধর্মীয় জীবনই ভারতের কেন্দ্রস্থল—জাতীয় জীবনের সমগ্র সংগীত ধর্ম-জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই ধ্বনিত হইতেছে।…সুতরাং তুমি যদি ধর্মকে ফেলিয়া রাজনীতি বা সমাজনীতি গ্রহণ করিবার চেষ্টায় সফল হও, তবে তোমার ধ্বংস অনিবার্য।…তোমার ধর্মের প্রাণশক্তির মধ্য দিয়াই সমাজ সংস্কার…এবং রাজনীতির কথা প্রচার করিতে হইবে।…প্রত্যেক মানুষকে তাহার নিজের পথ বাছিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক জাতিও নিজের পথ বাছিয়া লয়। আমরা আমাদের পথ বহু দিন পূর্বেই বাছিয়া লইয়াছি।…সে পথ হইল অবিনশ্বর আত্মার প্রতি বিশ্বাস।…কাহারও যদি সাধ্য থাকে, সে ইহাকে ত্যাগ করুক।… তুমি তোমার প্রকৃতির পরিবর্তন করিবে কেমন করিয়া ?"[২]

১ "আমার অভিযানের পরিকল্পনা" (*My Plan of Campaign*)—এই ছিল মাদ্রাজে প্রদত্ত তাঁহার প্রথম বক্তৃতার নাম।

২ মাদ্রাজে প্রদত্ত 'আমার অভিযানের পরিকল্পনা" বক্তৃতা হইতে গৃহীত। উদ্‌ধৃতি চিহ্নের মধ্যে

অভিযোগ করিও না। তুমিই অধিকতর শক্তিশালী। তোমার হাতে যে শক্তি আছে, তাহা ব্যবহার করো। সে শক্তি এমন সুবৃহৎ যে তুমি যদি কেবল তাহা উপলব্ধি করো এবং নিজেকে তাহার যোগ্য করিয়া তোলো, তবে তুমি সমগ্র বিশ্বে আমূল পরিবর্তন আনিতে পারিবে। ভারতবর্ষ লইল মানস গঙ্গা। অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতিগুলির বস্তু-বিজয় ইহার প্রবল স্রোতধারাকে রুদ্ধ করিতে পারা দূরে থাক, বরং তাহা উহাকে সাহায্যই করিবে। ইংল্যাণ্ডের শক্তি বহু জাতিকে একত্রিত করিয়াছে। ভারতের মানস-তরঙ্গ যাহাতে প্রসারিত হইয়া পৃথিবীর সুদূর সীমান্তকে স্নাত করাইতে পারে, সেজন্য সে সমুদ্র-পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। (সুতরাং, বিবেকানন্দ এই সংগে বলিতে পারিতেন—কারণ, এই সত্য তাঁহার অগোচর ছিল না—খৃস্টের বিজয়ের জন্যই রোম সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।)

তবে ভারতের এই আধ্যাত্মিকতা কি? কি এই নূতন বিশ্বাস, কি এই নূতন বাণী—যাহার জন্য বিশ্ব প্রতীক্ষা করিতেছে?

"অন্যতর যে মহান ভাবধারাকে আজ বিশ্ব আমাদের নিকট চাহিতেছে—উচ্চ শ্রেণীর অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা, শিক্ষিতদের অপেক্ষা অশিক্ষিতরা, শক্তিশালীদের অপেক্ষা দুর্বলরা অধিকতর পরিমাণে চাহিতেছে—তাহা হইল সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক ঐক্যের সেই চিরন্তন মহান ভাবধারা—সেই একমাত্র 'অসীম বাস্তবতা', যাহা তোমার মধ্যে আছে, আমার মধ্যে আছে, সকলের মধ্যে আছে, অহমের মধ্যে আছে, আত্মার মধ্যে আছে।…আমাদের এই পদ-দলিত নিপীড়িত জাতির মতোই ইউরোপও আজ ইহাই চাহিতেছে; ইংল্যাণ্ডে, জার্মানীতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায় আজ যে সকল আধুনিকতম সামাজিক ও রাজনীতিক আদর্শ দেখা দিতেছে, এই মহান আদর্শই অজ্ঞাতে এমন কি সেগুলিরও ভিত্তি হইয়া উঠিতেছে।"[১]

তাহা ছাড়া, প্রাচীন ভারতীয় মানসের গভীরতম বিশুদ্ধতম প্রকাশ যে মহান অদ্বৈতবাদ, তাহার, প্রাচীন বেদান্তের, ইহাই হইল গোড়ার কথা।…

"আমি একবার এই অভিযোগ শুনিয়াছিলাম যে, আমি অদ্বৈতবাদের কথা খুব বেশি এবং দ্বৈতবাদের কথা খুব কম বলিতেছি। হ্যাঁ, আমি জানি, সেই দ্বৈতবাদী…

প্রদত্ত কথাগুলি হুবহু দেওয়া হইয়াছে। অন্যগুলিতে বক্তৃতার যুক্তিগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১ "বেদান্তের আদর্শ" শীর্ষক বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

ধর্মের মধ্যে কি অসীম ভাবোন্মাদনা, কি অসীম আনন্দ-উচ্ছ্বাস রহিয়াছে। তাহা আমি সমস্তই জানি। কিন্তু এখন আমাদের, এমন কি আনন্দেও, কাঁদিবার সময় নহে; এখন আমাদের কোমল হইবারও সময় নহে। এই কোমলতা আমাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া রহিয়াছে এবং অবশেষে আমরা তুলার মতো নরম হইয়া গিয়াছি।...আজ আমাদের দেশ যাহা চায়, তাহা হইল লৌহের পেশী, ইস্পাতের স্নায়ু, অতিকায় ইচ্ছা শক্তি, যাহা কোনো প্রতিরোধ মানে না, যাহা সকল প্রকারে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। তাহাকে যদি সমুদ্রের অতল গভীরে নামিতে হয়, মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। তাহাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন; এবং তাহা গড়িয়া তুলিবার জন্য, তাহাকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়োজন অদ্বৈতবাদের আদর্শকে, ঐক্যের আদর্শকে, উপলব্ধি করা, আয়ত্ত করা। চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস, আত্ম-বিশ্বাস। তোমরা যদি তোমাদের তেত্রিশ কোটি পৌরাণিক দেবতার এবং যে সকল দেবতাকে বিদেশীরা তোমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে, সেগুলিকে বিশ্বাস কর, আর নিজের প্রতি বিশ্বাস না রাখো, তবে তোমাদের মুক্তি নাই।...নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখো এবং সেই বিশ্বাসে ভর করিয়া দাঁড়াও।...কেন আমরা এই তেত্রিশ কোটি মানুষ বিগত হাজার বছর ধরিয়া মুষ্টিমেয় বিদেশীর হাতে শাসিত হইতেছি?...কারণ, তাহাদের আত্মবিশ্বাস ছিল, আমাদের ছিল না।...ইংরেজ যখন আমাদের কোন দরিদ্র স্বজাতিকে হত্যা করে বা নির্যাতন করে, তখন কেমন করিয়া দেশময় চেঁচামেচি শুরু হয়, তাহা আমি সংবাদ পত্রে পড়ি; পড়ি আর কাঁদি; পর মুহূর্তেই ভাবি, এ সমস্তর জন্য দায়ী কে?...ইংরেজরা নয়।...আমরা, আমাদের এই অধঃপতন।... আমাদের অভিজাত পূর্বপুরুষেরা আমাদের দেশের জনসাধারণকে পদ-দলিত করিয়াছেন। অবশেষে তাহারা নিরুপায় হইয়াছে, অবশেষে এই অত্যাচারেব ফলে তাহারা যে মানুষ, একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া তাহারা কেবল কাট কাটিতে, জল তুলিতেই বাধ্য হইয়াছে; অবশেষে তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে যে, গোলামির জন্যই, এই কাঠ কাটা, জল তোলার জন্যই তাহারা জন্মিয়াছে।"[১]

"সুতরাং, হে ভবিষ্যৎ সংস্কারকগণ, হে ভবিষ্যৎ দেশপ্রেমিকগণ, তোমরা অনুভব কর। তোমরা কি অনুভব কর? তোমরা কি অনুভব কর যে, দেবতাদের,

১ "বেদান্তের আদর্শ" হইতে গৃহীত।

ঋষিদের এই কোটি কোটি বংশধর পশুর প্রতিবেশী হইয়া আছে? তোমরা কি অনুভব কর যে কোটি কোটি মানুষ আজ অনাহারে আছে, যুগ যুগ ধরিয়া অনাহারে আছে? তোমরা কি অনুভব কর যে, কৃষ্ণ মেঘের মতো অজ্ঞানতা সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহা কি তোমাদিগকে ব্যস্ত ও ব্যাকুল করে না? ...ইহা কি তোমাদিগকে বিনিদ্র করে না?...ইহা কি তোমাদিগকে প্রায় পাগল করিয়া দেয় না? এই ধ্বংসের, এই দায়িত্বের কথাই কি তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে না? তোমাদের নাম, যশ, স্ত্রী-পুত্র, ধনসম্পদ, এমন কি তোমাদের দেহের কথা-ও কি ভুলাইয়া দেয় না?...দেশপ্রেমিক হইবার ইহাই হইল প্রথম সোপান।...শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জনসাধারণ তাহাদের অধঃপতনের তত্ত্ব শিখিয়াছে। তাহাদের শেখানো হইয়াছে যে, তাহারা কিছু নয়, কেহ নয়। সমস্ত পৃথিবীময় জনসাধারণকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা মানুষ নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগকে এমন আতংকের মধ্যে রাখা হইয়াছে যে, তাহারা পশুপ্রায় হইয়া গিয়াছে। আত্মার কথা তাহাদের কখনো শুনিতে দেওয়া হয় নাই। আত্মার কথা তাহাদিগকে শুনিতে দাও—তাহারা শুনুক যে, তাহাদের মধ্যে সর্বনিম্ন যে, তাহার মধ্যে-ও আত্মা আছে—সে আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অস্ত্র তাহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, তাহা অবিনশ্বর, তাহা অনাদি, তাহা অনন্ত, তাহা সর্বশুদ্ধিমান্, সর্বশক্তিমান, তাহা সর্বত্র বিরাজমান।...[১]"

"হ্যাঁ, জাতি-জন্ম নির্বিশেষে, অজ্ঞ, অশক্ত, নরনারী শিশু সকলেই শুনুক ও শিখুক যে, কি শক্তিমান, কি দুর্বল, কি উচ্চ, কি নীচ, প্রত্যেকের মধ্যেই অসীম আত্মা রহিয়াছেন। সুতরাং মহান ও মহৎ হইবার অসীম সম্ভাবনা ও অসীম শক্তি সকলেরই আছে। আসুন, আমরা প্রত্যেকের কাছে ঘোষণা করি, উঠ! জাগো! লক্ষ্য-লাভের আগে আর ঘুমাইও না। উঠ! জাগো! দৌর্বল্যের এই জড়তা হইতে জাগো! প্রকৃতপক্ষে কেহই দুর্বল নহে; আত্মা অসীম, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী। উঠ, দাঁড়াও, নিজেকে জোরের সংগে প্রকাশ করো, তোমাদের মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাঁহাকে ঘোষণা করো, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না!..."[২]

"মানুষ গড়িতে পারে, এমন ধর্ম আমরা চাই।...চারি দিকে মানুষ গড়িতে

১ "আমার অভিযানের পরিকল্পনা" শীর্ষক বক্তৃতা।

২ "বেদান্তের আদর্শ" শীর্ষক বক্তৃতা।

পারে, এমন শিক্ষা আমরা চাই। মানুষ গড়িতে পারে, এমন তত্ত্ব আমরা চাই। এখানেই সত্যের পরীক্ষা—যাহাই তোমাকে দেহে, মনে ও আত্মায় দুর্বল করিবে—তাহাই বিষবৎ পরিত্যাগ করো। সত্য শক্তি দেয়। সত্য-ই শুদ্ধি। সত্য সর্বজ্ঞান।...সত্য শক্তি দিবে, জ্ঞান দিবে, প্রাণ দিবে। যে সকল অতীন্দ্রিয়-বাদ মানুষকে দুর্বল করে, তাহা ত্যাগ করো। শক্তিমান হও।...পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ সত্যই সরল, সহজ—তোমার নিজের অস্তিত্বের মতোই সরল, সহজ।"[১]

"সুতরাং আমার পরিকল্পনা হইল, ভারতে এমন সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করা, যাহা ভারতের ও ভারতের বাহিরের শাস্ত্রগুলিতে যে সকল সত্য লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলিকে প্রচার করিবার জন্য যুবকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। মানুষ চাই। আর সমস্ত কিছুই পাওয়া যাইবে। এখন চাই সবল, সমর্থ, বিশ্বাসী, অকপট, অল্পবয়স্ক মানুষ। এমন এক শত মানুষ পাইলে দুনিয়ার চেহারার আমূল পরিবর্তন হইবে। ইচ্ছাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। ইচ্ছার সম্মুখে সকল কিছুই মাথা নত করে। কারণ, ইচ্ছা ভগবান-প্রদত্ত শক্তি...বিশুদ্ধ বলিষ্ঠ ইচ্ছা সর্বশক্তিমান।"[২]

"যদি বংশগতভাবে পারিয়াদের অপেক্ষা ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্ঞান লাভের প্রতি অধিকতর প্রবণতা থাকে, তবে ব্রাহ্মণদের শিক্ষার জন্য আর অর্থব্যয় করিও না। পারিয়াদের শিক্ষার জন্য সমস্তটুকু ব্যয় করো। দুর্বলকেই দাও, কারণ, দানে তাহার প্রয়োজন আছে। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিলে যদি বুদ্ধিমান হওয়া যায়, তবে বিনা সাহায্যেই ব্রাহ্মণ নিজেকে শিক্ষিত করুক।...আমি ন্যায় ও যুক্তি বলিতে ইহাই বুঝি।"[৩]

"আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য অন্যান্য সকল অর্থহীন দেবতাকেই আমাদের মন হইতে বিদায় দিতে হইবে। একমাত্র জাগ্রত দেবতা হইলেন আমার নিজের জাতি; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, তাঁহার পদ, তাঁহার কর্ণ ব্যাপ্ত রহিয়াছে; তিনি সকল কিছুকেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। অন্যান্য সকল দেবতারা ঘুমাইতেছেন। যে বিরাট ভগবান আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছেন, তাঁহার পূজা না করিয়া আমরা কি অর্থহীন দেবতার পিছনে ছুটিব? আমাদের চতুর্দিকে যাঁহারা আছেন

১ "আমার অভিযানের পরিকল্পনা" শীর্ষক বক্তৃতা।

২ পূর্বোক্ত বক্তৃতা।

৩ 'বেদান্তের আদর্শ" শীর্ষক বক্তৃতা।

—সে বিরাটের পূজাই আমাদের প্রথম পূজা হইবে।...মানুষ ও প্রাণী, ইহারাই আমাদের দেবতা—সর্বপ্রথম আমরা যে যে দেবতাদের পূজা করিব, তাঁহারা হইলেন আমাদের স্বদেশবাসী।...”[১]

* * * * *

এই কথাগুলি কি প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিল, তাহা কল্পনা করুন! ভারতের জনসাধারণের সংগে, বিবেকানন্দের সংগে, কণ্ঠ মিলাইয়া পাঠক-ও প্রায় বলিয়া উঠিবেন ঃ

“শিব!...শিব!”

ঝড় কাটিয়া গেল। দেশের উপর দিয়া বহিয়া গেল এক বারি ও বহ্নির প্লাবন। সেই সংগে আসিল আত্মার শক্তির নিকট, মানুষের মধ্যে যে ভগবান নিদ্রিত আছেন, তাঁহার নিকট এবং তাঁহার অসীম সম্ভবনার নিকট, দুর্জয় এক আবেদন! রেমব্রাণ্ট-খোদিত চিত্রে বর্ণিত ল্যাজারাসের সমাধি পার্শ্বে দণ্ডায়মান যিশুর মতো[২] প্রাচ্যের এই ঋষিকে উর্ধ্ববাহু অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি। মৃতকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য তিনি যে দেহভংগী করিয়াছেন, তাহা হইতে শক্তি উৎসারিত হইয়া পড়িয়াছে।...

কিন্তু মৃত কি জাগিল? তাঁহার বাণীর ধ্বনিতে রোমাঞ্চিত ভারত কি তাহার এই অগ্রদূতের আশায় সাড়া দিল? তাঁহার কলকণ্ঠ, উৎসাহ-উদ্দীপনা কি কার্যে পরিণত হইল? ঐ সময় মনে হইল, সমস্ত আগুন বুঝি কেবল ধোঁয়ায় পরিণত হইয়াছে। দুই বৎসর বাদে বিবেকানন্দ অত্যন্ত তিক্তভাবে ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার বাহিনী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তরুণদলের ফসল ভারত হইতে উঠে নাই। যে জাতি কুসংস্কারের কবলে পড়িয়া স্বপ্নের কবরে ঘুমাইতেছে এবং সামান্যতম প্রচেষ্টার শক্তি-ও হারাইয়া ফেলিয়াছে, একটি মুহূর্তেই সেই জাতিকে দিয়া তাহার অভ্যাসগুলিকে পরিবর্তন করনো সম্ভব নহে। কিন্তু বিবেকানন্দের রূঢ় কশাঘাতে এই সর্বপ্রথম সে তাহার নিদ্রায় পাশ ফিরিল এবং এই সর্বপ্রথম তাহার স্বপ্নের মধ্যে সে ভগবৎ-সচেতন ভারতের সম্মুখপানে অভিযানের তূর্য নিনাদ শুনিতে পাইল। এই তূর্য নিনাদ সে কখনো ভুলিল না। সেদিন হইতে, এই অতিকায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ চলিতে লাগিল। বিবেকানন্দের মৃত্যুর তিন বৎসর

১ “ভারতের ভবিষ্যৎ” শীর্ষক বক্তৃতা।

২ রেমব্রাণ্টের বিখ্যাত খোদাই ‘ল্যাজারাসের পুনর্জন্মের’ কথা বলা হইতেছে।

বাদে তাঁহার বংশধরগণ যদি বাংলায় বিদ্রোহ এবং তিলক ও গান্ধীর আন্দোলনের সূচনা প্রত্যক্ষ করেন, ভারত যদি আজ জনসাধারণের সংঘবদ্ধ কর্মের মধ্যে আপনার সুনির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে, তবে তাহার জন্য সে প্রথম নাড়া পাইয়াছিল মাদ্রাজের সেই শক্তিময় আহ্বানেই :

"ল্যাজারাস, জাগ্রত হও।"

শক্তির এই বাণীর দুটি অর্থ ছিল : একটি জাতীয়, অন্যটি বিশ্বজনীন। এই অদ্বৈতবাদী মহা সন্ন্যাসীর নিকট বিশ্বজনীন অর্থটিই অধিক প্রাধান্য লাভ করিলে-ও, অন্য অর্থটি ভারতের পেশীগুলিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। কারণ, ইতিহাসের সেই মুহূর্তে যে উত্তেজিত দাবী পৃথিবীকে পাইয়া বসিয়াছিল, যাহার ভয়াবহ ফলাফল আমরা আজ প্রত্যেক্ষ করিতেছি, জাতীয়তাবাদের সেই মারাত্মক দাবীর উত্তরে ভারত সেদিন সাড়া দিয়াছিল। সুতরাং, ইহার আরম্ভটা বড়োই বিপজ্জনক ছিল। এরূপ আশংকার কারণ এই ছিল যে, এই উচ্চ আধ্যাত্মিকতাকে বাঁকাইয়া জাতির বা দেশের নিছক জৈব দর্পের এবং তাহার হিংস্র নির্বুদ্ধিতার কাজে লাগানো হইতে পারে। আমরা এই বিপদের কথা জানি। কারণ, আমরা এইরূপ আদর্শকে—সে আদর্শ যতোই বিশুদ্ধ হোক—ঘৃণ্য জাতিদর্পের সেবায় নিয়োজিত হইতে বহুবার দেখিয়াছি। কিন্তু নিজের জাতি ও দেশের সীমার মধ্য আবদ্ধ কোনো ঐক্য চেতনাকে তাহাদের মধ্যে আগে না জাগাইয়া ভারতের এই অসংঘবদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে মানবিক ঐক্যের চেতনা আনা কেমন করিয়া সম্ভব ছিল? একটির পথে অপরটিতে যাইতে হইবে। যাহাই হউক, আমি হইলে কিন্তু তৃতীয় কোন-ও পথ গ্রহণ করিতাম, কোন-ও শ্রমসাধ্য সারাসরি পথ; কারণ, আমার খুব ভালো করিয়াই জানা আছে, যাঁহারা জাতীয়তাবাদের পথ ধরিয়া অগ্রসর হন, তাঁহারা জাতীয়তার পথে চিরদিনই রহিয়া যান। তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসার সমস্ত শক্তিকেই পথে ফুরাইয়া ফেলেন।...কিন্তু বিবেকানন্দ তাহা চান নাই। তিনি এ বিষয়ে গান্ধীর মতোই কেবল মানবতার সেবার সহিত সম্পর্কিত করিয়াই ভারতবর্ষকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি ধর্মীয় মনোভাবের দ্বারা রাজনীতিকে পরিচালিত করিবার যে [illegible] প্রচেষ্টা গান্ধীজী করিয়াছিলেন, বিবেকানন্দের মতো গান্ধীজীর অপেক্ষা সতর্ক কোনো ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করাই ছিল উচিত। কারণ, প্রতিবারেই বিবেকানন্দ—আমরা তাঁহার আমেরিকা হইতে লিখিত পত্রগুলিতে ইতিপূর্বেই

লক্ষ্য করিয়াছি—রাজনীতি ও নিজের মধ্যে একটি উন্মুক্ত তরবারির ব্যবধান রাখিয়াছিলেন।…"রাজনীতির সহিত আমি কোন-ও সম্পর্ক রাখিতে চাহি না।" কিন্তু বিবেকানন্দের মতো কোনো ব্যক্তিকে সর্বদাই নিজের মেজাজ এবং নিজের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। সুতরাং এই দর্পিত ভারতীয় বিবেকান্দের মধ্যে, যিনি বিজয়ী অ্যাংলো-স্যাক্সনদের হাতে বহু নির্বোধ লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন পাইয়াছিলেন, এমন ঘোরতর একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল যে, যাহার ফলে তিনি নিজের ইচ্ছা ও আদর্শের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বে-ও জাতীয়তাবাদের বিপজ্জনক আবেগ-উত্তেজনায় অংশ গ্রহণ না করিয়া পারিলেন না। তাঁহার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিক পর্যন্ত চলিল। ঐ সময় তিনি একদিন একাকী কাশ্মীরের এক কালী মন্দিরে যান (ভারতের ধ্বংসলীলা ও ভারতের দুঃখযন্ত্রণা তাঁহার মনে তখন প্রবল এক আবেগের সৃষ্টি করিয়াছিল)[১] এবং তন্ময়ভাবে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিবেদিতাকে বলেন:

"আমার সমস্ত দেশপ্রেম চলিয়া গিয়াছে।…আমি ভুল করিয়াছিলাম। মা কালী আমাকে বলিলেন, 'এমন কি যদি অবিশ্বাসীরা আমার মন্দিরে আসে, আমার মূর্তিকে অপবিত্র করে, তাহাতে তোমার কি? তুমি আমায় রক্ষা কর, না, আমি তোমায় রক্ষা করি?' সুতরাং, আমার আর দেশপ্রেম নাই। আমি কেবল শিশু হইয়া আছি।"

কিন্তু তাঁহার মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি যে প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার কলধ্বনি ও প্লাবনের গর্জন ভেদ করিয়া কালীর এই তিরস্কারের প্রশান্ত ধ্বনি মানুষের কানে গিয়া পৌছিয়া মানুষের দর্প কমাইল না। মানুষ সেই শ্রোতাবর্গের উত্তাল তরংগের উচ্ছ্বাসের বেগে ভাসিয়া গেল।

১ মুসলমানদের ধ্বংসলীলার ফলে অপবিত্র ও বিধ্বস্ত কালীমন্দিরের দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে হয়: "কেমন করিয়া এ সমস্ত জিনিস মানুষে ঘটিতে দেয়? আমি যদি উপস্থিত থাকিতাম, তবে জীবন দিয়া-ও মাকে রক্ষা করিতাম।" কয়েক দিন পূর্বে-ও ইংরেজদের অসদ্ব্যবহারে তাঁহার মধ্যে জাতিদর্প জাগ্রত হইয়াছিল।

৮

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা

মানুষের সত্যকার নেতা যাঁহারা, তাঁহারা কখনো ছোটখাটো খুঁটিনাটি জিনিসগুলিকে-ও বাদ দেন না। বিবেকানন্দ জানিতেন, তিনি যদি একটি আদর্শ জয় করিবার অভিযানে জনসাধারণের নেতৃত্ব করিতে চান, তবে তাঁহাদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করিলেই হইবে না, তাঁহাদিগকে একটি আধ্যাত্মিক বাহিনীভুক্ত করিতে হইবে। নূতন মানুষের আদর্শরূপে অল্প কয়েকজন নির্বাচিত ব্যক্তিকে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে; কারণ, তাঁহাদের অস্তিত্বই আগামী ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি হিসাবে রহিবে।

এবং এই কারণেই বিবেকানন্দ তাঁহার মাদ্রাজ ও কলিকাতার বিজয়-অভিযান[১] হইতে অবসর পাইয়াই অবিলম্বে আলমবাজারের মঠের দিকে মনোযোগ দিলেন।[২]

তাঁহার গুরুভাইদিগকে তাঁহার নিজের চিন্তার স্তরে তুলিতে তাঁহাকে বেশ বেগ পাইতে হইল। এই গগনবিহারী পক্ষী সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি বহু দূর দিগন্ত নিরীক্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার গুরুভাইরা তখন গৃহে বসিয়া দুরু দুরু চিত্তে ধর্মকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই মহান ভাইকে

১ কলিকাতাতেও তাঁহার অভ্যর্থনায় মাদ্রাজের অপেক্ষা কম সমারোহ হইল না। বিজয়তোরণ রচিত হইল; সংকীর্তন ও নৃত্যগীতের শোভাযাত্রার মধ্যে উৎসাহী ছাত্ররা তাঁহার গাড়ী টানিতে লাগিল; একটি প্রাসাদোপম গৃহ তাঁহাকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইল। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পাঁচ হাজার শ্রোতার সম্মুখে মহানগরীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন জানানো হইল। অতঃপর বিবেকানন্দ তাঁহার দেশপ্রেম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন: এই বক্তৃতায় তিনি উপনিষদের নামে শক্তির প্রশস্তি গাহিলেন এবং যে সব মতবাদ ও কাজ মানুষকে শক্তিহীন করে, তাহার নিন্দা করিলেন।

২ ১৮৯২ খৃস্টাব্দে রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যরা নিজেদিগকে বরানগর হইতে রামকৃষ্ণের সাধনাস্থল দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী আলমবাজারে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহাদের কয়েক জন কলম্বোতে বিবেকানন্দের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম শিষ্য সদানন্দ তাঁহাকে সর্বপ্রথমে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন।

ভালোবাসিতেন, কিন্তু তাঁহাকে ভালো করিয়া বুঝিতেন না। সমাজ ও জাতির সেবার যে নূতন আদর্শ তাঁহার মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল, সে আদর্শ তাঁহাদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। তাঁহাদের গোঁড়া কুসংস্কার, তাঁহাদের ধর্মীয় ব্যষ্টিবাদ, শান্তিপূর্ণ ধ্যান-ধারণার স্বাধীন ও শান্ত জীবন, এ সমস্তকে বিসর্জন দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল; এবং নিতান্ত অকপট চিত্তেই তাঁহাদের এই ধর্মীয় স্বার্থপরতার সমর্থনে নানারূপ পবিত্র যুক্তি আবিষ্কার করিতে কোনো অসুবিধা-ও হইল না। এমন কি, তাঁহারা তাঁহাদের গুরুদেব রামকৃষ্ণের এবং জাগতিক ব্যাপারে তাঁহার নির্লিপ্তির উদাহরণও দিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ নিজেকে রামকৃষ্ণের গভীরতম চিন্তার প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মাদ্রাজ ও কলিকাতায় প্রদত্ত তাঁহার জ্বালাময় বক্তৃতাগুলিতে[১] তিনি কেবলই অবিরাম রামকৃষ্ণের উল্লেখ করিতেছিলেন: "আমার গুরু, আমার আদর্শ, আমার নেতা, এ জীবনে আমার ভগবান।" নিজেকে তিনি পরমহংসের বাণীবাহক বলিয়া দাবী করিলেন এবং এমন কি, তিনি নূতন কিছু চিন্তা বা চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন, এইরূপ কোনো গৌরব গ্রহণ করিতে-ও চাহিলেন না। তিনি রামকৃষ্ণের বিশ্বস্ত ভৃত্য, তাঁহারই আদেশ হুবহু পালন করিতেছেন, এইরূপ দাবী জানাইলেন:

"চিন্তায়, কথায় বা কাজে আমি যদি কিছু করিয়া থাকি, জগতে কাহারও কোনো উপকার হইয়াছে, এমন কোনো কথা যদি আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার নহে; তাহা তাঁহার।···যাহা কিছু দুর্বলতা, তাহা আমাব, আর যাহা কিছু জীবনদায়ক, শক্তিদায়ক, শুদ্ধ ও পবিত্র, তাহা তাঁহারই প্রেরণা হইতে, তাঁহারই বাণী হইতে, তাঁহা হইতেই আসিয়াছে।"

যে রামকৃষ্ণ তাঁহার বিস্তারিত পক্ষপুটে তাঁহার নীড়স্থ শিশুদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং যে রামকৃষ্ণ তাঁহার মহান শিষ্যের মধ্যে ঐ বিশাল পক্ষ সঞ্চার করিয়া সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দু'জনের দ্বন্দ্ব ছিল অনিবার্য। কিন্তু এই দ্বন্দ্বে কাহার জয় হইবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। তাহা পূর্ব হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল। এই তরুণ বিজয়ীর বিপুল প্রতিপত্তি, তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা এবং ভারতবাসীর নিকট তাঁহার মর্যাদাই একমাত্র ইহার কারণ ছিল না; তাঁহার প্রতি গুরুভাইদের এবং স্বয়ং রামকৃষ্ণের

[১] "ভারতের ঋষিরা" (মাদ্রাজ) এবং "বেদান্তের বিকাশ" (কলিকাতা) বক্তৃতাগুলি।

ভালোবাসাও তাহার পশ্চাতে ছিল। ঠাকুর যে তাঁহাকেই নেতা নির্বাচন করিয়া গিয়াছিলেন।

সুতরাং বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে যেমন আদেশ করিলেন, তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে সেগুলির সহিত একমত না হইলে-ও সেগুলিকে পালন করিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় শিষ্যদিগকে তাঁহাদের সংঘে লইতে এবং সেবা ও সামাজিক সাহায্যের আদর্শকে গ্রহণ করিতে তিনি তাঁহাদিগকে বাধ্য করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিজের কথা এবং নিজের মোক্ষের কথা ভাবিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, তিনি সন্ন্যাসীদের এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টির জন্য আসিয়াছেন। এই সন্ন্যাসীরা প্রয়োজন হইলে অপরকে উদ্ধারের জন্য নরকে-ও যাইবেন।[১] অসুর্বর ভগবানের নির্জন উপাসনা যথেষ্ট করা হইয়াছে! এখন জীবন্ত ভগবানের, সমাসন্ন ভগবানের, যিনি সমস্ত জীবাত্মার মধ্যে আছেন, সেই বিরাট ভগবানের পূজা করিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যে "ব্রহ্ম সিংহ" সুপ্ত আছেন, তাঁহাদের আহ্বানে তিনি জাগ্রত হইবেন![২]

এই তরুণ গুরুর নির্দেশগুলির মধ্যে এমন একটি আশু প্রয়োজনের সুর ছিল যে, তাঁহার গুরুভাইরা,—তাঁহাদের অনেকেই বিবেকানন্দের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন,—তাঁহার কথাগুলিকে প্রকৃত বিশ্বাস করার আগেই সম্ভবত তাঁহার কথামত কাজ করিতেছিলেন।[৩] এই আশ্রমগৃহ ত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত যিনি সর্বপ্রথম স্থাপন করিলেন, তাঁহার পক্ষে উহা সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক ছিল। কারণ, এই সুদীর্ঘ বারো বৎসরের একটি দিন-ও তিনি এই আশ্রম গৃহ ত্যাগ করেন নাই। তিনি রামকৃষ্ণানন্দ। তিনি মাদ্রাজে গিয়া দক্ষিণ ভারতে বেদান্তের মূলনীতি প্রচারের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন্ করিলেন। তাঁহার পর যিনি গেলেন, সেবার মনোভাব তাঁহার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করিয়াছিল। ইনি অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর)।

১ সেই সংগে তিনি এই ধর্মশাস্ত্রগত যুক্তিটি যোগ করিয়া দেন: "নিজের মুক্তির কথা ভাবা কোন অবতারের (রামকৃষ্ণ তাঁহাদের চোখে অবতার ছিলেন) শিষ্যের পক্ষে উপযুক্ত নহে। কারণ, তাঁহারা যে অবতারের শিষ্য, কেবল ইহাই তাঁহাদের মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট। (সম্ভবত দুর্বলের পক্ষে এই ধরণের যুক্তির উপযোগিতা ছিল; কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে উহা ভক্তি সাধনার মূল্যকে হ্রাস করিয়া দেয়।)

২ এই কথাগুলি বিবেকানন্দ চারজন তরুণ শিষ্যের দীক্ষার সময়ে বলিয়াছিলেন।

৩ আমরা পরে একটি করুণ দৃশ্যে কতকগুলি অনুযোগ শুনিব। তাঁহারা এই অনুযোগগুলি কখনো থামান নাই।

মুর্শিদাবাদে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। অখণ্ডানন্দ সেখানে গিয়া আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।[১]

প্রথমে ভারতের বিপুল জনসাধারণের সেবার জন্য বিভিন্ন পথ ইতস্তত পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল।

কিন্তু চিরদিনের জন্য কোন সুব্যবস্থিত একটি পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে বিবেকানন্দ অত্যন্ত উদ্‌বেগ অনুভব করিতেছিলেন। আর একটি দিন-ও নষ্ট করা চলিবে না। ভারতে আসিয়া প্রথম কয়েক মাসে জনসাধারণকে জাগ্রত করিবার জন্য তাঁহার যে অতি-মানবিক শক্তির ব্যয় হইয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার রোগের কঠিন আক্রমণ দেখা দিল। ঐ বৎসর বসন্ত কালে বিশ্রামের জন্য দুই বার তাঁহাকে পাহাড়ে যাইতে হইল—প্রথম বার কয়েক সপ্তাহের জন্য দার্জিলিঙে, এবং দ্বিতীয়বার আড়াই মাসের জন্য (৬ই মে হইতে জুলাইএর শেষ পর্যন্ত) আলমোড়ায়

ইহার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি একটি নূতন সম্প্রদায়ের—রামকৃষ্ণ মিশনের—প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে জন্য যে শক্তি প্রয়োজন ছিল, তাহা তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এই সম্প্রদায় আজ-ও তাঁহার কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

* * * * *

১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ১লা মে তারিখে রামকৃষ্ণের সমস্ত আশ্রমিক এবং অনাশ্রমিক শিষ্যদিগকে অন্যতম শিষ্য বলরামবাবুর বাড়িতে আহ্বান করা হইল।- বিবেকানন্দই গুরু হিসাবে কথাগুলি বলিলেন। তিনি বলিলেন, কোন সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী কিছু করা সম্ভব নহে। সাধারণতান্ত্রিক নিয়মে সকলের বলিবার সমান অধিকার থাকে এবং অধিকাংশের মত অনুসারে কোন্-ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ভারতের বর্তমান অবস্থায় এইরূপ নিয়ম অনুসারে কোন প্রতিষ্ঠান গড়িতে যাওয়া বিচক্ষণতার পরিচয় হইবে না। সদস্যরা যখন নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সংস্কারকে জনসাধারণের মংগলের জন্য বিসর্জন দিতে শিখিবেন, তখনই ঐ নিয়ম প্রয়োগের উপযুক্ত সময় আসিবে। এখন সাময়িক ভাবে একজন একনায়কের প্রয়োজন হইবে। তাহা ছাড়া, তিনি-ও তাঁহাদের মতোই তাঁহাদের সকলের গুরু রামকৃষ্ণের ভৃত্য হিসাবেই—তাঁহারই নামে ও নির্দেশে—কাজ করিবেন।

১. ইনিই ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে বিবেকানন্দের কথাগুলি শুনিয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তখন ক্ষেত্রীতে গিয়া জনসাধারণের শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া সেবার কাজ শুরু করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের চেষ্টাতেই নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল[১]:

১। "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

২। ইহার উদ্দেশ্য হইবে মানুষের মঙ্গলের জন্য রামকৃষ্ণ যে সকল সত্যকে প্রচার করিয়াছিলেন, নিজের জীবনে প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, এবং অন্যকে তাঁহাদের জীবনে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োগ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের প্রচার করা।

৩। ইহার কর্তব্য হইবে "বিভিন্ন ধর্মকে চিরন্তন ধর্মের বিভিন্ন রূপমাত্র জানিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সৌভ্রাত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য" রামকৃষ্ণ যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, উপযুক্ত মনোভাবের সহিত তাহার কার্যাবলীকে পরিচালিত করা।

৪। ইহার কর্মরীতি হইবে: (১) জনসাধারণের দৈহিক ও মানসিক মঙ্গলের অনুকূলে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার পক্ষে লোককে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগকে তৈয়ারি করা; (২) শিল্প ও চারুকলার উন্নতি করা ও সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া; (৩) সাধারণ বৈদান্তিক ও অন্যান্য ধর্মীয় ভাবগুলি রামকৃষ্ণের জীবনে যেরূপ অর্থ লাভ করিয়াছিল, সেই অর্থে সেগুলির প্রবর্তন ও প্রচার করা।

৫। ইহার কর্মের দুইটি শাখা থাকিবে: প্রথমটি হইবে ভারতীয়: "অন্যের শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন এইরূপ" সন্ন্যাসী ও সংসারী শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশে মঠ ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। দ্বিতীয়টি হইবে বিদেশীয়: ইহা আধ্যাত্মিক কেন্দ্র স্থাপন করিতে, "বিদেশীয় ও ভারতীয় কেন্দ্রগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং পারস্পারিক সাহায্য ও সহানুভূতির মনোভাব গড়িয়া তুলিতে" ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে সংঘের সদস্যগণকে পাঠাইবে।

৬। "মিশনের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ও মানবিকতাবাদী হওয়ায় ইহার সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকিবে না।"

বিবেকানন্দ যে ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে সুনির্দিষ্ট সামজিক মানবিকতাবাদ ও "সর্বমানবিক" প্রচারের দিকটি সুস্পষ্ট। অধিকাংশ ধর্মেই আধুনিক জীবনের প্রয়োজন, অভাব-অভিযোগ এবং যুক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বাসকে তুলিয়া

একটি সংক্ষিপ্তসার দিলে-ই যথেষ্ট হইবে মনে করি।

ধরা হয়। কিন্তু বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সম্প্রদায় বিজ্ঞানের সহিত বিশ্বাসকে সমান মর্যাদা দিল। ইহা বস্তুগত ও মানসগত, উভয় রূপ প্রগতির সহিতই সহযোগিতা করিবে এবং কলা ও শিল্পসমূহকে উৎসাহ দিবে। কিন্তু ইহার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের মংগল করা। সকল ধর্মের সামঞ্জস্য বিধানই চিরন্তন ধর্ম। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সৌভ্রাত্র্য স্থাপনই এই সম্প্রদায়ের ধর্ম-বিশ্বাসের মূলকথা, ইহা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন। রামকৃষ্ণের বিরাট হৃদয় তাঁহার প্রেমের মধ্যে সমস্ত মানবতাকেই আলিঙ্গন করিয়াছিল। তাই রামকৃষ্ণের পতাকাতলেই তাঁহারা সমস্ত কিছু করিতে লাগিলেন।

সেই "পবিত্র হংস" উড্ডীয়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষের প্রথম আঘাত পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যদি কোনা পাঠক এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার মনের পরিপূর্ণ গগন বিহারের স্বপ্নটিকে লক্ষ্য করিতে চান, তবে তিনি তাহা বিবেকানন্দ ও শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকারের মধ্যে লক্ষ্য করিবেন।[১]

এখন পরবর্তী কর্তব্য ছিল শীর্ষস্থানীয়দিগকে নির্বাচিত করা। সাধারণ সভাপতি বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি এবং যোগানন্দকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করিলেন। তাঁহারা বলরামবাবুর বাড়িতে প্রতি রবিবার মিলিত হইবেন স্থির হইল।[২] অতঃপর আর বিলম্ব না করিয়া তিনি জনসাধারণের সেবা ও বেদান্ত শিক্ষার বিবিধ কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।[৩]

সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে মানিয়া চলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অনুসরণ করা

১ বেলুড়ে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে।

২ এই ব্যবস্থা দুই বৎসর ছিল। ১৮৯৮-এর এপ্রিল মাসে কলিকাতার নিকটে বেলুড়ে সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় মঠের গৃহ-নির্মাণ শুরু হয়। ঐ বৎসর ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গৃহ উৎসর্গ করা হয় এবং ১৮৯৯ খৃস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে অবশেষে ঐ গৃহ ব্যবহার করা হয়। সংঘটি দুইটি যমজ প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত হয়। সেগুলির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল: প্রথমটি ছিল—রামকৃষ্ণ মঠ; ইহা মঠ ও আশ্রমগুলি সহ একটি আশ্রমিক প্রতিষ্ঠান; ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে ইহা ইহার বৈধ মর্যাদা লাভ করে; সার্বজনীন ধর্মের রক্ষা ও বিশুদ্ধ-প্রচার এই প্রতিষ্ঠানের ব্রত হয়। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি ছিল—রামকৃষ্ণ মিশন; ইহার উপরে মানবহিতৈষী ও দাতব্য উভয় প্রকার জনসেবার কাজেরই তত্ত্বাবধানের ভার থাকে; ধার্মিক ও সাধারণ উভয় প্রকার মানুষের কাছেই উহা উন্মুক্ত ছিল; উহার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল মঠের সভাপতি ও অছিদের উপর। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর, ১৯০৯ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে, উহাকে আইন সংগতভাবে রেজিস্টার্ড করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান দুইটি যেমন সগোত্র ও সম্পর্কিত, তেমনি পৃথক।

৩ তিনি নিজে তাঁহার গুরু ভাইদের শিক্ষা দেন ও বেদান্তের আলোচনাগুলি আরম্ভ করেন। এখানে-ও তিনি তাঁহার প্রাচীন মতবাদগুলির প্রতি তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রীতি থাকা সত্ত্বে-ও তাঁহার

তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তাই মাঝে মাঝে খুব সজীব তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। অবশ্য, তাঁহাদের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক কখনো ক্ষুণ্ণ হইল না। বিবেকানন্দের আবেগ ও রসিকতার শক্তি সকল সময় সংযমের সীমা মানিত না। কারণ, সেগুলি তাঁহার মধ্যস্থিত সুপ্ত ব্যাধির ফলে অতি-বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠিত। তাই তাঁহারা যখন তাঁহার প্রতিবাদ করিতেন, তখন তাঁহারা তাঁহার থাবার আঁচড় অনুভব করিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা কিছু মনে করিতেন না। এগুলি ছিল কেবল "রাজার খেলা"।[১] দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ ও নিষ্ঠা সম্পর্কে ছিলেন নিঃসংশয়।

মাঝে মাঝে তাঁহারা 'তাঁহাদের' ভাবোন্মাদনার রাজা রামকৃষ্ণ এবং তাঁহাদের ধ্যানময় জীবনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। রামকৃষ্ণ মিশনকে আবার ধ্যানময় নিষ্ক্রিয়তাময় একটি পূজা মন্দিরে পরিণত করিয়া ফেলিতেই তাঁহাদের হয়তো ভালো লাগিত। কিন্তু বিবেকানন্দ কঠোরভাবে তাঁহাদের সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলেন:

"তোমরা কি রামকৃষ্ণকে তোমাদের নিজের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাও?...রামকৃষ্ণ যতো বড়ো ছিলেন বলিয়া রামকৃষ্ণের শিষ্যরা বুঝিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা তিনি অনেক বড়ো ছিলেন।[১] তিনি অসীম আধ্যাত্মিক ভাবধারার মূর্ত প্রকাশ—সে ভাবধারাগুলি অসংখ্যভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে। তাঁহার মধুর আশীষ-ভরা চক্ষের একটি দৃষ্টিপাতেই একটি মুহূর্তেই এমন লক্ষ বিবেকানন্দ জন্মিতে পারিত। আমি তাঁহার চিন্তাকে সমস্ত পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করিতে চাই।..."

মানুষ রামকৃষ্ণ তাঁহার কাছে প্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাণী ছিল তাঁহার কাছে

মানসিক উদারতার পরিচয় দেন; তিনি আর্য ও জেনটাইলদের মধ্যে পার্থক্য বিধানকে অজ্ঞতা বলিয়া বর্ণনা করেন। ম্যাক্স্‌মুলারের মতো ব্যক্তির মধ্যে প্রাচীন বৈদিক টীকাকারদের পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করিতে তিনি ভালোবাসিতেন।

১ লা ফঁতেন-রচিত একটি নীতিকথার কথা বলা হইতেছে।

২ রামকৃষ্ণকে এই ধর্মীয় স্বার্থপরতা ও ধ্যানমগ্ন আলস্যের দৃষ্টান্ত বলিয়া দাবী করিতে না দিয়া বিবেকানন্দ ঠিকই করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য-স্মরণীয় যে, রামকৃষ্ণ নিজে-ও তাঁহার ভাবোন্মাদ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করিতেন। কারণ, এ ভাবোন্মাদনার জন্য তিনি অপরকে উপযুক্তরূপে সাহায্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার একটি প্রার্থনা ছিল: "আমি যদি একটি মাত্র মানুষের-ও কাজে আসি, তবে যেন আমি বারে বারে জন্মি। কুকুর হইয়া জন্মিলে-ও ক্ষতি নাই।..."

তাহার অপেক্ষা আরো প্রিয়। একটি নূতন ভগবানের বেদী রচনাই[১] রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি মানবজাতিকে তাঁহার চিন্তার অমৃত পরিবেশন করিতে চাহিয়া ছিলেন—যে চিন্তা সর্বাগ্রে ও সর্বাপেক্ষা আত্মপ্রকাশ করিবে কর্মের মধ্যে। "ধর্মকে প্রকৃত ধর্ম হইতে হইলে কার্যত প্রয়োগশীল হইতে হইবে।[২] তাহাছাড়া, তাঁহার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ছিল "জীবিতের মধ্যে, বিশেষত দরিদ্রের মধ্যে শিবকে প্রত্যক্ষ করা।" তিনি চাহিতেন, প্রতি দিন প্রত্যেকে এক জন, পাঁচ জন, দশ জন, যাহার যেমন শক্তি, ক্ষুধিত নারায়ণকে, খঞ্জ নারায়ণকে, অন্ধ নারায়ণকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া তাহাদের মুখে অন্ন দিক, মন্দিরে গিয়া শিব বা বিষ্ণুর যেমন পূজা করে, সেইভাবে পূজা করুক।[৩]

তাহাছাড়া কোনরূপ ভাবপ্রবণতা যাহাতে না ঢুকিয়া পড়ে, সে বিষয়ে-ও তিনি যথেষ্ট সতর্ক হন। কারণ, সকল প্রকার ভাবপ্রবণতাকেই তিনি অপছন্দ করিতেন। বাংলায় ভাবপ্রবণতা অতি সহজেই ছড়াইয়া পড়িবার একটি ঝোঁক ছিল এবং এই ভাবপ্রবণতার ফলে বাংলার সৃজনী শক্তির শ্বাসরোধ হইয়াছিল। ভাবপ্রবণতা সম্পর্কে বিবেকানন্দ অটল রহিলেন। তিনি এমন কঠোরভাবে অটল রহিলেন যে, তাঁহার কর্তব্য আরম্ভ করিবার পূর্বে তাঁহার নিজের এবং অপর সকলের মধ্য হইতে ভাবপ্রবণতাকে উৎসাদিত করিতে হইল। (নিম্নলিখিত দৃশ্যটিতে ইহার করুণ একটি সাক্ষ্য মিলে।)

একদিন তাঁহার এক সন্ন্যাসী গুরু-ভাই ঠাট্টাচ্ছলে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন যে, তিনি রামকৃষ্ণের ভাবোচ্ছ্বসিত বাণীর মধ্যে পাশ্চাত্যের সংঘ, কর্ম ও সেবার ভাবগুলিকে ঢুকাইয়াছেন। এই সমস্ত ভাবের প্রতি রামকৃষ্ণের কোন-ও সমর্থন ছিল না। বিবেকানন্দ প্রথমে শ্লেষের সহিত ইহার জবাব দেন এবং একটু রূঢ় রসিকতার সংগেই তাঁহার প্রতিবাদীকে এবং প্রতিবাদীর মধ্য দিয়া অন্যান্য

১ "আগেই দুনিয়া ধর্মসম্প্রদায়ে ভরিয়া গিয়াছে। এ দুনিয়ায় নূতন কোনো ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে আমি জন্মি নাই।" ঠিক এই কথাগুলিই বলিয়াছিলেন।

২ ১৮৯৭ খ্রস্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পাঞ্জাবে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু ছিল ইহাই।

৩ লাহোরে এক জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা। ইউরোপীয়রা দাতব্য বলিতে যাহা বুঝেন: "লও এবং লইয়া সরিয়া পড়ো", সেরূপ দাতব্যের প্রশ্নই উঠে না। তাহা দান সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা, যে দেয় এবং যে লয়, উভয়েরই তাহাতে ফল খারাপ হয়। বিবেকানন্দ তাহার প্রতিবাদ করেন। "সেবা ধর্মে" —সেবা বলিতে তিনি যেমনটি বুঝিতেন—"গ্রহীতা দাতার অপেক্ষা বড়ো"; কারণ, সাময়িকভাবে গ্রহীতা স্বয়ং ভগবান।

শ্রোতাদিগকে (কারণ তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে, এই বক্তার পিছনে তাঁহাদের-ও সমর্থন আছে) বলেন:

"তোমরা অজ্ঞ। তোমরা কি জান?...প্রহ্লাদের 'ক' অক্ষর দেখিয়া কৃষ্ণকথা মনে পড়িয়াছিল এবং চোখের জলে চোখ ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি আর কিছুই পড়িতে পারেন নাই। সেখানেই তাঁহার পড়াশুনা শেষ হইয়াছিল। তোমাদের হইয়াছে সেই রূপ।...তোমরা এক এক জন ভাবপ্রবণ নির্বোধ! তোমরা ধর্মের কি বোঝ? তোমরা কেবল হাঁত জোড় করিয়া প্রার্থনা করিতেই জান, বলিতে পার: 'প্রভু হে! তোমার নামটি কি সুন্দর! চোখ দুটি কি মধুর!' ইত্যাদি যত আজেবাজে কথা।...আর তোমাদের ধারণা, তোমাদের মোক্ষ তো হইয়াই আছে, শেষ সময় যখন আসিবে, তখন রামকৃষ্ণ আসিয়া হাত ধরিয়া বৈকুণ্ঠে পৌছাইয়া দিবেন।...তোমাদের মতে, পড়াশুনা করা, জনসভায় বক্তৃতা করা, মানুষের সেবা করা, এ সমস্ত মায়া। কারণ, রামকৃষ্ণ কাহাকে যেন বলিয়াছিলেন, 'প্রথমে ভগবানের সন্ধান কর, সাক্ষাৎ পাও; দুনিয়ার কোনো ভালো কাজ করা স্পর্ধার কথা!'...যেন ভগবানকে পাওয়া এতোই সহজ ব্যাপার! যেন ভগবান এমনই নির্বোধ যে, তিনি নির্বোধের খেলার জন্যে নির্বোধের হাতে নিজেকে ছাড়িয়ে দেন!"

তার পর তিনি অকস্মাৎ বলিয়া উঠেন:

"তোমাদের ধারণা, তোমরা রামকৃষ্ণকে আমার অপেক্ষা ভালো বুঝিয়াছ! তোমরা মনেকর, মনের সকল কোমল প্রবৃত্তিকে খুন করিয়া নীরস শুষ্ক পথেই 'জ্ঞান' লাভ করা যায়! তোমাদের ভক্তি হইল বুদ্ধিহীন ভাবপ্রবণতা, যাহা মানুষকে অক্ষম করিয়া তুলে। তোমরা রামকৃষ্ণকে যেমনটি বুঝিয়াছ, তেমনটি করিয়াই তাঁহাকে প্রচার করিতে চাও। আর বুঝিয়াছ-ও অতি-সামান্যই! ওসব রাখ! কে 'তোমাদের' রামকৃষ্ণকে চায়? তোমাদের ঐ ভক্তি ও মুক্তিতে কাহার কি আসে যায়? শাস্ত্র কি বলিয়াছে, না বলিয়াছে, তাহাতে কাহার কি বহিয়া গেল? আমি যদি তমোগুণে নিমজ্জিত আমার দেশবাসীকে জাগাইতে পারি, তাহাদিগকে নিজের পায়ে দাঁড় করাইতে পারি, এবং কর্মযোগের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়া 'মানুষ' করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমি হাজার বার হাসিমুখে নরকে-ও যাইতে প্রস্তুত।...আমি রামকৃষ্ণের বা অন্য কাহারও গোলাম নই; যে-ই নিজের ভক্তি ও মুক্তির কথা ভুলিয়া অপরের সেবা করিবে, সাহায্য করিবে, আমি কেবল তাহারই দাসত্ব করিব।"

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, তাঁহার চক্ষু দীপ্ত ও মুখমণ্ডল অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল। অকস্মাৎ তিনি ছুটিয়া নিজের ঘরে পলাইয়া গেলেন।• অন্যরা সকলে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। কয়েক মিনিট বাদে তাঁহাদের দু'একজন উঠিয়া গিয়া তাঁহার ঘরে উঁকি দিয়া দেখিলেন। বিবেকানন্দ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আছেন। তাঁহারা নীরবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখনো তাঁহার দেহে প্রবল ঝটিকার চিহ্নগুলি বিদ্যমান ছিল; তবে তিনি ইতিমধ্যেই শান্ত ভাব আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ধীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন:

"যখন কেহ ভক্তিকে আয়ত্ত করে, তখন তাহার হৃদয় ও স্নায়ুগুলি এমন কোমল ও অনুভূতিপ্রবণ হইয়া উঠে যে, ফুলের স্পর্শ-ও তাহার সহ্য হয় না! তোমরা কি জানো যে, আজকাল আমি একখানা উপন্যাস পর্যন্ত পড়িতে পারি না? আমি বেশিক্ষণ রামকৃষ্ণের কথা ভাবিতে বা বলিতে পারি না, অভিভূত হইয়া পড়ি। তাই আমি আমার মধ্যকার ভক্তির এই প্রবল উচ্ছ্বাসকে কেবলই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। জ্ঞানের লোহার শিকলে আমি কেবলই নিজেকে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছি। কারণ, আমার মাতৃভূমির জন্য আমার কাজ এখনো শেষ হয় নাই; জগতের কাছে আমার বাণী এখনো সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে নাই। তাই যখনই আমি দেখি যে, ভক্তির ভাবগুলি উপরের দিকে উঠিয়া আমাকে টলাইয়া দিতেছে, তখনই সেগুলিকে আমি কঠিন আঘাত দিই। তখন কঠোর জ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে অটল করিয়া তুলি। আমার যে অনেক কাজ পড়িয়া আছে! আমি যে রামকৃষ্ণের দাস, তিনি যে আমাকে দিয়া করাইয়া লইবার জন্য তাঁহার কাজ ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন! সে কাজ যতোক্ষণ না শেষ করিতে পারি, ততোক্ষণ তিনি আমাকে বিশ্রাম দিবেন না!...তিনি যে আমাকে কতো ভালবাসেন!..."

আবার বিবেকানন্দ আবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। যোগানন্দ তাঁহার চিন্তাকে অন্যদিকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কারণ, বিবেকানন্দ আবার উচ্ছ্বসিতভাবে কিছু বলিতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহারা এইরূপ আশংকা করিতেছিলেন।[১]

সেই দিন হইতে আর কেহ বিবেকানন্দের রীতির বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন

১ The Life of Swami Vivekenanda, ৩য় খণ্ড, ১৫৯-১৬১ পৃষ্ঠা।

নাই। তিনি নিজে ভাবেন নাই, এমন কি যুক্তিই বা তাঁহারা দেখাইতে পারিতেন? তাঁহারা তাঁহার বিশাল বিক্ষুব্ধ আত্মার গভীরে কি আছে, তাহা বুঝিয়াছিলেন।

* * * * *

প্রত্যেক আদর্শ প্রচারের মধ্যেই নাটকীয়তা আছে। কারণ, যিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহার, তাঁহার প্রকৃতির একাংশের, তাঁহার বিশ্রামের, তাঁহার স্বাস্থ্যের, এমন কি তাঁহার গভীরতম উচ্চাশার বিনিময়ে ইহা করিতে হয়। তাঁহার দেশবাসীরা ভগবানকে যে ভাবে দেখেন, বিবেকানন্দ-ও অনেকখানি সেই ভাবেই দেখিতেন। ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীদের মতো জীবন ও সংসার হইতে পলায়ন করিবার তাঁহারও প্রয়োজন ছিল। ধ্যানের জন্যই হউক, পড়াশুনার জন্যই হউক, কিম্বা সর্বব্যাপী আত্মার সহিত যোগাযোগ যাহাতে ক্ষণকালের জন্য-ও বিচ্ছিন্ন না হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রেমোন্মাদনায় তাড়িত, নির্লিপ্ত ও চিরঞ্চল আত্মার চিরন্তন উধ্ব প্রয়াণের জন্য-ই হউক, যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই তাঁহার অন্তরের গভীর হইতে ক্লান্তি ও শোচনার দীর্ঘশ্বাস পড়িতে শুনিতেন।[১] কিন্তু তিনি তো তাঁহার জীবনের পথ বাছিয়া লন নাই। পথই তাঁহাকে বাছিয়া লইয়াছিল।

১ "আমি নির্জন শান্ত অবকাশে কেবল পড়াশুনা লইয়া জীবন কাটাইবার জন্য জন্মিয়াছিলাম। কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ। তবু এখনো সেই ঝোঁকটা রহিয়া গিয়াছে।..." (৩রা জুন, ১৮৯৭, আলমোড়া)।

মাঝে মাঝে তিনি ধর্মভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার "তখন কাজকে মায়ার অধিক বলিয়া মনে হইত।" (অক্টোবর, ১৮৯৮)।

একদিন তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্যতম সন্ন্যাসী বিরজানন্দকে ধ্যানলোকের মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে উপযোগী কোনো কর্মে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত তর্ক করিতেছিলেন। তর্কের সময় যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্তি প্রকাশ পাইতেছিল:

"ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করিবার কথা তুমি কেমন করিয়া ভাবিতে পারো? যদি পাঁচ মিনিট, এমন কি এক মিনিট, তুমি মনঃসংযোগ করিতে পারো, তাহাই যথেষ্ট। বাকী সময়টা সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য পড়াশুনা ও কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকা উচিত।"

বিরজানন্দ বিবেকানন্দের সহিত একমত হইতে পারেন না এবং নীরবে চলিয়া যান। বিবেকানন্দ অপর একজন সন্ন্যাসীকে বলেন: "তাঁহার সমগ্র জীবনে সর্বাপেক্ষা আনন্দের ও মাধুর্যের যাহা কিছু ছিল, পরিব্রাজক অবস্থার দিনগুলির স্মৃতি ছিল সেগুলির অন্যতম। লোক সমাজের এই কষ্ট ও কর্মব্যস্ততা হইতে মুক্ত হইয়া সেই অজ্ঞাতের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পাইলে তিনি সকল কিছুই ত্যাগ করিতে পারিতেন।" (১৩ই জানুয়ারি, ১৯০১)। *

"আমার জন্য কোনো বিশ্রাম নাই। রামকৃষ্ণ যাহাকে কালি বলিতেন, রামকৃষ্ণের ইহলোক ত্যাগের তিন-চার দিন পূর্বে তাহা আমার দেহ ও মনকে অধিকার করিয়াছে, আমাকে কেবলই কাজ করিতে, নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন লইয়া বিন্দুমাত্র ব্যস্ত না হইতে বাধ্য করিতেছে।[১]

ইহাই তাঁহাকে অপরের মঙ্গলের জন্য নিজের কথা, নিজের বাসনা-কামনার কথা, নিজের মঙ্গলের কথা, এমন কি, নিজের স্বাস্থ্যের কথা-ও ভুলাইয়াছে।[২]

এবং এই আদর্শ ও বিশ্বাসকে তাঁহার প্রচারক বাহিনীর মধ্যে-ও সঞ্চার করিবার প্রয়োজন ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কর্মশক্তিকে জাগাইয়া দিয়াই কেবল তাহা সম্ভব ছিল। যে-জাতিকে লইয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইতেছিল, তাহা ছিল ভাবপ্রবণ ও অজীর্ণ-ব্যাধিগ্রস্ত এক জাতি।[৩] এই কারণেই তিনি তাঁহাদিগকে

১ মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি অন্যতম শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত আলাপ করিবার সময়ে তাঁহাকে রামকৃষ্ণের মৃত্যুর তিন-চার দিন পূর্বে তাঁহার মধ্যে কী এক দুর্বোধ্য সংক্রমণ ঘটিয়াছিল, তাহা বলেন :

"রামকৃষ্ণ আমাকে একা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন। তিনি আমার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। এই সময়ে তিনি সমাধিস্থ হইলেন। অকস্মাৎ-স্পৃষ্ট তড়িৎ-প্রবাহের মতো দুর্বোধ্য এক শক্তির প্রবাহ আমার দেহে খেলিয়া গেল। কি যেন আমার দেহ ভেদ করিয়া গেল। আমি-ও অচৈতন্য হইলাম।...কতক্ষণ আমি এইভাবে ছিলাম জানি না।...যখন চেতনা ফিরিল, দেখিলাম, ঠাকুর কাঁদিতেছেন। তিনি অসীম স্নেহ ও কোমলতার সহিত বলিলেন : 'নরেন রে, আজ আমি ফকির হইয়া গিয়াছি। আমার আর কিছুই নাই। যাহা ছিল সব কিছুই তোকে দিয়াছি। ইহা দিয়া তুই জগতে অনেক বিরাট কাজ করিবি। তাহার আগে এই শক্তি তুই ফিরাইয়া দিতে পারিবি না।...' আমার মনে হয়, এই শক্তিই আমাকে ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছে এবং আমাকে ক্রমাগত কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছে।..."

২ দেশের মঙ্গল করিবার জন্য যদি আমাকে নরকের মধ্য দিয়াও যাইতে হয়, তাহাকেও আমি মহা সম্মান মনে করিব।" (অক্‌টোবর, ১৮৯৭)

"সন্ন্যাসীরা দুইটি ব্রত গ্রহণ করেন : (১) সত্যকে উপলব্ধি করা ; (২) জগৎকে সাহায্য করা। সর্বোপরি তাঁহারা স্বর্গ-সুখের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন।" (নিবেদিতাকে, জুলাই, ১৮৯৯)।

ভারতীয় চিন্তাধারায় স্বর্গলাভকে ব্রহ্মলাভের নিম্নে স্থান দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন আছে।

৩ "একটি অজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত জাতি, যে জাতি খোল-করতাল বাজাইয়া, কীর্তন ও অন্যান্য ভাবপ্রবণ গান গাহিয়া অদ্ভুত সকল ক্রিয়াকাণ্ডের প্রশ্রয় দেয়।...আমি এমন কি সামরিক শক্তির সাহায্যে শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে এবং যাহা কিছু অবসন্ন ভাবপ্রবণতার জন্ম দেয়, তাহাকে নিষিদ্ধ করিতে চাই।..." (শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত আলাপ, ১৯০১)।

শক্ত করিয়া তুলিবার জন্য মাঝে মাঝে কঠোর হইতে পারিতেন। তিনি "কর্মের সকল ক্ষেত্রেই বীরত্বকে জাগাইয়া তুলিতে পারে, এমন কঠোর উন্নত মনোভাব" আশা করিতেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মানুষের সেবা, দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ কার্যের দ্বারাই এই মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে। তিনি যে বেদান্ত শিক্ষার উপর এতোখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, ইহার মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারক ভেষজের সন্ধান পাইয়াছিলেন :

"বৈদিক ছন্দের বজ্রধ্বনির মধ্য দিয়া জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।"

তিনি কেবল অপরের হৃদয়ের উপর অত্যাচার করিলেন না, নিজের হৃদয়ের উপর-ও করিলেন। অবশ্য, হৃদয় যে ভগবানের উৎস, একথা তিনি খুব ভালো করিয়াই জানিতেন। মানুষের নেতা হিসাবে তিনি উহার শ্বাস রোধ করিয়া মারিতে চাহিলেন না, চাহিলেন উহাকে উহার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিতে। হৃদয় যেখানে প্রাধান্য লাভ করিত, সেখানে তিনি তাহাকে খর্ব করিতেন ; হৃদয় যেখানে খর্ব হইয়া থাকিত, সেখানে তিনি তাহাকে তুলিয়া ধরিতেন।[১] মানুষের সেবাই ছিল সর্বাপেক্ষা আশু-প্রয়োজনীয় বিষয় : মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না। মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে কাজ করিবার জন্য তিনি অন্তরতর শক্তিগুলির মধ্যে একটি ত্রুটিহীন ভারসাম্য বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন।[২]

ইহা সত্য যে, ভারসাম্য কখনো স্থির ও স্থায়ী হইতে পারে না। বিশেষত, যে সকল জাতির লোকে আনন্দোচ্ছ্বাসের অগ্নিশিখা হইতে অবিলম্বে কামনার

১ তিনি বাংলা দেশে ভক্তির নিন্দা করেন, আবার যোদ্ধার দেশ পাঞ্জাবে গিয়া ভক্তির প্রশস্তি গাহেন। কলিকাতায় তিনি সংকীর্তন ও নাচগানের শোভাযাত্রাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিলে-ও, লাহোরে তিনি সেগুলির প্রবর্তন করিতে চান। কারণ, "এই পঞ্চ নদীর দেশ আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে ছিল বিশুষ্ক", সেখানে প্রয়োজন ছিল সিঞ্চন। (নভেম্বর, ১৮৯৭)।

২ দ্বিতীয় বার পশ্চিমযাত্রার প্রাক্‌কালে তিনি যখন তাঁহার মঠের সন্ন্যাসীদের নিকট ধর্মীয় জীবনের আদর্শ সম্পর্কে একটি মোটামুটি বর্ণনা দিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলেন :

"তোমাদিগকে তোমাদের জীবনে বিপুল আদর্শের সহিত বিপুল কর্মশক্তির মিলন ঘটাইতে হইবে। এখনই তোমরা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, পরমুহূর্তেই আবার তোমাদিগকে মাঠে কাজ করিতে যাইবার জন্য তৈয়ার হইতে হইবে। এখনই তোমাদিগকে শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইবে, পরমুহূর্তেই তোমাদিগকে ক্ষেতের ফসল বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতে হইবে। আশ্রমের উদ্দেশ্য হইল মানুষ তৈয়ার করা ; সত্যকার মানুষ হইল সেই, যে শক্তির মতোই শক্তিমান, অথচ নারীর মতোই যাহার হৃদয় কোমল।"

নির্বাপিত ভস্মে পরিণত হইয়া পড়ে, সেই সকল চরমপন্থী জাতির পক্ষে এই ভারসাম্যকে আয়ত্ত করা যেমন কঠিন, তাহার অপেক্ষা-ও কঠিন সেই ভারসাম্যকে রক্ষা করা। আর বিবেকানন্দের মতো কোনো ব্যক্তির পক্ষে তাহা ছিল আরো কঠিনতর। কারণ, বিবেকানন্দ ধর্মবিশ্বাস, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি কর্ম ও জয়ের সর্বপ্রকার আবেগ ও উত্তেজনার প্রচণ্ড স্বতবিরোধিতার মধ্যে ছিন্নভিন্ন, ক্ষতবিক্ষত হইতেছিলেন। অদ্বৈতের প্রতি এক বহ্নিমান ভালোবাসা এবং আর্ত মানবতার দুর্নিবার আবেদন—দণ্ডের এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তের মধ্যে তিনি যে তাঁহার আবেগ-উত্তেজিত হস্তে ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর। এই ভারসাম্য যখন আর রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, যখন দুটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইবার সময় আসিয়াছিল, তখন, সেদিন, মানবতার আহ্বানই জয়ী হইয়াছিল : 'তিনি করুণার কাছে'[১] তাঁহার ইউরোপীয় সহোদর বীঠোফেনের ভাষায়—"দীন দুঃস্থ মানবতার" কাছে, সকল কিছুই বলি দিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের সুন্দর ঘটনাটি তাহার একটি মনোরম দৃষ্টান্ত :

স্মরণ থাকিতে পারে যে, বিখ্যাত বাঙ্গালী নাট্যকার, লেখক ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছিলেন। অবশেষে গঙ্গার সেই সহৃদয় দুরন্ত ধীবর তাঁহাকে একদা তাঁহার বড়শীতে গাঁথিয়া তুলিলেন। সেই সময় হইতে গিরিশচন্দ্র, সংসার ত্যাগ না করিয়াও, রামকৃষ্ণের অন্যতম উৎসাহী ও অকপট ভক্ত হইয়া উঠেন ; তিনি প্রেম-বিশ্বাসের মধ্যে—ভক্তি যোগের মধ্যে—তন্ময় থাকিয়া তাঁহার দিনগুলি কাটাইতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বাক্-স্বাধীনতাটি বজায় রাখেন ; রামকৃষ্ণের শিষ্যরা-ও তাঁহাদের গুরুদেবের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

একদিন বিবেকানন্দ তাঁহার এক শিষ্যের সহিত জটিল দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে গিরিশচন্দ্র সেখানে আসিলেন। বিবেকানন্দ আলোচনা থামাইয়া তাঁহাকে সস্নেহ বিদ্রূপের সহিত বলিলেন :

"আচ্ছা, গিরিশবাবু, আপনি তো এসব জিনিস লইয়া পড়াশুনা করিলেন না। কেবল 'কেষ্ট বিষ্টু' করিয়া কাটাইয়া দিলেন।"

১ বেলুড়ে তিনি সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে একবার (১৮৯৯) বলেন :

"যদি তোমার মস্তিষ্ক ও তোমার হৃদয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে, তবে হৃদয়কে অনুসরণ কর।"

গিরিশচন্দ্র জবাব দিলেন ঃ

"আচ্ছা, নরেন, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বেদ-বেদান্ত সম্পর্কে তুমি তো অনেক পড়িয়াছ। কিন্তু সেখানে কি মানুষের এই আর্তনাদ, এই ক্ষুধার ক্রন্দন, এই ঘৃণিত পাপাচার···যাহা চারিদিকে রাত্রিদিন দেখিতেছি, সে সকলের কোনো প্রতিকার আছে? যে মা একদিন রোজ পঞ্চাশ জনকে খাওয়াইয়াছেন, সেই মা আজ তিন দিন ধরিয়া নিজের মুখে, নিজের ছেলেমেয়ের মুখে, দুটি অন্ন দিবার মতো-ও কিছু একটু রাঁধিতে পাইতেছেন না! অমুক-অমুক বাড়ির মেয়েদের উপর গুণ্ডারা অত্যাচার করিয়াছে, অত্যাচার করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। নিজের লজ্জা লুকাইবার জন্য গর্ভস্রাব করিতে গিয়া অল্পবয়সী অমুক-অমুক বিধবা মারা গিয়াছে!···আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, নরেন, তোমার বেদে কি এ সব অন্যায়ের কোন প্রতিকার আছে?···"

বিদ্রূপের সুরে গিরিশচন্দ্র সমাজের ঘৃণ্য ও বীভৎস দিকগুলির বর্ণনা করিয়া চলিলেন এবং বিবেকানন্দ নীরবে অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলেন। জগতের দুঃখ যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তিনি নিজের আবেগ লুকাইবার জন্য উঠিয়া ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। শিষ্যদিগকে গিরিশচন্দ্র বলিলেন ঃ

"তোমাদের গুরুদেবের মনটা কত বড়ো, এখন দেখিলে তো? যে বিরাট মন তাহাকে মানুষের দুঃখ দৈন্যে কাঁদাইয়া ফিরাইয়াছে, তাহার জন্য আমি তাহাকে যতোখানি শ্রদ্ধা করি, তাহার জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের জন্য ততোখানি করি না। দেখিলে তো, যেমনই মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা কানে আসিল, অমনই তাহার বেদ-বেদান্ত কোথায় উড়িয়া গেল; যে জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য সে এক মুহূর্ত আগে দেখাইতেছিল, তাহা সে পাশে সরাইয়া রাখিল; তাহার সমস্ত সত্তা প্রেম ও করুণার দুগ্ধে ভাসিয়া গেল। তোমাদের স্বামীজী যেমন জ্ঞানী, পণ্ডিত, তেমনি ভগবানের ভক্ত, মানুষের প্রেমিক।"

বিবেকানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। সদানন্দকে বলিলেন, দেশবাসীর দুঃখে দৈন্যে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইতেছে। অন্ততঃপক্ষে, একটি ক্ষুদ্র সাহায্য-কেন্দ্র খোলা প্রয়োজন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন ঃ

"সত্যি, গিরিশবাবু, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, দুনিয়ার দুঃখযন্ত্রণা দূর করিবার জন্য,—এমনকি একটি মানুষের সামান্যতম যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য—

যদি আমাকে হাজার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা-ও আমি সানন্দে করিব।[১]..."

* * * * *

এই করুণাময় হৃদয়ের মহানুভব আকুলতা তাঁহার সতীর্থ এবং শিষ্যগণকে সংঘবদ্ধ করিল। তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার নির্দেশ অনুসারে হাজারো ভাবে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অখণ্ডানন্দ বিবেকানন্দ-প্রেরিত দুই শিষ্যের সাহায্যে বাংলা দেশের মুর্শিদাবাদ জেলায় শত শত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গরীবের মুখে অন্ন দিলেন, তাহাদের সেবা করিলেন। তিনি পরিত্যক্ত শিশুদের কুড়াইয়া সংগ্রহ করিলেন এবং মহুলাতে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে এই আশ্রম শরগাছীতে স্থানান্তরিত হয়। ফ্রান্সিসকানদের মতো ধৈর্য ও ভালোবাসার সহিত অখণ্ডানন্দ জাতি-ধর্মনির্বিশেষে এই সকল শিশুর শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে তিনি তাহাদিগকে তাঁতের কাজ, ছুতার মিস্ত্রীর কাজ, রেশমের কাজ, এবং সেই সংগে লিখিতে, পড়িতে ও অংক কষিতে শিক্ষা দিলেন, ইংরাজি-ও শিখাইলেন।

ঐ বছরেই, ১৮৯৭-এ, ত্রিগুণাতীত দিনাজপুরে একটি দুর্ভিক্ষ সাহায্য-কেন্দ্র খোলেন। দুই মাসের মধ্যে তিনি চুরাশীটি গ্রামে সাহায্যের কাজ করেন। দেওঘর, দক্ষিণেশ্বর এবং কলিকাতাতে-ও সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হয়।

পর বৎসর, ১৮৯৮-এর এপ্রিল-মে মাসে, কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিলে সমগ্র রামকৃষ্ণ মিশন তাহার প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করেন। বিবেকানন্দ তখন অসুস্থ থাকিলে-ও সমস্ত সাহায্য-ব্যবস্থা নিজে পরিচালনা করিবার জন্য হিমালয় হইতে চলিয়া আসেন। টাকার অভাব ছিল। তাঁহাদের হাতে যে টাকা ছিল, তাহার সবটুকুই প্রায় নূতন মঠ নির্মাণের জন্য জায়গা খরিদে খরচ হইয়া গিয়াছিল। তবু বিবেকানন্দ বিন্দুমাত্র ইতস্তত করিলেন না।

বলিলেন: "প্রয়োজন হইলে জায়গা বেচিয়া ফেল। আমরা সন্ন্যাসী; গাছতলায় শুইবার এবং ভিক্ষার অন্নে দিন কাটাইবার জন্য আমাদিগকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

---

১ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, ৩য় খণ্ড, ১৬৫-১৬৭ পৃষ্ঠা।

একটি বিরাট জমি ভাড়ায় লইয়া সেখানে স্বাস্থ্য শিবির স্থাপন করা হইল। জনসাধারণকে সাহস এবং কর্মীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বিবেকানন্দ নিজে একটি দরিদ্র পল্লীতে আসিয়া থাকিলেন। ভগিনী নিবেদিতা সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার উপর এবং কয়েকজন সহযোগী সহ স্বামী সদানন্দ ও শিবানন্দের উপর ব্যবস্থাপনার ভার রহিল।* কলিকাতায় চারিটি প্রধান দরিদ্র পল্লীতে মার্জনা ও বিশোধনের কাজ তাঁহারা দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দ একটি সভায় (এপ্রিল, ১৮৯৯) ছাত্রদের আহ্বান করিয়া এই দুর্দিনে তাহাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন। ছাত্ররা নিজেদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া দলে দলে দরিদ্রের কুটিরগুলি পরিদর্শন করিতে লাগিল, স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক পুস্তিকা বিলাইল, এবং কেমন করিয়া মেথরের কাজ করিতে হয়, তাহা নিজেরা করিয়া দেখাইল। তাহারা প্রতি রবিবারে ভগিনী নিবেদিতার কাছে তাহাদের কাজের বিবরণী দিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাগুলিতে আসিল।

রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবকে দরিদ্র সেবার পবিত্র উৎসবে পরিণত করিল এবং ঐ দিন মঠ ও মিশনের সকল কেন্দ্রেই হাজার হাজার দরিদ্রকে খাওয়ানো হইল।

এইভাবে ভারতে দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য, সৌভ্রাত্র্য ও সংঘবদ্ধতার একটি নূতন মনোভাব দেখা দিল।

এই সামাজিক পারস্পরিক সাহায্যের কাজের পাশাপাশি শিক্ষা এবং বেদান্তের বাণী প্রচার-ও চলিতে লাগিল। কারণ, তাঁহার নিজের কথায় বলিতে গেলে, বিবেকানন্দ চাহিলেন, ভারত "ইসলামের মতো দেহ এবং বেদান্তের মতো হৃদয়ের" অধিকারী হউক। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে এবং মাদ্রাজের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বক্তৃতা দিতেছিলেন। তিনি সেখানে শহরের বিভিন্ন অংশে এগারোটি ক্লাশ খোলেন। তিনি একই সংগে শিক্ষা ও সেবার কাজ করিতে থাকেন। ঐ বৎসরের মাঝামাঝি সময়েই বিবেকানন্দ শিবানন্দকে সিংহলে বেদান্ত প্রচারের জন্য পাঠান। শিক্ষকশিক্ষিকাদিগকে একটি আবেগ-উন্মাদনায় যেন পাইয়া বসে। একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকার মুখে নিম্নলিখিত কথাগুলি শুনিয়া বিবেকানন্দ খুবই খুশী হন:

---

* ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয়বার প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময় ইহা করা হইয়াছিল।—ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশকের টীকা দ্রষ্টব্য।—অনুঃ।

"এই ছোট ছোট মেয়েদের আমি ভগবতীর মতো দেখি। আর কিছু পূজা-আচ্চা আমি জানি না।"

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার অল্পদিন বাদেই বিবেকানন্দ তাঁহার নিজের কাজ-কর্ম বন্ধ করিতে বাধ্য হন এবং কয়েক সপ্তাহ আলমোড়ায় গিয়া চিকিৎসাধীনে থাকেন। যাহাই হউক, তিনি ঐ সময় লিখিতে সমর্থ হন:

"আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছে। এ আন্দোলন আর থামিবে না।" (৯ই জুলাই, ১৮৯৭)।

"একটি মাত্র চিন্তা আমার মাথার মধ্যে জ্বলিতেছে—সে চিন্তা হইল ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতির যন্ত্রটাকে চালু করা এবং সে বিষয়ে আমি কতক পরিমাণে সফল হইয়াছি। ছেলেরা কিভাবে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কাজ করিতেছে, দেখিলে মন খুশিতে ভরিয়া উঠে। তাহারা অস্পৃশ্য কলেরা রোগীর মাদুরে বসিয়া সেবা করিতেছে, অভুক্ত চণ্ডালের মুখে অন্ন দিতেছে, ভগবান আমাকে এবং তাহাদের সকলকে সাহায্য করিতেছেন। আমার প্রিয়তম যিনি, তিনি আমার সাথে সাথেই আছেন। যখন আমেরিকায় ছিলাম, যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলাম, যখন ভারতে অজ্ঞাত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিতেছিলাম, তখনো তিনি এইভাবেই আমার সংগে ছিলেন। আমি বুঝি, আমার কাজ ফুরাইয়া আসিয়াছে, —বড়ো জোর আর তিন-চার বছর আমি বাঁচিব।[১] আমার মুক্তির সকল কামনাই আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। ঐহিক আনন্দ-ও আমি কখনো চাহি নাই। আমি দেখিতে চাই, আমার কাজের যন্ত্রটি সবল ও শক্তভাবে কাজ করিতেছে। অন্ততপক্ষে ভারতে মানুষের কল্যাণের জন্য আমার যন্ত্রটা আমি চালু করিতে পারিয়াছি এবং সে যন্ত্র আর কেহ থামাইতে পারিবে না, একথা নিশ্চিতভাবে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যেন মরিতে পারি। আর কি হইবে, না হইবে, তাহা আমি ভাবি না। একমাত্র ভগবান যিনি আছেন, একমাত্র ভগবান যাঁহাকে আমি বিশ্বাস করি, সেই সমস্ত আত্মার সমষ্টি, তাঁহার পূজার জন্য আমি বারে বারে জন্ম গ্রহণ করিয়া হাজার দুঃখ-দৈন্যকে সহ্য করিতে পারি।"[২]

১ আর ঠিক পাঁচ বছর বাকী ছিল। তিনি ১৯০২ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে মারা যান।

২ "বিবেকানন্দের জীবন", ৩য় খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাঁহার আদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে সুন্দর স্বীকৃতিটি-ও এখানে আছে। পূর্বে আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। আবার আমি যখন বিবেকানন্দের চিন্তা সম্পর্কে শেষে আলোচনা ও বিচার করিব, তখন এ বিষয়ে আবার ফিরিয়া আসিব।

তিনি একটু সুস্থ বোধ করিলেই তাঁহার কাজকে দশগুণ বাড়াইয়া তুলিতেন। ১৮৯৭-এর আগস্ট হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি পাঞ্জাব হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত ঝড়ের বেগে একবার ঘুরিয়া আসিলেন এবং তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই তাঁহার বীজ বপন করিলেন। কাশ্মীরে একটি বড়ো অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করা যায় কি না, সে বিষয়ে তিনি মহারাজার সহিত আলাপ করিলেন; লাহোরে কলেজগুলির ছাত্রসভায় তিনি বক্তৃতা দিলেন, তাহাদিগকে তিনি ভগবৎ-বিশ্বাসের প্রস্তুতি হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করিতে ও মানুষে বিশ্বাসী হইতে বলিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া তিনি সম্পূর্ণ সম্প্রদায়নির্বিশেষে, জনসাধারণের সাহায্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য একটি সংঘ গড়িয়া তুলিলেন। তিনি ভারতের যেখানেই গিয়াছেন, সেখানে কখনো মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছেন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনে সাহায্য করিতে ক্লান্তি বোধ করেন নাই। কিন্তু সর্বদাই তিনি বিশ্বাসকে কর্মের কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া লইয়াছেন। মানুষ যাহাতে মানুষের কাছে আসিতে পারে, সেজন্য তিনি অসবর্ণ বিবাহের প্রচার করেন, সমাজচ্যুতদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেন। অবিবাহিত মেয়েদের বা হিন্দু বিধবাদের কথা তিনি চিন্তা করেন, এবং যেখানেই তিনি দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতা ও অস্পৃশ্যতা দেখেন, সেখানেই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং এইভাবে সামাজিক অন্যায় ও অবিচারগুলির প্রতিকারের চেষ্টা করেন। সেই সংগে—(দুটি কাজই পরস্পরের পরিপূরক)—তিনি সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের সত্যকার প্রসার করিয়া, ভারতীয়দের মনে পশ্চিমী চিন্তাধারাকে প্রবেশ করাইয়া, এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে কেবল ডিগ্রীধারী ও রাজকর্মচারীর দল না গড়িয়া মানুষ গড়িতে পারে, সেভাবে সেগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া হিন্দু চিন্তাকে পুনর্গঠিত করিবার কাজ করিতে থাকেন।

হিন্দ্ স্বরাজের মতো বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া রাজনীতিক স্বাধীনতা আনিবার কোনোরূপ চিন্তা তাহার মধ্যে ছিল না।* বিশ্বের সহযোগের মতোই তিনি বৃটিশের সহযোগের উপরও নির্ভর করিতেন। বস্তুত, ইংলণ্ড তাঁহাকে তাঁহার কাজে সাহায্য করিয়াছিল। রাষ্ট্র করে নাই; কিন্তু লণ্ডন ও নিউ ইঅর্ক হইতে আগত তাঁহার অ্যাংলো-স্যাকসন শিষ্যরা স্বামীজীর জন্য ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং

* কিন্তু স্বামীজী ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা চাহিতেন।—ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশকের টীকা দ্রষ্টব্য।—অনুঃ।

অর্থ লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত টাকা দিয়াই বেলুড়ের বিশাল মঠের জন্য জমি কেনা হইয়াছিল ও বাড়ি তৈয়ার হইয়াছিল।[১]

১৮৯৮ খৃস্টাব্দটি প্রধানত রামকৃষ্ণ মঠের নূতনভাবে পরিচালনায় ব্যবস্থাপনায় এবং বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিষ্ঠায় কাটে। এই পত্রিকাগুলি পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মানসিক অঙ্গ এবং ভারতীয়দের শিক্ষার অন্যতম অস্ত্র হইয়া উঠে।[২]

* * * * *

কিন্তু এই বৎসরের, ১৮৯৮-এর, প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদিগকে বিবেকানন্দের শিক্ষাদান। তাঁহার আহ্বানেই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। মিস মার্গারেট নোবল আসেন জানুয়ারির শেষে—মিস্ মুলারের সহযোগিতায় ভারতীয় নারীদের শিক্ষার জন্য কতিপয় আদর্শ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে। এবং মিসেস ওলি বুল এবং মিস্ জোসেফিন ম্যাক্লেয়ড আসেন ফেব্রুয়ারীতে।[৩] মার্চ মাসে মিস্ মার্গারেট নোবল ব্রহ্মচর্যের ব্রত এবং নিবেদিতা নাম গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ তাঁহাকে সস্নেহে কলিকাতার জনসাধারণের কাছে ভারতকে

১ কলিকাতার নিকটস্থ বরানগরের পুরাতন আশ্রম বাড়ির অপর দিকে গঙ্গাতীরে পনের একর জমি। এই জমি ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে কেনা হয়। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে একজন ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে বাড়ি তৈয়ারি আরম্ভ হয়। ঐ ইঞ্জিনিয়ার পরে বিজ্ঞানানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২ "প্রবুদ্ধ ভারত" আগেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে তাহা তাহার তরুণ সম্পাদকের মৃত্যুর ফলে কিছুদিন বন্ধ ছিল। পত্রিকাটিকে সেভিয়ার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা স্বামী স্বরূপানন্দের সম্পাদনায় মাদ্রাজ হইতে আলমোড়ায় স্থানান্তরিত হয়। স্বামী স্বরূপানন্দ ছিলেন এক সংসারত্যাগী শক্তিমান পুরুষ, জনসাধারণের মঙ্গল করিবার অনুরূপ একটি আগ্রহ ও আবেগ তাঁহাকে বিবেকানন্দের নিকট টানিয়া আনিয়াছিল। বিবেকানন্দ তাঁহাকে দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রস্তুতির পর স্বামী স্বরূপানন্দ নামে তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত করেন। তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে মিস্ নোবলকে শিক্ষা দেন। তিনি পরে অদ্বৈত আশ্রমের সভাপতি হন।

১৮৯৯-এর গোড়ায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের পরিচালনায় "উদ্‌বোধন" নামে আর একটি মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। উহার মূল নীতি ছিল, কাহারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না করা, সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বেদের মতবাদগুলিকে সহজ ও সরলভাবে তুলিয়া ধরা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্নগুলির আলোচনা করা, জাতির দৈহিক ও মানসিক উন্নতি করা এবং নৈতিক শুদ্ধি, পারস্পরিক সাহায্য এবং সার্বজনীন সংগতির কথা প্রচার করা। এই পত্রিকাগুলির প্রথমটিতে ১৮৯৮-এর আগস্ট মাসে বিবেকানন্দ তাঁহার "প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি" নামে সুন্দর কবিতাটি প্রকাশ করেন।

৩ মিস্ ম্যাক্লেয়ড আমাকে তাঁহার স্মৃতিকথাগুলি জানাইয়া সম্মানিত করিয়াছেন। চার বছরের-ও অধিককাল বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। বিবেকানন্দ এক একবার কয়েক মাস

ইংল্যাণ্ডের দান বলিয়া বর্ণনা করেন এবং তিনি যাহাতে নিবেদিতার মধ্য হইতে তাঁহার স্বদেশের স্মৃতি-সংস্কার ও আচার-ব্যবহারের সকল চিহ্নকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারেন[১], সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার একদল শিষ্যের সহিত তাঁহাকে কয়েক মাসের জন্য ইতিহাসময় ভারত ভ্রমণের জন্য লইয়া যান।[২]

ধরিয়া তাঁহার গৃহে গিয়া অতিথি হইয়া থাকিতেন। মিস্ ম্যাক্লেয়ড তাঁহার ভক্ত ছিলেন; কিন্তু তিনি নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেন নাই বা বিবেকানন্দ-ও তাঁহার নিকট তাহা দাবী করেন নাই। যাঁহারা স্বেচ্ছায় ব্রত গ্রহণ করেন নাই, তিনি সর্বদাই তাঁহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। ফলে, মিস্ ম্যাক্লেয়ড তাঁহার বন্ধু এবং স্বাধীনা সহায়িকা-ই রহিয়া যান, নিবেদিতার মতো কখনো তাঁহার শিষ্যা হন নাই। মিস্ ম্যাক্লেয়ড আমাকে বলেন যে তিনি ভারতে পুনরায় স্বামীজীর সহিত যোগ দিবার জন্য আসিবার আগে স্বামীজীর অনুমতি চান। তাহার জবাবে স্বামীজী এই সুগম্ভীর বাণীটি পাঠান, (এখানে তাহা আমি আমার স্মৃতি হইতেই উদ্‌ধৃত করিতেছি):

"তুমি যদি দারিদ্র্য, অধঃপতন, অপরিচ্ছন্নতা এবং অর্ধোলংগ মানুষ, যাহারা ভগবানের কথা বলে, তাহাদিগকে দেখিতে চাও, তবে আইস। যদি অন্য কিছু দেখিতে চাও, আসিও না। কারণ, সমালোচনামূলক আর একটি কথা-ও সহিবার শক্তি আমাদের নাই।"

স্বজাতির এই দৈন্য বিবেকানন্দের গর্বে আঘাত করিত। তাই তিনি তাঁহার অধঃপতিত জাতির প্রতি সুগভীর স্নেহভরে এই শর্ত আরোপ করেন। মিস্ ম্যাক্লেয়ড-ও কঠোরভাবে এই শর্ত মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু একবার হিমালয়ে তাঁহারা এক কিম্ভূতকিমাকার ব্রাহ্মণকে দেখেন, এবং মিস্ ম্যাক্লেয়ড হাসিয়া একটি মন্তব্য করেন। বিবেকানন্দ "সিংহের মতো তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ান" এবং কঠিন দৃষ্টি হানিয়া বলিয়া উঠেন:

"চুপ করো। কে তুমি? কিই বা তুমি জীবনে করিয়াছ?"

মিস্ ম্যাক্লেয়ড লজ্জা পাইয়া চুপ করিলেন। পরে তিনি জানিয়াছিলেন যে, যাঁহারা বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য যাত্রার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই ব্রাহ্মণটি-ও একজন। এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন লোকের চেহারা কেমন, তাহা দিয়া নয়—লোকটি কি করে, তাহা দিয়া তাহার সত্যকার সত্তাকে উপলব্ধি করা যায়।

মিস্ ম্যাক্লেয়ড ভারতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করিতে পারি?"

"ভারতকে ভালোবাসিয়া।"

১ ইহা জাতিদর্প বা পাশ্চাত্ত্যবিরোধিতার কোনরূপ কুৎসিত মনোভাবের প্রকাশ ছিল না। ১৯০০ খ্রস্টাব্দে যখন তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে ক্যালিফর্নিয়ায় বসান, তখন তিনি তাঁহাকে বলেন: "আজ হইতে ভারতের যে স্মৃতি তোমার মধ্যে আছে, তাহাকে সমূলে বিনাশ করো।" কোনও জাতির প্রকৃত উন্নতির জন্য যদি তাহার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে হয়, তবে নিজের কথা ভুলিয়া নিজেকে সেই জাতির সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে: বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্যদের উপর এই মূল নীতিটি আরোপ করেন।

২ নিবেদিতা তাঁহার *Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda* গ্রন্থে

কিন্তু—এবং ইহা অদ্ভুত লাগে—তিনি যখন তাঁহার সহযাত্রীদের আত্মাগুলিকে তাঁহার জাতির ধর্মীয় গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন তিনি নিজে-ও আত্মহারা হইয়া তাহাতে নিমগ্ন হইতেছিলেন। লোকে দেখিল, এই মহান অদ্বৈতবাদী, নিরাকার ব্রহ্মের এই অত্যুৎসাহী উপাসক পুরাণে বর্ণিত দেবদম্পতি শিব ও কালীর পূজার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন: ইহাতে যে তিনি তাঁহার আচার্যদেব রামকৃষ্ণেরই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছিলেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণের মনের মধ্যে একই সংগে নিরাকার ব্রহ্ম ও সকলপ্রকার সাকার দেবদেবীর স্থান ছিল; বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া রামকৃষ্ণ এই সৌন্দর্যময়ী মহাদেবীর নিকট ব্যাকুল আত্মসমর্পণের আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে ইহা লক্ষণীয় যে, তিনি ইহা শুরু করিয়াছিলেন অদ্বৈতকে অধিগত করিবার পরে—পূর্বে নহে।* দেবদেবীর জন্ম তাঁহার এই আকুলতার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রকৃতির সমস্ত সকরুণ প্রচণ্ডতাকে নিয়োজিত করিলেন। ফলে দেবদেবীদিগকে, বিশেষত কালীকে, তিনি একটি সম্পূর্ণ ভিন্নস্তর আবেষ্টনীর মধ্যে আনিলেন। তাই রামকৃষ্ণের যে সস্নেহ সুকোমল

এই ভ্রমণ এবং বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথনের বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দ নিবেদিতার উপর যে কঠোর নীতি আরোপ করিয়াছিলেন, বিশেষভাবে সে বিষয়ে এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে আমি মিস্ ম্যাক্লেয়ডের (এবং তাঁহার দলের) স্মৃতি হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি। নিবেদিতার সহজাত স্বজাতিপ্রীতি বা পাশ্চাত্ত্য রমণী হিসাবে তাঁহার অভ্যাস ও রুচিগুলি কখনো বিবেকানন্দের কাছে সামান্যতম শ্রদ্ধা-ও পায় নাই; তিনি ক্রমাগত নিবেদিতার দাম্ভিক ও যুক্তিবাদী ইংরেজসুলভ চরিত্রকে কঠিন আঘাত দিয়া অবনত করিয়া রাখিতেন। সম্ভবত এইভাবে তিনি তাঁহার প্রতি নিবেদিতার আবেগপূর্ণ অনুরাগের বিরুদ্ধে নিজেকে এবং নিবেদিতাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। নিবেদিতার মনোভাব সর্বদা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ থাকিলে-ও সম্ভবত তিনি সেখানে বিপদের শংকা করিতেছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে প্রায়ই কঠোরভাবে খোঁচা দিতেন এবং নিবেদিতা যাহা কিছু করিতেন, তাহার মধ্যে ত্রুটি আবিষ্কার করিতেন। নিবেদিতা আঘাত পাইতেন, বিহ্বল হইয়া সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়া আসিতেন, কাঁদিয়া ফেলিতেন। অবশেষে তাঁহারা তাঁহার এই অতিশয় কঠোরতার জন্য বিবেকানন্দের কাছে অনুযোগ করেন; সেই হইতে কঠোরতা অনেকখানি হ্রাস পায় এবং নিবেদিতার মনে আলোক প্রবেশ করে। তাঁহার প্রতি বিবেকানন্দের বিশ্বাস এবং বিবেকানন্দের চিন্তার শাসনের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে যে আনন্দ ছিল, তাহা তিনি আরো গভীরভাবে অনুভব করেন।

* অদ্বৈতকে অধিগত করিবার পূর্বেও স্বামীজী কালী উপাসনা করিতেন।—ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশকের টীকা দ্রষ্টব্য।—অনুঃ।

ভাবোন্মাদনা দেবদেবীদিগকে ঘিরিয়া থাকিত, তাহার সহিত এই আবহাওয়ার পরিপূর্ণ পার্থক্য রহিল।

আলমোড়ায় সেভিয়ার-দম্পতিকে ইতিপূর্বেই বসানো হইয়াছিল। সেখানে অদ্বৈত আশ্রমের নির্মাণকার্য শুরু হইতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না। সেখানে কিছুদিন থাকার পর বিবেকানন্দ নদীপথে শ্রীনগর উপত্যকার মধ্য দিয়া শিকারায় চড়িয়া কাশ্মীরে যান। ১৮৯৮-এর জুলাই মাসে তিনি নিবেদিতাকে সংগে লইয়া পশ্চিম হিমালয়ের এক তুষারপ্রপাতময় উপত্যকায় অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে তাঁহার মহা তীর্থযাত্রা শুরু করেন। তাঁহারা দুই-তিন হাজার তীর্থযাত্রীর সংগে যাইতেছিলেন। এই সকল তীর্থযাত্রী যেখানে বিশ্রামের জন্য নামিতেছিলেন, সেখানে এক একটি শিবিরময় শহর গড়িয়া উঠিতেছিল। নিবেদিতা লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার গুরুদেবের মধ্যে অকস্মাৎ একটি পরিবর্তন আসিয়াছে। তিনি এই হাজার যাত্রীর সহিত মিশিয়া গিয়াছেন এবং প্রথা অনুসারে সামান্যতম অনুষ্ঠানগুলিকেও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পালন করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক পথে ক্রমাগত কয়েকদিন পর্বতের চড়াই ধরিয়া উপরে উঠিবার, কয়েক মাইলব্যাপী তুষারপ্রপাত পার হইবার, এবং প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও পুণ্য স্রোতধারায় স্নান করিবার প্রয়োজন ছিল। ২রা আগস্ট ছিল বার্ষিক উৎসবের দিন। ঐ দিন তাঁহারা অমরনাথের প্রকাণ্ড গুহায় উপস্থিত হইলেন। গুহাটির আয়তন একটি গির্জার পক্ষে স্থান সঙ্কুলান হইবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। গুহার পশ্চাতে ছিলেন তুষার-লিঙ্গম্—মহাদেব স্বয়ং। প্রত্যেককে উলঙ্গ হইয়া দেহে ভস্ম মাখিয়া গুহায় প্রবেশ করিতে হইবে। অন্যান্যদের পশ্চাতে বিবেকানন্দ আবেগ কম্পিত দেহে মূর্ছিতপ্রায় অবস্থায় গুহায় প্রবেশ করিলেন। গুহার অভ্যন্তরে অন্ধকারে তিনি ভূলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে এক বিরাট শুভ্রতা বিরাজ করিতেছিল। চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছিল শত শত কণ্ঠ হইতে উত্থিত সংগীত। এই অবস্থায় বিবেকানন্দ এক দিব্য দর্শন লাভ করিলেন···শিব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কি দেখিয়াছিলেন বা কি শুনিয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনো বলিতে চান নাই। তবে এই আবির্ভাবের আঘাতটি তাঁহার স্নায়ুর উপর এমন প্রচণ্ডভাবে লাগিয়াছিল যে, তিনি প্রায় মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। যখন তিনি গুহা হইতে বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার বাম চোখে এক ডেলা রক্ত জমিয়া গিয়াছিল। হৃৎপিণ্ড স্ফীত হইয়াছিল। তিনি পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা আর কখনো ফিরিয়া পান নাই। ইহার পর তিনি ক্রমাগত কয়েকদিন শিব

ভিন্ন অন্য কোন কথা বলেন নাই, শিব ভিন্ন অন্য কিছুই দেখেন নাই! তিনি শিবময় হইয়া গিয়াছিলেন, তুষারময় হিমালয় হইয়া উঠিয়াছিল সিংহাসনে সমারূঢ় মহাদেব।

এক মাস বাদে তিনি আবার মহাকালীর কবলিত হইলেন। এই মহা মাতা সর্বত্রই বিরাজ করিতেছিলেন। এমন কি চারি বৎসর বয়স্ক বালিকার মধ্যেও বিবেকানন্দ তাঁহারই পূজা করিলেন। কিন্তু কেবল এইরূপ শান্তিপূর্ণ ছদ্মবেশেই মা দেখা দিলেন না। বিবেকানন্দের সুগভীর ধ্যান বিবেকানন্দকে এই প্রতীকের কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল সমীপে লইয়া গেল। তিনি কালীর দিব্য দর্শন লাভ করিলেন। সে দিব্য দর্শন ছিল ভয়াবহ—কালী সেখানে জীবনের যবনিকার অন্তরালে মহা প্রলঙ্করী; তাঁহার পদক্ষেপের ফলে জীবনের যে ধূলি-ঝঞ্ঝা উড়িতেছে, তাহারই মধ্যে তিনি আবৃতা, অবগুণ্ঠিতা; সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ জ্বরের ঘোরে কাগজ ও কলম হাতড়াইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "মা মহাকালী" রচনা করিলেন, এবং রচনা শেষে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

তিনি নিবেদিতাকে বলেন:

"মাকে আপনা হইতে যেমন অমঙ্গলের মধ্যে, আতংকের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, ধ্বংসের মধ্যে, তেমনি যাহা কিছু আনন্দ ও মাধুর্য দেয়, তাহার মধ্যে-ও চিনিতে শেখো। মাগো, বোকারা তোমার গলায় মুণ্ডের মালা পরাইয়া দিয়া আতঙ্কে দূরে সরিয়া যায়। তোমাকে ডাকে করুণাময়ী নামে।...মৃত্যুর ধ্যান করো। ভয়ংকরকে পূজা করো! কেবল ভয়ংকরের পূজার মধ্য দিয়াই ভয়ংকরকে জয় করিতে পারো, অমরত্ব লাভ করিতে পারো।...যন্ত্রণার মধ্যেই আনন্দ থাকিতে পারে! মা-ই স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁহার অভিশাপও আশীর্ব্বাদ।, হৃদয়ে চিতা জ্বালা-ও, সেখানে সকল গর্ব্ব, স্বার্থ ও কামনাকে পুড়াইয়া ছাই কর। তখনই, কেবল তখনই, মা আসিবেন!"

ফলে এই ইংরেজ মহিলাটি-ও ঝড়ের বেগে কম্পিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই ভারতীয় দ্রষ্টা যে বিশ্ব বাত্যার সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে তাঁহার পাশ্চাত্ত্য ধর্মবিশ্বাসের সুশৃংখলা ও স্বাচ্ছন্দ্য কোথায় উড়িয়া গেল। নিবেদিতা লিখিয়াছেন:

"তিনি যখন কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন ভূমিকম্পের মধ্যে, আগ্নেয় গিরির মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাঁহার কথা ভুলিয়া করুণাময় ভগবানের, বিপদবারণ ভগবানের, সান্ত্বনাময় ভগবানের যে পূজা করা হয়, তাহার মধ্যে যে স্বার্থবুদ্ধি

আছে, তাহার কথা শ্রোতাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এই ধরণের পূজা যে, বিবেকানন্দের ভাষায়, 'দোকানদারি মাত্র', তাহা মানুষের চোখে সহজে প্রতিভাত হইল এবং ভগবান শুভ ও অশুভের মধ্যে সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, এই শিক্ষায় যে সত্য ও সাহসিকতা অনেক বেশী পরিমাণে আছে, তাহা বুঝিতে-ও কাহারও বাকী রহিল না। মানুষ বুঝিল, মনন ও ইচ্ছা শক্তির প্রকৃত প্রকাশ, যাহাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত জড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা নাই, বস্তুতপক্ষে হইল, স্বামী বিবেকানন্দের কঠোর ভাষায়, 'জীবনকে নয়, মৃত্যুকে সন্ধান করিবার, আপনাকে অসিমুখে নিক্ষিপ্ত করিবার, আপনাকে চিরতরে ভয়ংকরের সহিত মিশাইয়া দিবার' স্থির সংকল্প।" ১

আবার আমরা এই আক্ষেপোক্তির মধ্যে শৌর্যাভিলাষকেই প্রত্যক্ষ করি। বিবেকানন্দের কাছে এই শৌর্যাভিলাষই ছিল সকল কর্মের আত্মা। চরম সত্যকে তিনি তাঁহার নগ্ন ভয়ংকরতার মধ্যে, তাহার কঠোরতাকে বিন্দুমাত্র হ্রাস না করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন এমন একটি ধর্মবিশ্বাস, যাহা তাহার অজস্রতার বিনিময়ে কিছুই দাবী করে না। যাহা দেওয়া-নেওয়ার দর কষাকষিকে স্বর্গের প্রতিশ্রুতিকে, ঘৃণা করে—কারণ ধর্মবিশ্বাসের অবিনশ্বর শক্তি, তাহা নেহাই-এর উপর কঠিন হাতুড়ির আঘাতে গঠিত ইস্পাতের মতো অনমনীয় ও কঠিন।২

এই সৃজনশীল শক্তিমান আনন্দের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের শ্রেষ্ঠ খৃস্টান সন্ন্যাসীদেরও ছিল। এমন কি, প্যাস্‌কাল ইহার আস্বাদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু উহা কর্মে নির্লিপ্ত করিবার পরিবর্তে বিবেকানন্দকে উহা এক অগ্নিময় উৎসাহে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই অগ্নিময় উৎসাহ তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে ইস্পাতের মতো অনমনীয় করিয়াছিল, তাঁহাকে দশগুণ বর্ধিত নূতন উদ্যমের সহিত সংগ্রামের গভীরে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

তিনি জগতের সকল দুঃখযন্ত্রণাকে সানন্দে বরণ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা

১ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা রচিত *The Master as I Saw Him* পুস্তক, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

২ এমন কি সুকোমল রামকৃষ্ণ-ও মায়ের এই ভয়ংকর মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি এই ভয়ংকরীর মৃদু হাসিকে আরো ভালোসিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, একদিন কতকগুলি লোক ভগবানের গুণাবলী এবং সেগুলি যুক্তিসংগত কিনা তাহা লইয়া তর্ক করিতেছিল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রামকৃষ্ণ তাহাদিগকে থামাইয়া বলেন, 'ঢের হইয়াছে। ভগবানের গুণাবলী যুক্তিসংগত, কি যুক্তিসংগত নয়, তাহা লইয়া তর্ক করিয়া কি হইবে!...তোমরা বলো, ভগবান ভালো ;

লিখিয়াছেন, "দেখিলে মনে হইত, এই জগতের কাহার-ও প্রতি কোনো আঘাত তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া যাইত না। যেন কোনো যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যু-যন্ত্রণাও, তাঁহার নিকট হইতে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারিত না।"[১]

তিনি বলিতেন, "আমি মৃত্যুর দেহকে আলিংগন করিয়াছি।"

মৃত্যু তাঁহাকে কয়েক মাসের জন্য পাইয়া বসিল। মায়ের কণ্ঠস্বর ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল না। ইহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের উপর ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন মঠের সন্ন্যাসীরা এই পরিবর্তন দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। তিনি এমন একাগ্র চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন যে, দশ-বারো বার কোনো প্রশ্ন করিয়া-ও উত্তর মিলিত না। তিনি বুঝিলেন, ইহার কারণ "তীব্র তপস্যা"।

"শিব স্বয়ং আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি যাইবেন না!" ইউরোপের যুক্তিবাদী মনের কাছে দেহধারী ভগবান সম্পর্কে এইরূপ একাগ্র চিন্তাকে বিসদৃশ ও বিরক্তিকর লাগিতে পারে। এক বৎসর বাদে বিবেকানন্দ

ভগবানের ভালোত্বটা কি আমাকে যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিতে পারো? এই বন্যা দেখ, ইহাতে হাজার হাজার লোক মরিয়াছে। তুমি কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে পারো যে, ইহা দয়াময় ভগবানের আদেশে হইয়াছে? তোমরা হয়তো বলিবে, এই একই বন্যা নোংরা সমস্ত কিছুকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, মাটিকে সরস করিয়াছে—ইত্যাদি। কিন্তু তাহা কি দয়াময় ভগবান হাজার হাজার নিরপরাধ নরনারী ও শিশুকে না ডুবাইয়া মারিয়া করিতে পারিতেন না?' ইহার উত্তরে যাহারা তর্ক করিতেছিল, তাহাদের একজন বলিল, 'তবে ভগবান নিষ্ঠুর, এই কথা কি বিশ্বাস করিব?' রামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে নির্বোধ! তাহা কে বলিয়াছে? কেবল হাতজোড় করিয়া বলো, হে ভগবান, আমরা দুর্বলবুদ্ধি মানুষ, আমরা তোমার প্রকৃতি, তোমার কাজ, কিছুই বুঝি না। আমাদের বুঝাইয়া দাও।...তর্ক করি-ও না! ভালোবাসো!'"

(শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত *Reminiscences of Ramkrishna* বা 'রামকৃষ্ণের স্মৃতি' পুস্তক হইতে।)

ভয়ংকর ভগবান সম্পর্কে ধারণা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একই রূপ ছিল। তবে সে সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাবটি ছিল ভিন্নতর। যে ভগবানের চরণ তাঁহার হৃদয়কে পদদলিত করিতেছে, সেই চরণকে রামকৃষ্ণ নতমস্তকে চুম্বন করিতেন। আর বিবেকানন্দ, তিনি উন্নত শিরে মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইতেন। তাঁহার কর্মের সুগম্ভীর আনন্দ তাঁহার মধ্যে আপনাকে উপভোগ করিত। তিনি নিজেকে "অসিমুখে" নিক্ষেপ করিবার জন্য ধাবিত হইতেন।

১ সম্ভবত ইহার কিছুদিন পূর্বে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু গুডউইনের এবং পওহারি বাবার মৃত্যুর (জুন, ১৮৯৮) ফলে তাঁহার মধ্যে যে মানসিক আলোড়ন ঘটিয়াছিল, তাহাই তাঁহার অন্তর্লোকে এই ভয়ংকরীর আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।

তাঁহার সঙ্গীদের কাছে ইহার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহাদের উপকার হইবে মনে হয় :

"সকল আত্মার—কেবল মানব আত্মার নহে—সমষ্টিই হইলেন দেহধারী ভগবান। এই সমষ্টির ইচ্ছাশক্তিকে কিছুই রোধ করিতে পারে না। ইহাকে আমরা 'নিয়ম' বলি। শিব, কালী প্রভৃতি বলিতে-ও আমরা ইহাকেই বুঝাই।"[১]

কিন্তু এই মহান ভারতীয়ের শক্তিমান ভাবাবেগ অগ্নিমূর্তিতে উৎসারিত হইল। ইউরোপীয়দের মস্তিষ্কে উহা কেবল যুক্তির স্তরেই রহিয়া যাইত। অদ্বৈতে তাঁহার সুগভীর বিশ্বাস কখনো মুহূর্তের জন্য-ও টলিল না। কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণের বিপরীত পথে সেই একই সর্বগ্রাহী জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে—সেই চিন্তার উন্নত উত্থান ভবনে—গিয়া উপনীত হইলেন। মানুষ সেখানে নিজেই পরিধি, নিজেই কেন্দ্র : আত্মার সমষ্টি এবং আত্মার ব্যষ্টি—সেই ওম্[২] যাহা তাহাদিগকে ধারণ করিতেছে, যাহা তাহাদিগকে চিরন্তন 'নাদের' মধ্যে পুনরায় গ্রহণ করিতেছে—সেই অসীম দ্বৈত গতির প্রারম্ভিক বিন্দু, সামাপ্তিক বিন্দু। এখন হইতেই তাঁহার সতীর্থ সন্ন্যাসীরা অস্পষ্টভাবে তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণের একাত্মতা অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দ তাঁহাকে একবার বলিলেন :

"তোমার এবং রামকৃষ্ণের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে ?"

* * * *

বিবেকানন্দ বেলুড়ে নূতন মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে উহার শুভ উদ্বোধন করিলেন। ইহার কয়েকদিন আগে, ১১ই নভেম্বর তারিখে, কালীপূজার দিন নিবেদিতার মেয়েদের ইস্কুলের উদ্বোধন হয়। বিবেকানন্দ হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন। হাঁপানির আক্রমণে তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিত, ডুবন্ত মানুষের মুখের মতো তাঁহার মুখ নীল হইয়া যাইত। তাঁহার এই হাঁপানি এবং অসুস্থতা সত্ত্বে-ও তিনি সারদানন্দের সাহায্যে রামকৃষ্ণ মিশনের

১ তাঁহার দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাত্রার কালে সিসিলির উপকূলে জাহাজে। (*The Master as I Saw Him* পুস্তকে নিবেদিতার সহিত কথোপকথন তুলনীয়।)

২ বা পবিত্র ধ্বনি ওঁ। হিন্দু শাস্ত্র মতে এবং বিবেকানন্দের নিজের সূত্র অনুসারে "উহা সকল ধ্বনির সার, উহা ব্রহ্মের প্রতীক। বিশ্ব এই ধ্বনি হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।" তিনি বলেন, "নাদ ব্রহ্ম হইল ব্রহ্ম ধ্বনি।...উহা সর্বাপেক্ষা দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময়।" ("ভক্তিযোগের" মন্ত্রম্ ওঁ। "ধ্বনি ও জ্ঞান" তুলনীয়।)

(স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ৫৬–৫৮ পৃষ্ঠা।)

সংগঠনের কাজকে আগাইয়া লইয়া চলিলেন। দলে দলে লোক কাজ করিতেছিল। সংস্কৃত ভাষা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন, হাতের কাজ এবং ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। এ বিষয়ে তিনিই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছিলেন। তিনি অধিবিদ্যা পড়াইবার পরে বাগানে গিয়া মাটি চষিতেন, কূপ খুঁড়িতেন এবং রুটি বেলিতেন।[১] তিনি ছিলেন কর্মের একটি জীবন্ত বন্দনা।

"কেবল শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীরাই (ব্যাপকতম অর্থে: যিনি পরম পুরুষের সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন) শ্রেষ্ঠ কর্মী হইতেন, কারণ, তাঁহাদের কোনো বন্ধন নাই।… বুদ্ধ এবং খৃস্টের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কর্মী কেহ নাই।…কোনো কর্মই ঐহিক নহে। সমস্ত কর্মই হইল স্তুতি এবং উপাসনা।…"

তাহাছাড়া, কর্মের মধ্যে কোনো শ্রেণীবদ্ধ উচ্চতা-নীচতা নাই। সকল উপযোগী কর্মই মহৎ।…

"আমার গুরুভাইরা যদি বলেন যে, মঠের নর্দমা পরিষ্কার করিয়া আমাকে আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, তবে আমি নিশ্চয় তাহাই করিব। সাধারণের মংগলের জন্য কেমন করিয়া অনুগত হইতে হয়, তাহা যিনি জানেন, কেবল তিনিই শ্রেষ্ঠ নেতা।…"

প্রথম কর্তব্য হইল "ত্যাগ।"

"ত্যাগ ভিন্ন কোনো ধর্মই (তিনি বলিতে পারিতেন, আধ্যাত্মিকতার কোনো গভীর ভিত্তিই) স্থায়ী হইতে পারে না।"

এবং যিনি "ত্যাগ" করিয়াছেন, যিনি "সন্ন্যাসী," বেদের মতে তিনিই "বেদের শীর্ষে রহিয়াছেন"। "কারণ, তিনি সকল সম্প্রদায়, সকল ধর্মমত ও সকল ধর্ম-প্রচারক হইতে মুক্ত।" তিনি ভগবানের মধ্যে বাস করেন। ভগবান তাঁহার মধ্যে বাস করেন। তিনিই কেবল বিশ্বাস করুন!

"পৃথিবীর ইতিহাস হইল আত্মবিশ্বাসী কয়েকজন মাত্র মানুষের ইতিহাস। সেই বিশ্বাস ভিতরের দিব্য শক্তিকে বাহিরে ডাকিয়া আনে। তখন তুমি সকল কিছুই করিতে পারো। কেবল তখনই পারো না, যখন সেই অসীম শক্তিকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করো না। যখনই কোনো মানুষ বা কোনো জাতি আত্মবিশ্বাস

১ তিনি দৈহিক ব্যায়ামের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেন: "আমি আমার ধর্মের বাহিনীতে কুলী-মজুর চাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের পেশীকে শিক্ষিত করিয়া তোলো। কৃচ্ছ-সাধকদের জন্য নিগ্রহ-ই যথেষ্ট। কিন্তু কর্মীর জন্য চাই সুগঠিত দেহ, চাই লোহের পেশী, চাই ইস্পাতের স্নায়ু।"

হারায়, তখনই তাহার মৃত্যু ঘটে।। প্রথমে নিজেকে বিশ্বাস করো, তারপরে ভগবানে বিশ্বাস করো। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বলিষ্ঠ মানুষই পৃথিবীকে আন্দোলিত করিবে।”...

সুতরাং, সাহসী হও। সাহস-ই সর্বোত্তম গুণ। সর্বদা “সকলের কাছে নির্বিশেষে, নির্ভয়ে, দ্ব্যর্থকতা ও আপোষের মনোভাব ছাড়িয়া” সম্পূর্ণ সত্য বলিতে সাহস করো। কে ধনী, কে বড়ো, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইও না। ধনীদের সম্মান করা এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য তাহাদের পিছু লাগিয়া থাকা গণিকাদেরই শোভা পায়। সন্ন্যাসীর কাজ হইল গরীবকে লইয়া। সন্ন্যাসীরা সস্নেহে সযত্নে দরিদ্রের সহিত ব্যবহার করিবেন, সানন্দে সকল শক্তি দিয়া দরিদ্রের সেবা করিবেন।

“তুমি যদি নিজের মুক্তি খোঁজো, তবে তুমি নরকে যাইবে। তোমাকে খুঁজিতে হইবে অপরের মুক্তি।...যদি অপরের জন্য কাজ করিয়া তোমাকে নরকে যাইতে হয়, তবে নিজের মুক্তি খুঁজিয়া স্বর্গে যাইবার অপেক্ষা তাহার দাম অনেক বেশী। ...রামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন এবং বিশ্বের জন্য তাঁহার জীবন দিয়াছিলেন। আমি আমার জীবন দিব ; তোমাদের, তোমাদের প্রত্যেকেরই, দেওয়া উচিত। এই সব কাজ তো আরম্ভ মাত্র। আমাকে বিশ্বাস করো, আমার জীবনের যে রক্ত ক্ষয় করিতেছি, তাহা হইতে অতিকায় বীর্যবান কর্মীদের, ভগবৎ-যোদ্ধাদের, জন্ম হইবে। তাহারা সমস্ত বিশ্বে বিপ্লব আনিবে।”

তাঁহার কথাগুলি ছিল সংগীতের মতো ; বীঠোফেনের মতো ছিল সেগুলির বাক্যাংশের বিন্যাস, এবং হ্যাণ্ডেলের মিলিত সংগীতের মতো ছিল সেগুলির প্রাণ-মাতানো ছন্দ। তাঁহার এই সকল কথা ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার লেখা বইগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু তবু যখনই আমি সেগুলিতে হাত দিয়াছি, তখনই চকিতে তড়িৎ-স্পর্শ অনুভব করিয়াছি। কথাগুলি যখন সেই বীরের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছিল তখন সেগুলি কী তড়িৎ স্পর্শ, কী উন্মাদনারই না সৃষ্টি করিত!

তিনি যে মরিতেছেন, ইহা তিনি অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু “...জীবন একটি যুদ্ধ। যুদ্ধ করিয়া আমাকে মারিতে দাও। দুই বৎসরের দৈহিক ব্যাধি আমার বিশ বৎসরের শক্তিকে ছিনাইয়া লইয়াছে। কিন্তু আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় নাই। সে সর্বদাই এখানে রহিয়াছে ; সেই বোকাটা একটি মাত্র চিন্তা লইয়াই আছে ; সে চিন্তা হইল ‘আত্মন্’।...”

৯

দ্বিতীয় বার পশ্চিম যাত্রা

তাঁহার আরব্ধ কর্ম পরিদর্শন করিতে এবং তাঁহার প্রজ্বালিত অগ্নিকে আরো ভালো করিয়া জ্বালাইয়া তুলিতে তিনি দ্বিতীয় বার পশ্চিমের পথে যাত্রা করিলেন। এবার তিনি তাঁহার অন্যতম সুবিজ্ঞ সতীর্থ তুরীয়ানন্দকে সংগে লইলেন।[১] তুরীয়ানন্দ উচ্চ বর্ণে জন্মিয়া সৎ ও উচ্চ জীবন যাপন করিতেছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য।

বিবেকানন্দ বলেন, "গত বারে তাঁহারা একজন ক্ষত্রিয়কে দেখিয়াছেন। এবার আমি তাঁহাদিগকে একজন ব্রাহ্মণ দেখাইতে চাই।"

তিনি যে অবস্থায় যান,[২] সে অবস্থার সহিত তিনি যে অবস্থায় ফিরেন, তাহার প্রচুর পার্থক্য ছিল : তাঁহার শীর্ণ দেহে তিনি শক্তির একটি অগ্নিপাত্র বহিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন, তাহা হইতে কর্ম ও সংগ্রাম ধূমায়িত হইতেছিল। তাঁহার নিস্তেজ দেশবাসীর শৈথিল্য তাঁহার মনে বিরক্তি ও ঘৃণার ভাব জাগাইয়া দিয়াছিল। তাই জাহাজ হইতে কর্সিকা দ্বীপ দেখিয়া তিনি রণ-দেবতাকে (নেপলিয়ানকে) অভিনন্দন জানাইলেন।[৩]

নৈতিক কাপুরুষতার প্রতি তাঁহার ঘৃণা এমন সুগভীর হইয়া উঠিয়াছিল যে,

১ নিবেদিতা-ও তাঁহাদের সংগে ছিলেন।

২ ১৮৯৯-এর ২০শে জুন তারিখে তিনি কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ, কলম্বো, আদেন, নাপল্‌স্‌ ও মার্সেই-এর পথে যাত্রা করেন। ৩১শে জুলাই তিনি লণ্ডনে গিয়া পৌঁছেন। ১৬ই আগস্ট তিনি গ্ল্যাসগো হইতে নিউ ইঅর্ক রওনা হন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০০ খৃস্টাব্দের ২০শে জুলাই পর্যন্ত ছিলেন। ঐ সময় তিনি প্রধানত ক্যালিফর্নিয়াতেই ছিলেন। ১লা আগস্ট হইতে ২৪শে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সে থাকেন, সেখানে তিনি প্যারিসে ও ব্রিটানিতে যান। তারপর তিনি ভিয়েনা, বল্‌কান দেশগুলি, কনস্টান্টিনোপল, গ্রীস এবং ইজিপ্ট হইয়া ভারতে ফিরেন এবং ১৯০০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় ভারতে আসিয়া পৌঁছেন।

৩ তিনি রবস্‌পিয়েরের শক্তির কথা-ও স্মরণ করেন। ইউরোপের মহাকাব্যময় ইতিহাসে তাঁহার অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। জিব্রল্টারের কাছে আসিতেই তাঁহার কল্পনায় মুরদের ধাবমান অশ্বারোহী বাহিনী এবং আক্রমণকারী আরবদের অবতরণ ভাসিয়া উঠে।

তিনি কাপুরুষতা অপেক্ষা অপরাধ করিবার শক্তিকে-ও শ্রেয় মনে করেন[১] এবং তাঁহার বয়স যতোই বাড়িতে থাকে, তাঁহার মনে এই ধারণা দৃঢ়তর হয় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন চাই-ই। তিনি ভারতে ও ইউরোপে দুইটি স্বতন্ত্র বিকাশশীল বস্তুকে লক্ষ্য করেন। এই উভয় বস্তুর মধ্যেই যৌবনের শক্তিসামর্থ্য রহিয়াছে··· কিন্তু দুইটির কোনোটিই এখনো পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই। তাহাদের পরস্পরকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু সেই সংগে পরস্পরের বিকাশকে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। তিনি নিজেকেও তাহাদের দুর্বলতার সমালোচনা করিতে দেন নাই, কারণ, তাহারা একটি অকৃতজ্ঞ যুগের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের প্রয়োজন পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া বিকাশ লাভ করা।[২] তিনি যখন দেড় বৎসর বাদে ভারতে ফিরিলেন, তখন তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে জীবন

---

১ ভারতবর্ষে অপরাধের অল্পতার কথা কেহ উল্লেখ করিলে তিনি বলিয়া উঠিতেন, "আমার দেশকে ভগবান যদি অন্যরকম করিতেন তাহা হইলেই ভালো হইত। কারণ, ইহা মৃত্যুর সাধুতা ছাড়া আর কিছুই নহে।" তিনি আরো বলেন, "আমার বয়স যতোই বাড়িতেছে, পৌরুষের মধ্যেই সমস্ত কিছু রহিয়াছে, এই ধারণা আমার মধ্যে ততোই বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং ইহাই আমার নূতন বাণী।" এমন কি, তিনি একথা পর্যন্ত বলেন যে, "মন্দ কাজ-ও পৌরুষের সহিত করো। যদি দুষ্টই হইতে হয়, তবে প্রচণ্ডভাবে হও।"

বলাই বাহুল্য, এই কথাগুলিকে শব্দময় বজ্র হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই কথার মধ্য দিয়া এই ক্ষত্রিয়, এই আধ্যাত্মিক যোদ্ধা, প্রাচ্যের দুর্বলতাকে ভৎর্সনা করিতেছিলেন। (এই কথাগুলি তিনি তাঁহার সুপরিচিত ও সুপরীক্ষিত বন্ধুদের কাছেই বলিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে ভুল বুঝিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।) ইহার সত্যকার অর্থ সম্ভবত এই ছিল যে, যাহা আমি একটি ইতালীয়ান সূত্রের মধ্যে পড়িয়াছিলাম: *Ignavia est jacere*: নিষ্ক্রিয়তাই ঘৃণ্যতম অপরাধ।

২ নিবেদিতা কর্তৃক লিপিবদ্ধ সাক্ষাৎকারগুলি দ্রষ্টব্য। ঐগুলি হইতে সুস্পষ্টভাবে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা হইল তাঁহার "সার্বজনীন" ভাব। গণতান্ত্রিক আমেরিকা সম্পর্কে তাঁহার আশা ছিল; ম্যাটসিনির মহাজন্মদাত্রী ইতালির শিল্প, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি চীনদেশকে বিশ্বের ধনভাণ্ডার আখ্যা দেন। পারস্যের বেবিস্ট শহীদদের প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। তিনি হিন্দুদের ভারতবর্ষকে, বৌদ্ধদের ভারতবর্ষকে এবং মুসলমানদের ভারতবর্ষকে সমান চোখেই দেখিতেন। মোগল সাম্রাজ্য তাঁহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত। তিনি যখন আকবরের কথা বলিতেন, তখন তাঁহার চোখে জল আসিত। তিনি চেঙ্গিস খাঁর ঐশ্বর্য সমারোহ এবং ঐক্যবদ্ধ এশিয়ার স্বপ্নকে উপলব্ধি করিতেন এবং তাঁহার পক্ষ লইতেন। তিনি বুদ্ধদেবকে এক অপূর্ব প্রশস্তির বিষয়বস্তু করিয়া তোলেন: "আমি বুদ্ধের দাসানুদাস।"

তাঁহার মানব জাতির ঐক্য সম্পর্কে সহজাত ধারণাটি জাতি ও দেশের যথেচ্ছ বিভাগ ও বিচ্ছেদে বিনষ্ট হয় নাই। তিনি বলেন, তিনি পাশ্চাত্ত্য জগতে শ্রেষ্ঠ হিন্দুর নমুনা এবং ভারতে শ্রেষ্ঠ খৃস্টানের নমুনা দেখিয়াছেন।

সম্পর্কে নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার সমস্ত শক্তি তাঁহার মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদের অবগুণ্ঠন মোচন করিবার ফলে যে হিংস্র মুখমণ্ডলপ্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদের চোখে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের চোখে হিংস্র লুব্ধ ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তিনি প্রথমবার যখন গিয়াছিলেন, তখন আমেরিকা ও ইউরোপের সংগঠন শক্তি এবং আপাতঃদৃষ্ট গণতন্ত্র তাঁহাকে কবলিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এবার তিনি তাহাদের লালসা ও অর্থগৃধ্নুতা, তাহাদের স্বার্থ, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল সংঘবদ্ধতা ও হিংস্র সংগ্রামকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। শক্তিমান সংঘবদ্ধতার সমারোহকে শ্রদ্ধা জানাইবার মতো শক্তি তাঁহার ছিল।

"কিন্তু এক দল নেকড়ের মধ্যে কি সৌন্দর্য আছে?"

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "তাঁহার কাছে পশ্চিমের জীবন যাত্রা নরকের মতো লাগিত।..." বস্তুগত চাকচিক্য আর তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারিল না। শক্তির বলপ্রযুক্ত ব্যয়ের মধ্যে যে কারুণ্য ও ক্লান্তি গোপন আছে, হাস্য-চটুলতার মুখোসের অন্তরালে যে গভীর বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন। তিনি নিবেদিতাকে বলেন:

"পাশ্চাত্ত্যের জীবন যাত্রা অট্টহাস্যের মতো: কিন্তু তাহার তলায় আছে কান্না। উহার সমাপ্তি-ও কান্নাতেই। হাসি, ঠাট্টা, তামাসা, যাহা কিছু সব উপরেই; কিন্তু ভিতরটা বড়োই করুণ।...এখানে (ভারতে) উপরেই যতো বিষাদ, যতো কান্না; কিন্তু ভিতরে আছে নির্বিকার একটা ভাব আর আনন্দ।"[১]

এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টাসুলভ দৃষ্টি তিনি কেমন করিয়া পাইলেন? কখন এবং কোথায় তাঁহার দৃষ্টি বাহ্যিক সকল গৌরবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন পাশ্চাত্ত্যের অন্তরের এই গভীর ক্ষতকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ঘৃণা ও বেদনার, যুদ্ধ ও বিপ্লবের আসন্ন দিনগুলিকে পূর্ব হইতেই প্রত্যক্ষ করিল?[২] তাহা কেহই জানে না। তাঁহার যাত্রার বিবরণী

---

১ *My Master as I Saw Him* পুস্তক, ১৪৫ পৃঃ, তৃতীয় সংস্করণ।

২ ভগিনী ক্রিস্টিনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা হইতে জানা গিয়াছে যে, বিবেকানন্দ, ১৮৯৫ খ্রস্টাব্দেই, প্রথমবার পশ্চিম যাত্রার কালেই পাশ্চাত্ত্যের এই করুণ অবস্থা দেখিতে পাইয়াছিলেন:

"ইউরোপ একটি আগ্নেয়গিরির মুখে বসিয়া আছে। যদি উহার আগুনকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় ভাসাইয়া নিভাইয়া না দেওয়া হয়, তবে উহা হইতে অগ্ন্যুদ্গার ঘটিবে।"

অত্যন্ত খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এবারে তাঁহার সহিত গুডউইনের মতো কেহ ছিলেন না। বড়োই দুঃখের কথা যে, দুই-একটি ব্যক্তিগত পত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে—এইগুলির মধ্যে আলামেডা হইতে মিস্ ম্যাক্‌লেয়ডকে লেখা পত্রখানিই সর্বাপেক্ষা সুন্দর—তাঁহার গন্তব্য স্থান ও উদ্দেশ্যের সাফল্যের কথা ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না।

তিনি কিছুদিন লণ্ডনে থাকার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যান এবং সেখানে প্রায় এক বৎসর থাকেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখেন, অভেদানন্দ তাঁহার বেদান্তের কাজ পূরাদমে চালাইতেছেন। বিবেকানন্দ তুরীয়ানন্দকে নিউ ইঅর্কের নিকটে মণ্ট ক্লেয়ারে বসাইয়া দেন। তিনি নিজে বায়ু পরিবর্তনের জন্য ক্যালিফর্নিয়া যাইতে স্থির করেন। সেখানকার জলবায়ুর ফলে তিনি কয়েক মাস সুস্থ থাকেন। সেখানে তিনি অসংখ্য বক্তৃতা দেন।[১] তিনি স্যান্ ফ্রান্‌সিস্‌কো, ওকল্যাণ্ড ও আলামেডাতে বেদান্তের নূতন কেন্দ্র খোলেন। তিনি সান্তা ক্লারা অঞ্চলে এক শত ষাট একর পরিমাণ বনভূমির এক সম্পত্তি দান হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সেখানে একটি আশ্রম গড়িয়া তোলেন। তুরীয়ানন্দ সেখানে একদল সুনির্বাচিত ছাত্রকে আশ্রমিক জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেন। নিবেদিতা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তিনি নিউ ইঅর্কে হিন্দু নারীর আদর্শ এবং ভারতের প্রবীণ কলাশিল্প সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। রামকৃষ্ণের এই ক্ষুদ্র হইলে-ও সুনির্বাচিত দলটি অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। কাজের উন্নতি হইতে লাগিল; ভাবধারা প্রসারিত হইল।

ভগিনী ক্রিস্টিন আমাদিগকে বিবেকানন্দের সহজ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির আর-ও একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দিয়াছেন:

"বত্রিশ বছর আগে (অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে) তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন: 'পরবর্তী যে আলোড়ন নূতন একটি যুগের সৃষ্টি করিবে, তাহা রাশিয়া বা চীন হইতে আসিবে। আমি ঠিক বলিতে পারি না, কোন্‌টি হইতে, তবে উহা ঐ দুইটি দেশের একটি হইতেই আসিবে'।"

পুনরায়: "পৃথিবীতে এখন তৃতীয় যুগ চলিতেছে। এ যুগে বৈশ্যগণের (ব্যবসায়ীদের) প্রাধান্য আছে। কিন্তু চতুর্থ যুগে শূদ্রের (সর্বহারার) প্রাধান্য ঘটিবে।"

১ সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল পাসাডেনাতে "বাণীবাহক খৃস্ট", লস এঞ্জেলসে "মনের শক্তি", স্যান ফ্রান্সিস্‌কোতে "সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ", "গীতা", "বিশ্বের কাছে বুদ্ধ, খৃস্ট ও কৃষ্ণের বাণী", "ভারতের চারুকলা ও বিজ্ঞান", "মন এবং বিভিন্ন শক্তি ও সম্ভাবনা" ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা। তিনি ক্যালিফর্নিয়ার অন্যান্য স্থানেও বক্তৃতা দেন।

দুর্ভাগ্যবশত অনেকগুলি বক্তৃতা হারাইয়া গিয়াছে। সেগুলিকে টুকিয়া রাখিবার জন্য তিনি গুডউইনের মতো আর কাহাকেও পান নাই।

কিন্তু তাঁহাদের যিনি নেতা, তাঁহার তিন-চতুর্থাংশের সহিত এই পৃথিবীর আর সম্পর্ক ছিল না। এই বনস্পতির চারিদিকে ছায়া ঘিরিয়া দাঁড়াইতেছিল। সেগুলি কি ছায়া ছিল, কিম্বা ছিল অন্য কোন আলোকের প্রতিবিম্ব? তবে সেগুলি আমাদের এই সূর্যালোকের প্রতিবিম্ব ছিল না।...

"আমার জন্য প্রার্থনা কর যে, চির দিনের জন্য যেন আমার কাজ থামিয়া যায়, আমার সমগ্র আত্মা যেন মায়ের মধ্যে তন্ময় হয়।...আমি ভালোই আছি; মানসিক দিক হইতে খুব ভালোই আছি। দেহের শক্তির অপেক্ষা আত্মার শক্তিই বেশি অনুভব করিতেছি। যুদ্ধে যেমন হারিয়াছি, তেমন জিতিয়াছি-ও! আমি আমার পোঁটলা-পুঁটলী বাঁধিয়া সেই 'মহান মুক্তিদাতার' প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। হে শিব! তুমি আমার তরণী ওপারে ভিড়াইয়া দাও! নিজেকে আজ কিশোর মনে হইতেছে, আমি যেন দক্ষিণেশ্বরের সেই বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মুগ্ধ-বিস্ময়ের সহিত রামকৃষ্ণের বিস্ময়কর কথাগুলি শুনিতেছি। এই আমার সত্যিকার স্বভাব; কাজ আর অপরের ভালো করা, সেগুলা আমার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।...আমি আবার তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি; সেই পুরাতন কণ্ঠস্বর—তাহা আমার আত্মাকে আবার রোমাঞ্চিত করিয়া দিতেছে। বন্ধন ছিঁড়িতেছে, প্রেম মরিতেছে, কাজ বিস্বাদ লাগিতেছে; জীবনে আর সে জৌলুস নাই। এখন কেবল প্রভু আমাকে ডাকিতেছেন, বলিতেছেন,...'মৃতরা মৃতের কবর দিক; তুমি আমার সংগে আইস।'...'হে আমার দেবতা, আমি আসিতেছি, আসিতেছি!' নির্বাণ আমার সম্মুখে...সেই নিস্তরংগ, নির্বাত শক্তির মহা সমুদ্র!...আমি আনন্দিত যে, আমি জন্মিয়াছিলাম, আমি আনন্দিত যে, আমি এতো কষ্ট পাইলাম, আমি আনন্দিত যে, মহা ভুল করিলাম, আমি আনন্দিত যে, আমি আবার মহা শান্তির মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছি।...আমি কাহাকে-ও বাঁধিয়া রাখিয়া গেলাম না; আমি কোনো বাঁধন লইয়া গেলাম না।...সেই বৃদ্ধ তো চিরতরে চলিয়া গিয়াছে। সেই পথ প্রদর্শক, সেই গুরু, সেই নেতা আর নাই।..."

ক্যালিফর্নিয়ার প্রদীপ্ত সূর্যের নীচে গ্রীষ্মপ্রধান তরুলতার মধ্যে সেই অপরূপ জলবায়ুতে, বিবেকানন্দের মল্লযোদ্ধাসুলভ ইচ্ছাশক্তি নিজেকে শিথিল করিল। তাঁহার অবসন্ন সত্তা ধীরে ধীরে স্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হইল। তাঁহার দেহ ও আত্মা স্রোতের টানে আপনাকে ছাড়িয়া দিল।...

"হাত-পা দিয়া জলে ঝপাৎ করিয়া একটু শব্দ করিতে-ও সাহস পাইতাম না।

ভয় হইত, পাছে এই বিস্ময়কর নিস্তব্ধতা বিন্দুমাত্র ভঙ্গ হয়। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—তাহা দেখিয়া তোমার মনে হইবে, ইহা নিশ্চয় মায়া! আমার কর্মের পশ্চাতে ছিল উচ্চাশা, আমার প্রেমের পশ্চাতে ছিল ব্যক্তিত্ব, আমার শুদ্ধির পশ্চাতে ছিল আতঙ্ক, আমার পরিচালনার পশ্চাতে ছিল শক্তির আকাঙ্ক্ষা! এখন সেগুলি অদৃশ্য হইতেছে; আমি স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিয়াছি!…মাগো! তুমি আমায় যেখানেই ভাসাইয়া লইয়া যাও, আমি ভাসিয়া সেই নিস্তব্ধ, অদ্ভুত, আজব দেশে তোমার উষ্ণ কোলেই ফিরিয়া আসিতেছি। আমি আসিতেছি—আর অভিনেতার মতো নয়—দর্শকের মতো! আহা! চারিদিকে কী অপরূপ প্রশান্তি! আমার চিন্তাগুলি যেন বহু, বহু দূর হইতে আমার অন্তরের অন্তরলোকে আসিয়া পৌঁছিতেছে। সে যেন বহু দূরের অস্পষ্ট অস্ফুট কাহার কণ্ঠস্বর। সর্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতেছে—মধুর, সুমধুর শান্তি। এ যেন ঘুমাইয়া পড়িবার ঠিক আগের মুহূর্তগুলি—যখন সব কিছুকে ছায়ার মতো দেখায়, ছায়ার মতো লাগে। যখন কোনো ভয় থাকে না, আসক্তি থাকে না, আবেগ থাকে না।…প্রভু, আমি আসিতেছি! এই দুনিয়া আছে, ইহা সুন্দর-ও নয়, কুৎসিত-ও নয়! ইহা যেন সেই অনুভূতি, যাহা কোনরূপ আবেগের সঞ্চার করে না। আহা! ইহা ধন্য! সকল কিছুই সুন্দর লাগিতেছে, সকল কিছুই শুভ মনে হইতেছে। কারণ, আমার কাছে সেগুলি তাহাদের আপেক্ষিক আকার হারাইতেছে। আমার দেহ-ও সেগুলির মধ্যে প্রথমে রহিয়াছে। ওঁ—তৎ সৎ।"[১]

তীর তাহার প্রাথমিক গতির তাড়নায় তাড়িত হইয়া এখনো ঊর্ধ্বে ধাবিত হইতেছিল। তবে তাহা একেবারে শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, যেখানে তাহা জানিত, তাহার পতন আসন্ন।…লক্ষ্যের যে নিষ্ঠুর তাড়না তাহাকে তাড়িত করিয়া লইয়া চলিয়াছিল, তাহা যখন ফুরাইয়া গেল, তখন কী মধুময় ছিল সে মুহূর্ত—পতনের—"ঘুমাইয়া পড়িবার ঠিক আগের মুহূর্তগুলি"! ধনুক এবং লক্ষ্য উভয় হইতে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত হইয়া তীর মহা শূন্যে ভাসিতে লাগিল।…

বিবেকানন্দের তীর তাহার পথক্রম শেষ করিতেছিল। ১৯০০ খৃস্টাব্দের ২০শে জুলাই তিনি মহাসমুদ্র পার হইয়া প্যারিসে গেলেন। সেখানে বিশ্ব প্রদর্শনী উপলক্ষে ধর্মীয় ইতিহাসের এক সম্মিলন হইতেছিল। তাহাতে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। চিকোগোতে যেমন ধর্ম সম্মিলন হইয়াছিল, ইহা সেরূপ ছিল না।

১ আলামেডা হইতে ১৯০০-এর ১৮ই এপ্রিল তারিখে মিস্ ম্যাক্লেয়ডকে লিখিত পত্র।

ক্যাথলিক সম্প্রদায় সেরূপ হইতে দিতে রাজী ছিল না। উহা ছিল বিশুদ্ধভাবে একটি ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক সম্মিলন। বিবেকানন্দের জীবন মুক্তির পূর্বক্ষণে আসিয়া পৌছিয়াছিল। তাই ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির কিছু খোরাক জুটিলে-ও, তাঁহার সত্যিকার আবেগের, তাঁহার সমগ্র সত্তার খাদ্য জুটিল না। বৈদিক ধর্ম প্রকৃতিপূজা হইতে আসিয়াছে কি না, সে বিষয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে সম্মিলনের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলা হইল। তিনি ওপার্টের সহিত তর্ক করিলেন এবং হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি বেদ সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের উপরে গীতা ও কৃষ্ণকে স্থান দিলেন; ভারতীয় নাট্য, চারুকলা ও বিজ্ঞানের উপর গ্রীক প্রভাবকে অস্বীকার করিলেন।

কিন্তু ফরাসী সংস্কৃতির বিষয়েই তিনি তাঁহার অধিকাংশ সময় দেন। তিনি প্যারিসের মানসিক ও সামাজিক গুরুত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হন। ভারতের জন্য লিখিত একটি প্রবন্ধে[১] তিনি বলেন যে, "প্যারিস হইল ইউরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র ও উৎস, সেখানেই পাশ্চাত্ত্যের নীতি ও সমাজ গঠিত হইয়াছিল। এবং প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়-ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আদর্শস্থল। প্যারিস স্বাধীনতার জন্মভূমি; প্যারিস ইউরোপকে এক নূতন জীবন দিয়াছে।"

তিনি তাঁহার বান্ধবী মিসেস ওলি বুল এবং ভগিনী নিবেদিতাকে[২] সংগে লইয়া লাঁনিঅঁতেও কিছুদিন কাটান। সেণ্ট মাইকেলের স্মৃতিদিবসে তিনি মণ্ট সেণ্ট মাইকেল পরিদর্শনে যান। হিন্দু ধর্ম ও রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের সাদৃশ্য সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস ক্রমেই বাড়িতে থাকে।[৩] তাহা ছাড়া, তিনি এমন কি ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে-ও যে এশিয়াবাসীর রক্ত কম-বেশী মিশ্রিত আছে, তাহা আবিষ্কার করেন। ইউরোপ বা এশিয়ার মধ্যে একটি মূলগত স্বাভাবিক পার্থক্য আছে; ইহা অনুভব করা দূরের কথা, ইউরোপ ও এশিয়ার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে ইউরোপ যে পুনরুজ্জীবিত হইবে, এমন একটি দৃঢ় বিশ্বাস-ও তিনি পোষণ

---

১ "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।"

২ শীঘ্রই নিবেদিতা হিন্দু নারীদের উন্নতিকল্পে ইংল্যাণ্ডে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য চলিয়া যান। বিদায়-কালে আশীর্বাদ করিবার সময় বিবেকানন্দ তাঁহাকে এই বলিষ্ঠ কথাগুলি বলেন:

"তুমি যদি আমার হাতে গড়া হও, তবে ধ্বংস হইও। তুমি যদি 'মায়ের' হাতে গড়া হও, তবে বাঁচিয়া থাকিও!"

৩ "খৃস্টান ধর্মের সহিত হিন্দু মানসের কোথাও কোন বিজাতীয়তা নাই", একথা বলিতে বিবেকানন্দ ভালোবাসিতেন।

করেন। কেননা, তাহাতে ইউরোপ প্রাচ্যের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক ভাবধারা লইয়া নিজের প্রাণশক্তি নূতন করিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ফরাসী মানসের সন্ধানে প্যারিসে পাশ্চাত্ত্যের নৈতিক জীবন সম্পর্কে এমন গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন একজন দর্শককে কেবল ফাদার হায়াসিন্থ এবং ঝুঁ'ল বোয়ার মতো দুই ব্যক্তি পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেছিলেন।[১]

তিনি ২৪শে অক্টোবর তারিখে আবার ভিয়েনা ও কন্স্টান্টিনোপলের পথে প্রাচ্যের দিকে রওনা হইলেন। কিন্তু প্যারিসের পর আর কোনো শহর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। অষ্ট্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে তিনি অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে অদ্ভুত একটি মন্তব্য করেন ঃ বলেন যে, তুরস্ক যদি ইউরোপের রুগণ পুরুষ হয়, তবে অষ্ট্রিয়া ইউরোপের রুগ্‌ণ নারী।" ইউরোপ সম্পর্কে তিনি ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠেন। তিনি যুদ্ধের গন্ধ পাইতেছিলেন। যুদ্ধের দুর্গন্ধ চারিদিক হইতে উঠিতেছিল। তিনি বলেন, "ইউরোপ হইল একটা বিবাট সামরিক শিবির।"...

সুফী সন্ন্যাসীদের সহিত সাক্ষাতের জন্য বসফরাসের উপকূলে, অতঃপর আথেন্স ও ইউলিসিসের স্মৃতিবিজড়িত গ্রীসে, এবং অবশেষে কাইরোর জাদুঘরে অল্প সময়ের জন্য নামিলেও, ক্রমেই তিনি বহির্জগৎ সম্পর্কে অধিকতর নির্লিপ্ত হইয়া ধ্যাননিমগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। নিবেদিতা বলেন, পশ্চিমে তাঁহার অবস্থানের শেষ কয়েক মাসে মাঝে মাঝে মনে হইত, চারিদিকে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে, সে সম্পর্কে তিনি যেন সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আত্মা উদারতর

১ তবে প্যারিসে তাঁহার সহিত প্যাট্রিক গেড্সের এবং তাঁহার প্রদেশবাসী জীববিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎ হয়। জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিভার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। জগদীশচন্দ্রের উপর যে আক্রমণ চলিতেছিল, তিনি সেগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তাঁহার সহিত হিরাম ম্যাক্সিমের মতো অদ্ভুত লোকটির-ও সাক্ষাৎ ঘটে। হিরাম ম্যাক্সিমের নাম একটি ধ্বংস যন্ত্রের সহিত জড়িত হইয়া আছে। কিন্তু এইরূপ খ্যাতির অপেক্ষা ভালো কিছু তাঁহার কপালে জোটা উচিত ছিল। এইরূপ খ্যাতির বিরুদ্ধে তিনি নিজে-ও প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তিনি চীন ও ভারতকে ভালোবাসিতেন এবং এই দুই দেশের বিষয়ে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

মিস্ ম্যাক্লেয়ড, ফাদার হায়াসিন্থ (ইনি প্রাচ্যে মুসলমান ও খৃস্টানদের মিলনের জন্য কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন), মাদাম লোয়াসন, ঝুঁ'ল বোয়া এবং মাদাম কালভে তাঁহার সংগে ছিলেন। সন্ন্যাসীর এক অদ্ভুত রক্ষী দল—যে সন্ন্যাসী দীর্ঘ পদক্ষেপে জগৎ ও জীবন হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নির্লিপ্তই সম্ভবত তাঁহাকে অধিক সহিষ্ণু, অধিক উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল।

দিগ্‌বলয়ের পানে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। ইজিপ্টে মনে হইল, তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার শেষ পাতাগুলি উল্টাইয়া লইলেন।

অকস্মাৎ তিনি ফিরিবার জন্য দুর্নিবার আহ্বান শুনিতে পাইলেন। তাই আর একটি দিনও অপেক্ষা করিলেন না, তিনি প্রথম যে জাহাজ পাইলেন, তাহাতেই চড়িয়া একাকী ভারতে ফিরিলেন।[১] তিনি তাঁহার দেহকে চিতাশয্যায় ফিরাইয়া আনিলেন।

১ ১৯০০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে।

১০

প্রয়াণ

তাঁহার পুরাতন ও সুবিশ্বস্ত বন্ধু তাঁহার কিছু আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন। ২৮শে অক্টোবর তারিখে হিমালয়ে তাঁহার স্বহস্তনির্মিত আশ্রমে মিস্টার সেভিয়ারের মৃত্যু হয়। বিবেকানন্দ পৌঁছিয়া মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। কিন্তু ফিরিবার পথে তাঁহার মনে তিনি ইহার আভাস যেন পাইয়াছিলেন। বেলুড়ে বিশ্রামের জন্য না থামিয়াই তিনি মায়াবতীতে তার করিয়া দিলেন যে, তিনি আসিতেছেন। বৎসরের ঐ সময়ে হিমালয়ে আসা খুব কঠিন ও বিপজ্জনক। বিশেষত বিবেকানন্দের মতো স্বাস্থ্যের কাহার-ও পক্ষে। চার দিন বরফের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইল। আবার বিশেষভাবে সে বছর প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল। কুলী বা প্রয়োজনীয় বাহকের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তিনি দুই জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। আশ্রম হইতে একদল লোক পাঠানো হইয়াছিল, পথে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু এই তুষারপাত, কুয়াসা ও মেঘের মধ্যে তিনি হাঁটিতে পারিতেছিলেন না; তাঁহার দমবন্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার সঙ্গীরা উদ্‌বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে বহু কষ্টে মায়াবতী আশ্রমে বহিয়া লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে ১৯০১ খৃস্টাব্দে ৩রা জানুয়ারি তারিখে পৌঁছেন। মিসেস সেভিয়ারের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া, কাজ শেষ হইয়াছে দেখিয়া এবং পাহাড়ের উপর সুন্দর আশ্রমটিকে লক্ষ্য করিয়া বিবেকানন্দ একটি মিশ্রিত আনন্দ ও আবেগ অনুভব করিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বে-ও এই আশ্রমে পক্ষ কালের বেশী থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। হাঁপানীতে তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছিল; সামান্য দৈহিক পরিশ্রমে-ও তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। বলিতেন, "আমার দেহ শেষ হইয়াছে।" ১৩ই জুলাই তিনি তাঁহার ৩৮-তম জন্মদিন পালন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের জোর সর্বদাই অক্ষুণ্ণ ছিল।[১] বিবেকানন্দের ইচ্ছানুসারেই অদ্বৈত আশ্রম অদ্বৈত চিন্তার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। বিবেকানন্দ দেখিলেন, এই অদ্বৈত আশ্রমের একটি কক্ষ রামকৃষ্ণের পূজার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। রামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ আবেগভরে ভালোবাসিতেন এবং

---

১ এই হাঁপানীর শ্বাসরোধক আক্রমণের মধ্যে-ও তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারতের' জন্য তিনটি প্রবন্ধ লেখেন। (সেগুলির মধ্যে একটি ছিল ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে, যে ধর্মতত্ত্বের প্রতি কখনো তাঁহার কোনো প্রীতি ছিল না।)

সে ভালোবাসা সম্প্রতি কয়েক বৎসরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে, অদ্বৈত আশ্রমের এই অপমানে, বিবেকানন্দের ঘৃণার অবধি রহিল না। সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদের উদ্দেশ্যে যে মন্দির উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, সেখানে এইরূপ দ্বৈতবাদী ধর্মগত কোনো দুর্বলতা প্রবেশ করা উচিত হয় নাই, একথা তিনি তীব্রভাবে তাঁহার অনুচরদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।[১]

যে উত্তেজনার তাড়নায় তিনি এখানে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, সেই উত্তেজনার তাড়নায় তাঁহাকে এখান হইতে পলাইতে হইল। কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি ১৮ই জানুয়ারি তারিখে মায়াবতী ত্যাগ করিলেন এবং চার দিন ক্রমাগত পর্বতের পিছল উতরাই ধরিয়া, কখনো বা বরফের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া অগ্রসর হইলেন। অবশেষে ২৪শে জানুয়ারি তারিখে তিনি আশ্রমে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন।[২]

তিনি তাঁহার মাকে লইয়া পূর্ব বঙ্গে ও আসামে, ঢাকায় ও শিলং-এ[৩] তীর্থভ্রমণ করিতে যান এবং অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন। এই ভ্রমণের কথা বাদ দিলে তিনি ১৯০২ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে মাত্র কিছুদিনের জন্য বেলুড়

১ "বুড়াকে আশ্রমে বসানো হইয়াছে" দেখিয়া তিনি যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা বেলুড়ে ফিরিয়া তিনি পুনরায় প্রায় নৈরাশ্যভরেই বলিতে থাকেন। একটা কেন্দ্রকে নিশ্চয় দ্বৈতবাদ হইতে মুক্ত রাখা যাইত। তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে, এই ধরণের পূজা-ও রামকৃষ্ণের চিন্তার বিরোধী ছিল। রামকৃষ্ণের শিক্ষা ও ইচ্ছা অনুসারেই তিনি অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন। "রামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি অদ্বৈতবাদ শিখাইয়াছিলেন। তোমরা অদ্বৈতের অনুসরণ কর না কেন?" (কথাগুলি 'মায়ের'।)

২ ইহা নিশ্চিত যে, এই ক্ষত্রিয় তাঁহার যুদ্ধের মনোভাব বিন্দুমাত্র হারান নাই। আসিবার পথে ট্রেনে এক ইংরেজ কর্নেল তাহার কামরায় একজন ভারতীয়কে দেখিয়া রূঢ়ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং বিবেকানন্দকে বাহির করিয়া দিতে চায়। ফলে, বিবেকানন্দের ক্রোধ ফাটিয়া পড়ে এবং কর্নেলকেই কামরা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হয়।

৩ ১৯০১ খৃস্টাব্দে মার্চ মাসে। তিনি ঢাকায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন। আসামের রাজধানী শিলং-এ তাঁহার সহিত উদারমনা কয়েকজন ইংরেজের পরিচয় হয়। তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয় স্বার্থের সমর্থক চীফ কমিশনার স্যার হেনরি কটন-ও ছিলেন। অন্ধ ধর্মীয় রক্ষণশীলতাপূর্ণ এই অঞ্চলগুলি দিয়া তাঁহার শেষ ভ্রমণের ফলে তাঁহার নিজের ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রমুক্ত পৌরুষ আরো স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অন্ধবিশ্বাসী হিন্দুদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ভগবানকে দেখিবার প্রকৃত পথ হইল মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখা। অতীত যতোই গৌরবময় হউক, কেবল তাহা লইয়া নির্জীবভাবে বাঁচিয়া থাকা অর্থহীন। শ্রেষ্ঠতর কিছু করা, এমন কি শ্রেষ্ঠতর ঋষি হওয়া প্রয়োজন। যাহারা তথাকথিত অবতারে বিশ্বাস করে, তাহাদের প্রতি তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাহাদিগকে তিনি আরো বেশী করিয়া খাইতে এবং মস্তিষ্ক ও পেশীগুলির উন্নতি করিতে উপদেশ দেন।

ছাড়িয়া কাশীতে গিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবনের মহা যাত্রা শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

তিনি গর্বভরে বলিয়াছিলেন, "তাহাতে কি আসে যায়? আমি যাহা করিয়াছি, তাহা দেড় হাজার বছরের পক্ষে-ও যথেষ্ট!"

* * * * *

বেলুড় আশ্রমে তিনি দোতলায় একটি আলো-বাতাসযুক্ত বড়ো ঘরে থাকিতেন। ঘরে তিনটি দরজা ও চারটি জানালা ছিল।[১]

"...প্রশস্ত নদী দীপ্ত সূর্যালোকে নাচিতেছে; শুধু কচিৎ দু-একখানি মালবাহী নৌকার দাঁড় ফেলিবার শব্দে সে স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভঙ্গ হইতেছে।...সর্বত্র সবুজ ও সোনার ছড়াছড়ি। ঘাসগুলি যেন ভেল্‌ভেটের মতো।..."[২]

ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীদের গ্রাম্য জীবনের মতোই তিনি একটি গ্রাম্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। উদ্যানে ও পশুশালায় তাঁহার কাজ চলিল। "শকুন্তলা" নাটকে বর্ণিত ঋষিদের মতো তাঁহার প্রিয় জীবজন্তু তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিল: 'ভগা' কুকুর, 'হাসি' ছাগী, 'মঠরু' ছাগশিশু এবং একটি ছাগল, একটি বক। কতকগুলি হাঁস, কতকগুলি গরু ও ভেড়া।[৩] ছাগশিশুটার গলায় অনেকগুলি ঘণ্টি বাঁধা ছিল। তাহাকে লইয়া তিনি শিশুর মতো খেলিতেন। তিনি যেন ভাবাবেশের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সুন্দর সুগম্ভীর গলায় গান গাহিতেন, যে সকল শব্দ

---

১ তাঁহার মৃত্যুকালে যেমন ছিল, ঘরখানিকে ঠিক সেইভাবেই রাখা হইয়াছে: ঘরে একটি লোহার খাট, একটি লেখার টেবিল, ধ্যান করিবার জন্য একটি কার্পেটের আসন এবং একটি আয়না ছিল। সেই সংগে তাঁহার একটি পূর্ণাকার প্রতিকৃতি এবং রামকৃষ্ণের একটি ছবি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাটে তিনি বড়ো একটা শুইতেন না, মেঝেতে শুইতেই তিনি ভালোবাসিতেন।

২ ১৯০০ খ্রস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের পত্র।

৩ "সত্যই বর্ষা নামিয়াছে। দিনরাত অবিরল জল ঝরিতেছে। চারিদিক ভাসিয়া চলিয়াছে। নদী ফাঁপিয়া উঠিতেছে।...জল বাহির করিবার একটা গভীর নালা কাটিবার কাজে সাহায্য করিতেছিলাম, এইমাত্র ফিরিয়াছি।...আমার বড় বকটার কী আনন্দ! আমার পোষা ছাগলটা মঠ হইতে পলাইয়াছে।...দুঃখের বিষয়, আমার একটা হাঁস কাল মরিয়াছে।...একটা রাজহাঁসের পালক উঠিয়া যাইতেছে।..."

জীবজন্তুগুলিও তাঁহাকে ভালোবাসিত। ছোট ছাগল ছানা মঠরু পূর্বজন্মে তাঁহার আত্মীয় ছিল, তিনি এইরূপ ভাণ করিতেন। মঠরু তাঁহার ঘরেই ঘুমাইত। হাসিকে দুহিবার আগে সর্বদা তিনি তাহার অনুমতি চাহিতেন। ভগা হিন্দু অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করিত। শঙ্খ-কাঁসরঘণ্টা ধ্বনি-যোগে গ্রহণ শেষ হইয়াছে ঘোষণা করা হইলে সে গঙ্গা-স্নান করিত।

তাঁহার খুব ভালো লাগিত, সেগুলিকে তিনি বারে বারে উচ্চারণ করিতেন। এইভাবে সময় কাটিত, সেদিকে তাঁহার খেয়ালই থাকিত না।

কিন্তু সেই সংগে নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও কঠোর হস্তে কি ভাবে আশ্রম পরিচালনা করিতে হয়, তাহাও তিনি জানিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই তিনি শিক্ষানবীশদিগকে যোগাভ্যাস শিখাইবার জন্য বেদান্তের ক্লাস করিতেন। তিনি কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতেন, পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি কঠোরভাবে দৃষ্টি রাখিতেন সারা সপ্তাহে কখন কি কাজ করিতে হইবে, তাহার সূচী প্রস্তুত করিয়া দিতেন, এবং দৈনন্দিন কাজ নিয়মিতভাবে হইতেছে কিনা সেদিকে সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতেন। কোনো অবহেলা বা ত্রুটি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না।[১] তিনি তাঁহার চারিদিকে একটি শৌর্যপূর্ণ আবহাওয়া,—"একটি জ্বলন্ত জঙ্গল"[২] রক্ষা করিয়া চলিতেন, যাহার মধ্যে ভগবান সর্বদাই উপস্থিত থাকিতেন! তিনি একবার উঠানে একটি গাছের তলায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, আশ্রমবাসীরা উপাসনার জন্য চলিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন:

তোমরা ব্রহ্মকে খুঁজিতে কোথায় চলিয়াছ? তিনি তো সর্ব বস্তুতেই বিদ্যমান। এখানে এই তো দৃষ্টিগোচর ব্রহ্ম রহিয়াছেন! যাহারা দৃশ্যমান্ ব্রহ্মকে ফেলিয়া অন্য জিনিসে মন দেয়, তাহাদিগকে ধিক্! এই তো ব্রহ্ম রহিয়াছেন,

১ নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজিত। ভোর চারটায় বাজিত ঘুম ভাঙাইবার ঘণ্টা। আধঘণ্টা বাদে সন্ন্যাসীরা ধ্যান করিবার জন্য মন্দিরে যাইতেন। কিন্তু বিবেকানন্দ রোজ সকলের আগেই যাইতেন। তিনি তিনটার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া উপাসনাকক্ষে গিয়া উত্তরমুখে বসিয়া দুই ঘণ্টার-ও অধিককাল ধ্যান করিতেন। তিনি 'শিব' 'শিব' বলিয়া যোগাসন হইতে উঠিবার পূর্বে কেহই উঠিতেন না। তিনি একটি প্রশান্ত আনন্দময়তার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং তাহা তাঁহার চারিদিকের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিতেন। একদিন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে উপাসনাকক্ষে আসিয়া সেখানে মাত্র দুইজন সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। ফলে, তিনি সমগ্র আশ্রমের উপর, এমন কি বড় বড় সন্ন্যাসীদের উপর-ও, অবশিষ্ট দিন অনাহারে থাকিবার এবং ভিক্ষা করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবার আদেশ দিলেন। এইরূপ কঠোরতার সহিত তিনি সম্প্রদায়ের প্রকাশনগুলির-ও তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি ভাবাতিশয্য এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কণামাত্রকে ঐ সকল প্রকাশনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন না। ঐগুলিকে তিনি নির্বুদ্ধিতা আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে ঐগুলি জগতে সর্বাপেক্ষা অমার্জনীয় অপরাধ ছিল।

২ ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত মুশার জীবনের একটি ঘটনার সম্বন্ধে বলা হইতেছে। ভগবান একটি জঙ্গলের মধ্য হইতে তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন। ('বহিরাগমন,' ৩)

তাঁহাকে হাতের মধ্যকার ফলের মতো অনুভব করা যায়। দেখিতে পাইতেছ না? এইতো, এইতো, এইতো ব্রহ্ম!…"

তাঁহার কথাগুলিতে এমন শক্তি ছিল যে, প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হইয়া প্রায় পনের মিনিট কাল সেখানেই পাথরের মতো অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে বলিলেন:

"যাও, এখন উপাসনা কর গে।"[১]

কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, বহুমূত্র রোগের আকার ধারণ করিল: পাগুলি ফুলিল এবং দেহের কোনো কোনো অঙ্গের অনুভূতি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তিনি একরকম ঘুমাইতেই পারিলেন না। ডাক্তার তাঁহাকে সকল রকম পরিশ্রম ছাড়িতে বলিলেন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য করিলেন। এমন কি জল খাওয়া-ও নিষিদ্ধ হইল। তিনি নির্লিপ্ত ধৈর্যের সংগে সব মানিয়া চলিলেন। একুশ দিন ধরিয়া তিনি এক বিন্দু জল-ও খাইলেন না; এমন কি মুখ ধুইবার সময়-ও না। বলিলেন:

"দেহটা মনের মুখোস মাত্র। মন যাহা হুকুম করিবে, দেহ তাহা মানিতে বাধ্য। আমি এখন জলের কথা মনে আনি না; তাই জল খাইবার ইচ্ছা-ও আমার হয় না।…দেখিতেছি, আমি ইচ্ছা করিলে সব কিছুই করিতে পারি।"

আশ্রমের কর্তা বিবেকানন্দের অসুস্থতার জন্য আশ্রমের কাজ ও উৎসবাদি বন্ধ রহিল না। তিনি উৎসবগুলিকে আনুষ্ঠানিক এবং সমারোহময় করিতে চাহিতেন। তাঁহার যে মুক্ত মন সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে কোনো লোকনিন্দার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিত না, এবং অন্ধবিশ্বাসীদের বর্বর গোড়ামির ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইত,[২] তাহাই উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাচীন কাব্যময়তাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। কারণ, এই সকল উৎসব-অনুষ্ঠানই সরল বিশ্বাসীদের মনে ধর্মবিশ্বাসের ধারাকে জীয়াইয়া রাখে।[৩]

১ ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের শেষে।

২ আশ্রম প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে কিছুদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামের গোঁড়া লোকেরা আশ্রমের কার্যকলাপে লজ্জাবোধ করিত এবং বেলুড়ের সন্ন্যাসীদের দুর্নাম রটাইত। ইহা শুনিয়া বিবেকানন্দ বলেন: "বেশ তো। ইহাই তো প্রকৃতির নিয়ম। সকল ধর্মপ্রবর্তকের বেলায় ইহাই ঘটিয়াছে। পীড়ন ভিন্ন উচ্চ ভাবধারা কখনো সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।"

৩ মিস্ ম্যাক্‌লেয়ড আমাকে বলেন: "ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দ অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন ছিলেন এবং সমাজ জীবনে সেগুলির বন্ধন মানিয়া চলিতে আপত্তি করিতেন। কিন্তু আহারের সময়েও তিনি অনুষ্ঠানের অনুমতি দেন। কোন পুণ্যাত্মার মৃত্যুদিবস পালনের সময়ে আহারকালে মৃতের জন্য একটি

সুতরাং ১৯০১ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে দুর্গোৎসব হইল।[১] আমাদের ক্রিস্‌মাসের মতোই দুর্গোৎসব বাংলার জাতীয় উৎসব। সুবাসিত শরতের সানন্দ সমারোহে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বাঙ্গালীরা পরস্পরের সহিত মিলিত হন, পরস্পরকে উপহার দেন। দুর্গোৎসবের সময় আশ্রমে তিন দিন ধরিয়া শত শত দরিদ্রকে খাওয়ানো হইল। ১৯০২ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের সময়ে ত্রিশ হাজারের-ও অধিক তীর্থযাত্রী বেলুড়ে আসিলেন। কিন্তু স্বামীজী জ্বর-জ্বর অবস্থায় ফোলা পা লইয়া আপনার কক্ষে আবদ্ধ রহিলেন। তিনি জানালা দিয়া সংকীর্তন দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে যে শিষ্য শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলে তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া অতিবাহিত তাঁহার সেই দিনগুলির কথা আবার মনে পড়িতে লাগিল। স্মৃতিগুলি তাঁহার নিকট জীবন্ত হইয়া উঠিল।

তখনো তাঁহার জন্য একটি মহান আনন্দ অবশিষ্ট ছিল। একজন বিখ্যাত অভ্যাগত, ওকাকুরা, তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন।[২] ওকাকুরার সহিত একটি জাপানী বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ ওডা-ও আসিয়াছিলেন। তিনি পরবর্তী ধর্ম সম্মিলনে বিবেকানন্দকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। এই সাক্ষাৎকারটি অতিশয় মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। ইঁহারা দুজনেই দুজনের সহিত আত্মীয়তা স্বীকার করিলেন।

বিবেকানন্দ বলিলেন, "আমরা দুই ভাই; পৃথিবীর দুই প্রান্ত হইতে আসিয়া আবার আমাদের দেখা হইল।"[৩]

ওকাকুরা বিবেকানন্দকে অবিস্মরণীয় বোধ-গয়ার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিবেকানন্দ কয়েক সপ্তাহ একটু সুস্থ ছিলেন। তাই

আসন নির্দিষ্ট থাকিত এবং সেই আসনের সম্মুখে ভোজ্য দেওয়া হইত। তিনি বলেন, মানুষের দুর্বলতার জন্য যে এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করেন। কারণ, কোনো কাজকে নিয়ম অনুসারে বারে বারে না করিলে মানুষের মনে কোনো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে না বা তাহা তাহার স্মরণ থাকে না। তিনি বলেন: 'উহাকে বাদ দিলে (নিজের কপাল ছুঁইয়া) এখানে বুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না'।"

১ কিন্তু বলিদান তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২ ১৯০১ খৃস্টাব্দের শেষে।

৩ মিস্ ম্যাক্‌লেয়ড কর্তৃক কথিত। বিবেকানন্দ মিস্ ম্যাকলেয়ডকে এই সাক্ষাৎকার কালে তিনি কিরূপ অনুভব করিতেছিলেন, তাহা বলেন।

সেই সুযোগে তিনি ওকাকুরার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং শেষ বারের জন্য কাশী দেখিতে গেলেন।[১]

বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরে যে সকল আলাপ, পরিকল্পনা ও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার শিষ্যরা বিশ্বস্ততার সহিত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের পুনর্জাগরণের চিন্তাটি-ই সর্বদা বিবেকানন্দকে ব্যস্ত রাখিত। আরো দুইটি চিন্তা তাঁহার অন্তরের অত্যন্ত কাছাকাছি ছিল: এক, কলিকাতায় এমন একটি বৈদিক কলেজের স্থাপনা, যেখানে বিখ্যাত অধ্যাপকরা প্রাচীন আর্য সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা দিবেন; দুই, গঙ্গার তীরে বেলুড়ের মতো মেয়েদের একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করা—যে মঠ "মায়ের" (রামকৃষ্ণের বিধবা পত্নীর) পরিচালনায় থাকিবে।

কিন্তু একদিন তিনি সাঁওতাল মজুরদের সহিত আলাপের সময়ে তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণ প্রাচুর্য হইতে অন্তরের যে কথাগুলি সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে-ই তাঁহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক বাণী নিহিত আছে। সাঁওতালরা গরীব লোক; তাহারা মঠের কাছে মাটি কাটিতেছিল। বিবেকানন্দ তাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; তিনি তাহাদের সহিত মিশিতেন, আলাপ করিতেন, তাহাদিগকে আলাপ করাইতেন, এবং তাহারা যখন নিজের ছোট ছোট দুঃখের

১ ১৯০২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে। তাঁহারা উভয়ে একত্রে বিবেকানন্দের জন্মদিনে বোধগয়া দর্শন করেন। কাশীতে ওকাকুরা বিবেকানন্দের নিকট বিদায় লন। ইঁহারা দুজনে পরস্পরকে ভালোবাসিতেন এবং দুইজনের কর্তব্যের বিশালত্ব স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা পার্থক্য অস্বীকার করিতেন না। ওকাকুরার একটি স্বকীয় রাজ্য ছিল, সে রাজ্য শিল্পের। কাশীতে বিবেকানন্দ তরুণদের লইয়া একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘ তাঁহার অনুপ্রেরণায় অসুস্থ যাত্রীদিগকে সাহায্য, আহার ও সেবা দিবার জন্য সংগঠিত হয়। এই ছেলেদের সম্পর্কে বিবেকানন্দ গর্ব বোধ করিতেন এবং তাহাদের জন্য "রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের আবেদনটি" তিনি নিজে লিখিয়া দেন।

কাউন্ট কেইজারলিং কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন করেন এবং একটি গভীর ছাপ লইয়া যান: "ইহার অপেক্ষা অধিক হাসি-খুশির আবহাওয়া আমি অন্য কোনও হাসপাতালে দেখি নাই। মুক্তির নিশ্চয়তা সকল বেদনাকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিবেশীর প্রতি-ও ভাবটি এখানে অপূর্ব। তাহা পুরুষ শুশ্রূষাকারীদিগকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা সত্যই 'ভগবৎ-প্রণোদিত' রামকৃষ্ণের শিষ্য!" ("দার্শনিকের ভ্রমণপঞ্জী", ১ম খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ।) ইঁহারা যে বিবেকানন্দের নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেইজারলিং ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে,—যদি-ও সহানুভূতির সহিত—কিছু বলিলেও, বিবেকানন্দ সম্পর্কে একেবারে নীরব।

কাহিনী বলিত, তখন তিনি সহানুভূতিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন। তিনি একদিন তাহাদের জন্য একটি সুন্দর ভোজ দিলেন। ভোজের সময় বলিলেন:

"তোমরা নারায়ণ। আজ আমি সাক্ষাৎ নারায়ণকে ভোজন করাইতেছি।..."

তারপর তিনি তাঁহার শিষ্যদের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন:

"এই গরীব নিরক্ষর মানুষগুলি কী সরল ভাখো! তোমরা কি ইহাদের কণামাত্র দুঃখ লাঘব করিতে পারিবে না? যদি না পারো, তবে গেরুয়া পরিয়া লাভ কি?...আমি মাঝে মাঝে ভাবি: মঠ আশ্রম প্রভৃতি গড়িয়া লাভ কি? সেগুলি বিক্রয় করিয়া টাকা পয়সা গরীবদের মধ্যে, দুঃস্থ নারায়ণদের মধ্যে, বিলাইয়া দিলে হয় না? আমরা, যাহারা গাছ-তলাকে আশ্রয় করিয়াছি, তাহাদের আবার ঘর কি হইবে? হায়! দেশের লোকের যখন মুখে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই, তখন আমরা মুখে গ্রাস তুলি কেমন করিয়া?...মা গো! এর কি কোনো প্রতীকার নাই? তোমরা জানোই তো আমার পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম প্রচারে যাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল দেশের এই মানুষদের জন্য কোনো উপায় খুঁজিয়া বাহির করা। ইহাদের দুঃখদারিদ্র্য দেখিয়া আমি ভাবি: কি কাজ এই সব শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া? এই সব মূর্তির সম্মুখে বাতি ঘুরাইয়া উপাসনার আড়ম্বর করিয়া? কি কাজ পাণ্ডিত্যে, কি কাজ শাস্ত্রপাঠে, কি কাজ ব্যক্তিগত মুক্তির লোভে সাধনায়? এসব ফেলিয়া গ্রামে গ্রামে যাই, দরিদ্রের সেবায় জীবন দিই, আমাদের উন্নত চরিত্র, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সংযত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া ধনীদিগকে দরিদ্রের প্রতি তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলি, অর্থ সংগ্রহ করিয়া কিম্বা অন্য উপায়ে দীন-দুঃখীর সেবা করি।...হায়রে! আমাদের দেশে দীন-দুঃখীদের কথা কেহ ভাবে না! যাহারা জাতির মেরুদণ্ড, যাহারা খাদ্য উৎপন্ন করে, যাহারা এক দিন কাজ বন্ধ করিলে শহরে হাহাকার পড়িয়া যায়—তাহাদের জন্য আমাদের দেশে কে সহানুভূতি দেখায়, তাহাদের সুখে-দুঃখে কে অংশ লয়? ভাখো, হিন্দুদের সহানুভূতির অভাবেই হাজার হাজার পারিয়া আজ মাদ্রাজে খৃস্টান হইয়া যাইতেছে! ভাবিও না, কেবল ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা খৃস্টান হইতেছে। হইতেছে, কারণ তাহারা তোমাদের সহানুভূতি পায় না! তোমরা রাত্রিদিন তাহাদিগকে বলিতেছ: আমাদের ছুঁইও না! এটা ছুঁইও না, ওটা ছুঁইও না! ভ্রাতৃত্ব বোধ বা ধর্মবোধ কি আর দেশে আছে? কেবল আছে অস্পৃশ্যতা! এই সমস্ত প্রথা যেগুলি মানুষকে ছোট করিয়া দেয়, সেগুলিকে লাথি মারিয়া দূরে সরাইয়া ফেল! আমার ইচ্ছা করে,

আমি অস্পৃশ্যতার এই সমস্ত বাধাকে ধ্বংস করিয়া সকলকে একত্রে করিয়া বলি: এসো, দীন-দুঃখীরা এসো। এসো নিপীড়িতরা, এস নিষ্পেষিতরা, এস! রামকৃষ্ণের নামে আমরা অভিন্ন, আমরা এক! তাহাদের যদি তুলিয়া না ধরো, তবে মা (ভারতভূমি) কখনো জাগিবেন না! আমরা যদি তাহাদের মুখে অন্ন, দেহে বস্ত্র দিতে না পারি, তবে কি কাজ আমাদের? হায়রে! তাহারা দুনিয়ার হালচাল বুঝে না, তাই তাহারা রাত্রিদিন খাটিয়া-ও কায়ক্লেশে কোনরূপে দুটি অন্নের সংস্থান করিতে পারে না! তাহাদের চোখের বাঁধন খুলিয়া দাও! সেজন্য তোমাদের সকল শক্তি একত্রিত কর! আমি দিবালোকের মতো স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই একই ব্রহ্ম, একই শক্তি, যিনি আমার মধ্যে আছেন, তিনি তাহাদের মধ্যে-ও আছেন! শুধু প্রকাশের তারতম্য—এইমাত্র। তোমরা কি পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো জাতির উত্থান দেখিয়াছ, যে জাতির সমগ্র দেহে জাতীয় শোণিত সমান ভাবে সঞ্চালিত হয় নাই? নিশ্চয় জানিও, যে দেহের একটি অঙ্গ পঙ্গু, সে দেহের দ্বারা কোনো শ্রেষ্ঠ কর্ম কখনো হইতে পারে না।…"

একজন অনাশ্রমিক শিষ্য বলেন যে, কিন্তু ভারতে ঐক্য ও সংগতির বিধান করা দুষ্কর।

বিবেকানন্দ বিরক্ত হইয়া তাহার জবাবে বলেন:

"যদি কোনো কাজকে দুষ্কর বলিয়া ভাবো, তবে এখানে আর আসিও না। ভগবানের কৃপায়, সমস্ত কিছুই সহজসাধ্য হইয়া যায়। তোমাদের কর্তব্য হইল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দীন-দুঃখীর সেবা করা। তোমাদের কাজের ফল বিবেচনা করিবার তোমাদের কি অধিকার আছে? তোমাদের কর্তব্য হইল কাজ করিয়া যাওয়া। দেখিবে, ঠিক সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে—কাজ আপনিই চলিতে থাকিবে।…তোমরা সকলে বুদ্ধিমান যুবক, তোমরা সকলে আমার শিষ্য বলিয়া স্বীকার কর—বলো তো, তোমরা কে কি করিয়াছ? তোমরা অপরের জন্য তোমাদের একটা জন্ম-ও কি দিতে পারো না? বেদান্ত পাঠ, ধ্যান-ধারণা, যোগাভ্যাস—এসব পর জন্মের জন্য তুলিয়া রাখো! এই দেহকে অপরের সেবায় নিয়োগ করো—তাহা হইলেই জানিব, তোমরা আমার কাছে বৃথা আসো নাই!"

একটু বাদে তিনি আবার বলেন:

"এতো তপস্যা করিয়া এই সত্যটুকু আমি জানিয়াছি যে, 'তিনি' সকলের মধ্যেই আছেন। ইহারা সকলেই 'তাঁহার' বহুরূপে প্রকাশ মাত্র। আর অন্য

কোনো ভগবানের সন্ধান করিতে হইবে না! যে সকলের সেবা করে, কেবল সে-ই ভগবানের পূজা করে!"

এই মহান চিন্তায় কোনো আবরণ, কোনো প্রচ্ছন্নতা ছিল না। তাহা ছিন্ন মেঘের অবকাশে অস্ত-সূর্যের মতো উজ্জ্বল মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল: সকল মানুষ সমান, সকলেই সেই একই ভগবানের সন্তান, সকলের মধ্যেই সেই একই ভগবান রহিয়াছেন! আর কোনো ভগবান নাই! যে ভগবানের সেবা করিতে চায়, তাহাকে মানুষের সেবা করিতে হইবে—এবং প্রথমে হীনতম, দীনতম, পতিততম মানুষের সেবা। বাধাবন্ধ ভাঙিয়া ফেল! অস্পৃশ্যতার, অমানুষিকতার জবাব দাও! দুই বাহু প্রসারিত করিয়া মহানন্দে গাহিয়া উঠ: "এস, এস, আমার ভাই!"

বিবেকানন্দের শিষ্যরা এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। বিবেকানন্দ অবিরাম অশ্রান্তভাবে দীন-দুঃখী ও পতিতের সেবা করিলেন। বিশেষত, সাঁওতালদের প্রতি তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি রহিল। মৃত্যুকালে তাহাদিগকে তিনি তাঁহার শিষ্যদের হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

"এস দরিদ্র, এস নিঃস্ব! এস নিপীড়িত, এস নিষ্পেষিত! আমরা অভিন্ন, আমরা এক!"

এই ধ্বনি বিবেকানন্দ তুলিয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে অপর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার এই মশাল স্বহস্তে লইলেন, এবং অস্পৃশ্যদিগকে তাহাদের হৃত অধিকার ও হৃত মর্যাদা ফিরাইয়া দিবার জন্য পবিত্র সংগ্রাম শুরু করিলেন। সে ব্যক্তি এম. কে. গান্ধী।

মুমূর্ষু, শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁহার মহান দম্ভ দম্ভের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করিল; আবিষ্কার করিল, প্রকৃত মহানত্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে—"সুবিনীত বীরের জীবনের মধ্যে"[১]—নিহিত আছে।

তিনি নিবেদিতাকে বলেন: "বয়স বাড়ার সংগে সংগে আমি দেখিতেছি যে, আমি ছোট ছোট জিনিসের মধ্যেই বিরাটের সন্ধান করিয়াছি।...বড় পদে

১ আমি এই কথাগুলিকে আমার একটি চিন্তা-সংকলনের নাম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছি।

থাকিলে যে-কেহ বড় হইতে পারে। এমন কি কাপুরুষ-ও পাদপ্রদীপের আলোর ঔজ্জ্বল্যে সাহসী হইয়া ওঠে। জগৎ দেখে !. কিন্তু ক্রমেই আমার নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে যে, যে কীট নীরবে মুহূর্তের পর মুহূর্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাহার কর্তব্য করিয়া চলিয়াছে, প্রকৃত বিরাটত্ব তাহার মধ্যে-ই নিহিত আছে।”

মৃত্যু যতোই নিকটে আসিতে লাগিল, তিনি ততোই নির্ভয়ে তাহার দিকে চোখাচোখি তাকাইলেন, তাঁহার সকল শিষ্যকে, এমন কি সমুদ্রপারের শিষ্য-দিগকে-ও স্মরণ করিলেন। তাঁহার প্রশান্ত ভাব দেখিয়া সকলের এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিল যে, তিনি আরো তিন-চার বৎসর বাঁচিবেন। কিন্তু তিনি নিজে জানিতেন, তাঁহার যাওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু নিজের কাজকে অপরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া যাইতে তাঁহার কষ্ট হইতেছে, এমন কোনো ভাব তিনি প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন ঃ

“লোকে সর্বদা শিষ্যদের সহিত থাকিয়া তাহাদিগকে কী ভাবেই না নষ্ট করে !”

শিষ্যরা যাহাতে স্ব স্ব উন্নতি করিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন আছে, ইহা-ও বিবেকানন্দ অনুভব করিলেন। দৈনন্দিন কোনো বিষয়ে তিনি মতামত দিতে অস্বীকার করিলেন ঃ

“এই সকল বাহিরের ব্যাপারে আমি আর মাথা গলাইতে চাহি না। আমি রওনা হইয়াছি।”

১৯০২ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবারে, সেই পরম দিনে, তাঁহাকে অত্যন্ত সবল ও প্রফুল্ল দেখাইতে লাগিল। কয়েক বছরের মধ্যে এমন সবল ও প্রফুল্ল তাঁহাকে দেখা যায় নাই। তিনি খুব ভোরেই ঘুম হইতে উঠিলেন। উপাসনা মন্দিরে গিয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল দরজা-জানালাগুলি খুলিয়া দেওয়া। কিন্তু সেদিন তিনি সমস্ত জানালা কপাট বন্ধ করিয়া খিল দিলেন। সেখানে তিনি একাকী বেলা আটটা হইতে এগারোটা পর্যন্ত ধ্যানস্থ রহিলেন এবং একটি সুন্দর শ্যামা-সংগীত গাহিলেন। তারপর যখন মন্দির হইতে উঠানে নামিলেন, তখন তাঁহার মধ্যে একটি রূপান্তর ঘটিয়াছে। তিনি শিষ্যদের মধ্যে বসিয়া বেশ ক্ষুধার সংগেই আহার করিলেন এবং আহারের অব্যবহিত পরেই তিনি তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে একটানা তিন ঘণ্টা ধরিয়া বেশ সজীব ও সহাস্যভাবেই সংস্কৃতে পাঠ দিলেন। তারপর তিনি প্রেমানন্দকে সংগে লইয়া বেলুড় রোড ধরিয়া প্রায় দুই মাইল হাঁটিয়া আসিলেন। তিনি একটি বৈদিক কলেজ সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনার কথা

জানাইলেন। বৈদিক বিষয়ের পাঠ ও আলোচনা সম্পর্কে আলাপ-ও করিলেন। বলিলেন, "উহাতে কুসংস্কার বিনষ্ট হইবে।"

সন্ধ্যা হইল—সন্ন্যাসীদের সহিত তাঁহার শেষ সস্নেহ সাক্ষাৎ ঘটিল, তিনি বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের কথা বলিলেন :

"ভারত যদি তাহার ভগবৎ সন্ধান চালাইয়া যাইতে পারে, তবে তাহার মৃত্যু নাই। কিন্তু সে যদি রাজনীতি করে, সামাজিক দ্বন্দ্বে নামে, তবে সে মরিবে।"[১]

সাতটা হইল।...মঠে আরতির ঘণ্টা বাজিল।...বিবেকানন্দ তাঁহার কক্ষে গিয়া গঙ্গার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নির্জনে ধ্যান করিবার ইচ্ছায় তাঁহার সংগে যে তরুণ সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহাকে তিনি চলিয়া যাইতে বলিলেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে তিনি সন্ন্যাসীকে ডাকিলেন এবং মেঝেতে বাম পাশ মাড়িয়া নীরবে শুইলেন এবং নিশ্চল হইয়া রহিলেন। মনে হইল তিনি ধ্যান করিতেছেন। ঘণ্টা খানেক অতীত হইলে তিনি ঘুরিয়া শুইলেন, একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—কয়েক সেকেণ্ড নীরবে কাটিল—তাঁহার চোখের তারা দুইটি চোখের ঠিক মাঝখানে নিবদ্ধ হইল—আবার একবার তিনি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন...তারপর চিরতরে নীরব হইয়া গেলেন!

স্বামীজীর একজন সতীর্থ বলেন, "তাঁহার নাকের মধ্যে, মুখের পাশে এবং দুই চোখে সামান্য রক্ত পড়িয়াছিল।"

মনে হইল, তিনি স্বেচ্ছায় কুণ্ডলিনীর শক্তিতে[২] আবিষ্ট হইয়া—পরম ও চরম সমাধির মধ্যেই প্রস্থান করিয়াছেন। যখন তাঁহার কাজ শেষ হইবে, কেবল তখনই রামকৃষ্ণ তাঁহাকে এই সমাধিলাভের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।[৩]

তখন বিবেকানন্দের বয়স উনচল্লিশ বৎসর।[৪]

১ মিস্ ম্যাক্‌লেয়ড এই কথাগুলি আমাকে বলেন।

২ সেদিন আলোচনা প্রসংগে সুষুম্না প্রবাহ সম্পর্কে-ও আলোচনা হয়; এই সুষুম্না প্রবাহ দেহের ছয়টি "পদ্মের" মধ্য দিয়া উত্থিত হয়।

৩ আমি আমার বিবরণীতে বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের সাহায্য লইয়াছি। ঐ সকল বিবরণের মধ্যে কেবলমাত্র খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। ডাক্তারদের সহিত আলোচনা করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজন মৃত্যুর দুই ঘণ্টা বাদে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ও সন্ন্যাস রোগের ফলে বিবেকানন্দের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের দৃঢ় ধারণা যে, তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন। তবে এই দুই রকমের ব্যাখ্যার মধ্যে বিরোধ নাই। ভগিনী নিবেদিতা পরদিন আসিয়া পৌছেন।

৪ তিনি বলিয়াছিলেন: "আমি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচিব না।"

পরদিন রামকৃষ্ণের মতোই তাঁহাকে তাঁহার সতীর্থ ও শিষ্য সন্ন্যাসীরা কাঁধে করিয়া জয়ধ্বনি দিয়া বহিয়া লইয়া চলিলেন।

আমার কল্পনায় আমি শুনিতে পাইতেছি, সেই রামনাডে তাঁহার বিজয় অভিযান কালে যেমন 'জুডাস ম্যাকাবিয়াসের' মিলিত সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই ভাবে আজি-ও তাঁহার এই শেষ অভিযানে তাহাই ধ্বনিত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্ব-বাণী

"শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন : আমিই সেই সূত্র, যাহা মুক্তার মতো এই সকল বিভিন্ন ধারণার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

—"মায়া ও ভগবৎ-ধারণার বিকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধ, বিবেকানন্দ

বিশ্ববাণী

১

মায়া ও মুক্তির পথে অভিযান

যে দুইজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয়ের জীবন-কথা আমি এইমাত্র বিবৃত করিলাম, তাঁহাদের চিন্তাধারা সম্পর্কে যুক্তিতর্ক অবতারণা করিবার ইচ্ছা আমার বর্তমানে নাই। রামকৃষ্ণের মতোই বিবেকানন্দের চিন্তাগুলি তাঁহার ব্যক্তিগত আবিষ্কার ছিল না। এই চিন্তাধারা হিন্দু ধর্মের গভীরে নিহিত আছে। সরল ও সুবিনীত রামকৃষ্ণ কখনো কোন নূতন দার্শনিক মতবাদের প্রবর্তক বলিয়া দাবী করেন নাই। বিবেকানন্দ অধিকতর মূর্ধা-ধর্মী হওয়ায় নিজের মতবাদ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি-ও জানিতেন ও মানিতেন যে, তাঁহার এই মতবাদের মধ্যে নূতন কিছুই নাই। অন্যপক্ষে, তিনি তাঁহার মতবাদের গৌরবময় আধ্যাত্মিক সুপ্রাচীনতাকে তাহার সমর্থনেই ব্যবহার করিতে চাহিতেন। তিনি বলিতেন, "আমিই শংকর।"

(বর্তমান যুগে মানুষ নিজেকে কোনো চিন্তাধারার উদ্ভাবক বা অধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করে। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা নিশ্চয় রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ উভয়কেই হাসাইয়া দিত। আমরা জানি, মানব জাতির চিন্তাধারা সংকীর্ণ বৃত্তপথে ঘূর্ণিত হইতেছে; সেগুলি কখনো আত্মপ্রকাশ করে, আবার কখনো অন্তর্হিত হয়, কিন্তু সেগুলি সর্বদাই বর্তমান থাকে। তাহাছাড়া, যে সকল চিন্তাকে আমাদের নূতনতম মনে হয়, প্রায়ই দেখা যায়, বাস্তবিক পক্ষে সেগুলি পুরাতনতম; কেবল জগৎ সেগুলিকে সুদীর্ঘ কাল ভুলিয়া ছিল এই মাত্র।)

সুতরাং আমি পরমহংস এবং তাঁহার মহান শিষ্যের হিন্দু ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনার বিপুল অথচ অনর্থক কার্যে হাত দিতে প্রস্তুত নই। কারণ, ঐ প্রশ্নের গভীরে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল হিন্দুধর্মের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হইবে না। ভারতবাসীরা সাধারণত ভাবেন, তাঁহাদের এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, অতীন্দ্রিয় ভাবধারা ও দার্শনিক মতবাদ বিশেষভাবে তাঁহাদেরই। কিন্তু, প্রকৃত-পক্ষে, সেগুলি সেই সংগে পাশ্চাত্যের দুইটি ধর্মীয় দার্শনিক মতবাদের-ও,—গ্রীক ও খৃস্টান মতবাদেরও ভিত্তি স্বরূপ। সেই অসীম সর্বব্যাপী পরম পুরুষ, যিনি প্রকৃতির

মধ্যে আপনাকে অনবরত উৎসাহিত করিতেছেন, অথচ সেই সংগে অণুপরমাণুর মধ্যেও নিহিত আছেন—বিশ্বময় যে পরম দেবতার প্রকাশ ঘটিতেছে, অথচ প্রত্যেকের আত্মায় যাঁহার স্বাক্ষর বিদ্যমান—সেই অসীম শক্তির সহিত পুনর্মিলনের বিভিন্ন পন্থা—বিশেষভাবে সামগ্রিক নেতিবাচনের পন্থা—ঐক্যোপলব্ধির পর আলোকিত আত্মার দেবত্ব লাভ—এ সমস্তই আলেকজান্দ্রিয়ার প্লাটিনাস এবং প্রথম যুগের খৃস্টান অতীন্দ্রিয়বাদিগণ কর্তৃক অতি সুন্দর ভাবে এবং বলিষ্ঠ শৃংখলার সহিত বিবৃত হইয়াছে। ভারতীয় চিন্তার বিশাল সৌধের সহিত সেগুলির তুলনা করিতে কোনরূপ দ্বিধা বা ভয়ের কারণ নাই। অন্যপক্ষে, ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদিগণ সেগুলিকে গভীরভাবে পাঠ ও আলোচনা করিলে উপকৃত হইবেন।

ইহা সুস্পষ্ট যে, নিঃসীম পরম পুরুষ সম্পর্কে যে ধারণা এবং তাঁহার সহিত মিলন সম্পর্কে যে বিশাল বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইতিহাসগত বিভিন্ন রূপকে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করাও এখানে এই গ্রন্থসীমার মধ্যে সম্ভব নহে। তাহাতে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইবে—কারণ, ওই সকল চিন্তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল মানুষের রক্তমাংসের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে। সেগুলি মূলত সর্বদেশের, সর্বকালের। তাহাদের উপযোগিতার প্রশ্ন (সকল আধ্যাত্মিক চিন্তার সহিতই এই প্রশ্ন জড়িত আছে) বা "আত্মসমীক্ষার" বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন সম্পর্কেও আমি কোন আলোচনা আরম্ভ করিতে পারি না। সেরূপ আলোচনার জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন।·········আমি কেবল এখানে আধুনিক কালে বিবেকানন্দের মুখ দিয়া বেদান্ত চিন্তাধারা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

সমস্ত শ্রেষ্ঠ মতবাদ, যখন তাহা বহু শতাব্দী বাদে বাদে আবার আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহা যে যুগে আত্মপ্রকাশ করে, সে যুগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এবং সেই সংগে তাহা যাহার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সেই ব্যক্তির আত্মার সুস্পষ্ট ছাপও তাহাতে পড়ে। এইভাবে তাহা সেই যুগের মানুষের উপর নূতনভাবে ক্রিয়া করিবার উপযুক্ত রূপ-ও গ্রহণ করে। বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন আবহাওয়ার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি চিন্তাগুলিও বিশুদ্ধ চিন্তা রূপে প্রাথমিক অবস্থায় থাকে, এবং পরে সেগুলি কোন শক্তিমান ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ঘনীভূত হয়। তখন তাহারা দেবতাদের মতো মূর্তিগ্রহ করে। "এইভাবে চিন্তাই রক্ত-মাংস হইয়া উঠে।"[১]

১ *Et Caro facta est.*

অমর্ত্য চিন্তার এই মর্ত্য দেহ-ই উহাকে কোনো বিশেষ দিনের কোনো বিশেষ শতাব্দীর সাময়িক রূপটি আনিয়া দেয় এবং তাহার মধ্য দিয়াই আমাদের সহিত উহার যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

আমাদের চিন্তাধারার সহিত, আমাদের বিশেষ প্রয়োজনের সহিত, দুঃখ-যন্ত্রণার সহিত, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত, সন্দেহ-সংশয়ের সহিত, যাহা আমাদিগকে অন্ধ প্রাণীর মতো, কেবল অন্তর্নিহিত সহজ অনুভূতির তাড়নায় আলোকের দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—তাহার সহিত বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যে কীরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রহিয়াছে, তাহা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমাদের এই গাঙ্গেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আধুনিক মানুষদের মধ্যে সর্বপ্রথমে চিন্তার বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সমুন্নত এক ভারসাম্য ঘটাইতে পারিয়াছিলেন এবং আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রথম সন্ধি ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। তাই স্বভাবতই আমি আশা করি যে, আমার সহিত সাদৃশ্য আছে, এমন পাশ্চাত্ত্য কর্মীদিগকে তাঁহার সম্পর্কে আমি আমার মতোই আকর্ষণ অনুভব করাইতে পারিব।

*　　*　　*　　*　　*　　*

যদি একটি মাত্র কোন ভাব থাকে, যাহা আমার নিকট একান্ত অপরিহার্য, (এবং আমি হাজার হাজার ইউরোপবাসীর প্রতিনিধি হিসাবেই বলিতেছি), তাহা হইল স্বাধীনতার ভাব। তাহা ছাড়া সমস্ত কিছুই মূল্যহীন।......"আধ্যাত্মিকতার মূলকথাই হইল মুক্তি।"[১]

কিন্তু যাঁহারা বন্ধনের বেদনার সহিত পূর্ণতমরূপে পরিচিত হইয়াছেন,—সে বন্ধন অতীব ভয়াবহ পারিপার্শ্বিক বন্ধন বা নিজের প্রকৃতির পীড়নের বন্ধন, যাহাই হউক না কেন—তাঁহারাই মুক্তির এই অপরূপ মূল্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাত বছর বয়স হইবার আগেই দুনিয়াটাকে অকস্মাৎ আমার একটা ইঁদুর-ধরা কল বলিয়া মনে হইয়াছিল; কলের মধ্যে আমি আটক পড়িয়াছিলাম। সেই মুহূর্ত হইতে আমার সকল চেষ্টাই উহার আগলের ফাঁক দিয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টায় পরিণত হইয়াছিল। অবশেষে একদিন আমার যৌবনকালেই ধীর ও অবিরামভাবে চাপ দেওয়ার ফলে একটি আগল অকস্মাৎ সরিয়া গিয়াছিল এবং আমি মুক্তির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম।[২]

১ "Das Wesen des Geistes ist die Freiheit."—হেগেল।

২ আমি আমার এই অভিজ্ঞতাগুলি আমার এখনো-অপ্রকাশিত "অন্তর্লোক যাত্রা" পুস্তকের একটি

আমার জীবনটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জন্য নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। আমি যখন পরবর্তীকালে ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইলাম, তখন এই সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই আমাকে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কারণ, ভারতবর্ষ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া নিজেকে একটি বিশাল জালের মধ্যে নিপতিত নিবদ্ধ বলিয়া অনুভব করিয়াছে এবং হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সে উহার মধ্য হইতে যে কোন উপায়ে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিয়াছে। এই বন্ধন হইতে অবিরাম মুক্তির প্রচেষ্টা সকল ভারতীয় প্রতিভার মধ্যে,—তাঁহারা অবতার হউন, জ্ঞানী দার্শনিক হউন, কিম্বা কবি হউন,—মুক্তির প্রতি সজীব, সোৎসাহ, অক্লান্ত (কারণ, ইহাতে সর্বদাই বিপদের ভয় আছে) একটি গভীর আবেগ আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের মতো এমন বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি।

তাঁহার বন্য বিহঙ্গের উদ্দাম পক্ষ তাঁহাকে প্যাশ্‌কালের মতোই দুরন্ত ঝাপটা দিয়া শূন্যপথে এক মেরু হইতে অন্য মেরুতে, দাসত্বের গভীর গহ্বর হইতে মুক্তির মহাসমুদ্রে, উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যখন তিনি জন্মান্তরের কথা কল্পনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার মধ্যে যে করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা শুনুন :

"একটি জীবনের স্মৃতিকে কোটি কোটি বৎসরের বন্ধন বলিয়া মনে হয়। কেবল তাহাই নহে, সে স্মৃতি আবার বহু জীবনের স্মৃতিকে জাগাইয়া দেয় ! আর সে স্মৃতির মধ্যে মন্দের বা অশুভের অপ্রাচুর্য নাই।"[১]

কিন্তু পরে তিনি অস্তিত্বের মহিমা কীর্তন করেন :

"মানব প্রকৃতির মহিমা ভুলিও না ! আমরাই সকল অতীতের, সকল ভবিষ্যতের মহানতম বিধাতা। খৃস্ট ও বুদ্ধের দল অসীম সোঽহং সমুদ্রের তরংগ মাত্র।"[২]

ইহার মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নাই। কারণ, বিবেকানন্দের নিকট মানুষের মধ্যে ঐ দুইটি অবস্থা একই সংগে বাস করিয়াছে। "এই বিশ্ব কি ? মুক্তিতে ইহার সৃষ্টি, মুক্তিতেই ইহার স্থিতি।"[৩] অথচ প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রত্যেকটি কর্মই

পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি। পুস্তকখানি আমার ভারতীয় বন্ধুরা দেখিয়াছেন। [পুস্তকখানি বর্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ইংরেজী অনুবাদের নাম *Journey Within*—অনুঃ।]

১ দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ কালে, ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে।

২ যুক্তরাষ্ট্রের থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে একটি সাক্ষাৎকার কালে, ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে।

৩ ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী।

এই দাসত্ব শৃংখলকে আরো দুঃসহভাবে কশিয়া বাঁধিয়া দিতেছে। কিন্তু এই দুই ভাবের অসংগতি একটি সংগতির মধ্যে মিলিত হইয়াছে—হেরাক্লিটাসে মধ্যে যেমনটি হইয়াছিল, সেইভাবে একটি সংগতিময় অসংগতির সৃষ্টি করিয়াছে, যে সংগতিময় অসংগতি ছিল বুদ্ধের সেই প্রশান্ত সার্বভৌম এক সংগতির বিপরীত। বুদ্ধ মানুষকে বলিয়াছিলেন :

"এ সমস্তই মায়া, ইহা উপলব্ধি কর !"

কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত বলিয়াছে :

"মায়ার মধ্যেই সত্য রহিয়াছে, ইহা উপলব্ধি কর !"[১]

বিশ্বে কিছুই অস্বীকার্য নহে ; কারণ, মায়ার মধ্যে-ও সত্য রহিয়াছে। আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার জটিল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। বুদ্ধের মতো পরিপূর্ণ অস্বীকৃতির দ্বারা এই জটিল বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া "উহাদের অস্তিত্ব নাই" বলিলে উচ্চতর ও গভীরতর জ্ঞানের পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু যে সকল তীব্র আনন্দ ও দুঃসহ বেদনাকে বাদ দিয়া জীবন বৈচিত্র্যহীন ও ঐশ্বর্যহীন হইয়া পড়িবে, সেগুলির দিক হইতে বিচার করিলে "সেগুলি আছে, সেগুলি বন্ধন" এইকথা বলিয়া মুকুর হইতে মুখ তুলিয়া উপরের দিকে চাহিয়া তাহা যে রৌদ্রের খেলা মাত্র, তাহা আবিষ্কার করাই অধিকতর মনুষ্যোচিত এবং অধিকতর মূল্যবান হইবে। ব্রহ্ম সূর্য, মায়া তাঁহার লীলা ; মায়া ব্যাধিনী, সে প্রকৃতির হস্তে মৃগয়া করিতেছে।[২]

মায়া নামটির মধ্যেই একটি দ্ব্যর্থকতা আছে। পাশ্চত্ত্যের অতীব পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তাহা অনুভব করেন। সুতরাং আর অগ্রসর হইবার আগে এই দ্ব্যর্থকতা দূর করিয়া মায়া শব্দটিকে বর্তমানে কি অর্থে বৈদান্তিক মনীষীরা ব্যবহার করেন, তাহা দেখা দরকার। কারণ, উপস্থিত অবস্থায় ইহা আমাদের মধ্যে কাল্পনিক গণ্ডীর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে পরিপূর্ণ কুহক, বিশুদ্ধ দৃষ্টিভ্রম, বহ্নিহীন ধূম ভাবিয়া আমরা ভুল করি। এই ধারণা হইতেই আমরা প্রাচ্য সম্পর্কে একটি

১ লণ্ডনে নিবেদিতার সহিত বিবেকানন্দের কথোপকথন।

২ "মায়া ও কুহক" সম্পর্কে তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় বিবেকানন্দ ভারতে প্রথমে ঐ শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহার আলোচনা করেন। তখন উহা এক প্রকার ঐন্দ্রজালিক কুহক, সত্যের কুজ্ঝটিকাময় আচ্ছাদনরূপে ব্যবহৃত হইত। বিবেকানন্দ শেষ উপনিষদগুলির একটি হইতে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে) "মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে" কথাগুলি উদ্‌ধৃত করেন। (সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৮৮-৮৯ পৃঃ।) ["মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" —বিবেকানন্দের 'জ্ঞানযোগ', ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—অনুবাদক।]

নিন্দাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়া বসি যে, প্রাচ্যবাসীরা জীবনের বাস্তবতার সম্মুখীন হইতে পারেন না। আমরা মায়ার মধ্যে স্বপ্নের উপাদান ছাড়া আর কিছুই প্রত্যক্ষ করি না। ভাবি যে, ঐরূপ ধারণার ফলে প্রাচ্যবাসী মানুষরা অর্ধসুপ্ত, নিশ্চল ও শায়িত অবস্থায় আকাশের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শরতের মৃদু বাতাসে ভাসমান ঊর্ণাজালের মতো ভাসিয়া চলেন।

প্রকৃতি সম্পর্কে বিবেকানন্দের যেরূপ ধারণা ছিল, তাহার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের খুব বেশী পার্থক্য যে নাই, তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইলে, আধুনিক বেদান্তবাদ যেভাবে বিবেকানন্দের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে বিকৃত করা হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।[১]

সত্যকার বৈদান্তিক মনোভাব কোনরূপ চিন্তিতপূর্ব ধারণা লইয়া অগ্রসর হয় না। উহাতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। বিভিন্ন তথ্যের পর্যবেক্ষণ ব্যাপারে এবং বিভিন্ন রূপ প্রতিপাদ্যের মধ্যে সংগতি বিধানের প্রায়সে বেদান্ত যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছে, অন্য কোনও ধর্মে তাহার তুলনা মিলে না। পুরোহিত-তন্ত্রের বাধা না থাকায়, প্রত্যেক মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই দৃশ্যমান বিশ্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অন্বেষণে ইচ্ছামত অগ্রসর হইয়াছেন। বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এমন সময়ও ছিল যখন একই মন্দিরে ভগবৎ-বিশ্বাসীরা, নিরীশ্বরবাদীরা, আপোষহীন বস্তুবাদীরা পাশাপাশি তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতেন; পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের বস্তুবাদীদের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা তিনি প্রকাশ্যে জানাইয়াছেন, তাহা আমি পরে দেখাইব। তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বাধীনতাই আধ্যাত্মিক অগ্রগতির একমাত্র উপায়।" এই স্বাধীনতাকে কিভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আয়ত্ত করিতে (বা দাবী করিতে) হয়, তাহা ভারতের অপেক্ষা ইউরোপ অধিক কার্যকরীভাবে জানিয়াছে।[২] কিন্তু ইউরোপ এই মুক্তিকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অতি অল্পই আয়ত্ত করিয়াছে এবং আয়ত্ত করিবার কল্পনা-ও সে বেশী করে নাই। আমাদের তথাকথিত "স্বাধীন চিন্তাশীলদের" তথা বিভিন্ন

১ মায়া সম্পর্কে বিশেষভাবে পর্যালোচনার জন্য তিনি ১৮৯৬ খ্রস্টাব্দে লণ্ডনে চারটি বক্তৃতা দেন: (১) মায়া; (২) মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ; (৩) মায়া ও মুক্তি; (৪) অদ্বৈত ও তাঁহার প্রকাশ (অর্থাৎ, প্রাকৃতিক জগৎ)। সাক্ষাৎকারগুলিতে বা অন্যান্য দর্শন ও ধর্মসংক্রান্ত প্রবন্ধে তিনি বারে বারে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

২ বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য এই স্বাধীনতাকে পিষিয়া মারিবার জন্য সেই একই শক্তির প্রয়োগ করিতেছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রগুলি এখনো "পার্লামেন্টারি আদবকায়দা" বজায় রাখিলেও, তাহারা ফাসিস্ট স্বৈরতন্ত্রীদের অপেক্ষা পিছনে পড়িয়া নাই।

ধর্ম সম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা আমাদিগকে আর বিস্মিত করে না। সাধারণত ইউরোপবাসীদের স্বাভাবিক মনোভাব হইল : "আমিই সত্য"! কিন্তু হুইটম্যানের "সমস্তই সত্য"[১] এই মন্ত্রই বেদান্তবাদীদের নিকট অধিকতর প্রিয়। ব্যাখ্যার কোনোরূপ প্রয়াসকেই বেদান্তবাদীরা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন না, তাঁহারা প্রত্যেকের নিকট হইতেই চিরন্তন সত্যের কণিকাটুকুকে-ও গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন! ফলে, বেদান্তবাদী যখন আধুনিক বিজ্ঞানের সম্মুখীন হন, তখন তিনি তাহাকে সত্যকার ধর্মীয় ধারণার বিশুদ্ধ প্রকাশ রূপে লক্ষ্য করেন—কারণ, তাহা গভীর ও আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা পরম সত্যের মূলকথাটির সন্ধান করিতেছে।

মায়াকে এই দৃষ্টিভংগীতে দেখা হইয়াছে। বিবেকানন্দ বলেন, "ইহা বিশ্বকে ব্যাখ্যা করিবার কোনোরূপ তত্ত্ব নহে।[২] ইহা তথ্যের সহজ ও বিশুদ্ধ বিবৃতিমাত্র।" সকল পর্যবেক্ষকই তথ্য পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন। "ইহা হইল আমরা কি, এবং আমরা কি দেখি;" সুতরাং, আসুন, প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। আমরা এমন একটি জগতে রহিয়াছি, যেখানে কেবলমাত্র মন ও অনুভূতির অনিশ্চিত মাধ্যমেই উপনীত হওয়া যায়। কেবল মন ও অনুভূতির সহিত আপেক্ষিকভাবেই এই জগতের অস্তিত্ব রহিয়াছে। মন ও অনুভূতির যদি পরিবর্তন হয়, জগতেরও পরিবর্তন হইবে। আমরা ইহাকে যে অস্তিত্ব দিই, তাহা কোনোরূপ অপরিবর্তনীয়, অবিচল, ও বিশুদ্ধ সত্য নহে। ইহা সত্যের ও আপাত দৃশ্যের, অনিশ্চয়তা ও কুহকের অবর্ণনীয় অনির্দিষ্ট মিশ্রণ মাত্র। ইহা একটিকে বাদ দিয়া অপরটি নহে। এবং এই স্ববিরোধিতার মধ্যে প্লেটো-সুলভ কিছু নাই! আমাদের কর্ম ও আবেগময় জীবনে ইহা প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে ঘাড়ে ধরিয়া ঘুরাইতেছে—পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিই যুগে যুগে ইহাকে অনুভব করিয়াছেন। ইহাকে বাদ দিয়া জ্ঞান লাভের কোনোরূপ উপায় নাই। এই সমাধান-

১ "লীভস্ অব গ্রাস" হইতে।

২ যদি সমালোচনা করিতে দেওয়া হয়, তবে ইহাই বলা যথাযথ হইবে যে, এই তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে; কিন্তু উহা যদি বস্তুত অব্যাখ্যাত না হয়, তবে উহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাখ্যাত হয় নাই। এ বিষয়ে অধিকাংশ বেদান্ত দার্শনিকই একমত। ইহার অন্যতম আধুনিকতম দৃষ্টান্ত হিসাবে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম. এ., পি-এচ. ডি.-রচিত ১৯২৮ খৃস্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি কর্তৃক প্রকাশিত "*Comparative Studies in Vedantism*" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

হীন সমস্যার সমাধানের জন্য অবিরাম আমাদের আহ্বান আসিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানকে আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে খাদ্য ও ভালোবাসার মতোই অপরিহার্য মনে হয়। কিন্তু আমাদের ফুসফুসের উপর প্রকৃতি নিজে যে আবহাওয়ার বৃত্তকে চাপাইয়া দিয়াছে, আমরা তাহা ভেদ বা অতিক্রম করিতে পারি না। আমাদের উচ্চাশাগুলি এবং সেই সকল উচ্চশাকে ঘিরিয়া যে সকল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রহিয়াছে, সেগুলির মধ্যে, দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর বস্তুর মধ্যে, স্ববিরোধী বিভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে, মৃত্যুর দুর্নিবার সত্য এবং জীবনের আশু অনস্বীকার্য ও অনূ্যন সত্য-চেতনার মধ্যে—কতকগুলি বুদ্ধি ও নীতিগত দুর্লঙ্ঘ্য বিধি এবং হৃদয় ও মানসগত ধারণাসমূহের অবারিত উৎসারের মধ্যে, শুভ ও অশুভের, সত্য ও অসত্যের, স্থানে ও কালে উভয় দিকেই, অবিরাম বৈচিত্র্যের মধ্যে—একটি চিরন্তন স্ববিরোধিতা রহিয়াছে।[১] আদিকাল হইতে মানব জাতির চিন্তা এই নাগপাশের মধ্যে গুটিপোকার মতো নিজেকে জড়াইয়াছে, যখনই সে একদিকে নিজেকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চায়, তখনই সে অন্যদিকে নিজেকে আরো কঠিন করিয়া বাঁধিয়া ফেলে—ইহাই হইল প্রকৃত জগৎ। এবং এই প্রকৃত জগৎ-ই হইল মায়া।

তবে ইহাকে কিভাবে যথাযথরূপে বর্ণনা করা যায়? সম্প্রতি বিজ্ঞান যে শব্দটিকে অত্যন্ত সুপ্রচলিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার দ্বারা—আপেক্ষিকতার দ্বারা। বিবেকানন্দের কালে এই শব্দটির উদ্ভব হয় নাই। তখনো ইহার রশ্মিধারা বৈজ্ঞানিক চিন্তার তমসাচ্ছন্ন আকাশকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে নাই। বিবেকানন্দ-ও কেবল প্রসঙ্গত এই শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছেন।[২] কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহা তাঁহার ভাবটিকে যথাযথভাবে অর্থ দান করিয়াছে। এবং আমি

১ "মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা নহে।...একই ঘটনা, যাহা অদ্য শুভজনক বলিয়া মনে হইতেছে, কল্য তাহাই আবার অশুভ মনে হইতে পারে। একই বস্তু যাহা একজনকে অসুখী করিতেছে, তাহাই আবার অপরের সুখ উৎপাদন করিতে পারে। যে অগ্নি শিশুকে দগ্ধ করে, তাহা অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির উত্তম ভক্ষ্যান্ন-ও রন্ধন করিতে পারে।...অমঙ্গল নিবারণ করিতে হইলে মঙ্গল নিবারণই তাহার একমাত্র উপায়।...মৃত্যু রোধ করিতে হইলে জীবন-ও রোধ করিতে হইবে।, উভয়ই (এই স্ববিরোধী শব্দগুলির) একই বাস্তবিক বিকাশ। বেদান্ত বলেন, যে সকল আদর্শ অবলম্বন করিতে, আমাদের দৈহিক ব্যক্তিত্ব পরিহার করিতে ভয়ের উদ্রেক হয়, সময়ে সেগুলিকে দেখিয়া আমরাই হাস্য করি।" ("মায়া" সম্পর্কে বক্তৃতা, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৯৭-৯৮ পৃঃ।)

২ মায়া সম্পর্কে চতুর্থ বক্তৃতা হইতে।

টীকা হিসাবে তাঁহার রচনা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে এই বিষয়ে আর কোনো সংশয়ই থাকে না। কেবল প্রকাশভংগীর মধ্যে পার্থক্য আছে। বিবেকানন্দ ছিলেন অদ্বৈতবাদের আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ বলে যে, মায়াকে যেমন অসম্ভাব্য অনস্থিত্ব বলিয়া বর্ণনা করা যায় না, তেমনি উহাকে সত্তা বা অস্তিত্ব বলিয়াও বর্ণনা করা যায় না। উহা অসৎ এবং পরম সত্তা, সমানভাবে উভয়েরই মধ্যবর্তী একটি রূপ মাত্র। সুতরাং উহা আপেক্ষিক। হিন্দু বেদান্তবাদীরা বলেন, উহা সত্তা নহে, উহা অদ্বৈতের লীলা। উহা অনস্তিত্ব নহে, কারণ, ঐ লীলার অস্তিত্ব আছে এবং তাহাকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। লাভজনক খেলা লইয়া যে-সকল লোক তৃপ্ত থাকেন, তাঁহাদের সংখ্যাই পাশ্চাত্ত্য দেশে অধিক। তাঁহাদের পক্ষে উহা হইল সমস্ত অস্তিত্বের সমষ্টি। ঘূর্ণীয়মান মহাচক্র তাঁহাদের দিগবলয়কে সীমায়িত করিয়া রাখে। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয় সুমহৎ, তাঁহাদের নিকট অদ্বৈতই কেবল অস্তিত্ব নামের উপযুক্ত। তাঁহারা ঐ ঘূর্ণীয়মান মহাচক্রের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অদ্বৈতকে ধরিতে চাহেন। মানুষ যখন দেখে, সে যাহা কিছু গড়িয়াছিল,—ভালোবাসা, উচ্চাশা, কর্ম, এমন কি জীবন, সমস্তই তাহার অঙ্গুলির অবকাশে কালের বালুকার সহিত ঝরিয়া পড়িতেছে, তখন সে আর্তনাদ করিয়া উঠে। মানুষের এই আর্তনাদ শতাব্দীর শতাব্দী পার হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

"পৃথিবীর এই চক্রের মধ্যে চক্র, উহা একটি ভয়ানক যন্ত্র। উহাতে হাত দিলেই সংগে সংগে আমাদের হাত উহাতে আটকাইয়া যায়, আমাদের আর নিস্তার থাকে না! আমরা সকলেই এই শক্তিশালী জটিল জগৎ-যন্ত্রের সংগে টানা হইয়া চলি।"[১]

* * * * *

তবে আমরা কিভাবে মুক্তির পথ লাভ করিতে পারি?

বিবেকানন্দ বা তাঁহার মতো শক্তিমান মানসিক গঠন যাঁহার, এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে আগে হইতে আত্মসমর্পণ করিয়া নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়িবার কোনো প্রশ্নই উঠে না। কোনো সংশয়বাদীর মতো "আমরা কিই বা জানি" বলিয়া চোখে চাপা দিয়া আমাদের দেহ ঘেঁষিয়া নদীর তীর ধরিয়া ভাসমান অস্পষ্ট প্রেতমূর্তির মতো যে সকল ক্ষণিক আনন্দ দ্রুত ভাসিয়া যাইতেছে, সেগুলিকে

১ কর্মযোগ, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করা আরো অসম্ভব!... আমাদের মহাবুভুক্ষাকে, আমাদের আত্মার আর্তনাদকে কিসে তৃপ্ত করিতে পারে? নিশ্চয় রক্ত-মাংসের এই জীর্ণবাস" সমুদ্রের এই শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে পারিবে না। সমস্ত এপিকুরাসপন্থীদের সম্মিলিত গোলাপের সুগন্ধ-ও গলিত শবের দুর্গন্ধ দূর করিতে পারিবে না, কাম্পো সান্টোর ওর্কানিয়ার অশ্বগুলির মতো তাহারা পিছনে হটিয়া আসিতে বাধ্য হইবে।[১] এই কবরখানার বাহিরে, সমাধি মন্দিরের আবেষ্টনীর বাহিরে, শ্মশানের বাহিরে তাহাকে আসিতেই হইবে। তাহাকে হয় মুক্তি পাইতে হইবে, নয় মরিতে হইবেঃ প্রয়োজন হইলে, মুক্তির জন্য মৃত্যুই শ্রেয়।[২]

"পরাজিত হইয়া বাঁচিবার অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুই শ্রেয়!"

প্রাচীন ভারতের এই তূর্যনিনাদ[৩] পুনরায় বিবেকানন্দের মধ্যে ধ্বনিত হইল। তাঁহার মতে, ঐ আহ্বানই সকল ধর্মের আরম্ভে জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এই আরম্ভ হইতেই তাঁহারা যুগ যুগ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনোভাবেরও ইহাই হইল লক্ষ্যঃ "আমি নিজের জন্য একটি পথ প্রস্তুত করিয়া লইব। আমি সত্যকে জানিব এবং সে চেষ্টায় আমার জীবন উৎসর্গ করিব।"[৪] বিজ্ঞান এবং ধর্মের আদিম প্রেরণা একই—তাহাদের লক্ষ্য-ও একই—মুক্তি। যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকৃতির নিয়মে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের যে জ্ঞান তাঁহাদের মানস সত্তাকে মুক্তি দিয়াছে, সেই মানস সত্তার সেবায় নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই কি তাঁহারা প্রকৃতির নিয়মগুলিকে আয়ত্ত করিবার জন্য সেগুলিকে

১ পিসার কাম্পো সান্টোতে ওর্কানিয়ার প্রাচীর চিত্রের কথা বলা হইতেছে।

২ মনো-চিকিৎসকরা অকৃত্রিম অন্তর্মুখিতাকে-ও 'পলায়ন' বলেন। তাঁহারা তাহার সংগ্রামের দিকটি বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের এই ভুল ইহাতে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। রুইসব্রয়েক, একহার্ট, ঝাঁ দ লা ফ্রোয়া বা বিবেকানন্দ পলায়ন করেন নাই। তাঁহারা বাস্তবতার মুখামুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা সংগ্রামে নামিয়াছিলেন।

৩ বিবেকানন্দ উহাকে বুদ্ধদেবের বাণী বলিয়াছিলেন। মুক্তির জন্য সংগ্রামের এই ভাবটি খৃস্টান চিন্তার মধে-ও লক্ষ্য করা যায়। ডেনিস দি আরিওপাগিটে যিশুকে এমন কি প্রধানতম যোদ্ধা, "প্রথমত মল্লবীর" করিয়াই দেখাইয়াছেন।

"খৃস্টই ভগবানরূপে এই সংগ্রাম শুরু করেন।...এবং উহা আরো স্বর্গীয়। তিনি সর্বান্তঃকরণে মুক্তির পক্ষ লইয়া যুদ্ধে যোগদান করেন। প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি এই প্রথম মল্লবীরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সানন্দে যে সংগ্রামগুলিতে যোগদান করে, সে সংগ্রামগুলি যেন ভগবানেরই সংগ্রাম।" (*Concerning the Ecclesiastical Hierarcy*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, "চিন্তা", ৬)

৪ "মায়া ও মুক্তি" সম্পর্কে বক্তৃতা।

আবিষ্কার করিতে চান না? আর ধর্মগুলিই বা পৃথিবীতে কিসের সন্ধান করিতেছে? তাহাদের লক্ষ্য-ও ঐ একই সার্বভৌম মুক্তি, যে মুক্তি হইতে ব্যক্তিগত সত্তা বঞ্চিত হইয়াছে, যে মুক্তি ভগবানের মধ্যে—উচ্চতর, মহত্তর, শক্তিমত্তার বন্ধনহীন পরম সত্তার মধ্যে রহিয়াছে। যিনি এই মুক্তিকে জয় করিয়াছেন, সেই বিজয়ীর, সেই ভগবানের, বিভিন্ন ভগবানের, অদ্বৈতের বা প্রতিমার, ধ্যানের মধ্য দিয়াই মুক্তিকে জয় করিতে হইবে। এগুলিকে মানুষ তাহার শক্তির অস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; উহার পরিবর্তে মানুষ তাহাদের বিপুল উচ্চাশাগুলিকে সার্থক করিতে চায়, এই চির-অপস্রিয়মান জীবনের মধ্যে সে সকল উচ্চাশার পরিতৃপ্তিলাভ সম্ভব নহে। এই সকল উচ্চাশা ছাড়া মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব; এগুলি তাহাদের বাঁচিয়া থাকার-ও কারণ।

"তাই সমস্ত কিছুই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা সকলেই মুক্তি-পথের যাত্রী।"[১]

এবং উপনিষদ যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সেগুলির প্রহেলিকাপূর্ণ উত্তর প্রদান করিয়াছে, বিবেকানন্দ তাহা স্মরণ করেন:

"প্রশ্ন হইল: 'বিশ্ব কি? বিশ্ব কি হইতে আসে; বিশ্ব কোথায় যায়? উত্তর হইল: 'মুক্তি হইতে উহা আসে, মুক্তিতেই উহা থাকে, এবং মুক্তিতেই উহা বিলীন হয়।' "

তাই বিবেকানন্দ আরো বলেন, "তুমি মুক্তির এই ধারণাকে ত্যাগ করিতে পারো না।" ইহাকে বাদ দিলে তোমার সত্তাকে তুমি হারাইবে। ইহা বিজ্ঞানের বা ধর্মের, অযুক্তির বা যুক্তির, শুভের বা অশুভের, ঘৃণার বা প্রেমের প্রশ্ন নহে—সমস্ত কিছুই, যাহারই অস্তিত্ব আছে, তাহাই এই মুক্তির আহ্বানে কর্ণপাত করে; শিশুরা যেভাবে হ্যামেলিনের সেই বংশী-বাদকের[২] অনুসরণ করিয়াছিল। সমস্ত কিছুই সেইভাবে উহার অনুসরণ করে। কে ঐ ঐন্দ্রজালিকের কতোখানি কাছে আসিতে পারে এবং কতোখানি নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়, তাহার জন্য সকলেই নিজেদের মধ্যে গুঁতাগুঁতি করিতেছে; এবং তাহা হইতেই

১ পূর্বোক্ত স্থান দ্রষ্টব্য।

২ গ্যেটে কর্তৃক কথিত রেনিশ অঞ্চলের একটি প্রাচীন কিম্বদন্তীর কথা বলা হইতেছে। ঐ কাহিনীতে একটি "ইঁদুর-ধরা" তাহার বাঁশীর সুরে সকলকে সম্মোহিত করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য করিত।

পৃথিবীর এই নৃশংস সংগ্রামের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু কোটি কোটি প্রাণী অন্ধভাবেই নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করিতেছে, ঐ আহ্বানের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তাহারা বুঝে নাই। কিন্তু যাঁহাদিগকে বুঝিবার শক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা কেবল উহার অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারেন না, সেই সংগে ঐ সংগ্রামের সংগতিকেও উপলব্ধি করেন। এই সংগতির মধ্যেই মানুষের প্রতিবেশী গ্রহনক্ষত্ররা আবর্তিত হইতেছে; এই সংগতির বশেই সাধু, অসাধু, ভালো, মন্দ (তাহারা সকলেই একই লক্ষ্যপথে চলিয়াছে; তবে কে সোজা রহিয়াছে, কে টলিয়া পড়িয়াছে, সেই অনুসারে তাহাদিগকে এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে) সকল জীবই সংগ্রাম করিতেছে, ঐক্যবদ্ধ হইতেছে এবং একই লক্ষ্যপথে গুঁতাগুঁতি করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সে লক্ষ্য হইল মুক্তি।[১]

সুতরাং তাহাদের জন্য কোনো অজ্ঞাত পথ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই। বরং বিভ্রান্ত মানুষকে শিখিতে হইবে যে, হাজারো পথ রহিয়াছে, সেগুলি সমস্তই কম-বেশী সুনিশ্চিত, কম-বেশী সরল, এবং সেগুলি সমস্তই একই লক্ষ্যে গিয়া পৌছিয়াছে। মানুষ যে কর্দমাক্ত পিচ্ছল পথে হাঁটিয়া চলিয়াছে, মানুষ যে কণ্টকাকীর্ণ পথে পড়িয়া ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য মানুষকে সাহায্য করিতে হইবে; তাহাদিগকে এই সকল অসংখ্য পথের মধ্যে রাজপথগুলি দেখাইয়া দিতে হইবে। সেই রাজপথগুলি হইল বিভিন্ন যোগ: কর্ম যোগ, ভক্তি যোগ, জ্ঞান যোগ।

১ এবং অদ্বৈত বেদান্ত দেখাইয়াছে যে, এই 'বস্তু'-টি 'ব্যক্তি' হইতে, প্রত্যেকের প্রকৃত প্রকৃতি ও সারবস্তু হইতে স্বতন্ত্র নহে। ইহা 'অহম্'।

২

মহান পথগুলি

চারিটি যোগ

পাশ্চাত্ত্য জগতে হাতুড়েদের হাতে পড়িয়া "যোগ"[১] কথাটি বিকৃত হইয়াছে। অতীত বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রতিভাশীল মনো-দেহবিজ্ঞানীদের প্রয়োগ ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সকল আধ্যাত্মিক রীতিকে যাঁহারা অধিগত করিতে পারেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তিকে আয়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার লাভ করেন। এবং এই অধিকার অনিবার্য ও প্রকাশ্যভাবে কর্মশক্তির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। (প্রকৃতিস্থ ও পরিপূর্ণ আত্মা হইল আর্কিমিডিসের সেই 'লেভার': একটি আলম্ব আবিষ্কার কর, তুমি পৃথিবীকেও উত্তোলন করিতে পারিবে।) ফলে, স্বার্থের বশবর্তী হইয়া হাজার হাজার উপযোগবাদী নির্বোধ এই যোগের অকৃত্রিম রীতিগুলিকে বা সেগুলির নকলকে আয়ত্ত করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে।[২] তাহাদের আধ্যাত্মিকতার সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের কোনো পার্থক্য নাই। তাহাদের নিকট বিশ্বাস হইল বিনিময়ের মাধ্যম, যাহা দিয়া তাহারা অর্থ, শক্তি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, যৌনশক্তি প্রভৃতি পার্থিব বস্তুকে লাভ করিতে পারে। (সংবাদপত্র খুলিলেই নিম্নস্তরের চিকিৎসক ও ভণ্ড ফকিরদের দাবীর তালিকাগুলি চোখে পড়ে।) এমন কোনো প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী হিন্দু নাই, যাঁহারা যোগের অপব্যবহার দেখিয়া বিরক্তি, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা অনুভব না করিয়া পারেন এবং তাঁহাদের এই

১ বিবেকানন্দ উহাতে "যুক্ত করা" এই মূল ধাতুগত অর্থ লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ যোগ হইল ভগবানের সহিত মিলন এবং সেই মিলনকে লাভ করিবার উপায়। (বক্তৃতা ও কথোপকথন সংক্রান্ত নোট: স্বামী বিবেকানন্দের *সম্পূর্ণ রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

২ এখানে প্রথমে আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম (আমার মার্কিন ভাইদের নিকট আমি এজন্য মার্জনা চাই, কারণ, তাঁহাদের মধ্যে-ও আমি অনেক মুক্তমনা ও বিশুদ্ধচরিত্র ব্যক্তি দেখিয়াছি): "এই সকল নির্বোধের সংখ্যা আমেরিকার অ্যাংলো-স্যাক্সনদের মধ্যেই সর্বাধিক।" কিন্তু আমি এখন সে বিষয়ে যথেষ্ট নিশ্চিত নই। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো এ বিষয়ে-ও আমেরিকা কেবল 'পুরাতন জগতের' আগে চলিয়াছে। 'পুরাতন জগৎ' এখন তাহাকে প্রায় ধরিয়া ফেলে। আর আতিশয্যের বেলায় সকলের চেয়ে যাহারা পুরাতন, তাহারা সকলের পিছনে পড়িয়া থাকে না।

বিরক্তি, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাকে বিবেকানন্দ যেভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনভাবে আর কেহ পারেন নাই। যাহা মুক্তির পথ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাকে এইরূপ হীনভাবে ব্যবহার করাকে,—'চিরন্তন আত্মার' নিকট আবেদন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়কে রক্তমাংসের হীনতম কামনার, দম্ভ ও শক্তি-মদমত্তার অস্ত্রে পরিণত করাকে যে-কোনো নিঃস্বার্থ ধর্মবিশ্বাসীই অধঃপতিত আত্মার লক্ষণ মাত্র ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারেন না!

প্রকৃত বৈদান্তিক যোগগুলি একপ্রকার আধ্যাত্মিক সংযম মাত্র। এইভাবেই বিবেকানন্দ তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে সেগুলির বর্ণনা করিয়াছেন।[১] আমাদের পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা-ও তাঁহাদের "রীতি সংক্রান্ত আলোচনায়"[২] সরল পথে সত্যে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে এই সংযমেরই সন্ধান করিয়াছেন। এবং পাশ্চাত্ত্যে এই সরল পথ হইল যুক্তি এবং প্রয়োগ ও পরীক্ষার পথ।[৩]

কিন্তু প্রধান পার্থক্যগুলি হইল এই যে, প্রাচ্য দার্শনিকদের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা কেবল বুদ্ধির অধিগম্য নয়; দ্বিতীয়ত, চিন্তা হইল কর্ম এবং কর্ম ভিন্ন চিন্তার কোনো মূল্য নাই। ভারতীয়দিগকে সাধারণত ইউরোপবাসীরা নিজেদের তুলনায় অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভারতীয়রা তাঁহাদের বিশ্বাসের মধ্যে যিশুর শিষ্য সেণ্ট টমাসের মতোই সংশয় বহন করিয়া চলেন; তাঁহারা স্পর্শ করিতে চান;

১ আমি ইহা জানি যে, যোগের শ্রেষ্ঠ জীবিত প্রতিভা অরবিন্দ ঘোষ যোগ সম্পর্কে যে সূত্র দিয়াছেন, তাহার সহিত বিবেকানন্দের প্রদত্ত সূত্রের কিছু পার্থক্য আছে। অবশ্য, অরবিন্দ ঘোষ যোগ সমন্বয় (Synthesis of Yoga) বিষয়ে যে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন ('আর্য' পত্রিকা, পণ্ডিচেরী, ১৫ই আগস্ট, ১৯১৪), তাহাতে বিবেকানন্দকে প্রামাণ্য হিসাবে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। বৈদান্তিক যোগগুলি সর্বদা 'জ্ঞানের' উপর প্রতিষ্ঠিত। অরবিন্দ নিজেকে খাঁটি বৈদিক বা বৈদান্তিক যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি তান্ত্রিক যোগগুলিকে-ও শোধন করিয়া লইয়া সেগুলির সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। ফলে, উহাতে অ্যাপলিনিয়ান উপাদান হইতে স্বতন্ত্রভাবে ডিঅনিজিয়াক উপাদানও কিছু মিশ্রিত হইয়াছে। সংজ্ঞাময় সত্তা বা 'পুরুষ', যিনি পর্যবেক্ষণ করেন, বুঝেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁহার মুখামুখি প্রকৃতিকে, শক্তিকে এবং প্রকৃতির আত্মাকে স্থাপিত করা হইয়াছে। অরবিন্দ ঘোষের স্বকীয়তা হইল এই যে, তিনি জীবনের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

২ দেকার্তের বিখ্যাত প্রবন্ধের নামের কথা বলা হইতেছে। প্রবন্ধটি আধুনিক দর্শনের ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ।

৩ "এই সকল যোগের কোনটিই তোমাকে তোমার বুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে বলে না, কোনটিই তোমাকে তোমার চোখ বাঁধিয়া তোমার যুক্তিকে পুরোহিত বা ঐ ধরণের কিছুর হাতে তুলিয়া দিতে বলে না।...প্রত্যেকটি যোগই তোমাকে বলে যুক্তিকে ধরিয়া থাকো, যুক্তিকে জড়াইয়া থাকো।" ('জ্ঞান যোগ': 'সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ'।)*

ভাবগত প্রমাণই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যে সকল পাশ্চাত্ত্যবাসী দিব্যদ্রষ্টা হিসাবে ভাবগত প্রমাণ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চান, ভারতীয়রা তাঁহাদিগকে কেবলই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন, এবং তখন তাঁহারা অন্যায় করেন না।…"যদি ভগবান থাকেন, তবে ভগবানে পৌঁছা-ও সম্ভব।…ধর্ম কোনো কথা নহে, কোনো মত নহে। বাস্তবে পরিণত করাই ধর্ম। উহা কেবল শুনা এবং বিশ্বাস করা নহে। উহা থাকা এবং হওয়া। ধর্মগত উপলব্ধির শক্তির অনুশীলনের মধ্য দিয়াই উহার আরম্ভ।"[১]

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, "সত্যের" সন্ধানের সহিত "মুক্তি"-র সংগ্রাম সংযুক্ত হইয়াছে। "সত্য" ও "মুক্তি" এই দুইটি কথার মধ্যে বস্তুত কোনো পার্থক্য নাই: পাশ্চাত্ত্যবাসীদের জন্য[২] দুইটি পৃথক পৃথিবী রহিয়াছে: কল্পনা ও কর্ম, বিশুদ্ধ যুক্তি ও ব্যবহারগত যুক্তি। (ইউরোপের সর্বাপেক্ষা দার্শনিক মনোভাবাপন্ন জাতি, জার্মানরা, যে এই দুই পৃথিবীর মধ্যে পরিখা কাটিয়া কাঁটা তারের বেড়া লাগাইয়া দিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা বেশ সচেতন আছি।) কিন্তু ভারতীয়দের কাছে, এই পৃথিবী এক ও অভিন্ন: জ্ঞান বলিতে কর্মাভিলাষ এবং কর্মশক্তিকেও বুঝায়। "যে জানে, সে আছে।" সুতরাং "প্রকৃত জ্ঞান-ই মুক্তি।"

১ বিবেকানন্দ-রচিত 'ধর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা', ও 'মদীয় আচার্যদেব' দ্রষ্টব্য। একথা বহুভাবে লিখিত হইয়াছে। এই ধারণাটি ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত। বিবেকানন্দ উহাকে উহার সকল রূপেই ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন, বিশেষভাবে, ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোতে ধর্ম সম্মেলনে প্রদত্ত হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতায় এবং ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে পাঞ্জাবে প্রদত্ত ধারাবাহিক বক্তৃতা-গুলিতে। ঐগুলির অন্যতম মূল কথা এই যে, "ধর্মকে ধর্ম নামের যোগ্য হইতে হইলে কর্ম হইতে হইবে।" রামকৃষ্ণের শিষ্যরা যে বিপুল আধ্যাত্মিক সহিষ্ণুতার ফলে ধর্মের বিভিন্ন এবং বিপরীত রূপ-গুলিকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার ব্যাখ্যা মিলে। "ধর্ম কোনো মতবাদের ঘোষণার মধ্যে নহে, ধর্মের উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত থাকে।" সুতরাং সত্যকে বিভিন্ন মানব প্রকৃতির বিভিন্ন প্রয়োজনের সহিত খাপ খাওয়াইতে গেলে তাহার রূপের মধ্যে-ও পরিবর্তন বা পার্থক্য ঘটে।

২ পাশ্চাত্ত্য জগতের ক্যাথলিক খৃস্টান অতীন্দ্রিয়বাদকে আমি সর্বদাই বাদ দিয়া থাকি। ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সহিত উহার যে প্রাচীন ও গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে, এখানে তাহা দেখাইবার সুযোগ আমি প্রায়ই পাইব। শ্রেষ্ঠ খৃস্টানের কাছে পরম সত্যের প্রতি নিখুঁত আনুগত্যই প্রকৃত মুক্তি আনিয়া দেয়। কারণ, প্রকৃত মুক্তির জন্য "চাই ভগবানের সহিত পরিপূর্ণ মিলন ও আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বহির্বস্তু সম্পর্কে নির্লিপ্ত, নিঃসীম, নির্ভিন্ন একটি অবস্থা।" (সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসী অতীন্দ্রিয় ধর্মতাত্ত্বিক কার্ডিন্যাল বেরুল্যের শিষ্য সেগেনো-রচিত ১৬৩৪ অব্দে প্রকাশিত "*Canduite d'oraison*", প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। অ্যাব্রি ব্রেমোঁ তাঁহার *Metaphysique des Saints*, ১ম খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠায় উহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন।)

কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানকে কার্যকরী করিতে হইলে—অন্যথায় উহা নিছক কচকচিতে পরিণত হইবার আশংকা সর্বদাই আছে—উহা যাহাতে সমগ্র মানব সমাজকে প্রভাবিত করিতে পারে, উহাকে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। প্রধানত তিন ধরণের মানুষ রহিয়াছে: ক্রিয়াশীল, অনুভবশীল ও চিন্তাশীল। প্রকৃত বিজ্ঞান তাই কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের তিনটি রূপ গ্রহণ করিয়াছে।[১] এই তিনটির মধ্যে যে মূল শক্তি রহিয়াছে, তাহা হইল সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং অধিগত আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের বিজ্ঞান বা রাজযোগের বিজ্ঞান।[২]

আভিজাত্যের দিক হইতে কাউণ্ট কেইজারলিং হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সহিত একমত। তিনি হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ঐ তিনটি পথের কর্মযোগ হইল "নিম্নতম" পথ।[৩] কিন্তু রামকৃষ্ণের অসীম হৃদয়ের কাছে কোনোরূপ

১ কেশবচন্দ্র সেন নানা দিকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পূর্বেই শিষ্যদের প্রকৃতি অনুসারে আত্মার বিভিন্ন পথকে নিজেদের উপযোগী করিয়া লইবার রীতিটি গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি যখন তাঁহার নূতন আধ্যাত্মিক অনুশীলন আরম্ভ করেন, তখন তিনি কোনো কোনো শিষ্যকে রাজযোগ, কোনো কোনো শিষ্যকে ভক্তি যোগ, কোনো কোনো শিষ্যকে বা জ্ঞান যোগ অনুশীলন করিতে বলেন। তিনি ভগবানের বিভিন্ন নাম বা গুণ অনুসারে-ও ভক্তির বিভিন্ন রূপ নির্দেশ করেন—এবং অনুরূপভাবে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলময়ের বিভিন্ন পূর্ণ রূপের জন্য-ও বিভিন্ন মন্ত্র রচনা করেন। (পি. সি. মজুমদার, দ্রষ্টব্য।)

২ বিভিন্ন প্রকার যোগের মধ্যে এই যোগটিকেই অ্যাংলো-স্যাক্সন উপযোগবাদ অন্যায়ভাবে কাজে লাগাইয়াছে ও ভয়ানকভাবে বিকৃত করিয়াছে। উক্ত উপযোগবাদ যোগকেই উদ্দেশ্য বলিয়া ভাবে। অথচ যোগের হওয়া উচিত মনকে আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতির জন্য মনোনিবেশের একটি বিচক্ষণ প্রয়োগশীল রীতি। উহার দ্বারা মনো-দৈহিক অঙ্গের এমন নমনীয় ও অনুগত হইয়া পড়া উচিত যে, তাহার দ্বারা জ্ঞানের—অর্থাৎ উপলব্ধ সত্যের—এবং প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মুক্তির—অন্যান্য পথে আরো অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইতে পারে। পাঠকদিগকে কি স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে যে, খৃস্টান অতীন্দ্রিয়-বাদের-ও স্বকীয় রাজযোগ আছে এবং অতীতে সেই যোগকে বহু শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ক্রমাগত প্রয়োগ, পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন?

অরবিন্দ ঘোষ রাজযোগের এইরূপ সূত্র দিয়াছেন:

"সকল রাজ যোগই এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যে: আমাদের অন্তর্নিহিত সকল উপাদান, সকল সংমিশ্রণ, সকল ক্রিয়া, সকল শক্তিকে পৃথক বা দ্রবা করা যাইতে পারে এবং সেগুলিকে নূতনভাবে সংমিশ্রিত ও সংযোজিত করিয়া অভিনব এবং পূর্বে অসম্ভব ছিল এরূপ সকল কার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সুনির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার ফলে সেগুলির একটি নূতন ও ব্যাপক রূপান্তর ঘটিতে পারে।"

৩ স্বভাবত "ঊর্ধ্বতমটি"ই হইল দার্শনিক। ('জোনাথান কেপ' কর্তৃক ১৯২৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত

"নিম্ন" পথ বা "ঊর্ধ্ব" পথ ছিল বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। যাহা কিছুই ভগবানে লইয়া যায়, তাহাই ভগবানের পথ। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, দীনদুঃখীর প্রতি ভ্রাতৃত্বে পরিপূর্ণ বিবেকানন্দের নিকট দীনদুঃখীর নগ্নপদে দলিত পথ-ও ছিল পবিত্র :

" 'কর্ম ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য আছে, একথা পণ্ডিতে নয়, মূর্খেই বলে।'...... কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, প্রত্যেকটি যোগই মোক্ষ লাভের জন্য প্রত্যক্ষ ও স্বতন্ত্র উপায়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।"[১]

ভারতের এই সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় মনীষীদের মধ্যে কী সুন্দরভাবেই না স্বাধীন মনোভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে! আমাদের পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত ও ধর্মবিশ্বাসীদের শ্রেণীদর্পের সহিত তাহার কী গভীর পার্থক্য! অভিজাত, সুপণ্ডিত ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বিবেকানন্দ এই কথাগুলি লিখিতে কিছুমাত্র-ও ইতস্তত করেন নাই :

"এক ব্যক্তি সমস্ত জীবনে হয়তো একখানি দর্শন-ও পাঠ করেন নাই এবং এখন-ও করেন না, তিনি হয়তো সারা জীবনের মধ্যে একবার-ও উপাসনা করেন নাই; কিন্তু যদি কেবল সৎকর্মের শক্তিতে তাঁহাকে এমন অবস্থায় লইয়া যায়, যাহাতে তিনি অপরের জন্য তাঁহার জীবন এবং অন্য যাহা কিছু সবই ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জ্ঞানী যেখানে জ্ঞানের দ্বারা এবং ভক্ত যেখানে উপাসনার দ্বারা উপনীত হইয়াছেন, তিনি-ও সেইখানেই পৌঁছিয়াছেন।[২]"

এখানে ভারতীয় জ্ঞান ও গ্যালিলীর বিশুদ্ধ বাণী[৩] বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও পরম আত্মীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আত্মীয়তা সকল মহাত্মার মধ্যেই দেখা যায়।

"দার্শনিকের ভ্রমণপঞ্জী" পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ২৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু অরবিন্দ ঘোষ ভক্তিযোগকে ঊর্ধ্বতম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (*Essays on the Gita*).

১ কর্মযোগ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২ পূর্বোক্ত স্থান।

৩ এখানে দুইটি ধর্মীয় চিন্তা-রীতির মধ্যে যে সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করা যাক। উইলিয়াম জেম্‌স প্রশংসনীয় উৎসাহের সহিত "ধর্মীয় অভিজ্ঞতা" সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ছিল না—একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। (তিনি লিখিয়াছেন, "আমার প্রকৃতিটা এমন যে, সকল প্রকার অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লাভ হইতে আমাকে বিরত থাকিতে হইয়াছে, তাই আমি কেবল অপরের প্রদত্ত সাক্ষ্যগুলিই তুলিয়া দিতেছি।") উইলিয়াম জেম্‌স্ পাশ্চাত্ত্য অতীন্দ্রিয়-বাদকে "বিক্ষিপ্ত" ব্যতিক্রম বলিয়া বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন এবং উহার বিরুদ্ধে তিনি প্রাচ্য দেশের "সুনিয়মিতভাবে চর্চা করা অতীন্দ্রিয়বাদ"কে স্থাপন করিয়াছেন। এবং ইহার ফলে তিনি পাশ্চাত্ত্যের

১ কর্মযোগ

বিবেকানন্দের চারটি বাণীর—তাঁহার চারটি যোগের—মধ্যে আমি কর্মের বাণীর—কর্মযোগের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা গভীর এবং অনুভূতিময় সুরটিকে লক্ষ্য করি। যে অন্ধ বিশ্বচক্রে মানুষ আবদ্ধ ও নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহার সম্পর্কে

সাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পক্ষে ঐ রূপটিকে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে করিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে, অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্টের মতোই তিনি-ও পাশ্চাত্ত্য ক্যাথলিক ধর্মমতের "সুনিয়মিত অতীন্দ্রিয়বাদ" সম্পর্কে অতি অল্পই জানেন। যোগের মধ্য দিয়া ভারতীয়গণ ভগবানের সহিত যে ঐক্যের সন্ধান করেন, তাহা খৃস্টান ধর্মবিশ্বাসের মূল কথার সহিত সুপরিচিত শ্রেষ্ঠ খৃস্টানদের পক্ষে-ও স্বাভাবিক অবস্থা। সম্ভবত তাহা অধিকতর স্বভাবগত এবং স্বত-উৎসারিত। কারণ, খৃস্টান ধর্মবিশ্বাস অনুসারে "আত্মার কেন্দ্র" হইলেন ভগবান। "ভগবানের পুত্র" সমস্ত খৃস্টান চিন্তার সহিতই ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। সুতরাং খৃস্টানের পক্ষে উপাসনাকালে ভগবানের কাছে খৃস্টের প্রতি অনুগত থাকার কথা নিবেদন করিলেই ভগবানের সহিত তাঁহার মিলন ঘটিতে পারে।

পার্থক্য হইল এই যে (আমি এইরূপ বিশ্বাস করাই শ্রেয় মনে করি), পাশ্চাত্ত্য দেশে ভগবান ভারতের অপেক্ষা অধিকতর একটি সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতে মানবাত্মাকেই সকল প্রয়াস সাধন করিতে হয়। ব্রেম ঠিকই দেখাইয়াছেন যে, অতীন্দ্রিয় জীবনে সকলেই লাভ করিতে পারে এবং অবশিষ্ট জগতের কাছে এই অতীন্দ্রিয় মিলনের দ্বার মুক্ত করিয়া দেওয়াই যুগে যুগে খৃস্টান অতীন্দ্রিয়-বাদের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। এমন কি, এই দিক হইতে দেখিলে, সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্স বিস্ময়কররূপে গণতান্ত্রিক ছিল। (আমি আবার পাঠকদিগকে অঁ্যারি ব্রেমঁ-রচিত "মেতাফিজিক দে সে", বিশেষত, উহাতে বর্ণিত দুইটি চরিত্র, দেখিতে বলি। এই দুইটি চরিত্রের একটি হইল ফ্রান্সিসপন্থী "সর্বাতীন্দ্রিয়বাদী" পল দ্য ল্যানী; এবং অপরটি হইল মন্তমোরেন্সির "মদ প্রস্তুতকারী" ঝাঁ ওমঁ। ওমঁর গল-সুলভ বলিষ্ঠ সাধারণ বুদ্ধি "অতীন্দ্রিয়বাদ সকলের জন্য নহে" এইরূপ ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল: "অতিশয় আলস্যভরে যে লোক নত হইয়া পান করিতে সাহস করে না, তাহাকে ছাড়া এই শক্তি ভগবান সকলকেই দিয়াছেন।" বিখ্যাত সালেপন্থী ঝাঁ-পিয়ের ক্যামুস (সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদী ও স্যাভয়ের অন্তর্গত আনেসির বিশপ সেঁ ফ্রান্সিস দ্য সালের শিষ্য) ডেনিস দি আরিয়াপাগিটের শক্তিশালী মদ্যে জল মিশাইয়া তাহাকে সকল সৎ লোকের পানীয়ে পরিণত করিবার দুষ্কর কর্মটি করিয়াছিলেন। আমাদের ক্ল্যাসিক যুগের ফরাসীরা বুদ্ধি-দৃপ্ত সপ্তদশ শতাব্দীকে ক্ল্যাসিক যুগ বলিয়া অভিহিত করে—এই যুগের অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা হইল অতীন্দ্রিবাদের এইরূপ গণতন্ত্রীকরণ। মানবাত্মার সুমহৎ রূপান্তরগুলি যে সর্বদা গভীর হইতেই হয়, সে সম্পর্কে ধারণা-ও এই সর্বপ্রথম দেখা দিল না। ধর্মীয় বা অধিবিদ্যাগত চিন্তাগুলি সাহিত্যগত ও রাজনীতিগত চিন্তার এক শতাব্দী বা কয়েক শতাব্দী পূর্বেই আসে। যাঁহারা সাহিত্যগত ও রাজনীতিগতভাবে চিন্তা করেন, তাঁহারা ধর্মগত ও অধিবিদ্যাগত চিন্তার খোঁজ রাখেন না বলিয়া তাঁহারা ঐ সকল সত্যের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক বলিয়া গর্ববোধ করেন। অথচ ঐ সকল সত্য তাঁহাদের আগমনের বহু পূর্বেই মানুষের মনের নিয়ন্ত্রণের কাঠামোর অনেকখানিকেই গঠিত করিয়া তুলে।

তাঁহার ভয়াবহ মন্তব্য আমি ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। সেই সংগে আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে দিতেছি:

"এই 'চক্রের ভিতরে চক্র'—এ বড় ভয়ানক যন্ত্র। ইহার ভিতরে হাত দিলেই আমরা গেলাম।…এই শক্তিমান জটিল বিশ্বযন্ত্রটা আমাদের সকলকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বাঁচিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে: একটি হইতেছে এই যন্ত্রের সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করা—উহাকে চলিতে দাও, তুমি একধারে সরিয়া দাঁড়াও।…ইহা বলা খুব সহজ, কিন্তু করা প্রায় অসম্ভব। দুই কোটি লোকের ভিতরে একজন তাহা পারে কিনা বলিতে পারি না।…

"যদি আমরা ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জগৎকে ত্যাগ করিতে পারি, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইব। বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়—সমুদয় নিয়মের বাহিরে যাওয়া; আর যেখানেই জগৎ আছে, সেখানেই কার্য-কারণ শৃংখল আছে। কিন্তু এই জগৎকে ত্যাগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। অতি অল্প লোকেই সংসার ত্যাগ করিতে পারেন।…"

"অন্য পথটি ত্যাগের পথ নহে, গ্রহণের পথ।…উহাতে জগতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয় এবং কর্মের গোপন কৌশলটিকে আয়ত্ত করিতে হয়।… বিশ্বযন্ত্রের চক্র হইতে পলাইও না, উহার মধ্যে দাঁড়াও এবং কর্মের গোপন কৌশল আয়ত্ত কর। আর ইহাই হইল কর্মযোগ।…ভিতরে থাকিয়া ঠিক কাজ করিলে বাহিরে আসা-ও সম্ভব।…"

"দুনিয়ায় সকলকেই কাজ করিতে হইবে।…স্রোত যখন উহার নিজের স্বাভাবিক তাড়নায় কোনো শূন্যস্থানে আসিয়া পতিত হয়, সেখানে আবর্তের সৃষ্টি করে এবং আবর্তের মধ্যে একটুক্ষণ পাক খায়, তারপর তাহা আবার অবাধে স্বাধীন গতিতে অগ্রসর হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবন ঐ স্রোতের মতো। উহা আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করে। স্থান, কাল ও কার্য-কারণের জগতে নিজেকে জড়াইয়া ফেলে, ক্ষণেকের জন্য পাক খায়, আমার বাবা, আমার ভাই, আমার নাম, আমার যশ প্রভৃতি বলিয়া চেঁচাইতে থাকে এবং অবশেষে উহা হইতে বাহিরে আসে ও নিজের পূর্বেকার স্বাধীনতা লাভ করে। আমরা তাহা জানি আর না জানি, …সমস্ত দুনিয়াই তাহা করিতেছে। আমরা এই বিশ্ব-স্বপ্নের বাহিরে আসিবার জন্য সকলেই কাজ করিতেছি। এই জগতে মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাহাই তাহাকে উহার আবর্তের মধ্য হইতে বাহিরে আসিবার শক্তি দেয়।…"

"আমরা দেখি, সমস্ত দুনিয়াই কাজ করিতেছে। কিসের জন্য করিতেছে?… মুক্তির জন্য। অণু-পরমাণু হইতে উচ্চতম সত্তা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ঐ একই উদ্দেশ্যে —মানসিক মুক্তি, দৈহিক মুক্তি, আধ্যাত্মিক মুক্তির উদ্দেশ্যে—কাজ করিতেছে। সমস্ত কিছুই সর্বদা মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে, সর্বদাই বন্ধন হইতে পলাইতেছে। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র সমস্ত কিছুই এই বন্ধন হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবীর এই কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী শক্তি আমাদের এই বিশ্বের সকল কিছুতেই রহিয়াছে।…আমরা কর্মযোগ হইতে কর্মের সেই গূঢ় কৌশল, কর্মের সংগঠনী শক্তিকে শিক্ষা করি।…কর্ম অপরিহার্য…তবে উচ্চতম উদ্দেশ্যেই আমাদিগকে কর্ম করিতে হইবে।…"

কিন্তু এই উচ্চতম উদ্দেশ্য কি? ইহা কি নৈতিক বা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে নিহিত আছে? ইহা কি সেই আবেগময় কর্মপ্রবণতা, যাহা অতৃপ্ত ফাউস্টকে দগ্ধ করিতেছিল, যাহা ফাউস্টকে নিজের দৃষ্টিভ্রংশ ঘটিবার সংগে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিশ্বকে নিজের চিন্তার আদর্শে পুনর্গঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করাইয়াছিল (সেরূপ পুনর্গঠন যেন জগতের সকলের পক্ষেই কল্যাণকর ছিল!)?[১]

না! মেফিস্টফিলিস ফাউস্টের পতন দেখিয়া যাহা বলিয়াছিল, বিবেকানন্দ প্রায় সেইরূপ ভাষাতেই উহার উত্তর দিতেন:

"সে তাহার সমস্ত ভালোবাসা লইয়া কেবল কতকগুলি ছায়ামূর্তির পিছনে ছুটিয়াছে। এবং সেই শেষ শোচনীয়, শূন্যগর্ভ মুহূর্তটি পর্যন্ত সে হতভাগ্য উহাতে ক্ষান্তি দেয় নাই।"[২]

"কর্মযোগ বলে: 'অবিরত কাজ কর, কিন্তু কাজে আসক্ত হইও না।'…তোমার

১ এমন কি সে, ফাউস্ট, জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে-ও তাহার চিরানুগত মুক্তির ছায়ামূর্তিকে আহ্বান করিয়া বলে:

"কেমন করিয়া প্রতিদিন মুক্তিকে জয় করিতে হয়, যে জানে, কেবল সে-ই মুক্তির উপযুক্ত।…"

২ গ্যেটের রচনায় এই দৃশ্যটি পুনরায় পড়িবার সময় আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, ইহার চিন্তা ও প্রকাশভংগীর সহিত হিন্দু মায়ার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে:

মেফিস্টফিলিস (ফাউস্টের মৃত দেহের দিকে তাকাইয়া):

"চ'লে গেল! কী অর্থহীন কথা!…সে কখনো ছিল না, একথা-ও তো তার সম্পর্কে বলা যায়। অথচ মানুষ সব সময়ে চেষ্টা করে এবং অগ্রসর হয়, এমন একটা ভাব, সে যেন ছিল।…এর চেয়ে আমার কাছে চিরন্তন ধ্বংসই যে ভালো।"

মনকে মুক্ত রাখো।[১] উহার উপর 'আমি ও আমার'…স্বার্থের এই নাগপাশ নিক্ষেপ করিও না।"

এমন কি কর্তব্য-বিশ্বাস হইতে-ও সর্বপ্রকারে মুক্তি চাই। বিবেকানন্দ শেষ দিন পর্যন্ত কর্তব্যকে—ক্ষুদ্র দোকানদারির সেই শেষ অপরিচ্ছন্ন একঘেঁয়ে কুয়াশাটাকে—বিদ্রূপ করিয়া যান :

"কর্মযোগ আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, কর্তব্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণাটা সর্বদা নিম্নস্তরেই থাকে। তবু আমাদের প্রত্যেককেই আমাদের কর্তব্য করিতে হয়।[২] তথাপি আমরা দেখিতে পাই, কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের এই অদ্ভুত ধারণাটা প্রায়ই আমাদের মহাদুঃখের কারণ হইয়া উঠে।…কর্তব্য আমাদের রোগে পরিণত হয়।…উহা মানব জীবনে সর্বনাশরূপে দেখা দেয়।…এই সব হতভাগ্য কর্তব্যের ক্রীত-দাসদিগকে দেখ! কর্তব্য তাহাদিগকে উপাসনা করিবার মতো, স্নানাহ্নিক

১ ইহা গীতার সুপ্রাচীন মতবাদ : "নির্বোধরা কর্মে আসক্ত হইয়া কাজ করে ; জ্ঞানীরা-ও কাজ করেন, তবে সকল প্রকার আসক্তিকে অতিক্রম করিয়া, কেবল জগতের কল্যাণের জন্যই করেন।… সকল কাজ আমাকে অর্পণ করিয়া মনকে সংহত এবং সকল আশা ও স্বার্থ হইতে মুক্ত করিয়া কাজ করো, ভালো-মন্দ বিচার করিয়া উহাকে বিব্রত করিও না।"

খ্রিস্টান অতীন্দ্রিয়বাদ তুলনীয় :

"কোনো উপযোগিতা বা সাময়িক লাভের উদ্দেশ্যে, কিম্বা স্বর্গের জন্য, নরকের জন্য, ভগবৎকৃপার জন্য বা ভগবানের প্রিয় হইবার জন্য কাজ করিতে চাহিও না। কেবল ভগবানের উদ্দেশ্যেই কাজ করিয়া যাও।" (বেল্যজপন্থী ক্লোদ সেগেনো রচিত "কঁদ্যুত দ'অরেজ", ১৬৩৪)।

কিন্তু বিবেকানন্দ আরো সাহসের সহিত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, এইরূপ অনাসক্তির জন্য কোনো প্রকার ভগবৎ-বিশ্বাসের উপরে নির্ভরশীল হইতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। বিশ্বাস উহাকে কেবল সহজ করিয়া দেয়। কিন্তু বিবেকানন্দ সর্বপ্রথমে তাঁহাদের কাছেই আবেদন করেন, যাঁহারা বাহিরের কোনোরূপ সাহায্যে বা ভগবানে বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ উপায় অনুসারে কাজ করিবেন। নিজের ইচ্ছা, মনোবল ও বিচারশক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। তাঁহারা বলিবেন, 'আমরা অবশ্যই অনাসক্ত হইব।'"

২ প্রকৃত কর্তব্য কি, তাহার নির্ধারণে বিবেকানন্দ একটি সমগ্র অধ্যায় নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কর্তব্যের কোনোরূপ ব্যক্তিসম্পর্কহীন বাস্তবতা অস্বীকার করেন নাই : "কোনো কাজ হইতেই কর্তব্য নির্ধারণ করা যায় না।…তবে ব্যক্তিগত দিক হইতে কর্তব্য রহিয়াছে। যে কাজ আমাদিগকে ভগবানের দিকে লইয়া যায়, তাহাই সৎ কাজ ; যে কাজ আমাদিগকে নিচের দিকে লইয়া যায়, তাহাই অন্যায় কাজ।…কিন্তু কর্তব্য সম্পর্কে একটি ধারণাকে সকল কালের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল দেশের সকল নরনারীই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত সংস্কৃত সূত্রটিতে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—"পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।" (কর্মযোগ, চতুর্থ অধ্যায়।)

করিবার মতো-ও সময়টুকু দেয় না। কর্তব্য সর্বদাই তাহাদের উপর চাপিয়া থাকে। তাহারা বাহিরে যায়, কাজ করে। কিন্তু কর্তব্য চাপিয়াই থাকে! তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসে, আবার পর দিন কি কাজ করিবে, তাহাই ভাবিতে থাকে। তখনো কর্তব্য ছাড়ে না! ইহাই তো ক্রীতদাসের জীবন। অবশেষে সে একদিন রাস্তায় পড়িয়া লাগাম-দেওয়া ঘোড়ার মতো মরে। কর্তব্য বলিতে লোকে ইহাই বুঝে।...কিন্তু প্রকৃত কর্তব্য হইল অনাসক্ত হওয়া, স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং সকল কাজকে ভগবানে অর্পণ করা। আমাদের সকল কর্তব্যই 'তাঁহার'। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তিনি আমাদিগকে এখানে কাজ করিতে পাঠাইয়াছেন। আমরা আমাদের সময়ের সেবা করি; আমরা ভালো করি, কি মন্দ করি, কে জানে? যদি ভালো করি, আমরা তাহার ফল পাইব না।[1] যদি মন্দ করি, তাহাতে-ও বা আমাদের কি আসে-যায়?...শান্ত হও, মুক্ত হও, এবং কাজ করো।..."

"এই ধরণের স্বাধীনতা লাভ করা-ও অত্যন্ত কঠিন। গোলামিকে, রক্ত-মাংসের প্রতি রক্তমাংসের অসুস্থ আসক্তিকে কর্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা কতোই সহজ! মানুষে সংসারে গিয়া অর্থের জন্য (উচ্চাশার জন্য) কতো সংগ্রাম, কতো যুদ্ধই না করে! তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কেন তাহারা ইহা করে। তাহারা বলিবে, 'ইহা তাহাদের কর্তব্য।' আসলে উহা হইল স্বার্থান্ধ সুবর্ণের অর্থহীন লালসামাত্র, যে লালসাকে তাহারা কয়েকটা ফুল দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে চায়।... যখন কোনো আসক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় (যেমন, বিবাহ), তখন আমরা তাহাকে বলি কর্তব্য।...বলা চলে, উহা একটা অত্যন্ত পুরাতন ব্যাধি। উহা যখন তীব্র হইয়া উঠে, তখন উহাকে আমরা বলি অসুখ, আর যখন উহা সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিতে থাকে, তখন উহাকে বলি স্বভাব।...আমরা উহাকে শ্রুতিমধুর কর্তব্য নামে অভিহিত করি। আমরা উহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করি, শঙ্খধ্বনি করি, মন্ত্রপাঠ করি। তাপর সারা দুনিয়া এই কর্তব্যের নামে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে, পরস্পরের সর্বস্ব প্রাণপণে হরণ করে।...অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর পক্ষে, যাহাদের আর অপর কোনো আদর্শ নাই, উহা কিছুটা উপকারে আসে। কিন্তু যাঁহারা কর্মযোগী হইতে চান, তাঁহাদিগকে কর্তব্যের এই ধারণা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার জন্য বা আমার জন্য কোনো কর্তব্য নাই। তুমি জগৎকে যাহা

১ "আমাদের কর্মে অধিকার আছে, কিন্তু ফলে কখনো অধিকার নাই।"—গীতা

দিতে পারো, তাহা যে কোনো উপায়ে জগৎকে দাও, কিন্তু কর্তব্য বলিয়া দিও না। কর্তব্যের কথা ভাবিও না। বাধ্য হইও না। কেন বাধ্য হইবে? তুমি যাহাই বাধ্য হইয়া কর, তাহাই তোমাকে আসক্তি গঠনে সাহায্য করে। তোমার কর্তব্য কি হইবে? সকল কিছুই তুমি ভগবানে অর্পণ কর।[১] এই ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে, যেখানে কর্তব্যের আগুনে সমস্তকে জ্বালাইয়া ছারখার করিতেছে, তুমি সেখানে অমৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হও। আমরা সকলে কেবল তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করিতেছি। দণ্ড বা পুরস্কারের সহিত আমাদের সম্পর্ক কি?[২] তুমি যদি পুরস্কার চাও, তবে তোমাকে দণ্ড-ও লইতে হইবে; দণ্ডের হাত হইতে অব্যাহতির একমাত্র উপায় হইল পুরস্কারের আশা ত্যাগ করা। দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতির একমাত্র উপায় হইল সুখের কথা ত্যাগ করা, কেননা সুখ ও দুঃখ পরস্পর জড়িত। মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাইবার একমাত্র পথ হইল জীবনের প্রতি ভালোবাসাকে ত্যাগ করা। জীবন ও মৃত্যু দুই বিভিন্ন দিক হইতে দৃষ্ট একই বস্তু মাত্র। সুতরাং দুঃখকে বাদ দিয়া সুখের কথা, মৃত্যুকে বাদ দিয়া জীবনের কথা শিশু ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে খুবই উপযোগী হইলে-ও, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উহার মধ্যে কেবল নামের বৈপরীত্যকে লক্ষ্য করেন, ফলে উভয়কেই ত্যাগ করেন।"

এই অসীম মুক্তির উন্মাদনা মানুষের নির্লিপ্তিকে কোনো ঊর্ধ্বতম লোকে পৌঁছাইয়া দেয়। কেবল তাহাই নহে, ইহা-ও সুস্পষ্ট যে, এই আদর্শ অধিকাংশ মানুষের পক্ষে অনধিগম্য নহে, কিন্তু, উহাকে খারাপভাবে ব্যাখ্যা করিলে, উহার আতিশয্য মানুষকে তাহার প্রতিবেশীর প্রতি এবং নিজের প্রতি উদাসীন করিয়া তুলিবে এবং ফলে সকল সামাজিক কর্মেরই অবসান ঘটিবে। মৃত্যুর দংশন হয়তো আর থাকিবে না, কিন্তু সেই সংগে জীবন-ও তাহার দংশন হারাইবে।

১ "যাঁহাদের কোনো উচ্চাশা নাই, যাঁহারা সম্মান, উপযোগিতা, আভ্যন্তরীণ ত্যাগ, পুরস্কার, স্বর্গলাভ, কিছুই কামনা করেন না, যাঁহারা ঐ সকল বস্তুকে এবং নিজেদের সর্বস্বকে ত্যাগ করিয়াছেন— তাঁহারাই ভগবানকে শ্রদ্ধা করেন।" (মাইস্টার একহার্ট।)

২ "......স্বর্গীয় আলোকের কথা তাঁহারই ভাবিবার অধিকার আছে, যিনি কোনো কিছুরই, এমন কি নিজের সদ্‌গুণের-ও দাসত্ব করেন না।" (রুইস্‌ব্রয়েক: *De Ornatu Spiritualium Nuptiarum*.

"যে লোক কেবল বিনয় ভিন্ন অন্য কিছুকে যোগ্যতা, গুণ বা বিজ্ঞতা বলিয়া ভাবে, সে একটি নির্বোধ।" (রুইস্‌ব্রয়েক: *De Precipuis Quibusdam Virtuibus*)।

তখন উহা সেবার মতবাদে উদ্বুদ্ধ করিতে কি সাহায্যই বা করিবে—যে সেবা বিবেকানন্দের বাণী ও ব্যক্তিত্বের একটি মূলকথা ?

কিন্তু বিবেকানন্দের এই সকল বক্তৃতা বা রচনা কাহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বা রচিত হইয়াছিল, তাহা সর্বদাই লক্ষণীয়। কারণ, তাঁহার ধর্ম ছিল মূলত বাস্তববাদী ও প্রয়োগশীল, কর্মই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তাই শ্রোতা ও পাঠকের পার্থক্যের সহিত তাঁহার প্রকাশ-ভংগীতে-ও পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই বিশাল জটিল চিন্তাধারার সমস্তটুকুকে এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করা-ও সম্ভব নহে। তাই বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীর মধ্য হইতে বাছিয়া লইবার প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে বলিতেছিলেন। সুতরাং সেখানে অতিরিক্ত আত্মবিস্মৃতি ও কর্মের ফলে তাহারা পাপ করিবে, এমন আশংকা ছিল না। সুতরাং স্বামীজী সেখানে একেবারে বিপরীত প্রান্তের উপর,—সমুদ্রপারের অন্যান্য দেশের গুণাবলীর উপর,—জোর দেন।

অন্য পক্ষে, তিনি যখন ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন, তখন নির্লিপ্তির ধর্ম মানুষকে যে অমানুষিক অপব্যয়ের পথে লইয়া যায়, তিনি সর্বপ্রথম তাহারই নিন্দা করেন। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে তিনি আমেরিকা হইতে ফিরিবার ঠিক পরেই রামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য, একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক, এই আপত্তি তুলেন : "আপনি দান, সেবা এবং দুনিয়ার যে সকল কল্যাণকর কাজের কথা বলিতেছেন, সেগুলি, যাহাই হউক, সমস্তই মায়ার জগতেরই ব্যাপার। শৃংখল ভাঙাই আমাদের লক্ষ্য, বেদান্ত কি আমাদিগকে এই শিক্ষাই দেয় না ? তবে আমরা আবার আমাদের উপর আরো শৃংখল চাপাইব কেন ?"

বিবেকানন্দ বিদ্রূপের সহিত তাহার জবাব দেন :

"সে হিসাবে মুক্তির ধারণাটা-ও তো মায়ার জগতেরই জিনিস। বেদান্ত কি আমাদের এই শিক্ষা দেয় না যে, আত্মা সর্বদাই মুক্ত ? তবে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেন কেন ?"

পরে নিরিবিলিতে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলেন যে, বেদান্তের এইরূপ ব্যাখ্যা দেশের অপরিমেয় ক্ষতি করিয়াছে।[১] তিনি খুব ভালো করিয়াই জানিতেন

১ এই ধরণের আরো অনেক খণ্ড কাহিনী রহিয়াছে। তাহার অন্যতম হইল তাঁহার এক ভক্তের সহিত সাক্ষাৎকার-কালে একটি তুমুল তর্ক। ঐ সময় মধ্য ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল (উহাতে প্রায় নয় লক্ষ লোক মারা যায়)। ভক্তটি ঐ ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের কথা ভাবিতে নারাজ হন। তিনি বলেন যে, উহা কেবল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদের স্ব স্ব কর্মফল মাত্র; ইহা লইয়া তাঁহার মাথা

যে, অনাসক্তির এমন কোনো রূপ নাই, যাহার মধ্যে স্বার্থপরতা প্রবেশ করিতে পারে না এবং সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য হইল অপরের জন্য নহে—কেবল নিজের জন্য "মুক্তির" সন্ধান ও তাহার সহিত জড়িত অজ্ঞানকৃত বা জ্ঞান-কৃত ভণ্ডামি। তিনি ক্রমাগতই তাঁহার শিষ্যদিগকে বলেন যে, তাঁহারা দুইটি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; প্রথমটি হইল—"নিজের মুক্তি", দ্বিতীয়টি হইল—"অপরের মুক্তি"। তাঁহার নিজের এবং তাঁহার শিষ্যদের লক্ষ্য ছিল বেদান্তের মহান শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বার্থের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে গ্রহণের শক্তি অনুসারে সকল প্রকারের, সকল অবস্থার সকল মানুষের মধ্যে প্রচার করা।[১] তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলিতে যখন তাঁহার দেহ রোগের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং আত্মা সর্বপ্রকার মানসিক চিন্তা হইতে নিজের তিন-চতুর্থাংশ বিচ্ছিন্ন কবিবা লইবার অধিকার অর্জন কবিয়াছিল—কারণ, তিনি নিজের জীবন দিয়া তাঁহাব কর্তব্য সাধন করিয়াছিলেন—তখন তাঁহাকে দৈনন্দিন বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন, "তিনি মৃত্যুর পথে এতোখানি আগাইয়া গিয়াছেন যে, এ সকল প্রশ্ন তাহার মাথায় ঢুকিতেছে না।" কিন্তু তখনো সেই সংগে একটি কথা তিনি বলিতেন, "তাঁহার কাজ, তাঁহার সারা জীবনের কাজ।"[২]

ঘামাইবার কোনো কারণ নাই। বিবেকানন্দ রাগে লাল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে রক্ত স্রোত দ্রুত প্রবাহিত হইল। চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। এই হৃদয়হীন গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হইল। তিনি তাঁহার শিষ্যদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই, এই করিয়াই আমাদের দেশটা উচ্ছন্নে গেল। কর্মের মতবাদ কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখ। মানুষের জন্য যাহাদের দুঃখ-দয়া হয় না, তাহারা কি মানুষ?"

তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্রোধে ও ঘৃণায় কাঁপিতেছিল।

পূর্বে বর্ণিত আর-ও একটি স্মরণীয় ঘটনা এ প্রসংগে মনে পড়ে। তাঁহার শিষ্য এবং সতীর্থ সন্ন্যাসীরা যখন ব্যক্তিগত শুদ্ধির মতবাদ লইয়া মগ্ন থাকিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি ঘৃণাভরে তাহাকে-ও লাথি মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, এমন কি তাঁহারা রামকৃষ্ণের কথা তুলিলে তাঁহাকে-ও তিনি বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, "মানুষের সেবার" বিধানের অপেক্ষা উচ্চতর কোনো বিধান বা ধর্ম নাই।

১ "অদ্বৈত সম্পর্কে জ্ঞান বহুদিন ধরিয়া গুহায় ও অরণ্যে লুকায়িত ছিল। উহাকে গুহা ও অরণ্য হইতে উদ্ধার করিয়া সমাজের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার আমার উপর পড়িয়াছে।…অদ্বৈতের দামামা পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, পর্বত-শৃংগে, সর্বত্র ধ্বনিত হইবে।"

২ তাঁহার মৃত্যুর আগের রবিবারে: "তোমরা জান, কাজ সম্পর্কে আমার একটা দুর্বলতা আছে। যখনই আমি ভাবি যে, কাজ ফুরাইতে পারে, তখনই আমি আর কোনো আশা দেখি না।"

মানব জাতি তাহার বিশেষ যুগে নিজের উপর বিশেষ কাজের ভার ন্যস্ত করে। আমাদের কাজ হইল বা হওয়া উচিত জনসাধারণকে তুলিয়া ধরা—যে-জনসাধারণকে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ঠিক সেই মানুষরাই প্রতারিত, শোষিত ও অধঃপতিত করিয়াছে, যাহাদের উচিত ছিল তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দেওয়া, তাহাদিগকে রক্ষা করা। এমন কি, যে সকল সাধু ও শক্তিশালী পুরুষ মুক্তির তোরণে গিয়া উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তাঁহাদের সহযাত্রীদিগকে, যাঁহারা পথে পড়িয়া গিয়াছেন বা পিছনে পড়িয়া আছেন, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ফিরিয়া আসিতে হইবে। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যিনি অপরকে সিদ্ধিলাভে সাহায্য করিবার জন্য নিজের সিদ্ধিকে—কর্মযোগকে বিসর্জন দিতে রাজী আছেন।[১]

সুতরাং এই মহান্ কর্মযোগী তাঁহার নিজের আদর্শের কাছে তাঁহার শিষ্যদিগকে বলি দিবেন, এমন কোনো আশংকাই ছিল না—সে আদর্শ যতোই প্রশান্ত ও সমাহিত হোক, তাহা যদি অধিকাংশ মানুষের কাছে তাহাদের স্বভাবের আয়ত্তের বাহিরে বলিয়া অমানুষিক হয়। হীনতম হইতে উর্ধ্বতম পর্যন্ত সকল মানুষেরই যে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজন আছে, এই বোধকে এমন সহানুভূতির সহিত অন্য কোনো ধর্মীয় মতবাদ এইভাবে প্রকাশ করে নাই। এই মতবাদ সকল প্রকার ধর্মান্ধতাকে ও অসহিষ্ণুতাকে দাসত্বের এবং আধ্যাত্মিক মৃত্যুর মূল বলিয়া গণ্য করিয়াছে।[১] মুক্তিলাভের জন্য একটি মাত্র পথ অবলম্বন করা সম্ভব; সেটি হইল প্রত্যেক মানুষের নিজের আদর্শ কি তাহা জানা এবং তাহাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করা। তবে সে যদি নিজের আদর্শ কি তাহা আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হয়, তবে একজন গুরুর তাহাকে সাহায্য করা দরকার, অবশ্য, গুরুর আদর্শকে তাহার আদর্শ বলিয়া চালাইয়া দিলে চলিবে না। সর্বদা সর্বত্র বারে

১ "মানুষকে আপনার পায়ে ভর দিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে এবং নিজ নিজ কর্ম যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে সাহায্য কর।" (শিষ্যগণের প্রতি বিবেকানন্দ, ১৮৯৭)।

১ "অনাসক্ত হইয়া কিভাবে কাজ করিতে হয়, তাহা সর্বপ্রথমে শিক্ষা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে আর ধর্মান্ধতা থাকিবে না।...জগতে যদি ধর্মান্ধতা না থাকিত, তবে জগৎ এখনকার অপেক্ষা অনেকখানি আগাইয়া যাইতে পারিত।...ধর্মান্ধতা পিছনে টানিয়া রাখে।...তুমি যখন ধর্মান্ধতাকে এড়াইবে, কেবল তখনই তুমি ভালো ভাবে কাজ করিতে পারিবে।...অনেক ধর্মান্ধ ব্যক্তিকে ফস্ করিয়া বলিতে শুনা যায়, "আমি পাপীকে ঘৃণা করি না, পাপকে ঘৃণা করি; কিন্তু পাপ ও পাপীর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কে করিতে পারে, আমি তাহার মুখখানা একবার দেখিবার জন্য দূর-দূরান্তে-ও যাইতে প্রস্তুত আছি।..." (কর্মযোগ, পঞ্চম অধ্যায়।)

বারে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত কর্মযোগের আদর্শ হইল "মুক্তভাবে কাজ করা", "মুক্তির জন্য কাজ করা," "ক্রীতদাসের মতো নহে, প্রভুর মতো কাজ করা।"[১] এবং এই কারণেই গুরুর নির্দেশ অনুসারে কাজ করিবার কোনো প্রশ্নই উহাতে উঠিতে পারে না। গুরুর কথা কেবল তখনই কার্যকরী হইয়া উঠিতে পারে, যখন গুরু নিজেকে ভুলিয়া যাহাকে উপদেশ দিতেছেন, তাহার মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারেন, যদি তিনি তাহার স্বভাবকে গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহার দ্বারা নিজের আদর্শকে বুঝিতে ও কার্যে পরিণত করিতে সাহায্য করেন।

বিবেকানন্দের মতো মানবিক কর্মের সকল শ্রেষ্ঠ সাধকের ইহাই হইল প্রকৃত কর্তব্য। যে কর্মযোগের বিশাল কর্মশালায় বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন আকারের সম্মিলিত শ্রম চলিতেছে, যেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া একটি বিরাট কর্ম সম্পন্ন করিতেছে, তিনি সেই কর্মযোগের সমস্ত স্তরগুলিকেই বুঝিতেন।

কিন্তু "কর্মশালা," "রকম," "প্রকার" প্রভৃতি কথাগুলি বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে কাহার-ও উচ্চতা বা নিম্নতা প্রকাশ করিতেছে না। ঐগুলি অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র; এই মহান অভিজাত ঐগুলিকে অপ্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কর্মীদের মধ্যে তিনি কোনো জাতিভেদ প্রশ্রয় দিবেন না, কর্মীদের উপর কেবল পৃথক পৃথক কর্মের ভার ন্যস্ত থাকিবে।[২] যাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা চাকচিক্য আছে, যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, সে-ই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ নামের অধিকারী নহে। আর বিবেকানন্দের যদি কোনোদিকে অধিক টান ছিল বলা যায়, তবে তাহা ছিল যাহারা সবচেয়ে দীনহীন, সবচেয়ে সরল, তাহাদের দিকে:

"যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার করিতে চাও, তবে তাহার বড়

১ "এই শিক্ষার সারমর্ম হইল এই যে, তুমি ক্রীতদাসের মতো নহে, প্রভুর মতো কাজ করিবে। স্বাধীনভাবে কাজ করো!...আমরা যখন নিজেরা পার্থিব বস্তুর জন্য ক্রীতদাসের মতো কাজ করি,... তখন আমাদের সত্যিকার কাজ হয় না।...স্বার্থপ্রণোদিত কাজ ক্রীতদাসের কাজ।...অনাসক্ত হইয়া কাজ করো।" (কর্মযোগ, তৃতীয় অধ্যায়।)

২ কর্মযোগের মধ্যে স্তর বিভাগ আছে, ইহা স্বীকার করা প্রয়োজন। একটি বিশেষ পরিপার্শ্বের মধ্যে জীবনের বিশেষ অবস্থায় যাহা করণীয়, তাহা অন্য পরিপার্শ্বে জীবনের অন্য অবস্থায় করণীয় নহে।... প্রত্যেক মানুষের উচিত, তাহার নিজের আদর্শ কি তাহা জানা এবং তাহা সম্পন্ন করা। অপরের আদর্শকে গ্রহণের অপেক্ষা ইহাই হইল নিশ্চিততর পন্থা। কেননা, অপরের আদর্শকে কখনো কার্যে পরিণত করা যায় না।

বড় কার্যের দিকে লক্ষ্য দিও না। অবস্থা বিশেষে নিতান্ত নির্বোধ-ও বীরতুল্য কার্য করিয়া থাকে। লোককে তাহার সামান্ত কার্য করিবার সময় লক্ষ্য কর, উহাতেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটনায় সামান্ত লোককে-ও মহৎ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সকল অবস্থাতেই যাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব লক্ষিত হয়, তিনিই প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি।"[১]

কর্মীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ প্রসংগে বলিতে গিয়া বিবেকানন্দ যে সুবিখ্যাত-দিগকে, গৌরব ও শ্রদ্ধার মুকুটপরিহিত ব্যক্তিদিগকে—এমন কি খৃস্ট ও বুদ্ধদিগকে-ও —সর্বাগ্রে স্থান দেন নাই, তাহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কিছুই নাই। তিনি নামহীন নীরব কর্মীদিগকে—"অজ্ঞাত সৈনিকদিগকে-ই"—সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছিলেন।

কর্মযোগের এই কথাগুলি লক্ষণীয়। এগুলি পড়িলে সহজে ভোলা যায় না :

"জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা মানুষের কাছে অপরিচিত থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে আমাদের পরিচিত খৃস্ট ও বুদ্ধগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর বীর মাত্র। এইরূপ শত শত অজ্ঞাত বীর প্রতি দেশে আবির্ভূত হইয়া নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। নীরবে তাঁহারা জীবন যাপন করেন, নীরবে তাঁহারা চলিয়া যান। এবং সময়ে তাঁহাদের চিন্তারাশি বুদ্ধ ও খৃস্টগণের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে। তখন বুদ্ধ ও খৃস্টগণ-ই আমাদের নিকট পরিচিত হন। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের জ্ঞানের দ্বারা নাম ও খ্যাতির সন্ধান করেন নাই; তাঁহারা তাঁহাদের ভাবগুলি জগৎকে দিয়া যান। তাঁহারা নিজেদের জন্য কোনো দাবী উত্থাপন করেন না বা নিজেদের নামে কোনো সম্প্রদায় বা মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন না। ঐরূপ ব্যাপার হইতে তাঁহাদের স্বভাবই হইল দূরে সরিয়া দাঁড়ান। তাঁহারাই খাঁটি সাত্ত্বিক। তাঁহারা কখনো কোনো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন না; তাঁহারা কেবল প্রেমে বিগলিত হন।[২]...গৌতম বুদ্ধের জীবনে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্বদাই

১ কর্মযোগ, প্রথম অধ্যায়।

২ বিবেকানন্দ নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেন :

"আমি এইরূপ একজন যোগীকে দেখিয়াছি। তিনি ভারতবর্ষে একটি গুহায় বাস করেন।...তিনি তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বের ধারণাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছেন যে, আমরা বলিতে পারি, তাঁহার মধ্যে যে মানুষ ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে এবং পিছনে কেবল একটি সর্বব্যাপী ঐশী ভাব রাখিয়া গিয়াছে।"

বিবেকানন্দ এখানে গাজীপুরের পওহরি বাবার কথা বলিতেছিলেন। ১৮৮৯-৯০-এ তাঁহার ভারত পরিক্রমণের গোড়ার দিকে পওহরি বাবা তাঁহাকে আকৃষ্ট করেন। তবে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জন্ত যে

আপনাকে পঞ্চবিংশতিতম বুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার পূর্ববর্তী চব্বিশ জন বুদ্ধ ইতিহাসে অজ্ঞাত। কিন্তু ইতিহাসে পরিচিত বুদ্ধ নিশ্চয় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপরই তাঁহার ধর্মসৌধটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা প্রশান্ত, নীরব ও অজ্ঞাত। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে চিন্তার শক্তি কি তাহা জানেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহে জানেন, যদি তাঁহারা গুহায় গিয়া গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া পাঁচটি প্রকৃত চিন্তা করেন, তবে সেই চিন্তাগুলিই অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান থাকিবে। সেগুলি পর্বত ভেদ করিবে, সমুদ্র পার হইবে, সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ করিবে। সেগুলি মনে ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে এবং এমন নর-নারীর সৃষ্টি করিবে, যাঁহারা ঐ সকল চিন্তাকে কার্যত মানুষের জীবনে মূর্ত করিবেন।·· বুদ্ধ এবং খৃস্টের দল ঐ সকল চিন্তাকে দেশে দেশে প্রচার করিবেন।·· কিন্তু পূর্বোক্ত সাত্ত্বিকগণ ভগবানের এমন সান্নিধ্যে থাকেন যে, তাঁহারা সক্রিয় হইতে, সংগ্রাম করিতে, পৃথিবীতে মানুষের জন্য কাজ করিতে, যুদ্ধ করিতে, যাহা লোকে বলে, মঙ্গল সাধন, তাহা করিতে পারেন না।···[১]

বিবেকানন্দ নিজেকে এই প্রথম শ্রেণীর বীরদের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া দাবী করেন নাই। তিনি নিজেকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীদের—যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন, তাঁহাদের স্তরেই স্থান দেন।[২] কারণ, ঐ সকল সাত্ত্বিক পুরুষ, যাঁহারা কর্মযোগের স্তর পার হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আগেই অপর পারে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন আমাদের এই পারেই।

তাঁহার তীব্র ও নির্লিপ্ত অতীন্দ্রিয় চিন্তা হইতে বিকীর্ণ এই সক্রিয় সর্বশক্তিমত্তার আদর্শ নিশ্চয় পাশ্চাত্তের ধর্মাত্মাদিগকে বিস্মিত করিবে না। আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠ ধ্যানশীল ধর্ম সম্প্রদায়গুলিই উহার সহিত সুপরিচিত। ধর্মসম্প্রদায়-বহির্ভূত আধুনিক চিন্তার শ্রেষ্ঠ রূপগুলি-ও উহার মধ্যে স্ব স্ব সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে। যে হাজার

আদর্শ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতে ইনি বিবেকানন্দকে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। পওহরি বাবা বলিতেন, সাধারণভাবে দেখিতে গেলে কর্ম মাত্রেই বন্ধন। তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, দৈহিক কর্ম-বর্জিত আত্মা ভিন্ন কিছুই মানুষকে সাহায্য করিতে পারে না।

১ কর্মযোগ, সপ্তম অধ্যায়।

২ যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কিছুর উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া কাজ করেন, তিনি-ই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্মী। কোনো মানুষ যখন সেরূপ করিতে সমর্থ হইবে, তখন সে-ও বুদ্ধের মতো একজন হইয়া উঠিবে। তাহার মধ্য হইতে এমনভাবে কর্মশক্তি নির্গত হইবে, যাহা দুনিয়াকে বদলাইয়া দিবে। এইরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের উচ্চতম আদর্শের দৃষ্টান্তস্থল। (কর্মযোগ, অষ্টম অধ্যায়ের শেষে।)

হাজার নীরব কর্মীর কর্ম, চিন্তা ও বিনীত জীবন জাতির প্রতিভা ও শক্তির সম্পদরূপে প্রকাশ পায়, আমরা গণতান্ত্রিক রীতিতে আমাদের হৃদয়ের গভীর হইতে তাঁহাদিগকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিই, তাহার সহিত ইহার কি পার্থক্য আছে?[১]

যে ব্যক্তি এই কথাগুলি লিখিতেছে, তাহার যদি অন্য কোনো গুণ না থাকে, তবে সে যে যাট বছর ক্রমাগত কাজ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ সে দিতে পারিবে। সে বহু বৎসর ধরিয়া এই সকল নীরব কর্মীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে; এবং সে একই সংগে এই সকল নীরব কর্মীদের ফসল এবং কণ্ঠস্বর হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত কাজ করিতে করিতে সে নত হইয়া নিজের অন্তরে কান পাতিয়া শুনিয়াছে; শুনিয়াছে, সেখানে কতো নামহীন অগণিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতেছে। সে-ধ্বনি সমুদ্র-গর্জনের মতো—যে সমুদ্র হইতে মেঘ ও নদনদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই অগণিত মূক মানুষের অনুচ্চারিত জ্ঞান-ই আমার ইচ্ছাশক্তির উৎস ও চিন্তার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের কোলাহল শান্ত হইলে আমি তাহাদের প্রাণ-স্পন্দন শুনিতে পাই।

১ এই হিন্দু প্রতিভাও ইহা অনুভব করেন। কিন্তু তিনি উহাকে অবতারবাদের মতবাদের দ্বারা—জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত দীর্ঘ ধারাবাহিক কর্মের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন: "প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী সকল মানুষই প্রচণ্ড কর্মী...তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি ব্যাপক...তাঁহারা যুগ যুগ ধরিয়া ক্রমাগত কর্মের মধ্য দিয়া তাহা আয়ত্ত করেন।" বহু শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত কর্মের ফলে যে শক্তি পুঞ্জীভূত হয়, কেবলমাত্র তাহার ফলেই বুদ্ধ ও খৃস্টের মতো ব্যক্তিগণের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। (কর্মযোগ)

পাশ্চাত্ত্যবাসীর নিকট অবতারবাদের তত্ত্বকে ভূতুড়ে মনে হইলে-ও, উহা সকল যুগের সকল মানুষের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। উহা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে আমাদের অধুনাতন বিশ্বাসেরই সগোত্র।

২ ভক্তিযোগ

সত্যে—মুক্তিতে—উপনীত হইবার দ্বিতীয় পথ হইল হৃদয়ের পথ : ভক্তিযোগ। এখানে আমি আবার আমাদের পণ্ডিতদের সেই বাঁধা বুলি শুনিতে পাই : "মুক্তির মধ্য দিয়া ভিন্ন কোনো সত্যে পৌছানো যায় না। দাসত্ব ও বিভ্রান্তি ভিন্ন অন্য কিছুতে হৃদয় পৌছাইয়া দিতে পারে না।" আমি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিজেদের পথে থাকিতে অনুরোধ করি। আমি শীঘ্রই সেপথে ফিরিয়া আসিতেছি। সে পথই তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী; সুতরাং সে পথেই লাগিয়া থাকিলে তাঁহারা ভালো করিবেন; কিন্তু সকল প্রকার মনের পক্ষে ঐ পথ উপযোগী, এরূপ দাবী করিলে তাঁহারা ভালো করিবেন না। তাঁহারা কেবল মানব মনের বৈচিত্র্য সম্পদকে ছোট করিয়া দেখিবেন না, তাঁহারা সত্যের জীবন্ত স্বরূপটিকে-ও ছোট করিয়া দেখিবেন। হৃদয়ের পথে যে দাসত্ব ও বিভ্রান্তির বিপদ আছে, তাহার নিন্দা করিয়া তাঁহারা ভুল করেন না; কিন্তু তাঁহারা ভুল করেন, যখন তাঁহারা ভাবেন যে, ঐরূপ কোনো বিপদ বুদ্ধিজাত জ্ঞানের পথে নাই। এই মহান "বিচারকের" (বিবেকের) মতে, মানুষ যে পথেই যাক না কেন, আত্মা ধারাবাহিকভাবে আংশিক ভুল ও আংশিক সত্যের মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইতে থাকে, তাহা একে একে দাসত্বের বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে অবশেষে মুক্তি ও সত্যের সমগ্র ও বিশুদ্ধ আলোকে গিয়া উপনীত হয়। ঐ আলোককে বেদান্তবাদীরা সৎ-চিৎ-আনন্দ (অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দ) নাম দিয়াছেন। ঐ আলোকের সাম্রাজ্যে হৃদয় ও যুক্তির দুই বিভিন্ন রাজ্যেরই স্থান আছে।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের উপকারার্থে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা উচিত যে, হৃদয়ের পথে যে সকল বিপদ লুক্কায়িত আছে, সেগুলি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যতোখানি সচেতন ছিলেন, ততোখানি সচেতন তাঁহারা কেহই হইতে পারেন নাই। কারণ, সে-সকল বিপদের কথা তিনি সকলের অপেক্ষা অধিক জানিতেন। পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয়-তীর্থযাত্রীদের পথের নাম বিভিন্ন হইলে-ও তাঁহারা এই ভক্তিপথের সহিত পরিচিত ছিলেন। এবং তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া হাজার হাজার বিনীত বিশ্বাসী ঐ পথে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন রোম আমাদের ধর্মসম্প্রদায়-গুলিকে এবং রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ম ও শৃংখলার যে মনোভাবটি দিয়াছিল, তাহা এই ভক্তি-যোদ্ধাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করিয়াছে, পথের নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে

অভিযান- করিতে দেয় নাই। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপের সহিত তুলনা করিয়া ভক্তি সম্পর্কে কাউণ্ট ফন্ কেইজারলিং যে আপাতসত্য মন্তব্য করিয়াছেন, এই ব্যাপারটি হইতেই তাহার কারণ বুঝা যায়।[১] এই "ভ্রাম্যমাণ দার্শনিকের" চলমান উজ্জ্বল প্রতিভা পাশ্চাত্ত্যের হৃদয়হীনতাকে অত্যন্ত বাড়াইয়া দেখাইয়াছে এবং কেইজারলিং নিজেকে পাশ্চাত্ত্যের সর্বাপেক্ষা নিখুঁত নমুনা বলিয়া দাবী করিয়াছেন।[২] তাঁহার মনে কোমলতা না থাকায় তিনি ভক্তির নিন্দা করিয়াছেন এবং উহাকে "বার্ধক্য-পীড়িত নারীসুলভ আদর্শ" আখ্যা দিয়াছেন। কেননা, উহা তাঁহার স্বভাব সীমার বাহিরে। বস্তুতপক্ষে, ইউরোপের ক্যাথলিক ভক্তি-ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান নিতান্তই অগভীর। মনে হয়, দুর্ধর্ষ মাইস্টার একহার্ট এবং রুইসব্রয়েকের মতো ফ্ল্যাণ্ডার্স এবং জার্মানির ষোড়শ শতাব্দীর দুরন্ত অতীন্দ্রিয়বাদীদের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি করিয়াছেন। কিন্তু ফ্রান্স এবং অন্যান্য ল্যাটিন দেশগুলির অনুভূতিশীল প্রেম ও ধর্মীয় ভাবাবেগের সূক্ষ্ম সম্পদকে তিনি কি অবিশ্বাস করিতে পারেন? পাশ্চাত্ত্যের অতীন্দ্রিয়বাদীদিগকে "দৈন্য," "ক্ষুদ্রতা," শালীনতা ও সুরুচির অভাব[৩] সম্পর্কে অভিযুক্ত করার অর্থ হইল সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স অসংখ্য ধর্মীয় মনীষীদের মধ্য দিয়া যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহার নিন্দা করা। ঐ সকল মনীষী মানব মনের গোপন অনুভূতিগুলির বিশ্লেষণ ব্যাপারে ফরাসী ক্ল্যাসিক্যাল যুগের শ্রেষ্ঠ

---

১ "দার্শনিকের ভ্রমণপঞ্জী", ইংরেজি অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা ও তৎপরে দ্রষ্টব্য।

২ সেদিনের মতোই আজ-ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাগুলিই সত্য: "আমি যতোজন পাশ্চাত্ত্যবাসীকে জানি, কেইজারলিং তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ডভাবে পাশ্চাত্ত্য।" (কেইজারলিং তাঁহার "ভ্রমণ-পঞ্জী"-র মুখপত্রে এই কথাগুলিকে বেশ নির্বিকার চিত্তেই উদ্‌ধৃত করিয়াছেন।)

তাহা ছাড়া নিজের প্রকৃতির দিক হইতে সমস্ত পাশ্চাত্ত্যকে বিচার করিয়া তাঁহার নিজের মধ্যে যে অভাবটি আছে, সেটিকেই কেইজারলিং গুণ বলিয়া ভাবিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তাহাকেই তিনি পাশ্চাত্ত্যের "লক্ষ্য" বলিয়া-ও চালাইয়াছেন।

৩ লোকে যাহাই বলুক, প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্ত্যবাসীর মধ্যে হৃদয়ের বিকাশটা অতি অল্পই হইয়াছে। আমরা দেড় হাজার বছর ধরিয়া একটি প্রেমের ধর্মের কথা বলিয়া আসিয়াছি। তাই আমরা ভাবি যে, প্রেমই আমাদিগকে পরিচালিত করে। কিন্তু তাহা সত্য নহে।...রামকৃষ্ণের পার্শ্বে একজন টমাস কেম্পিসের প্রভাব কতোই না তুচ্ছ লাগে! কিম্বা, ধরুন, পারসিক অতীন্দ্রিয়বাদীদের পার্শ্বে উচ্চতম ভক্তিকে-ও কতো দরিদ্রই না মনে হয়। প্রাচ্যের অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্যের গতি-শক্তি বেশি। সেদিক হইতে পাশ্চাত্ত্যের অনুভব-শক্তি প্রাচ্যের অপেক্ষা বলিষ্ঠতর। কিন্তু উহা প্রাচ্যের মতো অমন সমৃদ্ধ, অমন সূক্ষ্ম, অমন বিচিত্র নহে।" (উপরোক্ত পুস্তক, ২২৭ পৃঃ হইতে তৎপরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

মনস্তাত্ত্বিকদের এবং আধুনিক ঔপন্যাসিকদের অপেক্ষা যদি শ্রেষ্ঠতর না হন, তবে সমান যে ছিলেন, তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই।[১]

এই ভক্তিধর্মের উৎসাহের বিষয়ে একথা আমি বিশ্বাস করিতে রাজী নহি যে, শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ধর্মবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে-ও তাহা শ্রেষ্ঠ এশিয়াবাসী ধর্মবিশ্বাসীদের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হইতে পারে। এশিয়াবাসীরা সর্বদা "সিদ্ধির" জন্য যে অত্যধিক বাসনা দেখাইয়াছেন, আমার মতে, তাহাই উচ্চতম ও শুদ্ধতম ধর্মাত্মার লক্ষণ নহে। "আমাকে স্পর্শ করিও না!" এই কথাগুলি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছে, ইহা একরম অসম্ভব।...বিশ্বাস করিবার জন্য সে দেখিতে, স্পর্শ করিতে ও আস্বাদ করিতে বাধ্য। এবং, অন্ততঃপক্ষে, সে একদিন ইহ জীবনেই তাহার লক্ষ্যে গিয়া উপনীত হইতে পারিবে, তাহার যদি এই আশা না থাকে, তবে বলিতে হইবে সে বিপজ্জনকভাবে অবিশ্বাসের কাছাকাছি গিয়া পৌছিয়াছে। বিবেকানন্দ নিজেই এমন সব কথা বলিয়াছেন, যেগুলির অকাপট্য মানুষকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে এবং বিহ্বল করিয়া দেয়।[২] তাঁহাদের ভবৎপিপাসা সর্ব-শক্তিমান; কিন্তু আমাদের ঋষিদের মধ্যে-ও একজন ভালোবাসার সমুন্নত মহিমান্বিত সলজ্জতার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একটি অলৌকিক কাণ্ড দেখাইবার সময়ে তিনি চোখ ফিরাইয়া থাকিয়া বলিয়াছিলেন:

"আমাকে না দেখিয়া বিশ্বাস করিবার মাধুর্যটুকু উপভোগ করিতে দাও।"

আমরা আমাদের আদর্শগুলির প্রশংসা করিতে ভালোবাসি এবং সেগুলি হইতে অগ্রিম ফল লাভের আশা করি না। এমন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে আমি জানি, যাঁহারা দেউলিয়া না হওয়া পর্যন্ত সর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন এবং প্রতিদানে কিছুই প্রত্যাশা করেন নাই।[৩]

১ অ্যাঁরি ব্রেম-রচিত *Histore litteraire du sentiment religieaux en France, depuis la fin des guerres de religion jusq'a nos jours*-এর মধ্যে "ফ্রান্সে অতিন্দ্রীয়বাদী আক্রমণ" ও "অতিন্দ্রীয়বাদী বিজয়" সম্পর্কে লিখিত খণ্ডগুলি দ্রষ্টব্য।

২ "যিনি ভগবানকে ও আত্মাকে প্রকৃত উপলব্ধি করিয়াছেন, কেবল তিনিই ধার্মিক।...আমরা সকলেই নিরীশ্বরবাদী; আসুন, আমরা একথা স্বীকার করি। কেবল মস্তিষ্ক দিয়া ভগবানকে স্বীকার করিলেই ধার্মিক হওয়া যায় না।...সমস্ত জ্ঞানকেই কতকগুলি তথ্যের উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।...ধর্ম একটি তথ্যের প্রশ্ন।" (জ্ঞানযোগ: "সিদ্ধি"।)

৩ আমাদের পাশ্চাত্ত্য অতিন্দ্রীয়বাদের একটি মর্মস্পর্শী লক্ষণ হইল এই যে, প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে-ও একটি যুক্তিজাত কল্পনা থাকে, যাহা তাঁহাদিগকে অপরের-মধ্যে তথাকথিত ভ্রমের

কিন্তু স্তর ভাগ করিয়া কাজ নাই। কারণ, প্রেমের একাধিক পদ্ধতি আছে। মানুষ যদি তাহার সর্বস্ব দেয়, তবে তাহার ও তাহার প্রতিবেশীর দানের পরিমাণের পার্থক্যে কিছুই আসে যায় না। তাহারা সকলেই সমান। ভারতে অতীন্দ্রিয়বাদ মুক্ত ধারায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্ত্য ধর্মসম্প্রদায়-গুলি অতীন্দ্রিয়বাদের উপর কড়া বিধিনিষেধ চাপাইয়াছেন। ফলে, উহার অনুভূতিগত প্রকাশ অনেক পরিমাণে চাপা পড়িয়াছে: উহা ভারতের মতো অমন সহজে চোখে পড়ে না। একথা আমাদের স্বীকার করা প্রয়োজন। বিবেকানন্দের মতো একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিন্দু—তাঁহার জাতির বিবেকের দায়িত্ব-শীল নেতা—ভালো করিয়াই জানিতেন যে, তাঁহার জাতির হৃদয়ে এই ভক্তি-প্রবণতাকে আর অধিক জাগাইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। অন্যপক্ষে, ঐ ভক্তি-প্রবণতাকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন ছিল। কারণ, তাহা অসুস্থ ভাবপ্রবণতায় পরিণত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। আমি আগেই বহুবার দেখাইয়াছি যে, ঐ ধরণের কিছুর বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের মধ্যে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। তিনি একবার সন্ন্যাসীদিগকে তাঁহাদের "ভাবপ্রবণ নিবু দ্ধিতার" জন্য তিরস্কার করেন ও নির্মম ভাবে ভক্তির নিন্দা করিতে থাকেন এবং তারপর অকস্মাৎ স্বীকার করিয়া বসেন যে, তিনি নিজে-ও ঐ ভক্তির কবলিত হইয়াছেন—সেই দৃশ্যটি একান্তই স্মরণীয়। সেই কারণেই তিনি ভক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুচরেরা যাহাতে হৃদয়ের অপব্যবহার না করেন, সেজন্য তিনি সর্বদা সতর্ক থাকিতেন। ভক্তিযোগের পথ-প্রদর্শক হিসাবে তাঁহার বিশেষ কর্তব্য ছিল ঐ পথের জটিলতা এবং ভাবপ্রবণতার বিপদ সম্পর্কে আলোকপাত করা।

"কঠিনতাকে", ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাসকে, বুঝিতে, গ্রহণ করিতে, এমন কি ভালোবাসিতে বাধ্য করে। ইহা *La Nuit Obscure*-এ সেন্ট ঝা দেলাক্রোয়ার সুবিখ্যাত পৃষ্ঠাগুলিতে এবং ফ্রাঁসোয়া ভ্য সালের *Traite de l'Amour de Dieu* পুস্তকের (ঔদাসীন্যের বিশুদ্ধতা বিষয়ক) নবম খণ্ডে বহু স্থলে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবত এমন সুন্দরভাবে আর কোথাও বর্ণিত হয় নাই। তাঁহাদের বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা, ভগবৎপ্রেমিক ভক্তরা যে কষ্ট পাইয়াছেন, তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা এবং তাঁহাদিগকে দুঃখের মধ্যে আনন্দ লাভ করিতে, দুঃখকে ভগবানের নিকট অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দেওয়া, ইহার কোনটি যে সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়, তাহা স্থির করা বড়োই কঠিন।

আমরা পরে দেখিব, ভারতে-ও এমন সব ভগবৎ-প্রেমিক আছেন, যাঁহারা পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়াই সর্বস্ব দান করেন; কারণ, "তাঁহারা ক্ষতিপূরণ ও দুঃখ-বেদনার স্তর পার হইয়া গিয়াছেন।" মানুষের মন সর্বত্রই এক রকম।

প্রেম ধর্মের[১] ব্যাপকতা বিশাল। ইহার সম্পূর্ণ আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন জেরুজালেম পরিভ্রমণের"[২] মতো একটা কিছুর। সে ভ্রমণ হইবে ভালোবাসার বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া পরম প্রেমের পথে আত্মার ভ্রমণ। সে যাত্রা যেমন সুদীর্ঘ, তেমনি বিপদাকীর্ণ। অল্প লোকেই তাঁহার উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপনীত হইতে পারেন।

"......আমাদের পশ্চাতে এমন একটি শক্তি আছে, যাহা আমাদিগকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। আসল বস্তুটির সন্ধান কোথায় মিলিবে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু এই প্রেম আমাদিগকে উহার সন্ধানে ক্রমাগত আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে। বারে বারে আমরা আমাদের ভুল বুঝিতে পারিতেছি। আমরা কিছু একটা ধরি, কিন্তু তাহা আমাদের আঙ্গুলের ফাঁকে পিছলাইয়া পলাইয়া যায়, তখন আমরা আবার একটা কিছুকে ধরি। এইভাবে আমরা ক্রমাগত চলিতে থাকি ; অবশেষে আলোকের সন্ধান পাই : আমরা ভগবানে উপনীত হই—সেই একমাত্র ভগবানে, যিনি আমদিগকে ভালোবাসেন। তাঁহার ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন নাই।[৩]...অন্য সব ভালোবাসাই স্তর মাত্র।...কিন্তু ভগবানে পৌছিবার পথ যেমন দীর্ঘ, তেমনি বিপজ্জনক।..."

আর অধিকাংশ লোকই পথে নিজেদিগকে হারাইয়া ফেলেন। তাই বিবেকানন্দ

১ ইংল্যাণ্ডে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত কতিপয় ধারাবাহিক বক্তৃতাকে "প্রেম ধর্ম" এই নামে অভিহিত করা হয়। ঐ বক্তৃতাগুলিতে বিবেকানন্দ একটি সার্বজনীন ভংগীতে ভক্তিযোগ সম্পর্কে তাঁহার মত সংক্ষেপে বলেন। (১৯২২ খৃস্টাব্দে কলিকাতা উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ১২৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।)

২ শাতোব্রিয়াঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *Itineraire a Jerusalem*-এর কথা বলা হইতেছে।

৩ "যেখানেই ভালোবাসা বলিয়া কিছু আছে, সেখানেই ভগবান আছেন। স্বামী যখন তাঁহার স্ত্রীকে চুম্বন করেন, সে চুম্বনে-ও ভগবান আছেন ; মা যখন তাঁহার শিশুকে চুম্বন করেন, সে চুম্বনে-ও ভগবান আছেন ; বন্ধু যখন বন্ধুর হাত চাপিয়া ধরেন, তখন তাহার মধ্যে-ও ভগবান থাকেন।... মহাপুরুষ যিনি মানব জাতিকে ভালোবাসেন এবং তাহার সাহায্য করিতে চান তাঁহার আত্মত্যাগের মধ্যে-ও ভগবান আছেন।"

"মানুষের আদর্শ হইল সকল কিছুর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা। যদি সকল কিছুর মধ্যে তুমি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তবে যে জিনিসটিকে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসো, তাহার মধ্যেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ কর, তারপর আবার অন্য কিছুর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ কর। এইভাবে আগাইতে থাক। আত্মার সম্মুখে অসীম জীবন পড়িয়া আছে। সময়ের সদ্ব্যবহার কর, তুমি তোমার লক্ষ্যে গিয়া উপনীত হইবে।" ("সর্বভূতে ভগবান" দ্রষ্টব্য।)

তাঁহার স্বজাতি ভারতীয়দিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন (পাশ্চাত্যের মানবতাবাদীরা ও খৃস্টানরা তাঁহার কথাগুলি লক্ষ্য করুন) :

"কোটি কোটি লোক ভালোবাসার ধর্মকে ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে। এক শতাব্দী কালে মাত্র কয়েকজন লোক ভগবানের ভালোবাসাকে আয়ত্ত করেন, তাহাতেই তাঁহাদের সমগ্র দেশ গৌরব ও আশীর্বাদ লাভ করে।...অবশেষে যখন সূর্যের আবির্ভাব ঘটে, তখন সকল ক্ষুদ্র আলোকগুলি অন্তর্হিত হয়।..."

তিনি সেই সংগে দ্রুত এই কথাগুলি জুড়িয়া দেন : "কিন্তু তোমাদের সকলকেই এই ক্ষুদ্রতর ভালোবাসার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।..."

কিন্তু এই সকল মধ্যবর্তী কোনো স্তরে থামিয়া থাকিও না; সমস্ত কিছুর কাছে অকপট হও। এমন কোনো অর্থহীন কৃত্রিম দম্ভের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইও না, যাহা তোমাকে বিশ্বাস করায় যে, তুমি ভগবানকে ভালোবাসিতেছ, অথচ আসলে যখন তুমি জগতের সহিত লিপ্ত হইয়া আছ। অন্যপক্ষে, (ইহা আরও একান্ত প্রয়োজন), অপর যে সকল সংযাত্রী সহজে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিও না! তোমার সহিত যাঁহাদের মতের মিল নাই, তাঁহাদিগকে বুঝা এবং ভালোবাসাই হইল তোমার সর্বপ্রথম কর্তব্য।

"অপরে ভুল করিতেছে, কেবল একথা যে অপরকে বলিব না, তাহা নহে, অপরে যাঁহারা নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা যে নির্ভুল তাহা-ও আমরা বলিব। তোমার প্রকৃতি তোমাকে যে পথ গ্রহণ করিতে অনিবার্যভাবে বাধ্য করিয়াছে, তাহাই তোমার নির্ভুল পথ।[১] চিন্তার মিল হয় নাই বলিয়া অপরের সহিত কলহ করা অর্থহীন।...কোটি কোটি ব্যাসার্ধ একই সূর্যের কেন্দ্র অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে।...সেগুলি কেন্দ্র হইতে যতোই দূরবর্তী হয়, সেগুলির মধ্যবর্তী ব্যবধান-ও ততোই বেশী থাকে। কিন্তু সেগুলি যখন কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হয়, তখন তাহাদের সকল ব্যবধান ও পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। তাই একমাত্র সমাধান হইল সম্মুখপানে কেন্দ্র-অভিমুখে অগ্রসর হওয়া।..."

সুতরাং জোর করিয়া কোনো শিক্ষাকে চাপাইয়া দিবার বিরুদ্ধে-ও বিবেকানন্দ অস্ত্র ধরিলেন; শিশুর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এমন আপ্রাণ চেষ্টা আর কেহই করেন নাই। শিশুর আত্মা এবং শিশুর দেহ সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া চাই। শিশুর আত্মাকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিবার মতো আর কোনো অপরাধ নাই; অথচ এই অপরাধ আমরা রোজই করিতেছি।

১ হিন্দুরা ইহাকে বলেন, মানুষের নিজ নিজ নিজ "ইষ্ট"।

"…আমি তোমাদিগকে কিছুই শিখাইতে পারিব না : তোমাদিগকে নিজে-দিগকে শিখিতে হইবে ; তবে আমি তোমাদিগকে তোমাদের সে চিন্তাকে প্রকাশ করিবার কাজে সাহায্য করিতে পারি।…আমি নিজেকে ধর্ম শিক্ষা দিতে চাই। আমার বাবার…অথবা আমার শিক্ষকের কি অধিকার আছে,আমার মাথায় আজে-বাজে জিনিস ঢুকাইয়া দিবার ?…এই সকল শিক্ষা হয়তো ভালো, কিন্তু তাহা আমার না-ও হইতে পারে। কোটি কোটি শিশু আজ শিক্ষার ভুল পথে পরিচালিত হইয়া বিকৃতবুদ্ধি হইয়া যাইতেছে। জগতে তাহার ফলে যে অমঙ্গল ঘটিতেছে, তাহার ভয়াবহতার কথা ভাবিয়া দেখ। পারিবারিক ধর্ম, জাতীয় ধর্ম, এমন সব ধর্মের চাপে কত সুন্দর সুন্দর আধ্যাত্মিক সত্যই না অঙ্কুরে বিনষ্ট হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, তোমাদের শৈশবকালীন ধর্মের, তোমাদের জাতীয় ধর্মের, কতো কুসংস্কারই না তোমাদের মাথায় এখন-ও রহিয়া গিয়াছে এবং কী অনর্থই না সাধন করিতেছে বা করিতে পারে !…"

তবে লোকে কি কেবল হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে ? বিবেকানন্দই বা তবে নিজেকে শিক্ষার ব্যাপারে এমন উৎসাহের সহিত কেন এমন ব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং সেই শিক্ষকের ক্ষেত্রে-ও বা কি ঘটিয়াছিল ? বিবেকানন্দ তখন ছিলেন মুক্তিদাতা, তিনি প্রত্যেককে নিজের ক্ষমতা অনুসারে নিজের ভাবে কাজ করিবার সুযোগ দিতেছিলেন, এবং সেই সংগে তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাদের প্রতি-বেশীর পন্থাকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা করিবার মনোভাবটিকেও জাগাইয়া তুলিতেছিলেন।

"বহু আদর্শ রহিয়াছে। তোমার কি আদর্শ হইবে তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার আদর্শও তোমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে পারি না। আমার উচিত হইবে, আমি যতোগুলি আদর্শের কথা জানি, সবগুলি তোমার সম্মুখে তুলিয়া ধরা এবং তোমার প্রকৃতি অনুসারে তুমি যেটিকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে কর, সেইটিকে গ্রহণ করিতে তোমাকে সাহায্য করা। তোমার পক্ষে যেটি উপযুক্ত, সেই আদর্শটিকে গ্রহণ কর এবং তাহা লইয়া অধ্যবসায়ের সহিত কাজ কর। তাহাই তোমার 'ইষ্ট'।"

এই কারণেই বিবেকানন্দ সকল প্রকার তথাকথিত "প্রতিষ্ঠিত" ধর্মের—সাম্প্রদায়িক ধর্মের—পরম শত্রু ছিলেন।

"ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি যত পারে মতবাদ, তত্ত্ব ও দর্শন প্রচার করুক," তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু প্রকৃত ধর্মে, "উচ্চতর ধর্মে," উপাসনা নামক কর্মের ধর্মে, স্তব-স্তুতিতে, ভগবানের সহিত আত্মার প্রকৃত যোগসাধনে, কোনো ধর্ম

প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার নাই। এগুলি হইল ভগবান ও আত্মার নিজস্ব ব্যাপার। "ধর্মের প্রকৃত অঙ্গ উপাসনা। উপাসনার বেলায় ব্যাপারটি যিশুর উক্তির অনুরূপই হওয়া উচিত। 'প্রার্থনা করিবার সময়ে তুমি তোমার রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশ কর এবং দ্বার রুদ্ধ রাখিয়া গোপনে তোমার 'পিতার' নিকট প্রার্থনা কর।' গভীর কোনো ধর্মকে জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা সম্ভব নহে।···আমি একই মুহূর্তের তলবে আমার ধর্মানুভূতিকে জাগাইয়া তুলিতে পারি না। এই সকল অভিনয় ও কৃত্রিমতার অর্থ কি? ইহা ধর্মকে পরিহাস করা মাত্র, ইহা বিধর্মিতা।···"

"মানুষ কেমন করিয়া এই সকল ধর্মাত্মক কুচকাওয়াজ সহ্য করিতে পারে? এ যেন ব্যারাকে সৈন্যদের কুচকাওয়াজের মতো। হাত তোলো, হাঁটু গাড়ো, বই লও, সবই একেবারে নিয়ম মাফিক। পাঁচ মিনিট অনুভব কর, পাঁচ মিনিট চিন্তা কর, পাঁচ মিনিট প্রার্থনা কর, সবই আগে হইতে নিয়ম মতো বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কুচকাওয়াজ ধর্মকে বিতাড়িত করিয়াছে; এইরূপ আরো কয়েক শতাব্দী চলিলে ধর্ম বিলুপ্ত হইবে।"

কেবল অন্তরতর জীবন লইয়াই ধর্ম। এই অন্তরতর অরণ্যে এমন সব নানা রকমের জীব-জন্তুর বাস যে, অরণ্যের রাজাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাছিয়া লওয়া সম্ভব নহে।

"সহজ অনুভূতি বলিয়া একটা জিনিস আমাদের মধ্যে আছে। তাহা পশুদের মধ্যে-ও আছে।···আবার আমাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য উন্নততর একটি বস্তু আছে; তাহাকে আমরা বলি যুক্তি। বুদ্ধি যখন তথ্যের সন্ধান পায়, তখন বুদ্ধি তথ্য হইতে সত্য আবিষ্কার করে। ইহার অপেক্ষা আর একটি উন্নততর রূপ আছে···তাহাকে আমরা বলি প্রেরণা। প্রেরণা যুক্তির আশ্রয় লয় না। সত্যকে চকিতে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু প্রেরণাকে সহজ অনুভূতি হইতে কিভাবে আমরা পৃথক করিয়া দেখিব? এইরূপ দেখা অত্যন্ত কঠিন। আজকাল প্রত্যেকে আসিয়া বলে, সে প্রেরণা লাভ করিয়াছে এবং অতিমানুষিক শক্তির অধিকারী হইয়াছে। কেমন করিয়া আমরা প্রেরণা ও প্রতারণার মধ্যে প্রার্থক্য করিতে পারি?"

উত্তরটি পাশ্চাত্যবাসী পাঠককে বিস্মিত করিবে। কারণ, এই উত্তরটি পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদীরাও দিতেন:

"প্রথমত, প্রেরণার সহিত যুক্তির বিরোধ থাকিবে না। বৃদ্ধ শিশুর বিরুদ্ধ ভাব নয়—বৃদ্ধ শিশুর পরিণত রূপ মাত্র। আমরা যাহাকে প্রেরণা বলি, তাহা যুক্তির

পরিণত রূপ মাত্র।...সহজ অনুভূতির পথটা যুক্তির মধ্য দিয়াই গিয়াছে।...কোনো সত্যকার প্রেরণা কখনো যুক্তির বিরোধিতা করে না। যেখানে করে, সেখানে উহা প্রেরণা নহে।"

দ্বিতীয় লক্ষণটি-ও কম বিচক্ষণতা বা সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক নহে :

"দ্বিতীয়ত, প্রেরণা সকলের এবং প্রত্যেকের মঙ্গল করিবে। তাহা কাহারও নাম, যশ, বা ব্যক্তিগত লাভের জন্য হইবে না। তাহা সর্বদাই জগতের মঙ্গলের জন্য এবং সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইবে।"

প্রেরণাকে এই দুই দিক হইতে বিচার করিবার পরেই কেবল প্রেরণা বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে। "কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, জগতের বর্তমান অবস্থায় দশ লক্ষে-ও একজন লোক প্রেরণার অধিকারী হন না।"

বিবেকানন্দ বিশ্বাসপরায়ণতাকে সুযোগ দিয়াছিলেন, এইরূপ অভিযোগ করা চলে না। কারণ, তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগকে জানিতেন : জানিতেন, তাঁহারা উহার কিরূপ অপব্যবহার করিতে পারেন। তাহাছাড়া, তিনি ইহাও জানিতেন যে, ভাবপ্রবণ ভক্তিটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্রের দুর্বলতার লক্ষণ মাত্র ; এবং এইরূপ দুর্বলতার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র করুণা ছিল না।

"শক্তিমান হও। সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং প্রেমময় ভগবানের সন্ধান কর। ইহাই শ্রেষ্ঠতম? শুদ্ধির শক্তির অপেক্ষা কোন্ শক্তি শ্রেষ্ঠতর?...দুর্বল কখনো এই ভগবৎ ভক্তি আয়ত্ত করিতে পারে না ; সুতরাং দেহ, মন, নীতি ও আধ্যাত্মিকতা, কোনো দিক হইতেই দুর্বল হইও না।"[১]

লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য শক্তি, সৃজনশীল যুক্তি, অবিরাম সার্বজনীন মঙ্গল সাধনের চিন্তা এবং পরিপূর্ণ স্বার্থশূন্যতা প্রয়োজন। আর একটি জিনিস-ও প্রয়োজন—পৌঁছিবার ইচ্ছা। অধিকাংশ লোকে যাঁহারা নিজেকে ধার্মিক বলিয়া বলেন, তাঁহারা আসলে ধার্মিক নহেন ; তাঁহারা অতি বেশী অলস, অতিবেশী ভীরু, অতি বেশী কপট ; তাঁহারা পথেই অপেক্ষা করিতে চান। তাঁহাদের সম্মুখে কি আছে, তাহা তাঁহারা ভালো করিয়া দেখিতে চান না। ফলে, তাঁহারা আনুষ্ঠানিক উপাসনার স্বপ্নবিলাসের রাজ্যে পড়িয়া থাকেন।

১ শ্রেষ্ঠ খৃস্টান অতীন্দ্রিয়বাদীরা ভক্তির উপর যে "শক্তির" ছাপ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা লক্ষণীয়। ..উহার মধ্যে নারীসুলভ কিছু নাই। শক্তিমান আত্মা সংগ্রামের মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া আঘাত ও মৃত্যুকে বরণ করে।

"মন্দির, গির্জা, পুঁথি, অনুষ্ঠান, এ সমস্ত শিশুর ক্রীড়া মাত্র; আধ্যাত্মিক মানুষকে উপরের দিকে উঠিবার পক্ষে উপযুক্ত শক্তি দিবার জন্য এগুলির প্রয়োজন। ধর্মকে আয়ত্ত করিতে হইলে এই সকল প্রাথমিক পন্থার প্রয়োজন আছে।"

এই ধরণের গতিহীনতাটা বিচক্ষণতার পরিচয়, একথা বলিয়া লাভ নাই। যাহারা এইরূপ গতিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারা যদি তাহাদের "শিশু শিক্ষালয়ের" বাহিরে আসে, তবে তাহাদের ভগবান ও ধর্মবিশ্বাসকে হারাইয়া ফেলিবার আশংকা আছে। সত্য কথা হইল এই যে, আসলে তাহাদের ভক্তিতে ভণ্ডামি থাকায় হারাইবার মতো তাহাদের কিছুই নাই। তাহাদের অপেক্ষা প্রকৃত অবিশ্বাসীরাও ভালো; কারণ, তাহারা ইহাদের অপেক্ষা ভগবানের আরো নিকটতর। এই সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরবিশ্বাসী অকপট ও উদার নিরীশ্বরবাদীদের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, তাহা এই:

অধিকাংশ লোকই নিরীশ্বরবাদী (এই কথাগুলি তিনি তাঁহার ভক্তদের নিকট বলিতেছিলেন)। অধুনা পাশ্চাত্ত্য জগতে আর এক নূতন শ্রেণীর নিরীশ্বরবাদী আসিয়াছেন। তাঁহারা বস্তুবাদী। ইহাতে আমি খুবই আনন্দিত; কারণ, তাঁহাদের নিরীশ্বরবাদে কাপট্য নাই।[১] ধার্মিক নিরীশ্বরবাদীদের অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; কারণ, এই ধার্মিক নিরীশ্বরবাদীরা ভণ্ড, তাহারা ধর্ম লইয়া তর্ক করে, যুদ্ধ করে, কিন্তু ধর্মকে কখনো চায় না, ধর্মকে কার্যে পরিণত করিতে ও বুঝিতে কখনো চেষ্টা করে না। খৃস্টের সেই কথাগুলি স্মরণ করুন: চাও, পাইবে; সন্ধান করো,

১ অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদী অরবিন্দ ঘোষ সম্প্রতি-ও আধুনিক বস্তুবাদকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। "আর্য" পত্রিকায় (২য় সংখ্যা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৪) প্রকাশিত "দিব্য জীবন" ও "যোগ সমন্বয়" প্রবন্ধগুলিতে তিনি বৈজ্ঞানিক ও অর্থ নৈতিক বস্তুবাদের মধ্যে প্রকৃতির এবং মানব আত্মা ও সমাজের অগ্রগতির জন্য প্রকৃতির কার্যের প্রয়োজনীয় একটি স্তরকে লক্ষ্য করিয়াছেন:

"সন্ধানী দৃষ্টির নিকট আধুনিক চিন্তা ও চেষ্টার সমগ্রধারাটি নিজেকে এইভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—আধুনিক সভ্যতা মানব জীবনকে যে সকল সুযোগ ও সম্ভাবনা দিয়াছে, সেগুলিকে সার্বজনীন করিয়া তুলিবার জন্য এবং সর্বসাধারণের পক্ষে মানসিক শক্তি ও সত্তার একটি সাম্য ঘটাইবার জন্য উহা মানব প্রকৃতির একটি বিরাট সচেতন প্রয়াস মাত্র। যে ইউরোপীয় মনীষীরা এই ধারণার নায়ক, তাঁহারা বস্তুগত প্রকৃতি এবং সত্তার বহির্ভাগ লইয়া ব্যস্ত থাকেন। এমন কি, এই ব্যস্ততা-ও ঐ প্রয়াসেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। উহা মানুষের দৈহিক সত্তা ও জৈব শক্তি এবং তাহার বস্তুগত পরিপার্শ্বের মধ্যে তাহার মানসিক বিকাশের পরিপূর্ণ সম্ভাবনার উপযুক্ত ভিত্তিকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।"

"তাঁহারা যে-সকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন, সেগুলি সকল সময়ে নির্ভুল বা অন্ততঃপক্ষে চূড়ান্ত না-ও হইতে পারে। তবে প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে তাঁহাদের লক্ষ্য নির্ভুল। তাঁহাদের লক্ষ্য হইতেছে—

সন্ধান মিলবে; দ্বারে আঘাত করো, দ্বার খুলিবে।...এই কথাগুলি কেবল কথা বা কল্পনা নহে; এগুলি সত্য।...কিন্তু ভগবানকে কে চায়?...আমরা সব কিছুই চাই—কেবল ভগবানকে চাই না।..."

পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য, উভয় দেশের ভক্তরাই এই রূঢ় উপদেশ হইতে উপকৃত হইবেন। বিবেকানন্দ ধর্মীয় কাপট্যের মুখোস খুলিয়া ধরিলেন। তিনি নির্ভীক-ভাবে আত্মগোপনকারী নিরীশ্বরবাদীদের স্বরূপ তাহাদের নিজেদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করিলেন:

"প্রত্যেকেই বলে: 'ভগবানকে ভালোবাসো!'...কিন্তু ভালোবাসা যে কি, তাহা মানুষ জানে না।...কোথায় ভালোবাসা? যেখানে লাভ-লোকসানের

ব্যক্তি ও সমাজের সুস্থ দেহ, বস্তুগত মনের ন্যায্য প্রয়োজন ও দাবীগুলির পূরণ যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য, অবকাশ, সমান সুযোগ-সুবিধা, যাহাতে—কেবল কোনো বিশেষ জাতি, শ্রেণী বা ব্যক্তি নহে,—সমগ্র মানব জাতিই বিনা বাধায় তাহার সাধ্যমত অনুভূতি ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিতে পারে। বর্তমানে হয়তো বস্তুগত ও অর্থনীতিগত উদ্দেশ্যটি অধিকতর প্রাধান্য পাইতেছে; কিন্তু সর্বদাই সেখানে উন্নততর ও প্রধানতর প্রেরণা বিদ্যমান রহিয়াছে ও কাজ করিতেছে।"

তিনি আরও স্বীকার করেন যে, "মানব সমাজ অত্যন্ত সাময়িকভাবে যে যুক্তিগত বস্তুবাদের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহারও একটি বিরাট অপরিহার্য উপযোগিতা আছে। কারণ, প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার যে বিশাল ক্ষেত্র আমাদের নিকট তোরণ মুক্ত করিতেছে, তাহাতে নিরাপদে প্রবেশ করিতে হইলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে কঠোরভাবে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। নূতনতর ও নিশ্চিততর পথে অগ্রসর হইবার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে এবং সেজন্য সাময়িকভাবে সত্যকে ও সত্যের ছদ্মবেশে যাহা কিছু আছে, তাহাকে এক সংগে ঝাঁটাইয়া ফেলিবার প্রয়োজন আছে। স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিত বুদ্ধির উপর ভিত্তি করিয়াই জ্ঞানকে অগ্রসর হইতে হইবে। সেই সংগে ইহা-ও চাই যে, জ্ঞানকে মাঝে মাঝে বস্তুজগতের বাস্তবতার মধ্যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যের সীমার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ভুল সংশোধন করিতে হইবে। এমন কি বলা চলে যে, যখন আমরা দৈহিকের উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে পারি, তখনই কেবল অতি-দৈহিককে পরিপূর্ণরূপে প্রকৃতপক্ষে আয়ত্ত করিতে পারি। যে আত্মা বিশ্বের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া উপনিষদ বলিয়াছেন, 'পৃথিবীই তাঁহার পাদভূমি' এবং ইহা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বস্তুগত জগতের জ্ঞানকে আমরা যতোই ব্যাপকতর ও নিশ্চিততর করিয়া তুলি, আমরা ততোই উচ্চতর জ্ঞানের, এমন কি উচ্চতম জ্ঞানের, এমন কি ব্রহ্মবিদ্যার ভিত্তিকে-ও ততোই ব্যাপকতর ও নিশ্চিততর করিয়া তুলি।"

এখানে ভারতীয় চিন্তা ইউরোপীয় যুক্তিগত বস্তুবাদকে পূর্ণ জ্ঞান লাভের এবং আত্মাকে অধিগত করিবার সোপানরূপে গ্রহণ ও ব্যবহার করিয়াছে।

"মন্দির, গির্জা, পুঁথি, অনুষ্ঠান, এ সমস্ত শিশুর ক্রীড়া মাত্র; আধ্যাত্মিক মানুষকে উপরের দিকে উঠিবার পক্ষে উপযুক্ত শক্তি দিবার জন্য এগুলির প্রয়োজন। ধর্মকে আয়ত্ত করিতে হইলে এই সকল প্রাথমিক পন্থার প্রয়োজন আছে।"

এই ধরণের গতিহীনতাটা বিচক্ষণতার পরিচয়, একথা বলিয়া লাভ নাই। যাহারা এইরূপ গতিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারা যদি তাহাদের "শিশু শিক্ষালয়ের" বাহিরে আসে, তবে তাহাদের ভগবান ও ধর্মবিশ্বাসকে হারাইয়া ফেলিবার আশংকা আছে। সত্য কথা হইল এই যে, আসলে তাহাদের ভক্তিতে ভণ্ডামি থাকায় হারাইবার মতো তাহাদের কিছুই নাই। তাহাদের অপেক্ষা প্রকৃত অবিশ্বাসীরাও ভালো; কারণ, তাহারা ইহাদের অপেক্ষা ভগবানের আরো নিকটতর। এই সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরবিশ্বাসী অকপট ও উদার নিরীশ্বরবাদীদের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, তাহা এই:

অধিকাংশ লোকই নিরীশ্বরবাদী (এই কথাগুলি তিনি তাঁহার ভক্তদের নিকট বলিতেছিলেন)। অধুনা পাশ্চাত্ত্য জগতে আর এক নূতন শ্রেণীর নিরীশ্বরবাদী আসিয়াছেন। তাঁহারা বস্তুবাদী। ইহাতে আমি খুবই আনন্দিত; কারণ, তাঁহাদের নিরীশ্বরবাদে কাপট্য নাই।[১] ধার্মিক নিরীশ্বরবাদীদের অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; কারণ, এই ধার্মিক নিরীশ্বরবাদীরা ভণ্ড, তাহারা ধর্ম লইয়া তর্ক করে, যুদ্ধ করে, কিন্তু ধর্মকে কখনো চায় না, ধর্মকে কার্যে পরিণত করিতে ও বুঝিতে কখনো চেষ্টা করে না। খৃস্টের সেই কথাগুলি স্মরণ করুন: চাও, পাইবে; সন্ধান করো,

১ অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদী অরবিন্দ ঘোষ সম্প্রতি-ও আধুনিক বস্তুবাদকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। "আর্য" পত্রিকায় (২য় সংখ্যা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৪) প্রকাশিত "দিব্য জীবন" ও "যোগ সমন্বয়" প্রবন্ধগুলিতে তিনি বৈজ্ঞানিক ও অর্থ নৈতিক বস্তুবাদের মধ্যে প্রকৃতির এবং মানব আত্মা ও সমাজের অগ্রগতির জন্য প্রকৃতির কার্যের প্রয়োজনীয় একটি স্তরকে লক্ষ্য করিয়াছেন:

"সন্ধানী দৃষ্টির নিকট আধুনিক চিন্তা ও চেষ্টার সমগ্রধারাটি নিজেকে এইভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—আধুনিক সভ্যতা মানব জীবনকে যে সকল সুযোগ ও সম্ভাবনা দিয়াছে, সেগুলিকে সার্বজনীন করিয়া তুলিবার জন্য এবং সর্বসাধারণের পক্ষে মানসিক শক্তি ও সজ্জার একটি সাম্য ঘটাইবার জন্য উহা মানব প্রকৃতির একটি বিরাট সচেতন প্রয়াস মাত্র। যে ইউরোপীয় মনীষীরা এই ধারণার নায়ক, তাঁহারা বস্তুগত প্রকৃতি এবং সত্তার বহির্ভাগ লইয়া ব্যস্ত থাকেন। এমন কি, এই ব্যস্ততা-ও ঐ প্রয়াসেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। উহা মানুষের দৈহিক সত্তা ও জৈব শক্তি এবং তাহার বস্তুগত পরিপার্শ্বের মধ্যে তাহার মানসিক বিকাশের পরিপূর্ণ সম্ভাবনার উপযুক্ত ভিত্তিকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।"

"তাঁহারা যে-সকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন, সেগুলি সকল সময়ে নির্ভুল বা অন্ততঃপক্ষে চূড়ান্ত না-ও হইতে পারে। তবে প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে তাঁহাদের লক্ষ্য নির্ভুল। তাঁহাদের লক্ষ্য হইতেছে—

সন্ধান মিলবে; দ্বারে আঘাত করো, দ্বার খুলিবে।…এই কথাগুলি কেবল কথা বা কল্পনা নহে; এগুলি সত্য।…কিন্তু ভগবানকে কে চায়?…আমরা সব কিছুই চাই—কেবল ভগবানকে চাই না।…"

পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য, উভয় দেশের ভক্তরাই এই রূঢ় উপদেশ হইতে উপকৃত হইবেন। বিবেকানন্দ ধর্মীয় কাপট্যের মুখোস খুলিয়া ধরিলেন। তিনি নির্ভীক-ভাবে আত্মগোপনকারী নিরীশ্বরবাদীদের স্বরূপ তাহাদের নিজেদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করিলেন:

"প্রত্যেকেই বলে: 'ভগবানকে ভালোবাসো!'…কিন্তু ভালোবাসা যে কি, তাহা মানুষ জানে না।…কোথায় ভালোবাসা? যেখানে লাভ-লোকসানের

ব্যক্তি ও সমাজের সুস্থ দেহ, বস্তুগত মনের ন্যায্য প্রয়োজন ও দাবীগুলির পুরণ যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য, অবকাশ, সমান সুযোগ-সুবিধা, যাহাতে—কেবল কোনো বিশেষ জাতি, শ্রেণী বা ব্যক্তি নহে,—সমগ্র মানব জাতিই বিনা বাধায় তাহার সাধ্যমত অনুভূতি ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিতে পারে। বর্তমানে হয়তো বস্তুগত ও অর্থনীতিগত উদ্দেশ্যটি অধিকতর প্রাধান্য পাইতেছে; কিন্তু সর্বদাই সেখানে উন্নততর ও প্রধানতর প্রেরণা বিদ্যমান রহিয়াছে ও কাজ করিতেছে।"

তিনি আরও স্বীকার করেন যে, "মানব সমাজ অত্যন্ত সাময়িকভাবে যে যুক্তিগত বস্তুবাদের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহারও একটি বিরাট অপরিহার্য উপযোগিতা আছে। কারণ, প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার যে বিশাল ক্ষেত্র আমাদের নিকট তোরণ মুক্ত করিতেছে, তাহাতে নিরাপদে প্রবেশ করিতে হইলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে কঠোরভাবে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। নূতনতর ও নিশ্চিততর পথে অগ্রসর হইবার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে এবং সেজন্য সাময়িকভাবে সত্যকে ও সত্যের ছদ্মবেশে যাহা কিছু আছে, তাহাকে এক সংগে ঝাঁটাইয়া ফেলিবার প্রয়োজন আছে। স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিত বুদ্ধির উপর ভিত্তি করিয়াই জ্ঞানকে অগ্রসর হইতে হইবে। সেই সংগে ইহা-ও চাই যে, জ্ঞানকে মাঝে মাঝে বস্তুজগতের বাস্তবতার মধ্যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যের সীমার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ভুল সংশোধন করিতে হইবে। এমন কি বলা চলে যে, যখন আমরা দৈহিকের উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে পারি, তখনই কেবল অতি-দৈহিককে পরিপূর্ণরূপে প্রকৃতপক্ষে আয়ত্ত করিতে পারি। যে আত্মা বিশ্বের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া উপনিষদ বলিয়াছেন, 'পৃথিবীই তাঁহার পাদভূমি এবং ইহা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বস্তুগত জগতের জ্ঞানকে আমরা যতোই ব্যাপকতর ও নিশ্চিততর করিয়া তুলি, আমরা ততোই উচ্চতর জ্ঞানের, এমন কি উচ্চতম জ্ঞানের, এমন কি ব্রহ্মবিদ্যার ভিত্তিকে-ও ততোই ব্যাপকতর ও নিশ্চিততর করিয়া তুলি।"

এখানে ভারতীয় চিন্তা ইউরোপীয় যুক্তিগত বস্তুবাদকে পূর্ণ জ্ঞান লাভের এবং আত্মাকে অধিগত করিবার সোপানরূপে গ্রহণ ও ব্যবহার করিয়াছে।

হিসাব নাই, ভয় নাই, স্বার্থ নাই, ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নাই কেবল সেখানেই ভালোবাসা আছে।"[১]

যখন শেষ স্তরে গিয়া পৌঁছিবে, তখন তোমার কি হইবে, কিংবা বিশ্বস্রষ্টা, সর্বশক্তিমান করুণাময় ভগবান, যিনি মানুষকে তাহার সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করেন, তিনি আছেন কি না, জানিবার প্রয়োজন হইবে না। ভগবান করুণাময়, কিম্বা ভগবান উৎপীড়ক, এমন কি তাহা জানিবার-ও তোমার প্রয়োজন হইবে না। "…যে প্রেমিক, সে পুরস্কার, শাস্তি, ভয়, সন্দেহ, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোনরূপ প্রমাণ, এ সকলের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আগাইয়া চলে।"…সে কেবল ভালোবাসে; "সমস্ত বিশ্ব যাহার প্রকাশ মাত্র…" সে সেই ভালোবাসার বাস্তবতাকেই আয়ত্ত করে।

কারণ, এই অবস্থায় ভালোবাসা তাহার সমস্ত মানসিক সীমা-সংকীর্ণতাকে হারাইয়া ফেলে এবং একটি বিশ্বগত অর্থ লাভ করে :

সে কি বস্তু, যাহা অণুকে অণুর সহিত, পরমাণুকে পরামাণুর সহিত সংযুক্ত করিতেছে? প্রকাণ্ড গ্রহগুলিকে পরস্পরের দিকে ধাবিত করিতেছে? পুরুষকে স্ত্রীর প্রতি, স্ত্রীকে পুরুষের প্রতি, মানুষকে মানুষের প্রতি, প্রাণীকে প্রাণীর প্রতি, সমস্ত বিশ্বকে যেন একই কেন্দ্রর প্রতি আকর্ষণ করিতেছে? ইহারই নাম ভালোবাসা। নিম্নতম অণু হইতে উচ্চতম আদর্শ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর মধ্যেই ইহার প্রকাশ : ইহা সর্বব্যাপী, সর্বময়, সর্বত্রবিরাজমান, ইহা ভালোবাসা।…এই একমাত্র শক্তি সমগ্র বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছে। এই ভালোবাসার তাড়নাতেই খৃস্ট মানব জাতির জন্য, বুদ্ধ সর্বজীবের জন্য, মাতা শিশুর জন্য, স্বামী স্ত্রীর জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে যান;— এই ভালোবাসার তাড়নাই মানুষকে দেশের জন্য তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত করে। এবং, বলিতে অদ্ভুত লাগে, এই ভালোবাসাই

---

১ অন্যত্র, 'বক্তৃতাবলী ও আলোচনাবলী হইতে গৃহীত সংক্ষিপ্তসারে' (সম্পূর্ণ রচনাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা), বিবেকানন্দ দিব্য প্রেমের পথে তিনটি সোপানের কথা বলিয়াছেন :

(১) মানুষ ভয় পায় ও সাহায্য চায়।

(২) সে ভগবানকে পিতারূপে দেখে।

(৩) সে ভগবানকে মাতারূপে দেখে। (এবং কেবল এই স্তর হইতেই প্রকৃত ভালোবাসার সূত্রপাত হয়, কারণ, কেবল এখনই ভালোবাসা ঘনিষ্ঠ ও নির্ভয় হইয়া উঠে।)

(৪) সে ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসে—এখন সে অন্য সকল গুণ এবং ভালো ও মন্দকে ছড়াইয়া যায়।

(৫) সে দিব্য মিলনের মধ্যে, ঐক্যের মধ্যে ভালোবাসাকে উপলব্ধি করে।

চোরকে চুরি করায়, খুনীকে খুন করায়; কারণ, এ সকল ক্ষেত্রে-ও মনোভাবটি ঐ একই রকম থাকে। চোর সোনা ভালোবাসে; সেখানে-ও ভালোবাসা আছে, তবে সে ভালোবাসা বিপথে চালিত হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত অপরাধের, সকল সৎ কর্মের পাশ্চাতে সেই চিরন্তন ভালোবাসাই বর্তমান থাকে।...প্রেমের শক্তিই বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছে; এই প্রেম ভিন্ন মুহূর্তেই বিশ্ব খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়িবে। এই ভালোবাসাই ভগবান।”

এখানে-ও কর্ম যোগের শেষের মতোই, আমরা মুক্তির বা ভাবোন্মাদনার—চরম ভক্তির—প্রবল প্রকাশের সম্মুখীন হই। মানুষকে তাহার সাধারণ অস্তিত্বের সহিত যে সকল বন্ধন বাঁধিয়া রাখে, সেগুলি এমনভাবে ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে মনে হয় যে, ঐ অস্তিত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়, নয় ভারসাম্য হারাইয়া ফেলে। ভক্ত সকল রূপ ও প্রতীককে পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে কোনো দল বা ধর্মসম্প্রদায় আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। ভক্ত অসীম ‘প্রেমের’ দেশে পৌঁছিয়াছেন, সেই প্রেমের সহিত ‘এক’ হইয়াছেন। তাই কোনো দল বা সম্প্রদায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখার মতো যথেষ্ট বড়ো নহে। ভক্তের সমগ্র সত্তাকে আলোক বন্যার মতো ভাসাইয়া দিয়াছে, তাঁহার সকল কামনা, স্বার্থপরতা ও অহংকারকে ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু ভালোবাসার সকল স্তরের মধ্য দিয়া সমস্ত পথ ধরিয়া তিনি অগ্রসর হইয়াছেন, বন্ধু হইয়াছেন, প্রেমিক হইয়াছেন, স্বামী হইয়াছেন, মাতা হইয়াছেন এবং এখন প্রেমময়ের সহিত ‘এক’ হইয়া গিয়াছেন। “আমিই তুমি, তুমিই আমি।...সব কিছুই ‘এক’, কেবল ‘এক’।[১]

কিন্তু ইহার পর কি অনুসরণ করিবার মতো আর কিছুই নাই?

এই আলোক-স্নাত পর্বতশিখর হইতে ভক্ত স্বেচ্ছায় অবতরণ করেন এবং যাঁহারা

১ অরবিন্দ ঘোষ পরম ভক্তির এক নূতন তত্ত্ব সম্পর্কে কয়েক পৃষ্ঠা সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দাবী করেন যে, এই তত্ত্ব তিনি গীতার বাণী হইতেই সিদ্ধান্তরূপে পাইয়াছেন। তিনি বলেন, এই অতিপ্রধান ভক্তি আত্মার উর্ধ্বতম আরোহণ; জ্ঞান-ও উহার সহিত বর্তমান থাকে; উহা সত্তার শক্তিগুলির কোনোটিকেই পরিত্যাগ করে না; তবে সেগুলিকে উহা পূর্ণাঙ্গরূপেই সম্পন্ন করে। (গীতা বিষয়ক প্রবন্ধাবলী)। আমার মনে হয়, এই প্রবন্ধাবলীর বহু ক্ষেত্রেই অরবিন্দ ঘোষের চিন্তা খৃস্টান অতীন্দ্রিয়বাদীদের চিন্তার অতি নিকটে গিয়া পৌঁছাইয়াছে।

এখনো পর্বতের তলদেশে রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উপরে উঠিতে সাহায্য করিবার জন্য ফিরিয়া আসেন।[১]

১ "অতি-চেতনা লাভের পর ভক্তি পুনরায় প্রেম ও পূজায় অবতরণ করে।......বিশুদ্ধ প্রেমের কোনো লক্ষ্য নাই। উহার কোনো লভ্য নাই।" (বক্তৃতাবলী ও আলোচনাবলী হইতে গৃহীত সংক্ষিপ্তসার, বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড।)

রামকৃষ্ণ নিজেকে ভাবাবেগ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "নাম্! নাম্!" তিনি নিজেকে তিরস্কৃত করিয়াছিলেন এবং তিনি যাহাতে অপরের সেবা করিতে পারেন, সেজন্য ভগবানের সহিত ঐক্যলাভে যে আনন্দ, তাহা লাভ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন:

"মাগো! আমাকে এই সব আনন্দ দিস্ না। আমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দে—আমি যেন জগতের কাজে আসতে পারি!......"

একথা কি আবার স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, প্রতিবেশীর সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য ভাবাবেশের আনন্দ হইতে কিভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়, তাহা খৃস্টান ভক্তরা সর্বদাই জানিতেন? আবেগময় রুইসব্রয়েক ভগবানকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিতেন, যেন তিনি ভগবানকে যুদ্ধে জিতিয়া পাইয়াছেন। এমন কি, এই রুইসব্রয়েকের উন্মত্ততম ভাবাবেশগুলি-ও "দানের" নামে চুপসাইয়া যাইত।

"......যদি তুমি সেন্ট পিটার, সেন্ট পল বা অন্য কাহার-ও মতো ভাবাবেশে অভিভূত, উন্মত্ত হও, এবং যদি তুমি শুন যে কেহ একটু খাদ্য চাহিতেছে, তবে আমি তোমাকে বলিব, তুমি ভাবাবেশ ছাড়িয়া জাগিয়া উঠ, এবং তাহার জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর। ভগবানের সেবা ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দাও: তাঁহাকে তাঁহার অংশগুলির মধ্যে দেখ এবং সেবা কর; এই পরিবর্তনে তোমার কোনো ক্ষতিই হইবে না।......(*De praecipuis quibusdam virtutibus*).

মানব সমাজের দিকে প্রসারিত এইরূপ দিব্যপ্রেমের বিষয়ে ইউরোপের খৃস্টান ধর্মের জোড়া মেলে না; কারণ, খৃস্টান ধর্ম সমগ্র মানব সমাজকে খৃস্টের অতীন্দ্রিয় দেহ বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা দেয়। অপরকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার ভারতীয় শিষ্যরা কেবল নিজেদের জীবন নহে, এমন কি নিজেদের মোক্ষ-ও উৎসর্গ করিবে, বিবেকানন্দের এই ইচ্ছা পাশ্চাত্ত্য জগতে চতুর্দশ শতাব্দীতে কুতাসে'র সরল কৃষাণী মারী দে ভালী বা ক্যাথেরিন অব সিয়েনার মতো উৎসাহী বিশুদ্ধাত্মারা-ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এমিল দের্মাংঘা মারী দে ভালীর অপূর্ব কাহিনীটিকে আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মারী দে ভালী হতভাগ্যদের উদ্ধারের জন্য ভগবানের নিকট নরকযন্ত্রণা-ও দাবী করিয়াছিলেন। "ভগবান তাঁহাকে তাহা দিতে চাহিলেন না। ভগবান যতোই দিতে অস্বীকার করিলেন, তিনি নিজেকে ততোই বেশী দিতে চাহিলেন। তিনি ভগবানকে বলিলেন, 'আমার মনে হয়, আমাকে যন্ত্রণা দিবার মতো যথেষ্ট যন্ত্রণা তোমার হাতে নাই।'"

৩ রাজ যোগ

চারি প্রকার যোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনের আদর্শই বিবেকানন্দ প্রচার করেন।[১] কিন্তু তাহা সত্ত্বে-ও একটি যোগ বিশেষভাবে তাঁহার নিজস্ব ছিল। সেটিকে তাঁহার নাম অনুসারেই অভিহিত করা চলে। সেটি হইল বিচার বা বিবেকের যোগ। তাহাছাড়া এই যোগটিই পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যকে মিলিত করিতে পারে। এই যোগ জ্ঞান যোগ—জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধিলাভের উপায়, অর্থাৎ মনের মাধ্যমে পরমতম সারবস্তুর বা ব্রহ্মের সন্ধান, আবিষ্কার ও বিজয়।

কিন্তু এই দুঃসাহসিক অভিযানের কাছে মেরু জয়-ও ছেলেখেলা মাত্র। এই অভিযানে বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে। এই অভিযান দাবী করে সুকঠোর ও সযত্ন শিক্ষার। পূর্বে বর্ণিত কর্ম ও ভক্তি যোগের মতো ইহা যেখানে ইচ্ছা, যেমনভাবে ইচ্ছা আরম্ভ করা যায় না। এই যোগের জন্য সজ্জিত, সশস্ত্র ও শিক্ষিত হইতে হয়। সজ্জিত, সশস্ত্র ও শিক্ষিত করিয়া তোলাই রাজযোগের কর্তব্য। রাজযোগ আপনার দিক হইতে সম্পূর্ণ; তাহা হইলে-ও উহা সর্বোচ্চ জ্ঞান যোগের পথের প্রস্তুতির বিদ্যালয় রূপে-ও কাজ করে। তাই আমার ব্যাখ্যার এই স্থলে আমি রাজযোগকে স্থান দিয়াছি। বিবেকানন্দ-ও উহাকে এখানেই স্থান দিয়াছিলেন।[২]

১ বিবেকানন্দের চরিত্রগত এই দিকটি রামকৃষ্ণ এবং পরে গিরিশচন্দ্র, উভয়ের নিকট ধরা পড়িয়াছিল :

গিরিশচন্দ্র আলমবাজারের মঠবাসী সন্ন্যাসীদিগকে বলিয়াছিলেন, "আপনাদের স্বামীজী যেমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ভগবানের ভক্ত ও মানুষের প্রেমিক।"

বিবেকানন্দ চারঘোড়ার গাড়ীর মতো প্রেম, কর্ম, জ্ঞান ও শক্তি—সত্যের এই চারিটি পথের লাগাম ধরিয়াছিলেন এবং সেগুলিকে একই সংগে চালাইয়া লইয়া ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

২ 'জ্ঞানযোগে,' 'সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে। মানুষের চারি প্রকারের প্রকৃতি এবং তদনুসারে বিভিন্ন যোগকে বিবেকানন্দ যেভাবে পর পর স্থান দিয়াছেন, আমি-ও আপনা হইতেই তাহাই অনুসরণ করিয়াছি। অবশ্য, ইহা কৌতূহলের বিষয় যে, দ্বিতীয় প্রকারেরটিকে—ভক্তি-যোগকে—পাশ্চাত্ত্যে "Mysticism" নামে অভিহিত করা হয়, কিন্তু বিবেকানন্দ উহাকে ঐ নামে অভিহিত করেন নাই। তিনি ঐ নামটি তৃতীয় প্রকারেরটির জন্য—রাজযোগের জন্য—রাখেন। রাজযোগে মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্তাকে বিশ্লেষণ ও বিজয় করা হয়। এইরূপে বিবেকানন্দ Mystic কথাটির প্রাচীন অর্থকে যতোখানি অনুসরণ করিয়াছেন, আমরা ততোখানি করি না। গ্রীলিজে 'মিস্তিক' কথাটির অর্থ "আধ্যাত্মবিষয়ক পর্যালোচনা" (বগুয়ে তুলনীয়)। আমরা ঐ কথাটির ভুল প্রয়োগ করিয়া থাকি এবং

যোগের রাজা রাজযোগ। এবং উহার এই রাজসিক লক্ষণ হিসাবে উহাকে কেবল যোগ নামেই অনেক সময় অভিহিত করা হয়, অন্য কোন নাম বা বিশেষণের প্রয়োজন থাকে না। উহা যোগোত্তম। আমরা যোগ বলিতে যদি জ্ঞানের পরম বস্তুর (ও ব্যক্তির) সহিত মিলন মনে করি, তবে রাজ যোগ হইল তাহা সরাসরি লাভ করিবার প্রয়োগমূলক মনো-দৈহিক উপায়।[১] বিবেকানন্দ ইহাকে নাম দিয়াছিলেন "মনস্তাত্ত্বিক যোগ"। কারণ, এই যোগের কর্মক্ষেত্র হইল জ্ঞানের সর্বপ্রথম অপরিহার্য অঙ্গ—মনের নিয়ন্ত্রণ শক্তি ও মনের উপর পরিপূর্ণ অধিকার। অভিনিবেশের দ্বারাই এই যোগ আপন লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে।[২]

সাধারণত আমরা আমাদের শক্তির অপব্যয় করি। বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের আবর্তে পড়িয়াই যে কেবল এই অপচয় ঘটে, তাহা নহে। আমরা যখন আমাদের দ্বার ও বাতায়নগুলি বন্ধ করিতে সমর্থ হই, তখন দেখি, আমাদের মধ্যে বিশৃংখলার প্রবল আবর্ত চলিতেছে; রোমান ফোরামে জুলিয়াস সীজারকে যে জনতা অভিনন্দন জানাইয়াছিল, তাহারই মতো উহা বিশৃংখল। আমাদের মধ্যে হাজার

উহাকে হৃদয় হইতে উৎসারিত বিষয়গুলিতেই সীমাবদ্ধ রাখি। পুংলিঙ্গে উহা রাজযোগী কথাটির ঠিক প্রতিশব্দ বলিয়া আমার মনে হয়—মিস্ত্—দীক্ষিত। অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার "গীতাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে" যোগগুলিকে যেভাবে পর পর সাজাইয়াছেন, তাহা অন্যরূপ। তিনি এইরূপ তিনটি স্তরকে পর পর এইভাবে সাজাইয়াছেন :

(১) কর্মযোগ, ইহা কর্মের দ্বারা নিঃস্বার্থ ত্যাগের মধ্যে সিদ্ধ হয়।

(২) জ্ঞানযোগ, ইহা আত্মা ও জগতের প্রকৃত প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান।

(৩) ভক্তিযোগ, ইহা পরমাত্মার সন্ধান ও সিদ্ধি, দিব্য সত্তা লাভের পরিপূর্ণতা। (গীতাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী, প্রশ্নমালা, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, ১৯২১)।

১ "রাজযোগের বিজ্ঞান সত্যে উপনীত হইবার পক্ষে কার্যত প্রয়োগশীল এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে উদ্ভাবিত একটি রীতিকে মানুষের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে।" (রাজযোগ, প্রথম অধ্যায়)

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, অরবিন্দ ঘোষ রাজযোগের ক্ষেত্রকে জ্ঞান হইতে শক্তিতে, চিন্তা হইতে কর্মে প্রসারিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি এখানে রাজযোগ বলিতে কেবল চিন্তার দিকটি সম্পর্কেই বলিতেছি। বেদান্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক পণ্ডিতরা রাজযোগ বলিতে এই অর্থে-ই বুঝেন।

২. তিনি রাজযোগের সুপ্রাচীন শ্রেষ্ঠ সূত্রকার পাতঞ্জলি কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। (পাশ্চাত্য-দেশীয় ভারতাত্ত্বিক বিজ্ঞানে পাতঞ্জলির সূত্রগুলিকে ৪০০ হইতে ৪৫০ খ্রস্টাব্দের মধ্যে বলিয়া নির্দেশ করা হয়। ম্যার্স-উর্সেল দ্রষ্টব্য)। বিবেকানন্দ এই ক্রিয়াটিকে বৃত্তগুলির মধ্যে চিত্ত যাহাতে ভাঙিয়া না পড়ে, সেজন্য তাহাকে সংযত করিবার বিজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

হাজার অপ্রত্যাশিত এবং "অবাঞ্ছিত" অতিথি আসিয়া হানা দেয় এবং আমাদিগকে ব্যস্ত বিপর্যস্ত করিয়া তোলে। আমরা যতোক্ষণ আমাদের স্ব স্ব গৃহকে সুশৃংখল করিয়া তুলিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহকে একত্রে সংহত করিতে না পারি, ততোক্ষণ পর্যন্ত অন্তরতর কোনো কার্য গুরুত্বপূর্ণ বা নিরবচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভব নহে। "মানসিক শক্তিগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মির মতো; যখন সেগুলি একত্রে সংহত হয়, তখনই সেগুলি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে। ইহাই আমাদের 'জ্ঞানের' এক মাত্র উপায়। সকল দেশে, সকল কালে পণ্ডিতরা, শিল্পীরা, শ্রেষ্ঠ কর্মীরা, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে নিজ নিজ ভাবে আপনা হইতেই এই অনুভূতির অনুশীলন করিয়াছেন। রাজযোগ বলিতে ঠিক যাহা বুঝায়, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া-ও কোনো পাশ্চাত্ত্য প্রতিভা উহাতে কতোখানি সফল হইতে পারেন, তাহা আমি বীঠোফেনের ক্ষেত্রে দেখাইয়াছি। কিন্তু উহা কি এবং উহাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়, তাহা না জানিয়া ব্যক্তিগতভাবে উহা অনুশীলন করিতে গেলে কি কি বিপদ আছে, সে সম্পর্কেও ঐ দৃষ্টান্ত হইতে সংকেত পাওয়া যায়।[১]

ভারতীয় রাজযোগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, মনঃসংযোগের উপর অধিকার বিস্তার করিবার জন্য এবং মনকে আয়ত্ত করিবার জন্য অতীতে বহু শতাব্দী ধরিয়া এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। মন বলিতে হিন্দু যোগীরা যাহা জানিতে হইবে এবং যাহা দিয়া জানিতে হইবে, উভয়কেই বুঝেন। এবং যাহা জানিতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁহারা এতদূর আগাইয়া যান যে, তাঁহাদিগকে অনুসরণ করা আমার সাধ্যাতীত। ইহার অর্থ এই নহে যে, হিন্দু যোগীরা তাঁহাদের এই বিজ্ঞানের অসীম শক্তি সম্পর্কে যে দাবী করেন, মূলনীতির দিক হইতে আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি। হিন্দু যোগীরা দাবী করেন যে, তাঁহাদের বিজ্ঞান কেবল আত্মার উপরে নহে, সমস্ত প্রকৃতির

১ বীঠোফেনের বধিরতা সম্পর্কে আমার আলোচনা তুলনীয়—"বীঠোফেন" পুস্তকের ১ম খণ্ড : "সৃষ্টির সুমহান যুগগুলি", ৩৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যোগীরা এ বিষয়ে ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন :—বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "সকল অনুপ্রাণিত ব্যক্তিই, যাঁহারা এই অতিচেতন অবস্থায় গিয়া পড়েন, তাঁহারা সাধারণত তাঁহাদের জ্ঞানের সহিত কতকগুলি অদ্ভুত কুসংস্কার-ও লাভ করেন। তাঁহারা নিজেদিগকে দৃষ্টিবিভ্রান্তির কবলিত হইবার জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখেন" এবং উন্মাদ হইবার বিপজ্জনক সম্ভাবনার সম্মুখীন হন। (রাজযোগ, সপ্তম অধ্যায়)

উপরে-ও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে (হিন্দুর নিকট আত্মা ও প্রকৃতি অভিন্ন)। মনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে কিছু মতামত প্রকাশ করাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয়; কারণ, মনের সীমা বা প্রসার—সীমা বলিতে আমি তাহার শক্তির সীমাবদ্ধতার কথা বলিতেছি—কোথায় ও কতোখানি তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে আজ-ও সুনির্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু ভারতীয় যোগীরা যাহা আজ পর্যন্ত কেহই প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নাই, তাহাকেই প্রমাণিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। আমি সেজন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া অন্যায় করি নাই। কারণ, যদি এইরূপ অসামান্য শক্তি সত্যই থাকে, তবে প্রবীণ ঋষিগণ জগৎকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য তাহা ব্যবহার করেন নাই কেন?[১] (এমন কি, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ও ধর্মবিশ্বাসী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু আমাকে একথা বলিয়াছিলেন।) এই ধরণের নির্বোধ প্রতিশ্রুতিগুলি আরব্যোপন্যাসের দৈত্যরাও দিতে পারিত। এবং এগুলির সর্বাপেক্ষা খারাপ দিক হইল এই যে, লোভী এবং নির্বোধরা এই সকল প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এমন কি, বিবেকানন্দও সর্বদা এই ধরণের প্রচার হইতে নিজেকে বিরত করিতে পারেন নাই। লোলুপ মানুষের ভয়াবহ ও সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে এই ধরণের প্রচারের একটি আকর্ষণ আছে।[২]

১ আমি ভালো করিয়াই জানি যে, অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার জীবনের বহু বৎসর জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিয়া এই সকল সন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন। এবং বলা হয় যে, তিনি এমন সকল "সিদ্ধি" লাভ করিয়াছেন, যেগুলি বর্তমানে আমরা মানস জগৎ বলিতে যাহা জানি, তাহাকে আমূল বদলাইয়া দিবে। তবে দার্শনিক প্রতিভা হিসাবে তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দিলে-ও, তাঁহার অনুচররা তাঁহার যে সকল আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন, সেগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের পরিপূর্ণ আলোকে না আনা পর্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ঐ গবেষক বা পরীক্ষক, তিনি যতোই প্রামাণ্য শক্তির অধিকারী হউক না কেন, তিনি যে সকল অভিজ্ঞতা কেবল একাকী লাভ করিয়াছেন বা বিচার করিয়াছেন, সেগুলিকে কঠোরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কখনো গ্রহণ করা হয় নাই। (শিষ্যদের কথা ধরা যায় না, কেন না তাঁহারা গুরুর ছায়া মাত্র।)

২ তাঁহার যে সকল রচনা প্রথমে আমেরিকায় প্রকাশিত হয়, রাজযোগ তাহার একটি। তিনি রাজযোগ (প্রথম পরিচ্ছেদ) বলিয়া ফেলেন যে, অধ্যবসায়ের সহিত রাজযোগ অভ্যাস করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই (কয়েক মাসে) প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার মতো ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। তাঁহার সর্বাপেক্ষা ধর্মপ্রাণা মার্কিন শিষ্যা ভগিনী ক্রিস্টিন তাঁহার যে সকল অন্তরঙ্গ স্মৃতি আমাকে জানাইয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, আমেরিকায় যাঁহারা রাজযোগ অভ্যাস করিতেন, বিশেষত মেয়েরা, পার্থিব চিন্তাই ছিল তাঁহাদের ধ্যান-ধারণার মূলকথা। (বিবেকানন্দের প্রথমের

কিন্তু বিবেকানন্দ সর্বদাই ক্রনহিল্ডের সেই পাহাড়ের মতো[১] লোভনীয় বস্তুটিকে আগুনের পাঁচটি গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখিতেন।[২] প্রকৃত শক্তিমান ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই ঐ বাঞ্ছিত পুরস্কার পাইতেন না। এমন কি, পাঁচটি অপরিহার্য শর্ত পূরণ না করিলে এমন কি উহার প্রথম স্তর—সংযম—আয়ত্ত করাও সম্ভব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—কণ্ঠস্বর ও মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের উপর যোগাভ্যাসের ফলাফল—তুলনীয়।) ইহা সত্য যে, তরুণ স্বামীজী তাঁহার আদর্শে ও বিশ্বাসে এমন তন্ময় ছিলেন যে, তাঁহার কথার উপর যে এইরূপ অগভীর অর্থ চাপাইয়া দেওয়া হইতে পারে, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন, তখনই তিনি জোরের সহিত উহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাদের একটি প্রবাদবাক্য আছে, শয়তানকে কখনও প্রলোভন দেখাইবে না। যদি দেখাই, তবে শয়তান সুযোগ পায় এবং আমরা যদি কেবল হাস্যাস্পদ হইয়াই অব্যাহতি পাই, তবে তাহা আমাদের সৌভাগ্য। আর এই হাস্যাস্পদ হওয়ার সঙ্গে নোংরামির প্রায়ই কোনো পার্থক্য থাকে না। তাহা ছাড়া, এমন অনেক যোগী আছেন, যাঁহাদের বিবেক-বুদ্ধি অতো প্রখর নয়, তাঁহারা উহার এই সকল আকর্ষণ দিয়াই ব্যবসায় চালান এবং রাজযোগকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর বিজয়ের বিষয়ে উৎসুক নরনারীর পক্ষে লোভনীয় করিয়া তোলেন।

১ ভাগনারের গীতিনাট্যে—ভালকিরিতে—নিবেলুনজেন্ রূপকথার কথা বলা হইতেছে।

২ অন্যান্য সকল শ্রেষ্ঠ যোগীর মতোই বিবেকানন্দও কখনো অতি-প্রাকৃতিক শক্তিকে যৌগিক প্রয়াসের পুরস্কার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বরং উহাকে তিনি প্রলোভন বলিয়াই মনে করিতেন। পর্বত শিখরে যিশুকে শয়তান পার্থিব সাম্রাজ্য দিতে চাহিয়া এইরূপ প্রলোভনই দেখাইয়াছিল। (আমার নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, খৃস্টের এই পৌরাণিক আখ্যানে বর্ণিত মুহূর্তটি তাঁহার ব্যক্তিগত যোগের সর্বশেষ স্তরের পূর্ব স্তর ছিল।) তিনি যদি এই প্রলোভনকে পরিত্যাগ করিতে না পারিতেন, তবে যোগের সকল সুফলই নষ্ট হইত।......(রাজযোগ, ৭ম পরিচ্ছেদ):

"যোগীর কাছে বিভিন্ন শক্তি আসিবে; কিন্তু যোগী যদি সেগুলির কোন একটির প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তবে তাঁহার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে।.. কিন্তু তিনি যদি এই সকল বিস্ময়কর শক্তিকে ত্যাগ করিবার মতো যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হন...তবেই তিনি মানস সমুদ্রের তরঙ্গাবলীকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিবার অধিকার লাভ করিবেন।" ভগবানের সহিত তাঁহার মিলন ঘটিবে। কিন্তু ইহা অতীব স্পষ্ট যে, সাধারণ মানুষ এই মিলন সম্পর্কে বড়ো একটা মাথা ঘামায় না, ইহ জগতের সুখ সম্পদের প্রতিই তাহাদের আকর্ষণ বেশী।

(এই সংগে আমি ইহা-ও বলিব যে, আমার মতো কোনো স্বাধীনচেতা আদর্শবাদীর কাছে, যিনি স্বভাবত বৈজ্ঞানিক সংশয়কে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সহিত সংযুক্ত করেন—এই সকল "অতিপ্রাকৃতিক শক্তি",—যেগুলি যোগীর কাছে আসে এবং যোগী যেগুলিকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দেন—বস্তুতপক্ষে দৃষ্টিভ্রম বলিয়াই মনে হয়, কারণ, তাঁহারা এরকম কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। তবে ইহার গুরুত্ব অল্প। যাহা গুরুত্বপূর্ণ, তাহা হইল এই যে, মানুষের মন এগুলির বাস্তবতা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সেজন্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার করে; এবং ত্যাগ হইল একমাত্র বাস্তবতা, যাহার গুরুত্ব আছে।)

নহে। এবং এই পাঁচটি শর্তের একটি পূরণ করিলেই যে কেহ ঋষিত্ব লাভ করিতে পারে :

(১) অহিংসা। উহা গান্ধীজীর মহান লক্ষ্য। প্রাচীন যোগীরা উহাকে মানুষের সর্ব শ্রেষ্ঠ গুণ ও সুখ বলিয়া মনে করিতেন। অহিংসা হইল—সমস্ত প্রকৃতির কোনো কিছুকে আঘাত না করা; কাজে, কথায়, চিন্তায়, কোনো জীবের অনিষ্ট না করা।

(২) সম্পূর্ণ সত্য। "কাজে, কথায় ও চিন্তায় সত্য।" যাহা কিছুর দ্বারা সমস্ত কিছু পাওয়া যায়, সত্যই তাহার ভিত্তি।

(৩) অক্ষুন্ন কৌমার্য বা ব্রহ্মচর্য।

(৪) লালসার সম্পূর্ণ বর্জন।

(৫) আত্মার শুদ্ধি ও সম্পূর্ণ অনাসক্তি। কোনো দান গ্রহণ করা বা প্রত্যাশা না করা। দান গ্রহণের অর্থই হইল স্বাধীনতার হানি এবং আত্মার মৃত্যু।[১]

সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, যে সকল সাধারণ লোক যোগকে "উন্নতির" ধাপ্পাবাজী উপায় বলিয়া মনে করে, যাহারা ভাগ্যকে ঠকাইতে চায়, যাহারা প্রেততত্ত্ব বা নারী সৌন্দর্যের সাধনা করে, তাহারা প্রথম গণ্ডীতেই প্রবেশপথ রুদ্ধ দেখে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সতর্কতার সহিত ঐ বিজ্ঞপ্তিটি এড়াইয়া যায়। তাহারা ঐ প্রবেশ পথের দ্বার রক্ষক গুরুর কাছে গিয়া প্রবেশের সুযোগ পাইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতে থাকে।

এই কারণেই বিবেকানন্দ যখন জানিলেন যে, কতকগুলি শব্দ প্রয়োগে দুর্বল ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি সেই শব্দগুলিকে সতর্কতার সহিত এড়াইয়া গেলেন।[২] তিনি ক্রমেই রাজযোগ সম্পর্কে তাঁহার উপদেশকে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক রীতির সাহায্যে—পরিপূর্ণ অভিনিবেশের

১ রাজযোগের অষ্টম পরিচ্ছদে কূর্ম পুরাণের সংক্ষিপ্তসার এবং স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা ও তৎপরবর্তী অংশ তুলনীয়।

২ বিবেকানন্দ যতো-ই বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিলেন, তিনি ততোই একথা আরো অধিকতর পরিমাণে স্বীকার করিতেছিলেন। একজন ভারতীয় শিষ্য তাঁহাকে মোক্ষলাভের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন: "যোগের (রাজযোগের) পথের বাধা অনেক। হয়তো মন মানসিক শক্তির পিছনে ছুটিবে, এবং এইভাবে তাহা তাহার প্রকৃত প্রকৃতিকে আয়ত্ত না করিয়া দূরে সরিয়া যাইবে। ভক্তির পথ অনুশীলনের পক্ষে সহজ, কিন্তু এই পথে অগ্রসর হইতে সময় লাগে। কেবল জ্ঞানের পথেই

সাহায্যে—জ্ঞানকে কি ভাবে জয় করিতে হয়, তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিলেন।[১]

এবং এ ব্যাপারে আমাদের সকলেরই কৌতূহল আছে। হিন্দু সত্য-সন্ধানীরা এই যন্ত্র ব্যবহার করায় মনের উপর যেরূপ ক্রিয়াই হউক না কেন, কি পাশ্চাত্ত্যের, কি প্রাচ্যের সকল সত্য-সন্ধানীরাই এই যন্ত্র ব্যবহার করেন। সুতরাং এই যন্ত্রটি যথাসম্ভব নিখুঁত এবং নির্ভুল হইলে তাহাতে সকল সত্য-সন্ধানীরই লাভ। ইহার মধ্যে প্রেততাত্ত্বিক বা ঐন্দ্রজালিক কিছুই নাই। পাশ্চাত্ত্যবাসী শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের মতোই বিবেকানন্দের সুস্থ বুদ্ধি-ও মনের অনুসন্ধানে যাহা কিছু গোপন ও গূঢ়, সে সকল কিছুর প্রতিই বিরূপ ছিল :

"…আমি যাহা বলিতেছি, তাহার মধ্যে গূঢ় বা প্রচ্ছন্ন কিছুই নাই।…যৌগিক রীতিগুলির মধ্যে কিছু গূঢ় বা রহস্যময় থাকিলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে।…যাহা তোমাকে দুর্বল করিবে, তাহাই পরিত্যাগ করো। দুর্বোধ্য হেঁয়ালির বেসাতি মানুষের মস্তিষ্ককে দুর্বল করিয়া দেয়। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকে—যোগকে—উহা প্রায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।…উহা কার্যত ঘটে কি না, তোমাকে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে। উহার মধ্যে রহস্যময় বা বিপজ্জনক কিছুই নাই।[২]…অন্ধের মতো বিশ্বাস করা অন্যায়।"[৩]

অপরিচিত কোনো ব্যক্তির হাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, এমন কি আংশিক বা সাময়িকভাবে লইলেও, বিন্দুমাত্র ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে, একথা বিবেকানন্দের মতো এমন সুনির্দিষ্টভাবে আর কেহ বলেন নাই। এই কারণেই বিবেকানন্দ সকল প্রকার 'আদেশের' বিরুদ্ধে, তাহা যতোই সৎ ও শুভেচ্ছা-প্রণোদিত হোক, প্রবল প্রতিবাদ জানান :

"তথাকথিত বশীকরণ আদেশগুলি কেবল দুর্বল মনের উপর ক্রিয়া করে…এবং

নিশ্চিত ও যুক্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। এইপথে সকলেই অগ্রসর হইতে পারে।" (সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী অংশ।)

১ "সকল কিছুতেই ঠোকরাইবার এই অভ্যাস ছাড়। একটি ভাব লও এবং সেই ভাবটিকে তোমার জীবন করিয়া তোল। যতোক্ষণ না তাহা তোমার অঙ্গীভূত হয়, তাহারই কথা চিন্তা কর, তাহাই স্বপ্নে দেখ, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া বাঁচ।" (রাজযোগ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

২ তাহা হইলে-ও যাঁহারা রাজযোগ অভ্যাস করিতে চান, তাঁহাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিবেকানন্দ অন্যত্র কতকগুলি বিচক্ষণ বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ করেন।

৩ রাজযোগ, ১ম পরিচ্ছেদ।

রোগীর মধ্যে একপ্রকার অসুস্থ 'প্রত্যাহারের' সৃষ্টি করে।...ইহা প্রকৃতপক্ষে কাহারও নিজের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মস্তিষ্ক কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রণ নহে। উহা যেন অন্য কাহারও ইচ্ছাশক্তির আঘাতে রোগীর মনকে সাময়িকভাবে বিমূঢ় করিয়া রাখা। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নহে, এমন যে-কোনো নিয়ন্ত্রণই...বিপজ্জনক; উহা কেবল বন্ধনের যে গুরুভার শৃংখল আগে ছিল, তাহাতে আর-ও একটি গ্রন্থি সংযোজন করা মাত্র। সুতরাং এমন কি সে যদি সাময়িকভাবে তোমার কিছু ভালো করিতে সমর্থ হয়...তাহা হইলেও তুমি কি ভাবে অপরকে তোমার উপর ক্রিয়া করিতে দাও, সে বিষয়ে সতর্ক হইবে।...তোমার নিজের মনকে ব্যবহার কর... দেহ ও মনকে নিজে নিয়ন্ত্রিত কর। স্মরণ রাখিও, তুমি যতোক্ষণ না অসুস্থ হইতেছে, ততোক্ষণ বাহিরের কোনো ইচ্ছাশক্তি তোমার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। যিনি তোমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করিতে বলিবেন, তিনি যতোই মহান ও মহৎ হউন, তাঁহাকে এড়াইয়া চলিও। কি ব্যক্তির পক্ষে, কি জাতির পক্ষে, এইরূপ বাহিরের অসুস্থ নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা দুরন্ত দুর্বৃত্ত থাকাও স্বাস্থ্যকর।... তোমার স্বাধীনতা হরণ করতে পারে, এমন সকল কিছু সম্পর্কেই সতর্ক থাকিও।"[১]

বিবেকানন্দ ছিলেন জাত শিল্পী, আজন্ম গায়ক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি টলস্টয়ের মতোই মানসিক মুক্তিলাভের অকম্পিত আগ্রহে এমন কি শিল্পের বিপজ্জনক অনুভব শক্তিকে-ও বর্জন করেন। বিশেষত, সংগীত যে অনুভূতির সৃষ্টি করে, তাহা মনে নির্ভুল ক্রিয়াকলাপের অন্তরায় হয়।[২] যে-কিছুতেই মনের নিজের

১ পূর্বোক্ত পুস্তক, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২ ভারতে যে শিল্পের প্রকৃত যোগ নাই, এমন নহে। বিবেকানন্দের নিজের ভাই এবং মনীষী মহেন্দ্রনাথ দত্ত গুরুদেব প্রদত্ত সংকেতগুলিকে পূর্ণতর রূপ দিয়াছেন। আমি ইউরোপীয় শিল্পতাত্ত্বিক-দিগকে তাঁহার "চিত্রকথা প্রসংগ" পড়িতে অতিবেশী জোরের সহিত বলিতে পারি না। (ঐ পুস্তকটি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম মঠাধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার একটি মুখপত্র লিখিয়াছেন। উহা ১৯২২ সালে 'সেবা সিরিজ পাবলিশিং হোম' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।) যোগীরা সত্যের সন্ধানে যে মনোভাব লইয়া অগ্রসর হন, ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় শিল্পীরা সেই মনোভাব লইয়া তাঁহারা যে বস্তুকে প্রকাশ করিতে চান তাহার সম্মুখীন হন। তাঁহাদের কাছে বস্তুই ব্যক্তি হইয়া উঠে। তাঁহাদের চিন্তার রীতিটি-ও কঠোর যৌগিক বিচার ও নির্বাচনের রীতি।

"শিল্পী কোনো আদর্শকে প্রকাশ করিতে গিয়া বাহ্য বস্তুর মাধ্যমে বস্তুত নিজের আত্মাকেই, তাঁহার দ্বৈত সত্তাকেই প্রকাশ করেন। ঐক্যসাধনের এক সুগভীর অবস্থার আত্মার অন্তরতর ও বাহ্যতর স্তরগুলি পৃথকীকৃত হয়: আত্মার বাহ্য স্তর বা পরিবর্তনশীল অংশটি পরিলক্ষিত বস্তুর সহিত লীন হয় এবং চির বা অপরিবর্তিত অংশটি প্রশান্ত পর্যবেক্ষকরূপে থাকে। একটি হইল 'লীলা' এবং অপরটি হইল 'নিত্য'। পরে কি আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না, কারণ উহা 'অব্যক্ত,' অবর্ণনীয় অবস্থা।..."

পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিবার স্বাধীনতা হ্রাস পাইবার আশংকা থাকে, এমন কি যদি তাহাতে সাময়িক শান্তি এবং শুভ আসে-ও তাহা হইলে-ও তাহাতে "ভবিষ্যৎ অধঃপাতের, অপরাধের, নির্বুদ্ধিতার এবং মৃত্যুর বীজ নিহিত থাকে।"

অত্যন্ত কঠোর বৈজ্ঞানিক মনস্বীরা-ও ইহার অপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে তাঁহাদের মতামত ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। এবং বিবেকানন্দ যে মূল নীতিগুলির উত্থাপন করিয়াছেন, সেগুলিকে পাশ্চাত্ত্য যুক্তি মানিয়া লইতে বাধ্য।

ইহা আরও বিস্ময়কর লাগে যে, ভারতীয় রাজ-যোগীরা যে সকল প্রয়োগমূলক ও পরীক্ষামূলক গবেষণা করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সেগুলিকে লক্ষ্য করে নাই এবং অতীব ক্ষণ-ভঙ্গুর ও অবিরত পরিবর্তনশীল একটি যন্ত্রকে তাঁহারা যে রীতিতে নিয়ন্ত্রণ ও আয়ত্ত করিয়াছেন, সেই রীতির অনুশীলনের চেষ্টা-ও করা হয় নাই। অথচ এই যন্ত্রটি সত্য অবিষ্কারের একমাত্র সহায়। রাজ-যোগিগণ যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিন্দুমাত্র রহস্যময়-ও নহে, তাহা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট।

যৌগিক মনোদেহতত্ত্ব যে সকল ব্যাখ্যা ব্যবহার করিয়াছে, সেগুলি বর্তমানে অচল এবং সেগুলিতে বহু তর্কের অবকাশ আছে, একথা স্বীকার করিলেও— অস্বীকার করিবার সম্ভাবনাও নাই—অতীত বহু শতাব্দীর প্রায়োগ ও পরীক্ষার ফলাফলগুলিকে সংশোধন করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের উপযোগী করিয়া লওয়াও (বিবেকানন্দ যেমন করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন) শক্ত কাজ নহে। হিন্দু পর্যবেক্ষকগণের যেমন গবেষণাগারের অভাব ছিল, তেমনি তাহার ক্ষতিপূরণরূপে তাঁহারা যুগব্যাপী ধৈর্যের ও সহজ অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অতীব প্রাচীন ও পবিত্র শাস্ত্রগুলিতে জীব দেহের প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নে যেরূপ কয়েকটি সারগর্ভ বাক্য দেওয়া হইল, সেগুলি হইতে বিচার করিলে এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকিবে না:

"ধারাবাহিক কতকগুলি পরিবর্তনকে 'দেহ' এই নাম দেওয়া হইয়াছে; নদীতে যেমন জলরাশি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে এবং নূতন জলরাশি আসিয়া পূর্ববর্তী জলরাশির স্থান অধিকার করিতেছে, দেহের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি ঘটিতেছে।"[১]

ইহা আশ্চর্য নহে যে, বহু ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পী, যাঁহারা এই সংযমের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা অবশেষে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন। (এ, কুমারস্বামী কৃত "শিবনৃত্য" প্রবন্ধ-ও দ্রষ্টব্য।)

১ প্রাচীন ইলিয়বাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারার সহিত এই ভাবধারার সাদৃশ্যের উপর জোর [illegible]

ভারতীয়দের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসকে কখনো বৈজ্ঞানিক নিয়মের পরিপন্থী হইতে দেওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহারা যে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন, ধর্মবিশ্বাসকে তাহার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে-ও তাঁহারা কখনো ন্যস্ত করেন না। অন্যপক্ষে, তাঁহারা সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত মনে রাখেন যে, সংশয়বাদী ও নিরীশ্বরবাদী এই উভয় প্রকার ধর্মসম্প্রদায়-বহির্ভূত যুক্তিও তাহাদের স্ব স্ব পথে সত্যকে লাভ করিতে পারে। ফলে রাজযোগ দুইটি পৃথক বিভাগকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে : মহাযোগ। ইহাতে ভগবানের সহিত অংশের ঐক্য কল্পনা করা হয় ; এবং অভাবযোগ (অভাব—অনস্তিত্ব), ইহাতে অহম্‌কে "শূন্য এবং দ্বৈততাহীন"[১] রূপে বিচার করা হয়। এই উভয় রীতিই বিশুদ্ধ ও কঠোর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য হইতে পারে।[২] এই ধরণের সহিষ্ণুতা পাশ্চাত্ত্যের ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে বিস্ময়কর মনে হইলেও বৈদান্তিক বিশ্বাসের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইল মানবাত্মাকে ভগবানরূপে স্বীকার করা—যে মানব হয়তো এখনো নিজের সম্পর্কে সচেতন হয় নাই, কিন্তু নিজের সম্পর্কে সে সচেতন হইয়া উঠিতে পারে।[৩] এই ধরণের আদর্শ বিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য লক্ষ্য হইতে-ও অধিক দূরে নহে ; সুতরাং উহা আমাদের নিকট অপরিচিও নহে।

তাহাছাড়া, হিন্দুর ধর্মীয় মনোদেহতত্ত্ব সত্তার বিশেষ একটি অবস্থা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী। ঐ অবস্থায় সত্তাকে খুবই উচ্চ স্থান দেওয়া হয় ; উহা মনকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিতে বাহিরের বস্তুগুলির ছাপ পড়ে। সেখানে সেগুলি সঞ্চিত হয় এবং সেখান হইতে মনে গিয়া পৌঁছে—

প্রয়োজন নাই। ডিউসেন তাঁহার "বেদান্ত দর্শনে" আত্মার চিরন্তন অস্থিরতা সংক্রান্ত হেরাক্লিটাসের মতবাদের সহিত হিন্দু মতবাদের তুলনা করিয়াছেন।

মূল ধারণাটি হইল এই যে, বিশ্ব একটি মাত্র উপাদান হইতে গঠিত এবং এই উপাদান অবিরাম পরিবর্তিত হইতেছে। "শক্তির সামগ্রিক সমষ্টি সর্বদাই একরূপ রহিয়াছে।" (রাজযোগ, ৩য় পরিচ্ছেদ)

১ রাজযোগ, ৮ম পরিচ্ছেদ (কূর্মপুরাণের সংক্ষিপ্তসার)।

২ এই রাজযোগের শিক্ষায় কোনো আদর্শ বা বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। যতোক্ষণ নিজে কিছুর সন্ধান না পাইতেছ, ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না।...প্রত্যেক মানুষেরই ধর্মের সন্ধান করিবার অধিকার ও শক্তি আছে।" (রাজযোগ, ৭ম পরিচ্ছেদ)।

৩ বৌদ্ধদের মতোই হিন্দুদের কাছে-ও মানব জন্ম সিদ্ধির পথে সত্তার উর্ধ্বতম আরোহণ। এবং এই কারণেই মানুষের উহার ক্রত সদ্ব্যবহার করা উচিত। এমন কি দেবতারা-ও কেবল মানব জন্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াই তাঁহাদের মুক্তাবস্থা আরম্ভ করিয়াছেন। (পূর্বোক্ত পুস্তক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

এই ভাবে মানুষ অনুভব করে। অনুভবের উৎপত্তির এই স্তরগুলি সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত কিন্তু মনটি সূক্ষ্মতর বস্তু দিয়া প্রস্তুত, অবশ্য, মূলত দেহের সহিত ঐ বস্তুর কোনো পার্থক্য নাই। ইহার অপেক্ষা একটি উচ্চস্তরে গিয়া অ-বস্তুগত আত্মার—পুরুষের—উদ্ভব হয়। এই পুরুষ ইহার অনুভূতিগুলিকে ইহার যন্ত্র—মন—হইতে গ্রহণ করে এবং উহার নির্দেশগুলিকে উদ্দেশ্য-কেন্দ্রগুলিতে চালান করিয়া দেয়। ফলে, প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া তিন চতুর্থাংশ পথ অগ্রসর হইতে পারে। কেবলমাত্র শেষ স্তরের পূর্ব স্তরে গিয়াই সে হাঁকিবে, "থামো!" সুতরাং, আমি এখানে কেবল এই কথা বলিতে চাই যে, পাশ্চাত্ত্য প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান এবং প্রাচ্যের ধর্মবিশ্বাস প্রথম তিন-চতুর্থাংশ পথ একত্রে যাইবে। কারণ, আমার বিশ্বাস, হিন্দু অভিযাত্রীরা তাঁহাদের যাত্রাপথে এমন অনেক জিনিস লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহা আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা তাহার ফলভোগ করিব এবং সেই সংগে তাঁহাদের সম্পর্কে আমাদের বিচার শক্তিকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিবার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিব।

এই পুস্তকের পরিসরের মধ্যে আমি রাজ-যৌগিক রীতিগুলির বিশদ বিচার-বিশ্লেষণের উপযুক্ত স্থান সংকুলান করিতে পারিব না। তবে এই যৌগিক রীতি মনের দেহগত গঠনতত্ত্বের উপর বৈজ্ঞানিকভাবে যতোখানি প্রতিষ্ঠিত, সেদিক হইতে বিচার করিয়া আমি পাশ্চাত্ত্য জগতের নয়া মনস্তাত্ত্বিকদিগকে ও শিক্ষক-দিগকে এ বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনা করিতে বলি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের অসাধারণ বিশ্লেষণগুলি হইতে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। তাঁহাদের শিক্ষাগুলিকে আমার নিজের জীবনে এখন আর প্রয়োগ করিবার মতো সময় না থাকিলেও তাঁহারা যেভাবে আমার জীবনের ভুল-ত্রুটি এবং মুক্তির প্রতি অস্পষ্ট দুর্বোধ্য সহজাত প্রবৃত্তিগুলিসহ অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহার প্রশংসা করি।

তবে মানসিক অভিনিবেশের ক্ষেত্রে প্রথম তিনটি মনস্তাত্ত্বিক স্তরের উল্লেখ

করা। একান্ত প্রয়োজন:[১] —'প্রত্যাহার', ইহাতে ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে মানসিক অনুভূতির দিকে ফিরাইতে হয়;—'ধারণা', ইহাতে মনকে বাহিরের দিকে বা ভিতরের দিকে কোনো একটি বিশেষ বস্তুতে নিবদ্ধ করিতে হয়;—'ধ্যান', ইহাতে পূর্বোক্ত অনুশীলনের দ্বারা সুশিক্ষিত মন কোনো নির্বাচিত বস্তুর প্রতি অবিরাম অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইবার শক্তি অর্জন করে।

বিবেকানন্দের মতে, প্রথম স্তরটি আয়ত্ত করিবার পরেই চরিত্র গঠন আরম্ভ হয়। কিন্তু "মনকে নিয়ন্ত্রিত করা কতো কঠিন!...উহাকে উন্মত্ত বানরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তুলনাটি ভালোই হইয়াছে।...উহা নিজের প্রকৃতির দ্বারা অবিরাম সক্রিয় থাকে; তারপর উহা কামনার মদে মত্ত হয়...ঈর্ষা...এবং দম্ভের ...জ্বালা মনের মধ্যে প্রবেশ করে।" সুতরাং গুরুজী কি পরামর্শ দেন? ইচ্ছা শক্তির ব্যবহার? না। তিনি আমাদের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকদের আগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সকল মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকরা এখন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছেন যে, কোনো মানসিক অভ্যাসের বিরুদ্ধে ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ করিলে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সেই অভ্যাসকে আরো জাগাইয়া দেয়। তাই বিবেকানন্দ এই "বানরটাকে" প্রশান্ত অন্তরলোকের নিরপেক্ষ বিচারের আওতায় আনিয়া শান্ত করিয়া পোষ মানাইতে বলেন। মনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ হইল মনের গভীরের গোপন ভয়ংকর দানবগুলির মুখামুখি দাঁড়ানো। ডাক্তার ফ্রয়েড আসিয়া এই শিক্ষা দিবেন, এই আশায় প্রাচীন যোগীরা বসিয়া ছিলেন না:

"তাই প্রথম পাঠ হইল কিছুক্ষণের জন্য বসিয়া মনকে দৌড়িতে দেওয়া। মন সর্বদাই ছটফট করিতেছে। তাই সর্বদাই বানরের মতো লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে। বানরটা যতো ইচ্ছা লাফালাফি করুক—তুমি কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাক, আর দেখ।...বহু ভয়াবহ চিন্তা-ও আসিতে পারে; জ্ঞান হইল শক্তি ...তুমি দেখবে, প্রতিদিন এই সকল খামখেয়ালের প্রাবল্য ক্রমেই কমিয়া

১ সেগুলির পূর্বে কতকগুলি দৈহিক ধরণের ব্যায়াম আছে—'আসন' এবং 'প্রাণায়াম'। এগুলি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের উদ্রেক করিবে। এগুলির পরে আছে মনের উন্নততর অবস্থা—সমাধি। সমাধিস্থ অবস্থায় "ধ্যানকে এমন তীব্র করিয়া তোলা হয় যে, সেখানে চিন্তার বহিরঙ্গ বর্জিত হয়" এবং উহা ঐক্যের মধ্যে লীন হইয়া যায়। আমরা জ্ঞানযোগ আলোচনা করিবার সময়ে এই বিষয়ে ফিরিয়া আসিব।

২ ইহার অর্থ হইল "সংগ্রহ করিয়া একদিকে আনা।"

আসিতেছে।...ইহা একটি প্রচণ্ড কাজ।...কেবল বছরের পর বছর ধরিয়া ক্রমাগত সংগ্রাম করিবার পর আমরা ইহাতে সফল হইতে পারি।"[১]

সুতরাং দ্বিতীয় স্তরে অগ্রসর হইবার পূর্বে যোগীকে কোনো বিষয়ে মনঃসংযোগের উদ্দেশ্যে মনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কল্পনা শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার শিখিতে হইবে।

কিন্তু বিবেকানন্দ সর্বদাই দেহতাত্ত্বিক বিষয়গুলি লইয়া অধিক ব্যস্ত থাকিতেন। ক্লান্তি এড়াইয়া চল। "এই অনুশীলন দিনের কঠিন পরিশ্রমের পরে করিবার জন্য নহে।" খাদ্যের প্রতি মনোযোগ দাও। "প্রথম হইতেই খাদ্যের বিষয়ে কঠোরতা আরম্ভ করিতে হইবে; দুধ এবং শস্যজাত খাদ্য খাইবে।" উত্তেজক কিছু খাওয়া চলিবে না।[২] আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলি-ও প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্যের সহিত লক্ষিত ও বর্ণিত হইয়াছে।[৩] অভিনিবেশ জয়ের সময়ে প্রথমের দিকে একটি সামান্য অনুভূতি-ও প্রচণ্ড তরংগাঘাতের মতো আসিয়া লাগে।" একটি আলপিন পড়ার শব্দ-ও ব্রজপাতের মতো শোনায়।"...সুতরাং অঙ্গগুলিকে খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, সম্পূর্ণরূপে শান্তি বজায় রাখিতে হইবে; কারণ ইহাই কাম্য।

১ এমন কি ডাঃ কুয়ে যেসব ব্যবস্থা দেন, যোগীদিগকে-ও সে রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। যেমন, আত্মাদেশ বা Auto-suggestion-এর রীতি। এই রীতি অনুসারে রোগী কোনো একটি হিতকর কথাকে বার বার উচ্চারণ করিতে থাকে। যোগীরা যোগ-শিক্ষার্থিদিগকে গোড়ার দিকে মনে মনে বারে বারে "সকলে সুখী হউক!" "সকলে সুখী হউক!" বলিতে গেলেন। ইহাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চারিদিকে শান্তির একটি আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

২ পরিপূর্ণ কৌমার্য। ইহা ছাড়া রাজযোগে ভয়ানক সব বিপদ ঘটিতে পারে। হিন্দু পর্যবেক্ষকরা এই মত পোষণ করেন যে, প্রত্যেক মানুষের সমগ্র শক্তির একটি স্থায়ী পরিমাণ আছে: কিন্তু এই শক্তিকে এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা যায়। যৌন শক্তি মস্তিষ্কের দ্বারা ব্যবহৃত হইলে তাহা মানসিক শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি মানুষ, একটি প্রচলিত প্রবাদবাক্য ব্যবহার করিলে বলিতে হয়, তাহার বাতির দুই দিকে পোড়াইতে থাকে, তবে তাহার দৈহিক ও মানসিক ধ্বংস অনিবার্য। এই অবস্থায় যোগ অভ্যাস করিলে অধিকতর বিক্ষেপ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ইউরোপের মনীষীরা যে বিষয়ে প্রায়ই অবহেলা করেন, তাহা-ও এই সংগে যোগ কর—স্বাস্থ্য ও পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা। যোগের নিয়ম অনুসারে যে "শুদ্ধি" দাবী করা হয়, তাহার মধ্যে মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকারের আবশ্যিক শুদ্ধিই পড়ে। কেহ এই দুই প্রকারের শুদ্ধি লাভ করিতে না পারিলে যোগী হইতে পারে না। (রাজযোগ, ৮ম পরিচ্ছেদ, কূর্ম পুরাণের সংক্ষিপ্তসার।)

৩ মাঝে মাঝে দূর হইতে আগত ঘণ্টাধ্বনির মতো শুনায়, ঘণ্টাধ্বনি ক্রমেই ধীরে ধীরে অবিরাম একটানা দূরে অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোক বিন্দু ভাসিয়া উঠে।... ইত্যাদি।

ইহাও সুস্পষ্ট যে, যাহাতে স্বাস্থ্যহানিকর অত্যধিক চাপ না পড়ে, সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা দৈহিক ব্যবস্থা বিকল হইবে, মন ভারসাম্য হারাইবে। ইহা দেখিয়াই পাশ্চাত্যের স্থূলতা দ্রুত সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে, কোনো ভাবোন্মত্ত বা বীঠোফেনের মতো অনুপ্রেরিত শিল্পীর পক্ষে উহা অনিবার্য।[১]

কিন্তু শ্রেষ্ঠ যোগী বিবেকানন্দের মতে, সংযমের দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্যের মতোই দৈহিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। তিনি বলেন, দেহের শান্ত ভাবের মধ্যে, মুখমণ্ডলের কোমলতার মধ্যে, এমন কি কণ্ঠস্বরের ভংগীতে-ও, উহার সুফল দ্রুত প্রকাশ পায়। কপট বা অকপট সকল প্রকার যোগীর সকল সংসারী শিষ্যই যে যোগের এই সকল সুফলের উপর জোর দিবেন তাহাই স্বাভাবিক। তাঁহারা জোর দিতে থাকুন! অভিজ্ঞতার এই সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে দেহ ও মনের বিভিন্ন দিকের ঐশ্বর্য সঞ্চিত রহিয়াছে, তাঁহারা সেখান হইতে স্ব স্ব ভাণ্ডারের জন্য ইচ্ছামত ঐশ্বর্য সংগ্রহ করুন। আমরা এখানে কেবল মনস্তাত্ত্বিকদের এবং পণ্ডিতদের কথাই বলিতে চাই![২]

১ "যে অনাহারে থাকে, যে বিনিদ্র থাকে, যে অত্যন্ত ঘুমায়, যে অত্যধিক কাজ করে, যে একেবারেই কাজ করে না, তাহারা কেহই যোগী হইতে পারে না।" (রাজযোগ, ১ম পরিচ্ছেদ)

"দেহ যখন অত্যন্ত অলস বা অসুস্থ মনে হইবে বা মন যখন অত্যন্ত কষ্ট বা বেদনাবোধ করিবে, তখন যোগ অভ্যাস করিও না।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৮ম পরিচ্ছেদ।)

২ দর্শনযোগ্যতা ও সম্ভাব্যতার স্তরের বাহিরে না গিয়াও ইহা বস্তুত প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্তরতর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের ফলে আমাদের অচেতন এবং অবচেতন জীবন (সম্পূর্ণরূপে না হইলেও আংশিকরূপে) আমাদের আয়ত্তে আসিতে পারে। "প্রায় প্রত্যেকটি কর্মকে, যাহার সম্পর্কে আমরা এখনও সচেতন নহি, চেতনার স্তরে আনিতে পারা যায়।" (রাজযোগ, ৭ম পরিচ্ছেদ)। ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, যোগীরা বহু দৈহিক কার্যকে, যেগুলির উপর ইচ্ছা শক্তির কোনো প্রভাব নাই, বন্ধ করিতে বা উদ্রেক করিতে পারেন। যেমন, হৃৎস্পন্দন। কঠোর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ এই সকল তথ্যের সত্যতাকে প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং আমরা নিজেরাও সেগুলিকে প্রমাণ করিয়াছি। যোগীরা এই ধারণা দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন যে, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে, সে প্রাণী যতোই ক্ষুদ্র হউক না কেন, শক্তির একটি বিরাট ভাণ্ডার রহিয়াছে। এবং এই প্রাণপ্রদ ও শক্তিপ্রদ বিশ্বাসের মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাকে নীতির দিক হইতেও অস্বীকার করা চলে; বিজ্ঞানের ক্রমাগত যে উন্নতি হইতেছে, তাহা বরং এই বিশ্বাসকে আরো বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে। কিন্তু যোগীদের বিশেষত্ব হইল এই যে, (এবং ইহা সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করা প্রয়োজন), তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা সুতীব্র অভিনিবেশের রীতির দ্বারা ব্যক্তির অগ্রগমনের ছন্দকে দ্রুত করিয়া তুলেন এবং মানবজাতির পরিপূর্ণ উদবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের পরিমাণকে হ্রাস করিয়া দেন। অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার "যোগ সমন্বয়ে" (The Synthesis of Yoga) (বিবেকানন্দের একটি উক্তির উপর নির্ভর করিয়া) যে অভিনব গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত:

৪ জ্ঞানযোগ

যে সত্যের মধ্যে মানবাত্মা তাহার মুক্তির সন্ধান পাইতে পারে, তাহার প্রতি তাহার ঊর্ধ্বমুখ উৎসার বিভিন্ন রূপেই—ভক্তির মধ্য দিয়া, নিঃস্বার্থ কর্মের মধ্য দিয়া, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে যে সকল নিয়ম, সেগুলিকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে মনঃসংযমের মধ্যে দিয়া—হইতে পারে, তাহা আমরা দেখিলাম। রাজযোগ এই সকল বিভিন্ন পন্থার প্রত্যেকটিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন শিক্ষা দেয়, যে অঙ্গুলি সঞ্চালনের দ্বারা মনো-দেহতন্ত্রের পিয়ানোটা বাজিতে পারে; কেননা, মনসংযোগের এই প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী কিছু করা বা হওয়া সম্ভব নহে। ইহার নিজস্ব স্বতন্ত্র পন্থা থাকিলে-ও, এইগুলির একটিতেও সাফল্য লাভের পক্ষে রাজযোগ একান্ত প্রয়োজন। রাজযোগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত এই শেষ পন্থাটি সম্পর্কে—জ্ঞানযোগ সম্পর্কে—এখন আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। জ্ঞানযোগ হইল যুক্তিবাদী দার্শনিক যোগ। আর রাজযোগ হইল আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞান। সে জন্য দার্শনিককে তাঁহার চিন্তার যন্ত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে রাজযোগের সাহায্য লইতে হয়। দার্শনিক বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ-পরীক্ষা অর্থে বিচারের—জ্ঞানের—এই পথটি ছিল মূলত বিবেকানন্দর একান্ত নিজস্ব পথ। কিন্তু তবু মহান 'বিচারক' বিবেকানন্দকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, জ্ঞান যোগের পথে "মানবাত্মা অর্থহীন তর্ক-বিতর্কের সীমাহীন জটিল জালে জড়াইয়া পড়িতে পারে" এবং রাজযোগের সাহায্যে মনঃসংযোগের অনুশীলন না করিলে ঐ জটিল জাল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর কোনো উপায় নাই।

সুতরাং ইহাই যুক্তিসঙ্গত যে, বিবেকানন্দের নিকট বিশেষভাবে প্রিয় এই উচ্চতর মানসিক পদ্ধতিটির ব্যাখ্যা সর্বশেষে স্থান পাইবে। 'রাজযোগ' এবং 'কর্মযোগ' সম্পর্কে প্রবন্ধগুলি তাঁহার মুখের কথা শুনিয়াই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানযোগের বিষয়ে তিনি এতো বেশী চিন্তা ও গবেষণা করেন বা বক্তৃতা দেন যে, সেগুলিকে তিনি রাজযোগের বা কর্মযোগের মতো প্রবন্ধাকারে সংক্ষিপ্ত রূপ দিতে পারেন নাই।[১]

"যোগকে" মানুষের উদ্‌বর্তনকে কয়েক বৎসরের, এমন কি মাত্র কয়েক মাসের, একটি জীবনের মধ্যে সংহত করিবার রীতি বলা চলে।" এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট সংশয় পোষণ করি। তবে আমার সংশয়ের বৈজ্ঞানিক কারণ আছে।

১ "জ্ঞানযোগের" সুবৃহৎ গ্রন্থটি বিভিন্ন বক্তৃতার অনেকাংশে কৃত্রিম একটি সংগ্রহ মাত্র। ঐ সকল বক্তৃতার অধিকাংশই ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। সেগুলি "সম্পূর্ণ রচনাবলীর" ২য় খণ্ডে,

জ্ঞানযোগ সম্পর্কে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, অন্যান্য যোগের মতো পরম সত্তাই উহার লক্ষ্য হইলেও উহার আরম্ভ ও ক্রিয়া-পদ্ধতির সহিত পাশ্চাত্যের ধর্মীয় মনোভাবের অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক মনোভাবেরই অধিকতর সাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞান ও যুক্তিকে উহা কোনোরূপ অনিশ্চয়তার ভংগীতে গ্রহণ করে না।

"অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস।"[১]

"এই সকল যোগের কোনোটিই তোমাকে তোমার বিচার-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে ···বা বিচার-বুদ্ধিকে কোনো পুরোহিত বা পাদরির হাতে তুলিয়া দিতে বলে না। ···যোগের প্রত্যেকটিই তোমাকে তোমার বিচার-বুদ্ধিকে ত্যাগ না করিতে এবং শক্ত করিয়া বিচার-বুদ্ধিকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বলে।"[২]

জ্ঞানযোগের অন্তরঙ্গ সহকারী হইল যুক্তি। তাই জ্ঞানযোগ যুক্তিকে বড়ো করিয়া সর্বোচ্চে স্থান দেয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়মের মতোই ধর্মকে-ও পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

"বিজ্ঞান বা বহির্জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা যে সকল অনুসন্ধান রীতির প্রয়োগ করিয়া থাকি, ধর্মীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে-ও কি সেগুলিকে ব্যবহার করা চলিবে? আমি বলিব, 'চলিবে।' এবং সেই সংগে আমি ইহাও বলিব যে, 'এবং তাহা যতো সত্বর হয় ততোই মঙ্গল।' এইরূপ অনুসন্ধানের দ্বারা ধর্ম যদি বিনষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে, ধর্ম অর্থহীন, মূল্যহীন কুসংস্কার মাত্র। সে ক্ষেত্রে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উহার ধ্বংসই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়—উহা হইতে কোনো শুভ হইতে পারে না।[৩] এই রূপ অনুসন্ধানের ফলে ভেজাল ও মেকী যাহা কিছু

৪৭—৪৬০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ রচনাবলীর বিভিন্ন স্থলে বিক্ষিপ্ত খণ্ড রচনাগুলিকেও ধরিতে হইবে। যেমন, "জ্ঞানযোগের ভূমিকা", ৭ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা ও তৎপরবর্তী অংশ, "যোগ প্রসঙ্গ" ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা ও তৎপরবর্তী অংশ।

১ "যুক্তি ও ধর্ম" সাত, ৪৭।

২ "সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ", দুই, ৩৮৫।

৩ তাঁহার গুরুদেব রামকৃষ্ণ, যিনি সর্বদাই দুর্বলের "ভাই" ছিলেন, তিনি তাঁহার এই মহান মনীষী ও উদ্ধত শিষ্যের আপোসহীনতার মনোভাবকে সমর্থন করিতেন কি না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নহি। তিনি হয়তো তাঁহাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, একটি গৃহের একাধিক দরজা থাকে, এবং প্রত্যেকেরই সম্মুখের দরজা দিয়া আসা সম্ভব নহে। আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে বিবেকানন্দের অপেক্ষা গান্ধী রামকৃষ্ণের এই সার্বজনীন "স্বাগতির" অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের এই অগ্নিগর্ভ শিষ্য এজন্য পরবর্তীকালে সকলের আগেই অত্যন্ত বিনয়ের সংগে নিজের নিন্দা করেন।

আছে, তাহা দূর করিতে হইবে এবং যাহা কিছু খাঁটি, তাহা সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিবে।"[১]

যুক্তির নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে স্থান দাবী করিবার কি অধিকার আছে ধর্মের?

"যুক্তির দিকটাকে মানিয়া চলিতে তাহারা বাধ্য নহে, ধর্মগুলি এইরূপ দাবী কেন করিবে, জানি না।...কেহ বলিয়াছে বলিয়া অন্ধের মতো দুই কোটি দেবতায় বিশ্বাস করার অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নিরীশ্বরবাদী হওয়াও ভালো। এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতিকে ছোট করিয়া দেয় এবং মানুষকে পশুর স্তরে নামাইয়া আনে। আমাদিগকে যুক্তির অনুসরণ করিতেই হইবে।...এমন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ থাকিতে পারেন, যিনি বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়া চকিতে সুদূর সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমরাও যখন নিজেরা সেইরূপ করিতে পারিব, কেবল তখনই আমরা তাহা বিশ্বাস করিব; তাহার আগে করিব না।"[২]

"বলা হয় যে যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী নহে; যুক্তি আমাদিগকে সকল সময়ে সত্যে উপনীত হইতে সাহায্য করে না; বহুবার উহা ভুল করে; সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদিগকে গির্জা বা কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতেই হইবে। কোনো একজন রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান আমাকে একথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় আমি কোনো যুক্তি দেখি নাই। অন্যপক্ষে, আমি বলিব, যুক্তি যদি এতোই দুর্বল হয়, একদল পুরোহিত বা পাদরি তাহার অপেক্ষাও অধিক দুর্বল হইবেন। সুতরাং আমি তাঁহাদের মতামতকে স্বীকার করিতে বাধ্য

---

১ জ্ঞানযোগ।

২ পনের বছর পূর্বে কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার "ভারতীয় ভ্রাতাদের নিকট পত্রে" (১৮৮০) এই কথাই বলিয়াছিলেন:—

"কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মতো তোমরা কোনো কিছুকে বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিবে না। বিজ্ঞানই হইবে তোমাদের ধর্ম—আমাদের ভগবান এই কথাই বলিয়াছেন। বিজ্ঞানকে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দিবে: বস্তুর বিজ্ঞানকে বেদের উপরে এবং আত্মার বিজ্ঞানকে বাইবেলের ঊর্ধ্বে স্থান দিবে। জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও দেহতত্ত্ব, উদ্‌ভিদ্‌বিদ্যা ও রসায়ন—এ সমস্তই প্রকৃতির ভগবানের জীবন্ত শাস্ত্র। দর্শন, ন্যায়, নীতিশাস্ত্র, যোগ, প্রেরণা ও উপাসনা—এগুলি আত্মার ভগবানের শাস্ত্র। এই "অভিনব ধর্মে" (অর্থাৎ তিনি যে ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন) সমস্ত কিছুই বিজ্ঞানসম্মত। তোমাদের মনকে প্রেততত্ত্বের কুহেলিকায় অস্পষ্ট করিয়া তুলিও না। নিজেদিগকে স্বপ্ন ও আজব কল্পনার রাজ্যে ছাড়িয়া দিও না। সুস্পষ্ট দৃষ্টি ও নির্ভুল বিচারশক্তি দিয়া প্রশান্ত চিত্তে সকল কিছুকে প্রমাণ করিয়া দেখ এবং যাহার প্রমাণ পাইয়াছ, তাহাকে ধরিয়া থাক। তোমাদের সকল বিশ্বাসে ও প্রার্থনায় বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া সেগুলি একটি প্রকৃত বিজ্ঞানে পরিণত হওয়া উচিত।"

নই। আমি আমার নিজের যুক্তির অনুসরণ করিব, কারণ, উহার সকল দুর্বলতা সত্ত্বে-ও আকস্মিক ভাবে উহার মধ্য দিয়া সত্যে উপনীত হইবার সম্ভাবনা আছে।··· সুতরাং আমি আমার যুক্তিরই অনুসরণ করিব। এবং যাঁহারা যুক্তির অনুসরণ করিবার ফলে কোনোরূপ বিশ্বাসে উপনীত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইব। কারণ, কেহ বলিয়াছেন বলিয়া মানুষ অন্ধের মতো দুই কোটি দেবতায় বিশ্বাস করিবে, তাহার অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া সে নিরীশ্বরবাদী হইবে, তাহাও শ্রেয়। আমরা চাই অগ্রগতি।···কোনো থিওরি মানুষকে উচ্চতর করিতে পারে না।···যাহা পারে, তাহা হইল একমাত্র সিদ্ধি, তাহা আমাদের সঙ্গেই আছে। এবং তাহা চিন্তা হইতেই আসে। মানুষকে চিন্তা করিতে দাও।···মানুষের গৌরব হইল এই যে, মানুষ চিন্তশীল প্রাণী।···আমি এমন একটি দেশে জন্মিয়াছি যেখানে কর্তৃত্ব এক চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। তাই কর্তৃত্বের কুফল আমি অনেক দেখিয়াছি। এবং দেখিয়াছি বলিয়াই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি, যুক্তির অনুসরণ করি।"[১]

বিজ্ঞান ও ধর্মের (ধর্ম বলিতে বিবেকানন্দ যে অর্থে বুঝিতেন), উভয়েরই ভিত্তি এক—জ্ঞান বা যুক্তি। ফলে, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সেগুলির প্রয়োগে ছাড়া মূলত কোনো পার্থক্য নাই। এমন কি, তিনি সেগুলিকে একই বিষয়ের স্বীকৃতি বলিয়া ভাবিতেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, "মানুষের সকল জ্ঞানই ধর্মের অংশ মাত্র।"[২] এখানে তিনি ধর্মকে জ্ঞানের সমষ্টি হিসাবেই দেখিয়াছেন। অন্য সময়ে তিনি সদম্ভ স্বাতন্ত্র্যের সহিত "ধর্মের সেই সকল প্রকাশকে—যেগুলির মস্তক পৃথিবীর পঙ্কে পা আবদ্ধ রাখিয়া-ও উচ্চ লোকের গোপন রহস্য ভেদ করিতেছে—অর্থাৎ, তথাকথিত বস্তুবাদী বিজ্ঞানকে"[৩] তুলিয়া ধরেন। "বিজ্ঞান ও ধর্ম, দুই-ই আমদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে চায়। ধর্ম হইল কেবল অধিকতর পুরাতন এবং আমাদের এই কুসংস্কার (একজন আবেগময় ধর্মবিশ্বাসীর মুখে কথাটি লক্ষ্য করুন!) আছে যে, উহা অধিকতর পবিত্র।"[৪] সুতরাং বিজ্ঞানে ও ধর্মে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য তাহাদের প্রয়োগে।

১ ব্যবহারিক বেদান্ত, তিন, ৩৩৩।

২ সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, ১০১।

৩ পূর্বোক্ত স্থান, ২য় খণ্ড, ৬৮ পৃঃ।

৪ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭ম খণ্ড, ১০১ পৃঃ। তবে বিবেকানন্দ সেই সংগে ইহাও বলেন যে, "এক অর্থে

"ধর্মের কারবার অধিবিদ্যাগত বিশ্বের সত্য লইয়া; এবং রসায়ন বা অনুরূপ অন্যান্য বিজ্ঞানের কারবার হইল পদার্থগত বিশ্বের সত্য লইয়া।"[১]

এবং যেহেতু অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে, সেই হেতু অনুসন্ধানের রীতিতেও পার্থক্য থাকা উচিত। ধর্মীয় বিজ্ঞানের সম্পর্কে—এই বিজ্ঞান জ্ঞান-যোগের অন্তর্গত—বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পাশ্চাত্ত্যে ধর্মগুলির তুলনামূলক ইতিহাসের যে ভাবে চর্চা করা হইয়া থাকে, তাহার বিপরীত। এবং উহাকে বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানের ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতেন। প্রাচীন ধর্মগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে এইরূপ ঐতিহাসিক গবেষণা ও নানারূপ বুদ্ধি সূচক তত্ত্বের প্রতি আগ্রহকে তিনি কিছুমাত্র খাটো না করিয়াই বলেন যে, এই সকল রীতি অতি-বেশী "বাহ্য"। ফলে, এগুলি ধর্মের মতো মূলত আভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ের যথাযথ বিবরণ দিতে অসমর্থ। ইহা সত্য যে, অভ্যস্ত চোখ শরীর ও মুখের চেহারা দেখিয়াই স্বাস্থ্য বা শরীরের অবস্থা কি তাহা ধরিতে পারে। কিন্তু দেহতত্ত্ব বা দেহের গঠনতত্ত্ব না জানিলে কোনো প্রাণীর স্বরূপ জানা সম্ভব নহে। সেইরূপ ধর্মগত কোনো তথ্য জানিতে হইলে অভ্যাস প্রয়োজন। অন্তর্মুখী পর্যবেক্ষণের এই রীতি মূলত মনস্তাত্ত্বিক, এমন কি অব-মনস্তাত্ত্বিক (infra-psycholgical)। উহা মানবত্মার রসায়ন—লক্ষ্য হইল মূল উপাদানগুলির, জীবকোষের, অণু-পরমাণুর আবিষ্কার।

পবিত্রতরও বটে। কারণ, ধর্ম নীতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়, কিন্তু বিজ্ঞান ঐ দিকটিকে অবহেলা করে।" তবে "এক অর্থে"—এই কথাগুলি অন্যান্য মতের স্বাতন্ত্র্যকে-ও রক্ষা করিয়াছে।

১ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা। ভুলিলে চলিবে না যে, 'সংগ্রাম' এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা বিবেকানন্দের ক্ষাত্র মনোভাবের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তাঁহার নিকট বিজ্ঞান ও ধর্ম, উভয়ের কাজ-ই কোনরূপ সত্যের নিষ্প্রাণ সন্ধান মাত্র নহে—তাহা হাতাহাতি সংগ্রাম।

"মানুষ যতোক্ষণ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, করে, ততোক্ষণই সে মানুষ। এই প্রকৃতি আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্য, উভয়ই। এই প্রকৃতি কেবল আমাদের দেহের বা আমাদের বাহিরের বস্তুকণাগুলিকে যে সকল নীতি শাসন করে, তাহাই নহে। ইহা আমাদের মধ্যে যে সূক্ষ্মতর ও দুর্বোধ্যতর প্রকৃতি রহিয়াছে, যাহা বস্তুতপক্ষে বাহিরের সকল কিছুকে শাসন করিবার মূল শক্তি, তাহা-ও। বাহিরের প্রকৃতিকে জয় করিবার মধ্যে মহত্ত্ব ও গৌরব রহিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তর-প্রকৃতিকে জয় করিবার মধ্যে মহত্ত্ব ও গৌরব আরো অধিক পরিমাণ আছে। কি কি নিয়মে গ্রহ-নক্ষত্র চলে, তাহা জানা মহৎ ও গৌরবজনক নিশ্চয়ই। কিন্তু তাহার অপেক্ষা-ও বহুগুণে মহৎ ও গৌরবময় হইল মানুষের আবেগ কামনা, ইচ্ছা অনুভূতি কি কি নিয়মে চলে, সেগুলিকে জানা।... অন্তরতর মানুষকে জয় করিবার অধিকার কেবল ধর্মেরই আছে।" (জ্ঞানযোগ: "ধর্মের প্রয়োজনীয়তা।")

"আমি এক কণা মাটিকে যদি ভাল করিয়া জানি, তবে আমি তাহার সমগ্র প্রকৃতিকে, তাহার উদ্ভব, বিকাশ, ক্ষয় ও ধ্বংস, সকল কিছুকেই জানিতে পারিব। খণ্ডের ও সমগ্রের মধ্যে কালের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য নাই। কম-বেশী দ্রুততার সঙ্গেই এই চক্রটি সম্পূর্ণ হয়।"

এই ক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিক পরমাণুর আবিষ্কারের জন্য সর্ব প্রথম অপরিহার্য বস্তু হইল অন্তরতর বিশ্লেষণের অভ্যাস। যখন এই পরমাণু আবিষ্কৃত হইয়া প্রাথমিক উপাদানে বিভক্ত হইবে, তখন সেগুলিকে পুনরায় সাজানোও সম্ভব হইবে। এবং মূল নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করা হইবে পরবর্তী কাজ। "বুদ্ধিবৃত্তি গৃহ নির্মাণ করিবে; কিন্তু ইটকে বাদ দিয়া সে গৃহ নির্মাণ করিতে পারে না এবং উহা সে প্রস্তুত-ও করিতে পারে না।"[১] জ্ঞানযোগ হইল উপাদানমূলক তথ্যগুলির গভীরে প্রবেশ করিবার সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত পদ্ধতি এবং এই স্তরে জ্ঞানযোগ রাজযোগের প্রয়োগমূলক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে।

প্রথমে মনের শারীরিক গঠনকে, তাহার অনুভূতির ও শক্তি সরবরাহের অঙ্গগুলিকে, মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিকে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য ও বিচার করিতে হইবে। অতঃপর মানসিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। সাংখ্য দর্শনের মতে, এই মানসিক পদার্থ আত্মা হইতে পৃথক এক বস্তুর অংশ মাত্র। অনুভূতিগুলির যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং সেগুলির বুদ্ধিগত পরিণতিকে-ও লক্ষ্য করিতে হইবে। বাস্তবিক বাহ্য জগৎ এক অজ্ঞাত X. আমরা যে জগৎকে জানি, তাহা x+(বা—) মন (উহার অনুভূতিক্রিয়ার দিক হইতে) জগতের উপর নিজের অবস্থার যে ছাপ রাখে তাহা। মন কেবল মনের মাধ্যমেই নিজেকে জানিতে পারে। উহা একটি অজ্ঞাত y+ (বা—) মনের বিভিন্ন অবস্থা। কাণ্টের[২] বিশ্লেষণের সহিত বিবেকানন্দ সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের সাক্ষ্য অনুসারে, কাণ্টের বহু শতাব্দী পূর্বেই বেদান্ত দর্শন এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিল এবং উহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল।[৩]

আধ্যাত্মিক ক্রিয়া আপনাকে দুইটি বিভিন্ন এবং পরিপূরক স্তরে ভাগ করে: প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি: অগ্রসর হওয়া এবং চক্রাকারে পুনরাবর্তন করা। বিজ্ঞ অধিবিদ্যা-

১ "জ্ঞান যোগের ভূমিকা," ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা ও তৎপরে।

২ বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক।—অনুঃ

৩ হার্ভার্ডে প্রদত্ত "বেদান্ত দর্শন" সম্পর্কে বক্তৃতা (২৫শে মার্চ, ১৮৯৬) এবং জ্ঞানযোগের ভূমিকা।

গত ও ধর্মগত রীতিগুলি উহাদের দ্বিতীয়টিকে দিয়াই আরম্ভ করে—অস্বীকার ও সীমাবদ্ধতাকে দিয়া।[১] দেকার্তের[২] মতো 'জ্ঞানীরা' আগে সমস্ত ঝাঁটাইয়া ফেলেন এবং পুনরায় নির্মাণ কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে স্থায়ী স্থলের সন্ধান করেন। ভিত্তি-ভূমিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং বিভ্রান্তির সকল কারণকে দূরীভূত করা সর্বপ্রথমে একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং জ্ঞানযোগ হইল প্রথমত স্থান, কাল, কার্য-কারণ প্রভৃতি জ্ঞানলাভের বিভিন্ন অবস্থার অনুসন্ধিৎসু সমালোচনা। জ্ঞানযোগ মনের সীমান্তগুলিকে অতিক্রম করিবার পূর্বে সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখে।

* * * *

কিন্তু জ্ঞান-যোগীকে সেই সকল সীমান্ত অতিক্রম করিবার অনুমতি কে দিবে? কি তাঁহার মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস আনিয়া দিবে যে, মনের অবস্থাগুলির পারে বাস্তব *X* বা *Y*—একমাত্র বাস্তবতা রহিয়াছে? এই পর্যন্ত ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব একত্রে চলিয়াছিল। স্পষ্টত এবার তাহারা দ্বিধা বিভক্ত হইল। কিন্তু এখানে দ্বিধা বিভক্ত হইবার কালেও তাহারা পরস্পরের সহিত খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই রহিল। কারণ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের এইরূপ অনুসরণ বলিতে কি বুঝায়? ঐক্যের অনুসন্ধান—অনুসন্ধানের প্রকৃতি যাহাই হোক—এবং ঐ ঐক্যের প্রতি একটি নীরব বিশ্বাস, যাহা মনের সাহায্যে সমসাময়িক ভাবে কাজ চালাইবার উপযোগী এমন সব সারগর্ভ প্রকল্প উত্থাপিত করিবে, যেগুলি অচিরে অনুভূত এবং সুনির্দিষ্টভাবে গৃহীত হইবে। এবং সেই সংগে থাকিবে এমন একটি তীব্র ও গভীর সহজাত বোধশক্তি, যাহা ভবিষ্যতের সকল সন্ধানকেই আলোকিত করিবে।

"বিজ্ঞান কোন্ পথে বলিতেছে, তাহা কি তোমরা লক্ষ্য করিতেছ না? হিন্দুরা মনের পর্যালোচনার মধ্য দিয়া, অধিবিদ্যা ও যুক্তির মধ্য দিয়া, অগ্রসর হন। আর ইউরোপবাসীরা বহিঃপ্রকৃতি হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা-ও এখন ঐ একই লক্ষ্যে গিয়া পৌছিতেছেন। আমরা দেখিতেছি, মনের মধ্য দিয়া সন্ধান করিয়া আমরা অবশেষে সেই 'একত্বে', সেই বিশ্বব্যাপী একে, সেই সকল কিছুর অন্তর্নিহিত আত্মায়, সেই সকল কিছুর সারবস্তুতে ও বাস্তবতায় গিয়া পৌছি।…বস্তুবাদী বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া-ও আমরা ঐ একই 'একত্বে' গিয়া উপনীত হই।…"[৩]

---

১ মায়া সম্পর্কে লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী, অক্টোবর, ১৮৯৬।—"মায়া ও ভগবৎ ধারণার ক্রমবিকাশ।"

২ দেকার্তে—বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক।—অনুঃ

৩ সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৪০ পৃঃ।

"আমি এক কণা মাটিকে যদি ভাল করিয়া জানি, তবে আমি তাহার সমগ্র প্রকৃতিকে, তাহার উদ্ভব, বিকাশ, ক্ষয় ও ধ্বংস, সকল কিছুকেই জানিতে পারিব। খণ্ডের ও সমগ্রের মধ্যে কালের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য নাই। কম-বেশী দ্রুততার সঙ্গেই এই চক্রটি সম্পূর্ণ হয়।"

এই ক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিক পরমাণুর আবিষ্কারের জন্য সর্ব প্রথম অপরিহার্য বস্তু হইল অন্তরতম বিশ্লেষণের অভ্যাস। যখন এই পরমাণু আবিষ্কৃত হইয়া প্রাথমিক উপাদানে বিভক্ত হইবে, তখন সেগুলিকে পুনরায় সাজানোও সম্ভব হইবে। এবং মূল নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করা হইবে পরবর্তী কাজ। "বুদ্ধিবৃত্তি গৃহ নির্মাণ করিবে; কিন্তু ইটকে বাদ দিয়া সে গৃহ নির্মাণ করিতে পারে না এবং উহা সে প্রস্তুত-ও করিতে পারে না।"[১] জ্ঞানযোগ হইল উপাদানমূলক তথ্যগুলির গভীরে প্রবেশ করিবার সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত পদ্ধতি এবং এই স্তরে জ্ঞানযোগ রাজযোগের প্রয়োগমূলক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে।

প্রথমে মনের শারীরিক গঠনকে, তাহার অনুভূতির ও শক্তি সরবরাহের অঙ্গ-গুলিকে, মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিকে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য ও বিচার করিতে হইবে। অতঃপর মানসিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। সাংখ্য দর্শনের মতে, এই মানসিক পদার্থ আত্মা হইতে পৃথক এক বস্তুর অংশ মাত্র। অনুভূতিগুলির যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং সেগুলির বুদ্ধিগত পরিণতিকে-ও লক্ষ্য করিতে হইবে। বাস্তবিক বাহ্য জগৎ এক অজ্ঞাত X. আমরা যে জগৎকে জানি, তাহা x+(বা—) মন (উহার অনুভূতিক্রিয়ার দিক হইতে) জগতের উপর নিজের অবস্থার যে ছাপ রাখে তাহা। মন কেবল মনের মাধ্যমেই নিজেকে জানিতে পারে। উহা একটি অজ্ঞাত y+ (বা—) মনের বিভিন্ন অবস্থা। কান্টের[২] বিশ্লেষণের সহিত বিবেকানন্দ সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের সাক্ষ্য অনুসারে, কান্টের বহু শতাব্দী পূর্বেই বেদান্ত দর্শন এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল এবং উহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল।[৩]

আধ্যাত্মিক ক্রিয়া আপনাকে দুইটি বিভিন্ন এবং পরিপূরক স্তরে ভাগ করে: প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি: অগ্রসর হওয়া এবং চক্রাকারে পুনরাবর্তন করা। বিজ্ঞ অধিবিদ্যা-

১ "জ্ঞান যোগের ভূমিকা," ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা ও তৎপরে।

২ বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক।—অনুঃ

৩ হার্ভার্ডে প্রদত্ত "বেদান্ত দর্শন" সম্পর্কে বক্তৃতা (২৫শে মার্চ, ১৮৯৬) এবং জ্ঞানযোগের ভূমিকা।

গত ও ধর্মগত রীতিগুলি উহাদের দ্বিতীয়টিকে দিয়াই আরম্ভ করে—অস্বীকার ও সীমাবদ্ধতাকে দিয়া।[১] দেকার্তের[২] মতো 'জ্ঞানীরা' আগে সমস্ত ঝাঁটাইয়া ফেলেন এবং পুনরায় নির্মাণ কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে স্থায়ী স্থলের সন্ধান করেন। ভিত্তি-ভূমিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং বিভ্রান্তির সকল কারণকে দূরীভূত করা সর্বপ্রথমে একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং জ্ঞানযোগ হইল প্রথমত স্থান, কাল, কার্য-কারণ প্রভৃতি জ্ঞানলাভের বিভিন্ন অবস্থার অনুসন্ধিৎসু সমালোচনা। জ্ঞানযোগ মনের সীমান্তগুলিকে অতিক্রম করিবার পূর্বে সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখে।

*　　*　　*　　*

কিন্তু জ্ঞান-যোগীকে সেই সকল সীমান্ত অতিক্রম করিবার অনুমতি কে দিবে? কি তাঁহার মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস আনিয়া দিবে যে, মনের অবস্থাগুলির পারে বাস্তব *X* বা *Y*—একমাত্র বাস্তবতা রহিয়াছে? এই পর্যন্ত ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব একত্রে চলিয়াছিল। স্পষ্টত এবার তাহারা দ্বিধা বিভক্ত হইল। কিন্তু এখানে দ্বিধা বিভক্ত হইবার কালেও তাহারা পরস্পরের সহিত খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই রহিল। কারণ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের এইরূপ অনুসরণ বলিতে কি বুঝায়? ঐক্যের অনুসন্ধান—অনুসন্ধানের প্রকৃতি যাহাই হোক—এবং ঐ ঐক্যের প্রতি একটি নীরব বিশ্বাস, যাহা মনের সাহায্যে সমসাময়িক ভাবে কাজ চালাইবার উপযোগী এমন সব সারগর্ভ প্রকল্প উত্থাপিত করিবে, যেগুলি অচিরে অনুভূত এবং সুনির্দিষ্টভাবে গৃহীত হইবে। এবং সেই সংগে থাকিবে এমন একটি তীব্র ও গভীর সহজাত বোধশক্তি, যাহা ভবিষ্যতের সকল সন্ধানকেই আলোকিত করিবে।

"বিজ্ঞান কোন্ পথে বলিতেছে, তাহা কি তোমরা লক্ষ্য করিতেছ না? হিন্দুরা মনের পর্যালোচনার মধ্য দিয়া, অধিবিদ্যা ও যুক্তির মধ্য দিয়া, অগ্রসর হন। আর ইউরোপবাসীরা বহিঃপ্রকৃতি হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা-ও এখন ঐ একই লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছিতেছেন। আমরা দেখিতেছি, মনের মধ্য দিয়া সন্ধান করিয়া আমরা অবশেষে সেই 'একত্বে', সেই বিশ্বব্যাপী একে, সেই সকল কিছুর অন্তর্নিহিত আত্মায়, সেই সকল কিছুর সারবস্তুতে ও বাস্তবতায় গিয়া পৌঁছি।…বস্তুবাদী বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া-ও আমরা ঐ একই 'একত্বে' গিয়া উপনীত হই।…"[৩]

---

১ মায়া সম্পর্কে লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী, অক্টোবর, ১৮৯৬।—"মায়া ও ভগবৎ ধারণার ক্রম-বিকাশ।"

২ দেকার্তে—বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক।—অনুঃ

৩ সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৪০ পৃঃ।

"ঐক্যের আবিষ্কার ভিন্ন বিজ্ঞান আর কিছুই নহে। যখনই বিজ্ঞান ত্রুটিহীন ঐক্যে গিয়া উপনীত হইবে, তখনই উহা আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া বন্ধ করিবে। কারণ, তখন উহা উহার উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌছিবে। রসায়ন যখন এমন একটি উপাদান আবিষ্কার করিবে, যাহা হইতে অপর সকল কিছুই প্রস্তুত হইতে পারে, তখন তাহা আর অগ্রসর হইবে না। পদার্থবিস্তা যখন এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিবে যে, অন্যান্য সকল শক্তি তাহারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র এবং এইরূপ আবিষ্কারের দ্বারা তাহার কাজ শেষ করিবে, তখন সে-ও থামিয়া দাঁড়াইবে।…যিনি মৃত্যুর জগতে একমাত্র জীবন, তাঁহাকে যখন ধর্মীয় বিজ্ঞান আবিষ্কার করিবে, তখনই তাহা ত্রুটিহীন ও সম্পূর্ণ হইবে। তখন ধর্ম-ও আর অগ্রসর হইবে না। সকল বিজ্ঞানের উহাই লক্ষ্য।"[১]

সুতরাং ঐক্য হইল সেই প্রয়োজনীয় প্রকল্প, যাহার উপর বিজ্ঞানের কাঠামোটা দাঁড়াইয়া আছে। ধর্মবিজ্ঞানে ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, মূলগত ঐক্যের পরমতমের মূল আছে।[২] জ্ঞানযোগ যখন সীমবদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাকে সীমাহীন করিয়া দেয়, তখন কর্মযোগের কাজ হয় এই ভঙ্গুর ও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত উর্ণনাভের জালগুলিকে পৃথক করিয়া নিজেকে অসীমের এক ভিত্তি প্রস্তরের সহিত সংযুক্ত করা।

কিন্তু মনের এই জালের ক্ষেত্রেই ভারতের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ইউরোপীয় যুক্তি-বাদীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য রীতি হইতে দূরে সরিয়া যান। তাঁহারা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-সীমা ও অদ্বৈতের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ দেহের মধ্যকার কতকগুলি অভিনব অভিজ্ঞতার সাহায্য লন, যেগুলিকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান কখনো সমর্থন করে নাই। এবং ইহাই হইল তাঁহাদের কাছে, প্রকৃত অর্থে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা।

এইমাত্র আমি ইটের কথা বলিয়াছি, "যে ইট দিয়া মস্তিষ্ক তাহার গৃহ রচনা করিবে।" ভারতীয় যোগীদের এই সকল ইট আমাদের নির্মাণশালায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান প্রয়োগ, পরীক্ষা ও যুক্তির পথেই অগ্রসর হয়। ঐ উভয় ক্ষেত্রে কি বহিঃপ্রকৃতির দিক হইতে, কি নিজের মনের দিক হইতে, উহা

১ সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১২-১৩ পৃঃ

২ মায়া সম্পর্কে বক্তৃতাবলী—"অদ্বৈত ও তাঁহার প্রকাশ।"

আপেক্ষিকতার চক্র হইতে বাহিরে আসিতে চেষ্টা করে না। বিশ্বব্যাপারের কেন্দ্ররূপে ঐ ঐক্য সংক্রান্ত প্রকল্প যাহা গ্রহণ করে, তাহা শূন্যে ঝুলিতে থাকে। এই প্রকল্প যুক্তি ও তথ্যের শৃংখলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। তাহা হইলে-ও উহা সাময়িকভাবে কাজ চালাইবার জন্য যতোখানি উপযোগী, অপরিহার্য অংশ হিসাবে ততোখানি নহে। কিন্তু পেরেকটা যতোক্ষণ লাগিয়া থাকে, ততোক্ষণ লোকে জানে না বা জানিতে চাহে না, উহা কিসে লাগিয়া আছে।

বৈদান্তিক ঋষি বিবেকানন্দ তাই পাশ্চাত্ত্যে বিজ্ঞানের অনুমান-সাহসের (এ সম্পর্কে সে নিজে যতোই লজ্জাবোধ করুক) এবং তাহার কাজের আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না যে, ইহার এই পদ্ধতিগুলি কখনো তাঁহাকে তাঁহার একান্ত প্রয়োজনীয়[১] ঐক্য লাভের পথে লইয়া যাইতে পারে। তাঁহার কাছে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যেমন মানব মনের আকারের ঊর্ধ্বে উঠিয়া কোনো বাস্তবতায় গিয়া পৌঁছিতে পারে নাই,[২] তেমনি পাশ্চাত্ত্যে ধর্মগুলি-ও তাহাদের নরাকার ভগবানের ধারণার হাত হইতে নিজেদিগকে মুক্ত করিতে পারে নাই।[৩] কিন্তু যে বিশ্বে সকল বিশ্ব নিহিত আছে, তাহাকে

---

১ সম্ভবত তিনি ভুল করিয়াছেন। বিজ্ঞান তাহার শেষ কথা বলে নাই। বিবেকানন্দের পর আইনস্টাইনের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি "তুরীয় বহুবাদের" (Transcendental Pluralism) কথা কল্পনা করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশে নূতন চিন্তার জগতে এই তুরীয় বহুবাদের বীজগুলি যুদ্ধ ও বিপ্লবের দ্বারা কর্ষিত ভূমি হইতে উত্থান লাভ করিতেছে। বরিস ইয়াকভেঙ্কো লিখিত *Vom Wesen des Pluralismus*, (বন হইতে ১৯২৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য। উহাতে এচ. রিকার্টের এই কথাগুলিকে মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে: "*Das All ist nure als Veilheit su begreifen*" —"বহুর মধ্যেই কেবল সমগ্রকে বুঝা সম্ভব।")

২ এখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুল করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতীয় বেদান্তের কাছে সুমহান খৃস্টান অধ্যাত্মবাদের গভীর অর্থটি অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। নরাকার ভগবান সম্পর্কে জনসাধারণের যে প্রিয় ধারণা রহিয়াছে, তাহার দ্বারা বা তাহার জন্য যে সকল আকার ও প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেগুলির সীমাকে শ্রেষ্ঠ বেদান্তবাদের মতোই খৃস্টান আধ্যাত্মবাদও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তবে একথা-ও বলা চলে যে, বিবেকানন্দকে যে সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর খৃস্টান শিক্ষকের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাঁহারাও ছিলেন এ বিষয়ে ঐরূপ অজ্ঞ।

৩ আধুনিক বিজ্ঞানের উচ্চতর অনুমানগুলির সহিত, বহুমাত্রিক অংক বিদ্যার সহিত, অনিউক্লিডীয় জ্যামিতির সহিত, "অসীমের যুক্তিবিদ্যার" সহিত, জ্ঞানতত্ত্বের সহিত, বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা না থাকিলে বিজ্ঞানগুলি কেমন হইত, তাহা যাহার শিক্ষা দেওয়া উচিত, ক্যান্টরিয়ানদের সেই "বিজ্ঞানের বিজ্ঞান"-এর সহিত বিবেকানন্দ পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। (আঁরি পঁয়কারের *Dernieres Penseos* এবং *La Science et L'Hypothese* তুলনীয়।) তবে তিনি সম্ভবত সেগুলিকে কোনো রকমে ধর্মীয়

আবিষ্কার করিতে হইবে। এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে মূল সত্যের এমন আবিষ্কারের মধ্যে, যে আবিষ্কার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর ও নিম্নতর সকল জগতের সকলের সাধারণ গুণ হইবে। ভারতের প্রাচীন মনীষীরা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা যতোই কেন্দ্র হইতে দূরে যাইতে থাকেন, ততোই ব্যবধান বাড়িতে থাকে, এবং তাঁহারা যতোই কেন্দ্রের নিটবর্তী হইতে থাকেন, ঐক্যের সান্নিধ্য-ও ততোই অধিক অনুভূত হইতে থাকে। "বহির্জগৎ কেন্দ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত, সুতরাং বহির্জগতে এমন কোনো স্থান নাই, যেখানে অস্তিত্বের সকল ঘটনাই মিলিত হইতে পারে।" বহির্জাগতিক ঘটনা ছাড়াও অন্য ঘটনা রহিয়াছে: মানসিক, নৈতিক ও মস্তিষ্কগত ঘটনা। অস্তিত্বের বিভিন্ন তল রহিয়াছে: ঐ তলগুলির একটিকে আবিষ্কার করিলেই সমগ্রটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রয়োজন হইল কেন্দ্রে গিয়া উপনীত হওয়া, যে কেন্দ্র হইতে অস্তিত্বের বিভিন্ন তলগুলির সূত্রপাত হইয়াছে। এই কেন্দ্র আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। প্রাচীন বেদান্তবাদীরা অনুসন্ধান চালাইয়া অবশেষে আবিষ্কার করেন যে, আত্মার অন্তরতম কেন্দ্রটিই হইল সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্র।[১] সুতরাং সেখানেই পৌছিতে হইবে ; সেই খনিকে

বিজ্ঞানের দিকেই লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন। বস্তুতপক্ষে, আমি ঐগুলির মধ্যে একটি ধর্মের চকিত আলোকোদ্ভাসকেই লক্ষ্য করি। সে ধর্ম এখনো নিজের সম্পর্কে সচেতন হয় নাই এবং তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে ধর্মবিকাশের সর্বাপেক্ষা প্রাণবান একটি শিখা।

১ "জ্ঞান যোগ", "সিদ্ধি" (২৯শে অক্টোবর, ১৮৯৬)। বিবেকানন্দ সাধারণ ভাবে কঠোপনিষদের একটি বিশ্লেষণ দেন এবং বিশেষ ভাবে মৃত্যুর সুন্দর দেবতা যমের সহিত সত্যসন্ধী তরুণ নচিকেতার সংলাপটি যে কাহিনীর মধ্যে আছে, সেই গভীর ভাবপূর্ণ কাহিনীটিকে প্রায় হুবহু ভাষান্তরিত করেন।

খৃস্টান অধ্যাত্মবাদ-ও ঐ একই জিনিস আবিষ্কার করিয়াছে। উহা আত্মার সুকঠিন তলদেশ। বিখ্যাত তোলের বলিয়াছেন, "কখন-ও কখন-ও উহাকে আত্মার তলদেশ, কখন-ও কখন-ও বা উহাকে আত্মার শিখর দেশ বলা হয়।" "এই গভীরতার মধ্যে ভগবানের সহিত আত্মার সাদৃশ্য এবং অক্ষয় সান্নিধ্য রহিয়াছে ; আত্মার এই গভীরতম, অন্তরতম, গোপনতম গভীরেই অবিচ্ছেদ্য ভাবে, বাস্তবভাবে, প্রকৃতভাবে ভগবান রহিয়াছেন।"

ভগবান বলিলে সমস্ত বিশ্বকেই বোঝায়।

বিখ্যাত সালেপন্থী জে. পি. কেমাস বলেন: "এই কেন্দ্রের (আত্মার) বিশেষ গুণ হইল এই যে, উহা শক্তি সমূহের সমগ্র ক্রিয়াকে একটি সমুন্নত ভংগীতে সমাবেশ করে এবং প্রথম মূল শক্তি তাহার অপেক্ষা নিম্নতর জগৎগুলিকে যে ভাবে শক্তির প্রেরণা দিয়াছিল, উহাও ঐ সকল শক্তিসমূহকে সেই ভাবেই শক্তি দেয়।"

(*Traite de la Reformation interieure selon l'esprit du B. Francois de Sales, Paris, 1631*, তুলনীয় ব্রেমঁ-রচিত *Metaphysique des Saints* Vol. I., P., 56)

ভেদ করিতে হইবে, খনন করিতে হইবে; দেখিতে হইবে, স্পর্শ করিতে হইবে। এবং হিন্দুদের অর্থে, ধর্মের উহাই প্রকৃত কর্তব্য। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, উহা, সমগ্রত না হইলে-ও প্রধানত তথ্যেরই প্রশ্ন। বিবেকানন্দ ইহাও লিখিতে সাহস করিয়াছিলেন: "অনুভব না করিবার (অর্থাৎ অনুভব এবং প্রয়োগ ও পরীক্ষা না করিবার) অপেক্ষা বিশ্বাস না করাও শ্রেয়।" বিবেকানন্দের ধর্মের সহিত যে অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা মিশ্রিত ছিল, তাহা এখানে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহা ছাড়া, এই বিশেষ বিজ্ঞান বিশেষ-বিশেষ ইন্দ্রিয়াতীত প্রয়োগ ও পরীক্ষাকে ব্যবহার করিবার দাবী করে।

বিবেকানন্দ বলেন, "ইন্দ্রিয় সমূহের সীমা অতিক্রম করিবার সংগ্রাম হইতেই ধর্মের জন্ম।" সেখানেই উহাকে উহার "প্রকৃত বীজ"[১] আবিষ্কার করিতে হয়, "সকল সংঘবদ্ধ ধর্মেই প্রতিষ্ঠাতারা...বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থা লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন।...এই সকল অবস্থায়[২] তাঁহারা যাহাকে আধ্যাত্মিক রাজ্য বলা হয়, তাহার সম্পর্কে নূতন ও ধারাবাহিক কতকগুলি তথ্যের সম্মুখীন হইয়াছেন।[৩] এই ভাবে প্রত্যেকটি ধর্মেই একটি প্রচণ্ড কথা বলা হইয়াছে। সেটি হইল এই যে: মানুষের মন কোনো কোনো মুহূর্তে কেবল যে ইন্দ্রিয়ের সীমাকে

সমগ্র প্রবন্ধটিকেই এই "আত্মার কেন্দ্র" সন্ধানে নিয়োগ করা হইয়াছে। এবং সন্ধানের এই সমুদ্রযাত্রাটি স্বভাবতই বেদান্তবাদীদের ক্ষেত্রে যেমন হইয়া থাকে, তেমনভাবেই একটি বিশ্বগত রূপ লাভ করিয়াছে।

১ "জ্ঞানযোগ": "ধর্মের আবশ্যকতা" (লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা।) এই সন্ধান সম্পর্কে প্রেরণা মানুষ সর্বপ্রথম স্বপ্নগুলির মধ্য দিয়াই পাইয়াছিল। স্বপ্নগুলি তাহাকে অমরত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটি অস্পষ্ট জড়িত ধারণা দিয়াছিল।" মানুষ আবিষ্কার করিল...যে, স্বপ্নাবস্থায় মানুষ নূতন অস্তিত্ব লাভ করে না।... কিন্তু এই সময় সন্ধান শুরু হইয়া গিয়াছিল... এবং মানুষ মনের বিভিন্ন স্তরগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে তাহাদের জিজ্ঞাসা চালাইতে লাগিল এবং জাগ্রতাবস্থার বা স্বপ্নাবস্থার অপেক্ষা উচ্চতর স্তরগুলির সন্ধান পাইল।"

২ পূর্বোক্ত স্থান। বিবেকানন্দ সেই সংগে বলেন, "বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে কিছুটা অন্যথা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।... কিন্তু এমন কি বৌদ্ধরা-ও একটি চিরন্তন নৈতিক নিয়মকে লক্ষ্য করেন। যুক্তি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার দ্বারা ঐ নৈতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হয় নাই। বুদ্ধ উহাকে একটি অতিচেতন অবস্থায় লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আবিষ্কার করিয়াছিলেন।"

৩ ইহা লক্ষণীয় যে, বিবেকানন্দের পর—অরবিন্দ ঘোষ আর এক পা অগ্রসর হইয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক মনের স্বাভাবিক রীতিগুলির মধ্যে স্বজ্ঞা বা সহজ বোধশক্তিকে-ও পুনরায় স্থাপন করিয়াছেন:

অতিক্রম করিয়া যায় তাহা নহে, তাহা বুদ্ধির শক্তিকেও অতিক্রম করে। "এবং তখন তাহা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির রাজ্যের বহির্ভূত কতকগুলি তথ্যের সম্মুখীন হয়।"[১]

ইহাই স্বাভাবিক যে, এই সকল তথ্যকে না দেখিয়া বা প্রমাণ না করিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। আমরা যদি সেগুলি সম্পর্কে একটি প্রকৃতিস্থ সংযম বজায় রাখিয়া চলি, তবে তাহাতে আমাদের হিন্দু বন্ধুদের-ও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আমরা কেবল তাঁহাদের নিজেদের বৈজ্ঞানিক নিয়মকেই মানিয়া চলিতেছি: "তুমি যদি স্পর্শ না করিয়া থাকো, বিশ্বাস করিও না।" এবং বিবেকানন্দ এই বৈজ্ঞানিক নিয়মের সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, যে-অভিজ্ঞতা জ্ঞানের কোনো একটি শাখায় একবার ঘটিয়াছে, তাহা ইহার পূর্বে-ও হয়তো

"ব্যবহারিক যুক্তির ত্রুটি হইল এই যে, বাস্তবতাকে উহা তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে এমন আপাতঃদৃষ্ট তথ্যের কাছে উহা অত্যধিক নতি স্বীকার করে। উহা সম্ভাবনার ও সুপ্ত শক্তির গভীরতম তথ্যগুলিকে সেগুলির যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়া দিবার সাহস রাখে না। যাহা এখন আছে, তাহা একটি পূর্বতন সম্ভাবনার সুপ্ত শক্তির পরিণতি মাত্র; এবং এই ভাবে বর্তমানে যে সম্ভাবনাময় সুপ্ত শক্তি রহিয়াছে, তাহা-ও ভবিষ্যৎ পরিণতির সূচনা মাত্র।" ('দিব্য জীবন')

"স্বজ্ঞা আমাদের মানসিক ক্রিয়াগুলির পশ্চাতে অবগুণ্ঠিত অবস্থায় থাকে। উহা মানুষের কাছে অজ্ঞাতের রাজ্য হইতে সেই সকল বাণী বহন করিয়া আনে, যেগুলি মানুষের উন্নততর চেতনার সূত্রপাত মাত্র। ঐ সকল সমৃদ্ধি হইতে কতখানি সে লাভ করিতে পারে, তাহা দেখিবার জন্য পরেই বিচার বুদ্ধি আসিয়া পৌঁছে। যাহা আমরা জানি বা যাহা আছে বলিয়া মনে হয়, তাহার পশ্চাতে বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া কিছু থাকার ধারণাটিকে আমরা স্বজ্ঞার দ্বারা পাই। এই কিছুটাকে সর্বদা আমাদের অল্প-পরিণত বুদ্ধির এবং আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার বিরোধী বলিয়া মনে হয়। উহা আমাদিগকে ভগবান, অমরতা প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের যে স্থির ধারণাগুলি আছে, সেগুলির মধ্যে ঐ রূপহীন অনুভূতিকে-ও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য তাড়া দেয়, এবং আমরা মনের অভ্যন্তরে 'তাঁহাকে' ব্যাখ্যা করিবার কাজে উহাকে ব্যবহার করি।"

অর্থাৎ স্বজ্ঞা মনের পরিচালক ও পরামর্শদাতার কাজ করে এবং যুক্তি থাকে সাধারণ সৈনিক হিসাবে পশ্চাতে। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে যেমনটি হইয়াছিল, সে ভাবে উহারা একতলা দুতলা হিসাবে বিচ্ছিন্ন নহে। তরঙ্গের বা জ্ঞানরূপ প্রবাহমান নদীর সকল স্রোতের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্নতা থাকে, তেমনি একটি অবিচ্ছিন্নতা উহাতে আছে। বিজ্ঞানের সীমা অন্তর্হিত হইয়াছে। এমন কি, ভগবান ও অমরতা প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণাগুলি এবং ঠিক ধর্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সে সমস্তই অরবিন্দের ব্যাখ্যায় কতকগুলি উপায় মাত্রে পরিণত হইয়াছে। ঐ উপায়গুলির দ্বারা আত্মা সেই 'সত্যের' সুদূর জীবনকে প্রকাশ করে, যে সত্য আজ যুক্তির আগেই আসিয়াছে, কিন্তু যে সত্যকে কাল যুক্তি আয়ত্ত করিতে পারিবে।

"জীবনের," "জীবনের সমগ্রতার" ধারণায় ভারতীয় মানস বর্তমানে অগ্রগমনের এই স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উহাতে ধর্মীয় স্বজ্ঞাকে বিজ্ঞানের কঠোর গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করানো হইয়াছে।

ঘটিয়াছে এবং পরে-ও হয়তো ঘটিবে। কোনো অনুপ্রেরিত ব্যক্তিই এইরূপ কোনো বিশেষ সুযোগের দাবী করিতে পারেন না যে, উহা পুনরায় ঘটিবে না। সুতরাং যদি কোনো সত্য (উচ্চতম শ্রেণীর সত্য) কোনো "সুনির্বাচিত" ব্যক্তির ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ফসল হয়, তবে অনুরূপ অভিজ্ঞতা আবার অবশ্যই ঘটিবে। এবং রাজযোগের বিজ্ঞানের লক্ষ্য হইল মনকে ঐরূপ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া।[১]

প্রত্যেকেই এই আত্মশিক্ষার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু আমি এখানে কেবল এই সকল পর্যবেক্ষণের চূড়ান্ত ফলটিই দেখাইতে চাই। তাহা হইল এই যে, সকল সুপ্রতিষ্ঠিত উন্নততর ধর্মেই যখন কতকগুলি ভাবসার আধ্যাত্মিক তথ্য আবিষ্কৃত

১ হৃৎপদ্ম বা ব্রহ্মতালুর মধ্যে মনকে নিবদ্ধ করার নাম 'ধারণা'। একটি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ হইয়া সেই স্থানটিকে ভিত্তি করিয়া এক বিশেষ ধরণের মানসিক তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেগুলিকে অন্য ধরণের মানসিক তরঙ্গ গ্রাস করে না; সেগুলি ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করে, এবং অন্য ধরণের তরঙ্গগুলি ক্রমেই সরিয়া যায় ও অবশেষে অন্তর্হিত হয়। পরে এই সকল তরঙ্গের বহুত্ব একত্বে পরিণত হয় এবং একটি মাত্র তরঙ্গ মনের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। উহাকে বলে 'ধ্যান'। যখন কোনরূপ ভিত্তির প্রয়োজন হয় না, যখন সমগ্র মন একটি মাত্র তরঙ্গে পরিণত হয়, একাকার হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলা হয় 'সমাধি'। সকল স্থান ও কেন্দ্রগুলির সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া তখন চিন্তার অর্থটি (অর্থাৎ বোধশক্তির অন্তরতর অংশটি) মাত্র বর্তমান থাকে। যদি মনকে বারো সেকেণ্ডের জন্য কেন্দ্রস্থ করা যায়, তবে উহা হইবে 'ধারণা', এইরূপ বারোটি ধারণা হইলে হইবে 'ধ্যান', এবং বারোটি 'ধ্যান' হইলে হইবে 'সমাধি', এবং উহাই আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দ। (রাজযোগ, ৮ম অধ্যায়, কূর্ম পুরাণের সংক্ষিপ্তসার)।

কৌতূহলীদের জন্য আমি এই মানসিক কর্মপদ্ধতির কলা-কৌশলের প্রাচীন সংক্ষিপ্তসারটি দিলাম। তবে আমি চাই না যে, কেহ উপযুক্তরূপ বিবেচনা না করিয়া নিজেকে উহার হাতে ছাড়িয়া দেন। কারণ, এই ধরণের সমুন্নত আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনুশীলনগুলির সহিত বিপদও জড়িত থাকে। ভারতীয় গুরুরা অসতর্ক পরীক্ষাকারীদিগকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে কখনো বিরত হন না। বর্তমানে বিচারবুদ্ধি এতোই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, এই সকল অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা যেটুকু বুদ্ধি অবশিষ্ট আছে তাহাকে বিপন্ন করা উচিত হইবে না—অন্ততঃপক্ষে সেগুলির ফলাফলকে সুকঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ইচ্ছাশক্তি যদি পরিণত না হয়। এ বিষয়ে যাঁহারা লক্ষ্য করিতে চান, তাঁহাদের জন্যই আমি ঐ বিষয়ের গবেষণার গতিটা কোন্ পথে, তাহা বর্ণনা করিয়াছি। আমি মুক্ত ও সুদৃঢ় বিচারবুদ্ধির নিকট আবেদন করিতেছি। ইউরোপের বুকে "আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের" নূতন কোনো এক সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া দিবার কোনরূপ মতলব আমার নাই। তবে যাঁহারা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের একটি পথ যে অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য, উপেক্ষা বা কুসংস্কারের জন্য পরিত্যক্ত হইবে, তাহা সহিতে পারেন না।

ও অনুভূত হয়, তখন সেগুলি একটি মাত্র ঐক্যে ঘনীভূত হইয়া উঠে। এবং এই ঐক্যটি কোনো 'ভাবসার উপস্থিতির', কোনো সর্বব্যাপী সত্তার, ভগবান নামে অভিহিত কোনো নির্বস্তুক ব্যক্তিত্বের, কোন নৈতিক নিয়মের, কিম্বা সকল অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত আছে, এমন কোনো নির্বস্তুক মূল উপাদানের আকার গ্রহণ করে।[১]

এবং এই শেষোক্ত আকারটিই বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের আকার। এই আকারের মধ্যে আমরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের লক্ষ্যের এতো কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছি যে, সে দুটির মধ্যে সহজে পার্থক্য করা যায় না। যাহারা এই সাম্যের উদ্দেশ্যে ছুটিতেছেন, তাঁহারা শেষ চিহ্নের কাছে পৌঁছিবার সময়ে কি রকম ভংগী করেন, তাহাতেই প্রধান প্রার্থক্যটি থাকে। বিজ্ঞান চিন্তার বিচ্ছিন্ন স্তরে অগ্রসর হইবার জন্য এবং সেগুলিকে যথার্থ স্থানে স্থাপিত করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রকল্পিত সংজ্ঞা হিসাবে ঐক্যকে দেখে ও গ্রহণ করে। কিন্তু যোগ ঐক্যকে জড়াইয়া ধরে এবং ঐক্যের লতা-পল্লবের আবরণে আচ্ছাদিত হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক ফলটা হয় কর্যত একরূপ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দার্শনিক অদ্বৈতবাদ এই একই সিদ্ধান্তে আসে যে, "সকল বস্তুর ব্যাখ্যা সেগুলির স্ব স্ব প্রকৃতির মধ্যেই মিলিবে এবং এই বিশ্বে যাহা ঘটিতেছে তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য বাইরের কোনো সত্তার বা অস্তিত্বের কোনরূপ প্রয়োজন নাই। এবং এই মূলনীতির উপসিদ্ধান্ত হইল এই যে, "প্রত্যেক বস্তুই ভিতর হইতে আসিয়াছে" এবং এই উপসিদ্ধান্তই আধুনিক বিজ্ঞানের উদবর্তনবাদ। উদ্‌বর্তনের সমগ্র অর্থ হইল সরল ভাষায় এই: "কোনো বস্তুর (বিকাশের কালে) প্রকৃতি পুনরায় জন্মলাভ করে, কার্য্যগুলি কারণের ভিন্নতর রূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কার্যের মধ্যে যাহা ঘটে, তাহার সকল সম্ভাবনাই কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এবং এই সমগ্র সৃষ্টিই সৃজন নহে, উদ্‌বর্তন মাত্র।"[২]

উদ্‌বর্তনের আধুনিক তত্ত্বের সহিত সুপ্রাচীন অধিবিদ্যা ও বৈদান্তিক বিশ্বরূপ তত্ত্বের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আছে, বিবেকানন্দ প্রায়ই তাহার উপর জোর দিতেন।[৩]

১ "জ্ঞানযোগ": "ধর্মের আবশ্যকতা।"

২ সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ৩৭৪ পৃঃ।

৩ তিনি তাঁহার "প্রশ্নের উত্তরে" শীর্ষক বেদান্ত সংক্রান্ত বক্তৃতায় উদ্‌বর্তনবাদ ও সৃষ্টির প্রাচীন তত্ত্বের, অথবা যথাযথভাবে বলিতে গেলে, প্রাণের ক্রিয়ার দ্বারা আকাশের উপরে বিশ্বের "প্রক্ষেপের" মধ্যে—এই আকাশের পারে সেই মহৎ বা বিশ্ব মানস বর্তমান রহিয়াছেন, যে বিশ্ব মানসের মধ্যে আকাশ ও বিশ্ব

কিন্তু উদ্‌বর্তনবাদী প্রকল্প এবং হিন্দু প্রকল্পের মধ্যে এই মূলগত পার্থক্যটি রহিয়াছে : দ্বিতীয়টির সঙ্গে তুলনায় প্রথমটি হইল যেন সমগ্র সৌধের একটি অংশ মাত্র : এবং বেদান্তবাদের মধ্যে যে সাময়িক নিবর্তন (involution) রহিয়াছে, তাহা উদ্‌বর্তনবাদের পরিপূরক বাকী অংশ (বা তাহা উদ্‌বর্তনবাদকে ঠেকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে)। সকল হিন্দু তত্ত্বই সেগুলির স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে চক্র তত্ত্বের (theory of Cycles) উপর প্রতিষ্ঠিত। অগ্রগতি সেখানে পর পর তরঙ্গপ্রবাহের রূপে দেখা দেয়। প্রত্যেক তরংগ উঠে নামে ; প্রত্যেক তরংগের পরে আবার নূতন করিয়া তরংগ আসে ; সে তরংগও উঠে ও নামে :

"এমন কি আধুনিক গবেষণার ভিত্তিতেও মানুষ কেবল উদ্‌বর্তন মাত্র হইতে পারে না। প্রত্যেক উদ্‌বর্তনের জন্য চাই অনুবর্তন-ও। আধুনিক বিজ্ঞানী বলিয়া দিবেন যে, তুমি কোনো যন্ত্রের মধ্যে যতোখানি শক্তি দিবে, সে যন্ত্র হইতে ততোখানি শক্তিই তুমি পাইতে পারো। কিছু-না হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। মানুষ যদি আদিম মেরুদণ্ডহীন কোনো প্রাণীর উদ্‌বর্তিত রূপ হয়, তবে পূর্ণতম মানুষ, বুদ্ধ-মানুষ, খৃস্ট-মানুষ, তাঁহারও ঐ আদিম মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মধ্যে নিবর্তিত হইয়াছিলেন। এই ভাবে আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারি। পূর্ণতম মানুষের রূপ লাভ না করা পর্যন্ত যে শক্তি বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা শূন্য হইতে আসিতে পারে না। এই শক্তি কোথাও না কোথাও বিদ্যমান ছিল। এবং যদি জীবকণায় গিয়া তুমি ইহার সূত্রপাত লক্ষ্য কর, তবে ঐ জীবকণাতেই নিশ্চয় সেই শক্তি বিদ্যমান ছিল।"[১] "দেহ নামধারী সেই বস্তুসমষ্টিই আত্মা নামধারী সেই শক্তির প্রকাশের কারণ, একথা এক দল বলেন।" আবার একদল বলেন যে, আত্মাই দেহের কারণ। এই দুই দলের মধ্যে আলোচনা করিয়া লাভ নাই। তাঁহারা কোনো ব্যাখ্যা দেন না। "যে সমষ্টিকে আমরা দেহ বলি বা আত্মা

উভয়ই নিহিত হইতে পারে—একটি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। তিনি প্রাচীন পাতঞ্জলির বিখ্যাত টীকাগুলি উদ্‌ধৃত করিয়া দেখান। ঐ উদ্‌ধৃতিগুলিতে "প্রকৃতিকে পূর্ণ করণের দ্বারা" এক প্রকারের সত্তার অন্য প্রকারের সত্তায় পরিবর্তিত হইবার কথা আছে।

১ তাঁহার জ্ঞানযোগ সংক্রান্ত একটি বক্তৃতায় ("সিদ্ধি", ২৯শে অক্টোবর, ১৮৯৬) বিবেকানন্দ এই উদ্‌বর্তন-নিবর্তনের ধারণাকে একটি বিস্ময়কর ও ভীতিপ্রদ রূপ দেন। তাহা ওএলসের বিপরীত উদ্‌বর্তনের অনেকখানি অনুরূপ। "আমরা যদি জন্তু-জানোয়ার হইতে উত্থিত হইয়া থাকি, তবে জন্তু-জানোয়ারও অধঃপতিত মানুষ হইতে পারে। কেমন করিয়া জানিলেন যে, তাহা নহে? আপনারা কতকগুলি

বলি, তাহার মূলে যে শক্তি রহিয়াছে, সে শক্তি কোথা হইতে আসিল?…… ইহা বলাই যুক্তিসংগত যে, যে শক্তি বস্তু দিয়া দেহ গঠন করে, সেই শক্তিই দেহের মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করে।……ইহা দেখানো সম্ভব যে, আমরা যাহাকে বস্তু বলি, তাহার কোনো অস্তিত্বই নাই। উহা কেবল শক্তিরই একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র। কি এই শক্তি, যাহা দেহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে?"… প্রাচীন কালে প্রাচীন শাস্ত্রে এই শক্তিকে, এই শক্তির প্রকাশকে, একটি জ্যোতির্ময় পদার্থ ভাবা হইত। এই জ্যোতির্ময় পদার্থ দেহের আকার ধারণ করিত এবং দেহের পতন হইলে তাহা অবশিষ্ট থাকিত। কিন্তু পরে আরও একটি উচ্চতর ধারণা আসিল যে, এই জ্যোতির্ময় দেহই শক্তিকে প্রকাশ করে না। যাহা কিছুর আকার আছে …তাহার আরও কিছু থাকা প্রয়োজন।…সেই আরও কিছুকে সংস্কৃত ভাষায় নাম দেওয়া হইল আত্মা।…এক, সর্ববাপী, এবং অসীম।"[১]

কিন্তু অসীম কিভাবে সসীম হইল? ইহা একটি অধিবিদ্যাগত[২] বিরাট সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু প্রতিভা অক্লান্তভাবে কাঠামো গড়িয়াছেন। কিন্তু সে কাঠামো ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আবার সে কাঠামোকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কারণ, অসীমকে কল্পনা করা, প্রমাণ করা, স্পর্শ করা, তাহা কেবল আরম্ভ মাত্র। উহাকে এমন একটি জিনিসের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে, যাহা উহার নিজের সূত্র অনুসারেই কখনো উহার আয়ত্তে আসিতে পারে না। খৃস্টান অধিবিদ্রা[৩] এ বিষয়ে এমন একটি বুদ্ধি-শৃঙ্খলা ও সংগতির গঠন প্রতিভাকে নিয়োগ করিয়াছেন, যাহার সহিত তাঁহাদের সহযাত্রীদের—আমাদের

ধারাবাহিক দেহ লক্ষ্য করিয়াছেন, সেগুলি ক্রমেই উন্নততর হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে আপনারা কেমন করিয়া জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন যে, উহা কেবল নিম্নতর হইতে উচ্চতর হইয়াছে, কখনও উচ্চতর হইতে নিম্নতর হয় নাই?………আমি বিশ্বাস করি যে, এই ধারাবাহিকতা বারে বারে নিচ হইতে উপরে এবং উপর হইতে নিচে উঠা-নামা করিতেছে।" গ্যেটের কতকগুলি কথা এই নূতন চিন্তাকে রঞ্জিত করিয়া তুলিতে পারে। এই কথাগুলি তাঁহার মধ্যেও প্রতিধ্বনি পাইতে পারিত। এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই উহাকে তিনি ক্রোধ ও আতঙ্কের সহিত দূরে ঠেলিয়া দিতেন।

১ জ্ঞানযোগ, ২, "মানুষের প্রকৃত প্রকৃতি" (লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা)

২ এবং অঙ্কের দিক হইতেও (পাঁস্কার-রচিত Dornieres Penseos দ্রষ্টব্য)।

৩ এখানেও গথিক গম্বুজের সেই অসীম ও সসীমের সেতু রচনার সুমহান শিল্পটি আলেকজান্দ্রিয়া ও প্রাচ্য হইতেই প্লটিনাস ও ডেনিস দি আরিওপাগিটের মধ্য দিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়।

গির্জার শ্রেষ্ঠ নির্মাতাদের—প্রতিভার সাদৃশ্য রহিয়াছে। এবং সেগুলির গঠন সৌকর্য আমার কাছে হিন্দু অধিবিদ্যাগত সৃষ্টিগুলির অপেক্ষা সুন্দরতর মনে হইয়াছে (অবশ্য, এ বিষয়ে স্থির করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে)—মাদুরার মন্দিরগুলির উপর্যুপরি স্তূপীকৃত খোদিত প্রস্তরের পুঞ্জিত শিখরগুলির সহিত তুলনা করিয়া শাত্রে বা আমিয়াঁর গির্জাগুলিকে কোনো ইউরোপীয়ানের কাছে যেমনটি মনে হয়। (তবে প্রকৃতির এই দুইটি ফসলই সমান বিরাট, তাহারা দুই ভিন্নতর মানসিক জলবায়ু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; দুই ভিন্নতর প্রকাশের নিয়ম অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে; তাহাদের কোন্‌টি দ্বিতল, কোনটি নিম্নতল সেরূপ কোনো প্রশ্নই উঠে না।)

ভারতের উত্তর হইল হিন্দু স্ফিংসের[১] উত্তর—মায়া। মায়ার যবনিকার মধ্য দিয়া আত্মার নিয়মগুলিকে প্রেরণ করিলেই "অসীম" "সসীম" হইয়া উঠে। মায়া, তাহার যবনিকা, তাহার বিভিন্ন নিয়ম এবং আত্মা, এগুলি সমস্তই "ঘটনায়" দ্রবীভূত "অদ্বৈতের অবতরণ" হইতেই উদ্ভূত হয়। ইচ্ছাশক্তি এক স্তর উপরে থাকে। অবশ্য, শোপেনহাউয়েরে[২] ইচ্ছাশক্তিকে মর্যাদার যে আসন দিতে চাহিয়াছিলেন,[৩] বিবেকানন্দ তাহাকে তাহা দেন নাই। বিবেকানন্দ ইচ্ছাশক্তিকে অদ্বৈতের দ্বারদেশে রাখিয়াছেন: সে দ্বাররক্ষী। উহা অদ্বৈতের প্রথম প্রকাশ এবং প্রথম গণ্ডী। উহা কার্যকারণের ঊর্ধ্বে যে প্রকৃত অহম্ রহিয়াছে, এবং যে মন এই দিকে বাস করিতেছে, উহা তাহাদের মিশ্র রূপ। কিন্তু কোনো মিশ্র রূপই চিরন্তন রূপ নয়। জীবিত থাকিবার ইচ্ছার মধ্যে মৃত্যুর ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সুতরাং, "অমর জীবন" কথাগুলি স্ববিরোধী। প্রকৃত চিরন্তন সত্তা জীবন ও মৃত্যুর ঊর্ধ্বে।

কিন্তু পরম সত্তা কিভাবে ইচ্ছা-শক্তির, মনের, আপেক্ষিকের, সহিত মিশ্রিত হইয়াছে? বেদান্ত হইতে বিবেকানন্দ তাহার জবাব দিয়াছেন: "উহা কখনো মিশ্রিত হয় নাই। তুমিই এই পরম সত্তা, তুমি কখনো পরিবর্তিত হও নাই। যাহা পরিবর্তিত হইতেছে, তাহা মায়া—প্রকৃত আমার এবং তোমার মধ্যে মায়ার

১ স্ফিংস্—গ্রীক পুরাণে বর্ণিত রাক্ষসী। তাহার নারীর মতো মস্তক এবং সিংহীর মতো দেহ। সে যাত্রীদিগকে একটি ধাঁধা সমাধান করিতে বলিত। যাত্রীরা ধাঁধার সমাধান করিতে না পারিলে তখন তাহাদিগকে সে হত্যা করিত।—অনুঃ।

২ শোপেনহাউয়ের—জার্মান দার্শনিক।—অনুঃ।

৩ তিনি তাঁহার "মায়া" সংক্রান্ত বক্তৃতায়—"অদ্বৈত ও তাহার প্রকাশে"—শোপেনহাউয়েরকে উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন।

যবনিকা স্থাপিত রহিয়াছে।" জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, পুরুষানুক্রমিক জীবন, সমস্ত মানবিক উদ্বর্তন, অস্তিত্বের উষাকালীন নিম্নতম স্তর হইতে প্রকৃতির অবিরাম ঊর্ধ্বগমন—এই সকল কিছুর লক্ষ্যই হইল যবনিকাকে অপসারিত করা। মন যখন সর্বপ্রথম আলোড়িত হয়, তখন সে একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের সৃষ্টি করে এবং সেই ছিদ্রপথেই অদ্বৈতের দৃষ্টি ঝরিয়া পড়ে। মন যতোই বিকশিত হয়, ছিদ্রটি ততোই বাড়িতে থাকে। এই ভাবে প্রতিদিন এই ছিদ্র হইয়া বিস্তৃততর উপরিভাগকে গ্রাস করে, অবশেষে যবনিকা বিলুপ্ত হয়, তখন অদ্বৈত ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।[১] অবশ্য, এ কথা বলা ঠিক হইবে না যে, কাল ঐ ছিদ্রপথে যাহা দেখিব, তাহা আজ ঐ ছিদ্রপথে যাহা দেখিতেছি তাহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য বা অধিকতর বাস্তব হইবে।

"বাহ্যভূমি অতীত মগন,
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর,
বাজে তথা অনাহত পদধ্বনি তব বাণী…"

এই বোধন সংগীতে আত্মা জাগ্রত হয়।…

এই বিরাট 'এক' তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিবে। "এই কথা বলিলে লোকে ভয় পায়।" "তাহারা বারে বারে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহারা কি তবে তাহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে রাখিতে পাইবে না? কিন্তু ব্যক্তিত্বটা কি, আমি তাহা দেখিতে চাই।" সমস্ত কিছুই গতিশীল, সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। পথের শেষ ভিন্ন অন্যত্র কোথাও "ব্যক্তি বলিয়া কিছু নাই।" "আমরা এখনো ব্যক্তি হইয়া উঠি নাই। আমরা ব্যক্তিত্ব লাভের জন্য যুদ্ধ করিতেছি: এবং সে-ব্যক্তিত্ব হইল 'অসীম'—আমাদের প্রকৃত স্বভাব।[২] যাহার জীবন সমগ্র বিশ্ব, সে-ই কেবল জীবিত আছে; আমরা যতোই সীমাবদ্ধ বস্তুতে নিজেকে আবদ্ধ করি, আমরা

১ "জ্ঞানযোগের ভূমিকা", সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা ও তৎপরে।

২ "অস্তিত্বহীন" ব্যক্তিত্ব ভাসিয়া যাইবে ভাবিয়া যাহারা ভয় পায়, তাহাদিগকে ভরসা দিবার সময় খৃস্টান অতীন্দ্রিয়বাদীরাও এই কথাই বলে। তাঁহার অপরূপ উচ্চাঙ্গ রীতিতে সেন্ট ডোমিনিকপন্থী শায়র্দ বলেন:

ততোই দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই। আমাদের জীবন যখন, যে মুহূর্তগুলিতে, বিশ্বময় অপর সকল কিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়, তখন, কেবল সেই মুহূর্তগুলিতেই, আমরা বাঁচিয়া থাকি। এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা মৃত্যু মাত্র এবং এই কারণেই মৃত্যুর ভয় আসে। মৃত্যুর ভয়কে কেবল তখনই জয় করা সম্ভব, যখন মানুষ বুঝে যে, যতক্ষণ এই বিশ্বে একটি মাত্র প্রাণ-ও অবশিষ্ট আছে, ততক্ষণ সে-ও জীবিত আছে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা যে মানুষকে দেখিতেছি, তাহা কেবল সীমার বাহিরে যে ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ করিবার সংগ্রাম মাত্র।...”

এই সংগ্রাম প্রাকৃতিক উদ্বর্তনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এবং এই প্রাকৃতিক উদ্বর্তন ধীরে ধীরে অদ্বৈতের প্রকাশের দিকে আগাইয়া দেয়।[১]

কিন্তু এই উদ্বর্তনবাদের সহিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন জুড়িয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। “প্রকৃতির পূরণ” বিষয়ে বিবেকানন্দ পাতঞ্জলির তত্ত্বকে গ্রহণ করেন।[২] জীবনের জন্য সংগ্রাম, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন, এগুলি প্রকৃতির নিম্নতর শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রেই কেবল সম্পূর্ণ ও বলিষ্ঠ ভাবে প্রযুক্ত হয়। সেখানে সেগুলি প্রজাতির (species) উদ্বর্তনের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তী স্তরে,—মানুষের স্তরে—সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা অগ্রগতির সাহায্য করে না, বরং তাহার অন্তরায় হইয়া উঠে। কারণ, বিশুদ্ধ বৈদান্তবাদ অনুসারে সকল অগ্রগতির লক্ষ্য ও তাহার পূর্ণ পরিণতি হইল মানবের অন্তর্নিহিত প্রকৃত স্বভাব। সুতরাং কতকগুলি বাধা ভিন্ন অন্য কিছুই ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইতে মানুষকে বিরত করিতে পারে না। মানুষ যদি ঐ সকল বাধাকে সাফল্যের সহিত এড়াইতে পারে, তবে তাহার উচ্চতম প্রকৃতি অবিলম্বে আত্মপ্রকাশ করিবে। এবং

“দিব্য প্রেম জীবকে এমনভাবে ভগবানে রূপান্তরিত করে যে, উহা ভগবত্তীকৃত সত্তার মধ্যে, দিব্য পরিপূর্ণতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তাহা হইলে-ও জীব সত্তা তাহার সত্তাকে ছাড়িয়া ফেলে না, বরং তাহার অসত্তাকে ত্যাগ করে এবং সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া বারিবিন্দু যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তেমনি উহার হ্রাস পাইবার আতঙ্ক-ও চলিয়া যায়।...উহা ভগবানের সত্তার মধ্যেই দিব্য সত্তা লাভ করে। ভগবানের অতলেই উহা তলাইয়া যায়।...উহা যেন পরিপূর্ণ রূপে জলে ভরা স্পঞ্জ, উহা সমুদ্রের বুকে ভাসিতে থাকে ; সে সমুদ্রের পরিমাণ, উচ্চতা, গভীরতা, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সবই অসীম।...” (*La Croix de Jesus*, **1647.** ব্রেম-রচিত *Mataphysique de Saints*, **II.** pp. 47 দ্রষ্টব্য।)

১ “জ্ঞান যোগ” : ২ : “মানুষের প্রকৃত প্রকৃতি।”

২ ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতায় ডারুইনবাদ প্রসংগে আলোচনাকালে বিবেকানন্দ তাঁহার এই ধারণাগুলি প্রকাশ করেন। (The Life of Swami Vivekananda, ১২শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

এ বিষয়ে মানুষের জয়লাভ শিক্ষা, আত্ম-সংস্কার, ধ্যান, অভিনিবেশ, এবং সর্বোপরি ত্যাগ ও আত্মবলির দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। এই জয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ঋষি, তাঁহারাই ভগবানের পুত্র। সুতরাং হিন্দু মতবাদ বৈজ্ঞানিক উদ্‌বর্তনবাদে বিশ্বাসী হইলে-ও মানবাত্মাকে তাহার মহান পক্ষে ভর দিয়া দ্রুত ঊর্ধ্বতম সোপানে গিয়া উপনীত হইতে এবং তদ্দ্বারা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ধীর পদক্ষেপে ঊর্ধ্বে উঠিবার হাত হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি পাইতে সুযোগ দেয়।[১] এই সমগ্র রীতির দার্শনিক সম্ভবপরতা বা যে মায়ার অদ্ভুত প্রকল্পের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করি বা না করি, তাহাতে কিছু আসে যায় না—এই ব্যাখ্যাটি নিঃসংশয়ে চিত্তাকর্ষক এবং ইহার সহিত সার্বজনীন অনুভূতির কতিপয় কুহেলীগ্রস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সাদৃশ্যও আছে। কিন্তু ব্যাখ্যাটিও ব্যাখ্যার দাবী রাখে। অথচ কেহ এই ব্যাখ্যা করেন নাই, বা কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। প্রত্যেকেই শেষ আশ্রয় হিসাবে এই যুক্তিটিতে আসিয়া উপনীত হন: "আমি অনুভব করি, ইহা এইরূপ। তুমি ঐরূপ অনুভব কর না?"[২] হ্যাঁ, করি। জাজ্বল্যমান সুস্পষ্টতার সহিত আমি-ও প্রায়ই এই

---

১ কলিকাতার চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট বিবেকানন্দ এই উক্তিটি করেন। উক্তিটি শুনিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভদ্রলোক খুবই বিস্মিত হন। ঐদিন সন্ধ্যায় আবার বলরামবাবুর বাড়িতে একদল বন্ধুর কাছে তিনি ঐ বিষয়ে আলোচনা করেন। ডারুইনবাদ কেবল জন্তু-জানোয়ার ও উদ্‌ভিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও মানুষের ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য নহে, এ কথা সত্য কিনা এবং তাহাই যদি সত্য হয়, তবে তিনি তাঁহার বক্তৃতা অভিযানগুলিতে ভারতীয়দের বস্তুগত অবস্থার উন্নতি বিধানের সর্বপ্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বারে বারে কেন বলিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি তাঁহার অভ্যাসমতো আবেগময় রোষে ফাটিয়া পড়েন: "তোমরা কি মানুষ? তোমরা জন্তু-জানোয়ারের অপেক্ষা কোনো অংশে ভালো নও; তোমরা খাইয়া, ঘুমাইয়া, জন্ম দিয়া সন্তুষ্ট থাকো, ভয়ে কাঁপিতে থাকো! তোমাদের মধ্যে যদি একটু বিচারবুদ্ধি থাকিত, তবে এতোদিনে তোমরা চারিপায়ে হাঁটিতে আরম্ভ করিতে! তোমাদের ওই সমস্ত বৃথা আস্ফালন ও তত্ত্ব প্রভৃতিকে ছাড়িয়া ফেলিয়া তোমরা তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজ ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে শান্ত চিত্তে ভাবিয়া দেখ। তোমাদের মধ্যে জান্তব প্রকৃতি অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই আমি তোমাদিগকে প্রথমে টিকিয়া থাকিবার যুদ্ধে জয়ী হইতে চেষ্টা করিতে, তোমাদের দেহগুলিকে সুগঠিত করিয়া তুলিতে, শিক্ষা দিতে চাই। তাহা হইলে তোমরা আরো ভালোভাবে তোমাদের মনের সহিত যুঝিতে পারিবে। আমি বারে বারে বলিয়াছি, দেহের দিক হইতে যাহারা দুর্বল, তাহারা কখনো আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। একবার মনকে বশে আনিতে পারিলে মানুষ নিজের আত্মাকে-ও বশে আনিতে পারে। তখন দেহ দুর্বল হইল, কি শক্তিশালী হইল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, তখন মনের উপর দেহের আর প্রাধান্য থাকে না।..."

২ এখানে শাঁসটি—অসীমের ও মায়ার "অভিজ্ঞতাটি" রহিয়াছে। বাকীটা বাহিরের খোসা মাত্র;

আপাতদৃষ্ট বিশ্বের অবাস্তবতাকে, যেখানে এরিয়েলের মতো ভংগীতে লিলুলি নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে,[১] সেই সূর্যালোক-স্নাত উর্ণনাভের জালকে, এই লীলাকে, এই হাস্যময়ী মায়াকে অনুভব করি—প্রত্যক্ষ করি এই যবনিকাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ যবনিকার মধ্য দিয়া আমি দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়াছি; শৈশব হইতে কেবল আমি গোপনে দুরু দুরু বক্ষে ঐ ছিদ্রকে অঙ্গুলি দিয়া বৃহত্তর করিয়াছি। কিন্তু ইহাকে আমি প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করিতে চাহি না। উহা এক দিব্য দৃষ্টি। ঐ দৃষ্টি অন্য কাহাকে-ও দিতে গেলে তৎপূর্বে তাহাকে আমার চক্ষু-ও দিতে হইবে। মায়া বা প্রকৃতি (নামে কি আসে যায় ?) প্রত্যেক মানুষকে তাহার নিজের চক্ষু দিয়াছেন। আমরা ঐ চক্ষুগুলিকে আমার, আপনার বা তোমার, যাহারই বলি না কেন, ঐ চক্ষুগুলি মায়ারই—সেগুলি মায়ার আলোকরশ্মিতে আচ্ছন্ন। আমি নিজে কোনো বিশেষ অধিকারে অধিকারী একথা বলিবার মতো নিজের প্রতি আগ্রহ আর আমার নাই। আমি আমার চক্ষুকে এবং সে চক্ষু যাহা দেখে, তাহাকে যেমন ভালোবাসি, তুমি-ও তেমনি তোমার চক্ষুকে এবং সে চক্ষু যাহা দেখে তাহাকে ভালোবাসো। সেগুলিকে আমার চক্ষুর মতোই উন্মুক্ত থাকিতে দাও!

ধর্মের বিজ্ঞান যদি নিজেকে কেবল তত্ত্ব ও আচার-অনুষ্ঠানের গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, তবে তাহা ভুল পথে চলিয়াছে। তত্ত্ব ও ধর্মমতগুলির প্রভাব কেন এক দল মানুষ হইতে আরেক দল মানুষে প্রসারিত হইয়াছে? কারণ, তাহারা কতকগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফিলো, প্লটিনাস এবং প্রথম যুগের খৃস্টানদের মতবাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু ফিলো, প্লটিনাস ও প্রথম যুগের খৃস্টানরা যে একই রূপ "আলোকে" সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, উহা হইতে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। কৌতূহলের প্রধান বিষয়টি হইল এই যে, এই সকল ধর্মীয় "অভিজ্ঞতাগুলি" বিভিন্ন জাতির ও কালের মানুষের মধ্যে প্রায়ই একই ভংগীতে হইয়া থাকে। এই সকল অভিজ্ঞতার মূল্য কি, তাহা কিভাবে নির্ধারিত করা সম্ভব? সম্ভবত একটি নূতন মনোবিজ্ঞানের দ্বারা, যাহার আধুনিক মনসমীক্ষা ও তাহার বংশধরদের অসম্পূর্ণ স্থূল রীতিগুলি অপেক্ষা বিশ্লেষণের জন্য অধিকতর নমনীয় ও সূক্ষ্মতর কোনো যন্ত্র রহিয়াছে। ভাগবত তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া নিশ্চয় নয়। প্লটিনাস বা ডেনিসের মতবাদগুলির চিন্তা-স্থাপত্য হিসাবে মূল্য আছে, তবে উহা লইয়া মতভেদ ঘটিতে পারে। কিন্তু এই স্থাপত্য অবশেষে সকল সময়েই অসীমের অনুভূতিতে এবং উহাকে একটি উপযুক্ত মন্দির গড়িয়া দিবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়াসগুলিতে ফিরিয়া যায়। বুদ্ধিগত সমালোচনা কেবলমাত্র গির্জার উপরের কাঠামোতে গিয়া পৌঁছে। উহা ভিত ও খিলানকে স্পর্শ করে না।

১ এখানে রোম্যা রোঁলার আরিস্টফেনিসীয় কায়দায় রচিত "লিলুলি" নাটকের কথা বলা হইয়াছে। লিলুলি "মায়ার" প্রতীক।

সুতরাং, আমার ইউরোপীয় বন্ধুগণ, ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আমি আপনাদের কাছে কোনো বিশেষ রীতির সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি না। কারণ, সকল রীতিই মানুষের রীতি। সুতরাং সেগুলি প্রকল্প (hypothesis) মাত্র। তবে আমি আশা করি, এই প্রকল্পের মহিমান্বিত রূপটি আমি আপনাদিগকে দেখাইয়াছি। এবং ইহা-ও দেখাইয়াছি, বিশ্বের অধিবিদ্যাগত ব্যাখ্যা হিসাবে উহার মূল্য যাহাই হউক, তথ্যের জগতে উহার সহিত আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলির কোনো বিরোধিতা নাই।

সার্বজনীন বিজ্ঞান-ধর্ম

সত্যই, ধর্ম বলিতে বিবেকানন্দ যাহা বুঝিতেন, তাহার পক্ষগুলি এমন সুবিশাল ছিল যে, তাহা স্থির হইয়া বসিয়া মুক্ত আত্মার সকল ডিম্বগুলির উপরই তা দিতে পরিত। জ্ঞানের অকপট ও প্রকৃতিস্থ রূপগুলির কোনো অংশকেই বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার নিকট ধর্ম ছিল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতিবেশী এবং ধর্মের একমাত্র শত্রু ছিল অসহিষ্ণুতা।

"ধর্মের সকল প্রকার সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ ও সংগ্রামশীল ধারণাকে ত্যাগ করিতে হইবে।...বিশ্বে যাহা কিছু রহিয়াছে, যাহা কিছু শ্রেয় এবং মহৎ, তাহাই ভাবী ধর্মের আদর্শের মধ্যে স্থান পাইবে এবং সেই সংগে ভবিষ্যতে ঐ সকল আদর্শের বিকাশের-ও অসীম সুযোগ থাকিবে। অতীতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহার সংরক্ষণ করিতে হইবে; এবং ভাণ্ডারে যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার সহিত ভবিষ্যতে আরও কিছু যাহাতে সংযুক্ত হইতে পারে, সেজন্য ভাণ্ডারের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। ধর্মগুলিকে (এই নামের মধ্যে বিজ্ঞান-ও পড়ে) সর্বগ্রাহী হইতে হইবে। ভগবান সম্পর্কে অপর কোনো ধর্মের ধারণা ভিন্নরূপ বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করা চলিবে না। আমি আমার জীবনে বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে, বহু মহাত্মাকে দেখিয়াছি, যাঁহারা ভগবানে বিশ্বাসই করেন না। হয়তো তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা ভগবানকে ভালো করিয়া বুঝেন। সাকার ভগবান, নিরাকার ভগবান, অসীম ভগবান, নৈতিক নিয়ম, আদর্শ পুরুষ—এ সমস্তই ধর্মের সূত্রের মধ্যে পড়িয়াছে।"[১]

বিবেকানন্দের নিকট "ধর্ম" কথাটি মনোভাবের "সার্বজনীনতার" সহিত একার্থক ছিল। "ধর্মীয় ভাবগুলি যতোদিন পর্যন্ত এই সার্বজনীনতায় গিয়া পৌঁছিতে না পারে, ততোদিন ধর্মের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নহে। কারণ, ধর্ম কি যাহারা জানে না, তাহারা যেমনটি বিশ্বাস করে, ধর্ম আসলে সেরূপ নহে—ধর্ম যাতোখানি অতীতের বস্তু, তাহার অপেক্ষা তাহা অধিক পরিমাণে ভবিষ্যতের বস্তু। ধর্মের কেবল মাত্র সূত্রপাত হইয়াছে।

১ "ধর্মের প্রয়োজনীয়তা"।

"...অনেক সময় বলা হয় যে, ধর্মগুলি মরিয়া যাইতেছে, আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি মরিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, সেগুলি কেবল মাত্র জন্মিতে শুরু করিয়াছে।...ধর্ম যতদিন মুষ্টিমেয় নির্বাচিত কয়েক জনের হস্তে বা একদল পুরোহিতের হস্তে ছিল, ততোদিন তাহা মন্দিরে, গির্জায়, পুঁথিতে, মতবাদে, অনুষ্ঠানে, প্রথায় ও পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমরা যখন ধর্মের প্রকৃত, আধ্যাত্মিক, সার্বজনীন ধারণাটি লাভ করিব, তখনই, কেবল তখনই, ধর্ম সজীব ও বাস্তব হইয়া উঠিবে। তাহা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিবে; আমাদের প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে বাস করিবে; আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবে এবং তাহা অসীম মঙ্গল সাধনের শক্তির অধিকারী হইবে; এমনটি ইতিপূর্বে কখনো হয় নাই।"[১]

আমাদের সম্মুখে যে কর্তব্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহা হইল এক খণ্ড জমি লইয়া মামলায় মত্ত দুই ভাইএর মধ্যে মিলন ঘটাইয়া দেওয়া—কারণ, ঐ জমির পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তাহাদের উভয়ের মিলিত শ্রমের প্রয়োজন—এই দুই ভাই হইল বিজ্ঞান ও ধর্ম। "বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে...মানসিক ঘটনাগুলির পর্যালোচনার ফলে যে সকল বিভিন্ন ধর্মীয় ধারণার প্রকাশ ঘটিয়াছে, সেগুলির মধ্যে—দুঃখের বিষয় এইরূপ পর্যালোচনাকে কেবল 'ধর্ম' নামেই অভিহিত করা হয়—এবং যে ধর্মের উন্নত শির...স্বর্গের গুপ্ত রহস্যকে ভেদ করিতেছে...সেই তথাকথিত বস্তুবাদী বিজ্ঞানের—প্রকাশগুলির মধ্যে একটি সৌভ্রাত্র্য গড়িয়া তোলা অবিলম্বে প্রয়োজন।"[২]

এক ভাইয়ের সুবিধার জন্য অন্য ভাইকে ভাগাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া কোনো লাভ নাই। বিজ্ঞান বা ধর্ম, কোনটিকেই বাদ দেওয়া চলে না।

"বর্তমানে ইউরোপে বস্তুবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তোমরা আধুনিক সংশয়ীদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে পারো। কিন্তু তাহাতে তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে না, তাহারা চায় যুক্তি।"[৩]

তবে এই সমস্যার সমাধান কি? দুই ভাইয়ের মধ্যে একটি আপোসের রীতি

১ পূর্বোক্ত স্থল।

২ পূর্বোক্ত স্থল।

৩ "অদ্বৈত ও তাঁহার প্রকাশ", বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ।

আবিষ্কার করিতে হইবে। মানুষের ইতিহাস বহু অংশেই তাহা আবিষ্কার করিয়াছে; কিন্তু বিস্মৃতিপরায়ণ মানুষ সহজেই বিস্মৃত হয়; তাই তাহার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কাগুলিকে পুনরাবিষ্কার করিতে বহু মূল্য দিতে হয়।

"একটি যুক্তিবাদী ধর্মের উপর ইউরোপের মুক্তি নির্ভর করে।"

এবং সেরূপ ধর্ম আছে-ও। তাহা ভারতের অদ্বৈতবাদ, এক, পরম ও নিরাকার ভগবানের ধারণা।[১] ইহাই "একমাত্র ধর্ম, যাহা বুদ্ধিবাদী মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।"

"অদ্বৈতবাদ দুইবার ভারতকে বস্তুবাদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। বুদ্ধের আগমনের মধ্য দিয়া…এক বীভৎস ও ব্যাপক বস্তুবাদের যুগে বুদ্ধের আর্বিভাব ঘটিয়াছিল…এবং শংকরের আগমনের মধ্য দিয়া…দুর্নীতিপরায়ণ শ্রেণী শাসন ও নিম্ন স্তরের কুসংস্কারের আকারে বস্তুবাদ যখন ভারতকে গ্রাস করিয়াছিল, তখন শংকর বেদান্তের মধ্য হইতে এক যুক্তিবাদী দর্শনকে বাহির করিয়া বেদান্তের মধ্যে এক নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন।" "আমরা আজ বুদ্ধিবৃত্তির সূর্যকে বুদ্ধের সেই প্রেম ও করুণার আশ্চর্য অসীম হৃদয়ের সতি সংযুক্ত করিয়া পাইতে চাই। এই মিলনের ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনের সৃষ্টি হইবে। বিজ্ঞান ও ধর্ম মিলিত হইয়া করমর্দন করিবে। কাব্য ও দর্শনের মধ্যে বন্ধুত্ব ঘটিবে। ইহাই হইবে ভাবী কালের ধর্ম; আমরা যদি এইরূপ একটি ধর্মকে গড়িয়া তুলিতে পারি। তবে নিঃসংশয়ে তাহা সকল কালের সকল জাতির ধর্ম হইয়া উঠিবে। এবং ইহা এমন একটি পথ, যাহা আধুনিক বিজ্ঞানের নিকট-ও গ্রহণযোগ্য হইবে। কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় এই পথেই আসিয়া পড়িয়াছে। যখন কোনো বিজ্ঞানের শিক্ষক বলেন যে, সকল বস্তু একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, তখন কি সেই উপনিষদে বর্ণিত ভগবানের কথাই মনে পড়ে না: এক অগ্নিই যেমন বিশ্বের আকারে আত্মপ্রকাশ করেন, একই আত্মা-ও তেমনি প্রত্যেক আত্মার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিতেছেন, এবং তাহা আরও বহু গুণে?"[২]

১ সাধারণত ভারতীয়েরা যে ভুলটি করেন, বিবেকানন্দও তাহাই করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছেন যে, অদ্বৈত কেবল ভারতীয়দেরই সম্পত্তি। খৃস্টান অধিবিদ্যার এবং প্রাচীন জগতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দর্শনের মূল ভিত্তিই হইল অদ্বৈত। আশা করি, ভারতবর্ষ দিব্য অদ্বৈতের এই অন্যতর প্রকাশগুলিকে দেখিবে এবং তাহার আপনার ভাবের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে।

২ "অদ্বৈত ও তাঁহার প্রকাশ", বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৪১ পৃঃ।

অদ্বৈতকে বিজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু সংযোগের ফলে অদ্বৈত বিজ্ঞানের নিকট কিছুমাত্র আত্মসমর্পণ করিবে না এবং বিজ্ঞান তাহার বাণী বদলাক, এইরূপ দাবী-ও করিবে না। অদ্বৈত ও বিজ্ঞান উভয়ে যে মূলনীতি-গুলিকে মানিয়া চলে, সেগুলিকে স্মরণ করা যাক্ :

"যুক্তির প্রথম মূলনীতি হইল এই যে, যতোক্ষণ না আমরা বিশ্বগত কোনো ব্যাখ্যায় পৌঁছিতে পারি, ততোক্ষণ বিশেষকে সাধারণের দ্বারাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা হইল এই যে, কোনো বস্তুর ব্যাখ্যা বাহির হইতে নহে, ভিতর হইতেই আসিবে।...এই দুই মূলনীতিই অদ্বৈতের মধ্যে পাওয়া যায়।"[১] এবং অদ্বৈত এই দুই মূলনীতিকে তাহার স্বনির্বাচিত ক্ষেত্রে অনুসরণ করে। "ইহা উহাকে চরম সাধারণীকরণের দিকে ঠেলিয়া দেয়" এবং ঐক্যকে কেবল উহার বিকিরণের এবং পরীক্ষা হইতে যুক্তির দ্বারা লব্ধ ফলের মধ্যে নহে, উহার নিজের মধ্যে, উহার নিজের উৎসের মধ্যে, আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়া দাবী করে। এখন তোমাদের কর্তব্য হইল উহার পর্যবেক্ষণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা। উহা নিয়ন্ত্রণকে এড়াইয়া চলে না, বরং উহা নিয়ন্ত্রণেরই সন্ধান করে। কারণ, যে সমস্ত ধর্মীয় শিবির নিজেদের আবিষ্কারের রহস্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে, উহা তাহাদের মধ্যে পড়ে না। উহার দরজা-জানালাগুলি সবলের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে। এস, দেখ! হইতে পারে, উহা ভুল—হইতে পারে, তোমার-ও ভুল,—হইতে পারে, আমাদের সবারই ভুল। কিন্তু উহা ভুল হউক কি না হউক, উহা একই ভিত্তির উপর একই প্রসাদ গড়িয়া তুলিতে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে।

*

ঐক্যবন্ধন উহার উদ্দেশ্য হইলে-ও, পরস্পরকে বুঝিবার পক্ষে উহার তলদেশে যে অন্তরায় রহিয়াছে—মানব জাতির মিলনের প্রধান অন্তরায়,—তাহা হইল "ভগবান" এই শব্দটি। কারণ, এই শব্দটির মধ্যে চিন্তার সকল প্রকার দ্ব্যর্থকতাই আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং এই শব্দটি যুক্তির স্বচ্ছ চক্ষুকে কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া দেয়। বিবেকানন্দ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন।..."আমাকে লোকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'আপনি "ভগবান" এই পুরাতন শব্দটি ব্যবহার করেন কেন?'

১ "যুক্তি ও ধর্ম", সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ৩৭২-৭৩ পৃ।

করি, কারণ, এই শব্দটি আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী।[১]…কারণ, এই শব্দটিকেই কেন্দ্র করিয়া মানুষের সকল আশা, ভরসা, আনন্দ ঘিরিয়া আছে। এখন এই শব্দটিকে পরিবর্তন করা অসম্ভব। এই ধরণের শব্দগুলি শ্রেষ্ঠ ঋষিরাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সকল শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিতেন। কিন্তু এই সকল শব্দ যখন সমাজে চালু হইল, তখন অজ্ঞান লোকে-ও এই সকল শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিল এবং ফল হইল এই যে, শব্দগুলি তাহাদের নিজ নিজ গৌরব ও মহিমা হারাইল। স্মরণাতীত কাল হইতে ভগবান কথাটি ব্যবহৃত হইতেছে। বিশ্বগত বুদ্ধি এবং যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র, তাহারই ধারণা এই শব্দটির সহিত জড়িত রহিয়াছে। আমরা যদি এই শব্দটিকে ত্যাগ করি, তবে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করিবে, ফলে ভাষার বিভ্রাট ঘটিবে, সৃষ্টি হইবে বেবেলের এক নূতন মিনারের। "পুরাতন শব্দই ব্যবহার কর, কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া উহার প্রকৃত অর্থে উহাকে ব্যবহার কর, পূর্ণরূপে উপলব্ধি কর, এই মহান প্রাচীন শব্দটির অর্থ কি।…দেখিবে, এই শব্দগুলির সহিত সংখ্যাতীত মহিমা ও শক্তিময় ভাব জড়িত রহিয়াছে; কোটি কোটি মানুষ সেগুলির ব্যবহার করিয়াছে, পূজা করিয়াছে, মানব প্রকৃতির যাহা কিছু উচ্চতম, যাহা কিছু মহত্তম, যাহা কিছু যুক্তিগত, যাহা কিছু আদরণীয়, যাহা কিছু মহৎ ও সমারোহময় সেগুলির সহিত জড়িত করিয়াছে।…"

বিবেকানন্দ আমাদের জন্য বিশেষভাবে বলেন যে, উহা হইল উহার নিজের কেন্দ্রে সংহত "বিশ্বময়" প্রকাশিত সকল বুদ্ধির সমষ্টিগত রূপ। "এবং বস্তু, চিন্তা, শক্তি প্রভৃতি বিশ্বগত শক্তির সমস্ত বিভিন্ন রূপই এই বিশ্বগত বুদ্ধিরই প্রকাশ মাত্র।"[২]

এই "বিশ্বগত বুদ্ধি-ই" বৈজ্ঞানিক যুক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। প্রধান পার্থক্য হইল এই যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উহা এক খণ্ড যন্ত্র মাত্র হইয়া থাকে। অন্য পক্ষে, বিবেকানন্দ উহার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। পিগম্যালিয়নের মূর্তি সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি পণ্ডিতরা একযোগে ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে বৈজ্ঞানিক-

১ বিবেকানন্দ তাঁহার "উদ্দেশ্যের" যে শেষ সূত্রটি দিয়াছিলেন, তাহা এই পরিচ্ছেদের শেষে পাঠকরা পাইবেন।

২ "জ্ঞানযোগ"—"বিশ্বলোক", নিউইয়র্ক, ১৯শে জানুয়ারি, ১৮৯৬।

অদ্বৈতকে বিজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু সংযোগের ফলে অদ্বৈত বিজ্ঞানের নিকট কিছুমাত্র আত্মসমর্পণ করিবে না এবং বিজ্ঞান তাহার বাণী বদলাক, এইরূপ দাবী-ও করিবে না। অদ্বৈত ও বিজ্ঞান উভয়ে যে মূলনীতি-গুলিকে মানিয়া চলে, সেগুলিকে স্মরণ করা যাক্ :

"যুক্তির প্রথম মূলনীতি হইল এই যে, যতোক্ষণ না আমরা বিশ্বগত কোনো ব্যাখ্যায় পৌঁছিতে পারি, ততোক্ষণ বিশেষকে সাধারণের দ্বারাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা হইল এই যে, কোনো বস্তুর ব্যাখ্যা বাহির হইতে নহে, ভিতর হইতেই আসিবে।...এই দুই মূলনীতিই অদ্বৈতের মধ্যে পাওয়া যায়।"[১] এবং অদ্বৈত এই দুই মূলনীতিকে তাহার স্বনির্বাচিত ক্ষেত্রে অনুসরণ করে। "ইহা উহাকে চরম সাধারণীকরণের দিকে ঠেলিয়া দেয়" এবং ঐক্যকে কেবল উহার বিকিরণের এবং পরীক্ষা হইতে যুক্তির দ্বারা লব্ধ ফলের মধ্যে নহে, উহার নিজের মধ্যে, উহার নিজের উৎসের মধ্যে, আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়া দাবী করে। এখন তোমাদের কর্তব্য হইল উহার পর্যবেক্ষণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা। উহা নিয়ন্ত্রণকে এড়াইয়া চলে না, বরং উহা নিয়ন্ত্রণেরই সন্ধান করে। কারণ, যে সমস্ত ধর্মীয় শিবির নিজেদের আবিষ্কারের রহস্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে, উহা তাহাদের মধ্যে পড়ে না। উহার দরজা-জানালাগুলি সকলের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে। এস, দেখ! হইতে পারে, উহা ভুল—হইতে পারে, তোমার-ও ভুল,—হইতে পারে, আমাদের সবারই ভুল। কিন্তু উহা ভুল হউক কি না হউক, উহা একই ভিত্তির উপর একই প্রসাদ গড়িয়া তুলিতে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে।

ঐক্যবন্ধন উহার উদ্দেশ্য হইলে-ও, পরস্পরকে বুঝিবার পক্ষে উহার তলদেশে যে অন্তরায় রহিয়াছে—মানব জাতির মিলনের প্রধান অন্তরায়,—তাহা হইল "ভগবান" এই শব্দটি। কারণ, এই শব্দটির মধ্যে চিন্তার সকল প্রকার দ্ব্যর্থকতাই আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং এই শব্দটি যুক্তির 'স্বচ্ছ' চক্ষুকে কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া দেয়। বিবেকানন্দ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন।..."আমাকে লোকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'আপনি "ভগবান" এই পুরাতন শব্দটি ব্যবহার করেন কেন?'

১ "যুক্তি ও ধর্ম", সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ৩৭২-৭৩ পৃষ্ঠা।

করি; কারণ, এই শব্দটি আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী।[১]…কারণ, এই শব্দটিকেই কেন্দ্র করিয়া মানুষের সকল আশা, ভরসা, আনন্দ ঘিরিয়া আছে। এখন এই শব্দটিকে পরিবর্তন করা অসম্ভব। এই ধরণের শব্দগুলি শ্রেষ্ঠ ঋষিরাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সকল শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিতেন। কিন্তু এই সকল শব্দ যখন সমাজে চালু হইল, তখন অজ্ঞান লোকে-ও এই সকল শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিল এবং ফল হইল এই যে, শব্দগুলি তাহাদের নিজ নিজ গৌরব ও মহিমা হারাইল। স্মরণাতীত কাল হইতে ভগবান কথাটি ব্যবহৃত হইতেছে। বিশ্বগত বুদ্ধি এবং যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র, তাহারই ধারণা এই শব্দটির সহিত জড়িত রহিয়াছে। আমরা যদি এই শব্দটিকে ত্যাগ করি, তবে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করিবে, ফলে ভাষার বিভ্রাট ঘটিবে, সৃষ্টি হইবে বেবেলের এক নূতন মিনারের। "পুরাতন শব্দই ব্যবহার কর, কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া উহার প্রকৃত অর্থে উহাকে ব্যবহার কর, পূর্ণরূপে উপলব্ধি কর, এই মহান প্রাচীন শব্দটির অর্থ কি।…দেখিবে, এই শব্দগুলির সহিত সংখ্যাতীত মহিমা ও শক্তিময় ভাব জড়িত রহিয়াছে; কোটি কোটি মানুষ সেগুলির ব্যবহার করিয়াছে, পূজা করিয়াছে, মানব প্রকৃতির যাহা কিছু উচ্চতম, যাহা কিছু মহত্তম, যাহা কিছু যুক্তিগত, যাহা কিছু আদরণীয়, যাহা কিছু মহৎ ও সমারোহময় সেগুলির সহিত জড়িত করিয়াছে।…"

বিবেকানন্দ আমাদের জন্য বিশেষভাবে বলেন যে, উহা হইল উহার নিজের কেন্দ্রে সংহত "বিশ্বময়" প্রকাশিত সকল বুদ্ধির সমষ্টিগত রূপ। "এবং বস্তু, চিন্তা, শক্তি প্রভৃতি বিশ্বগত শক্তির সমস্ত বিভিন্ন রূপই এই বিশ্বগত বুদ্ধিরই প্রকাশ মাত্র।"[২]

এই "বিশ্বগত বুদ্ধি-ই" বৈজ্ঞানিক যুক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। প্রধান পার্থক্য হইল এই যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উহা এক খণ্ড যন্ত্র মাত্র হইয়া থাকে। অন্য পক্ষে, বিবেকানন্দ উহার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। পিগম্যালিয়নের মূর্তি সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি পণ্ডিতরা একযোগে ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে বৈজ্ঞানিক-

---

১ বিবেকানন্দ তাঁহার "উদ্দেশ্যের" যে শেষ সূত্রটি দিয়াছিলেন, তাহা এই পরিচ্ছেদের শেষে পাঠকরা পাইবেন।

২ "জ্ঞানযোগ"—"বিশ্বলোক", নিউইয়র্ক, ১৯শে জানুয়ারি, ১৮৯৬।

ভাবে প্রমাণিত হয় নাই, এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত করিলে-ও সে সিদ্ধান্ত যে অবৈজ্ঞানিক, এমন কোনো কথা নাই। ইহা বলা সহজ যে, পিগম্যালিয়ন মূর্তিটিকে সেই ভাবে গড়িয়াছিলেন, যে ভাবে মূর্তিটি পিগম্যালিয়নকে গড়িয়াছিল। যাহাই হউক, তাহারা উভয়েই একই কারখানা হইতে বাহির হইয়াছিল; যদি একটির মধ্যে জীবন থাকিত এবং অন্যটি যন্ত্রমাত্র হইত, তবে সত্যই তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইত। মানব বুদ্ধি বলিলে বিশ্ব বুদ্ধিকেও (উচ্চতর স্তরে, যেখানে উহা প্রমাণ করিতে বা অস্বীকার করিতে পারে না) বুঝায়। বৈজ্ঞানিক গুণের দিক হইতে বিবেকানন্দের মতো কোনো পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তির যুক্তিকে "অসীমের যুক্তি", যাহা বিজ্ঞানের একাংশকে স্বীকার করে বা জ্যারি পঁয়কার যাহাকে ক্যাণ্টরিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে খুব ভিন্নতর বলিয়া আমার মনে হয় না।

*   *   *   *

মুক্ত ধর্ম বলিতে বিবেকানন্দ যাহা বুঝিতেন, তাহাকে বিজ্ঞান গ্রহণ করুক বা না করুক, যিনি নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করিতেন সেই বিবেকানন্দের প্রশান্ত দম্ভকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই; কারণ, তাঁহার ধর্ম বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম এমন বিশাল যে, সত্যের সকল বিশ্বস্ত সন্ধানীকেই সে তাহার সহিত একাসনে স্থান দিতে পারে। ধর্ম তাহার নিজস্ব সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখে বটে, কিন্তু উহা সকলের স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে, অবশ্য, সেখানে যদি পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা থাকে। বিবেকানন্দের অন্যতম সুন্দরতম স্বপ্নটি ছিল একটি "সার্বজনীন ধর্মকে" জাগাইয়া তোলা।[১] এই বিষয়েই তিনি তাঁহার জ্ঞানযোগের শেষ প্রবন্ধগুলি লেখেন।

পাঠক এখন বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানিয়াছেন। চিন্তার যে টেলরিজম্ নিজের রঙকে বিশ্বের ইন্দ্রধনুর উপর চাপাইতে চায়, বা যেহেতু শাদা রঙের মধ্যে অন্য সকল রঙগুলি আছে, সেই হেতু সেগুলির পরিবর্তে কেবল শাদা রঙকেই চালাইতে চেষ্টা করে, পাঠক তাঁহার মধ্যে তেমন কিছুই পাইবেন না। প্রকার ভেদের অভাব ছিল তাঁহার নিকট মৃত্যু। ধর্মের ও ধারণার বিপুল বৈচিত্র্যই

১ ১, "সার্বজনীন ধর্মকে বাস্তবে পরিণত করার উপায়"; ২, "সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ।" (১৯০০-১ এর জানুয়ারিতে ক্যালিফর্নিয়া, পাসাডেনায় এবং ১৮৯৬-এ ডেট্রয়টে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী)।

তাঁহাকে আনন্দ দিত। তিনি চাহিতেন, ধর্ম ও ধারণাগুলি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইতে থাকুক।...

"আমি শ্মশানের মতো দেশে বাস করিতে চাহি না: আমি মানুষের জগতে মানুষ হইতে চাই।...বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ।...পার্থক্যই চিন্তার প্রথম চিহ্ন।... আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সেগুলির (সম্প্রদায়গুলির) সংখ্যা ক্রমেই এমন ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকুক, যেন অবশেষে প্রত্যেক মানুষ এক একটি পৃথক সম্প্রদায় হইয়া উঠে।...কেবল প্রবহমান জীবন্ত স্রোতধারাতেই ঘূর্ণী ও আবর্ত্ত বর্তমান থাকে।...চিন্তার সংঘাতই চিন্তাকে জাগ্রত করে।...ধর্মে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চিন্তার রীতি থাকুক্।...উহা আছে-ও। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে চিন্তা করিতেছি। কিন্তু এই স্বাভাবিক পথটিকে সর্বদাই রুদ্ধ করা হইয়াছে এবং এখনো রুদ্ধ করা হইতেছে।"

সুতরাং মানুষের আত্মাকে খনন করিতে হইবে। আমার ভ্যালে অঞ্চলের প্রতিবেশীরা যখন জমিকে সিক্ত করিতে চান, তখন তাঁহারা বলেন, আবার "বাইসেস"[১] খুলিয়া দাও। তৃষ্ণার্ত ভ্যালেতে যখন জলের ব্যয় সংকোচ করিতে হয়, তখন পালা করিয়া কলসীগুলি এক হাত হইতে অন্য হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু আত্মাকে খুলিয়া দেওয়ার সহিত বাইসেস খুলিয়া দেওয়ার পার্থক্য আছে।... আত্মার বারিতে কখনো অভাব ঘটে না। উহা চারিদিকে ঝরিয়া পড়ে। যাহারা ধর্ম মানে না, তাহারা যুক্তির সাধারণ ধর্মের নামে যতোই আত্ম-প্রতারণা করিতে চা'ক না কেন, পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মেই জীবনের এক একটি শক্তিমান ভাণ্ডার থাকে এবং জীবন সেখানে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। বিবেকানন্দ বলেন, সম্ভবত একমাত্র জরথুস্ত্রবাদ ছাড়া আর কোনো ধর্মই বিগত বিংশ শতাব্দীর মধ্যে বিনষ্ট হয় নাই। (জরথুস্ত্রবাদের বিনষ্টির সম্বন্ধে কি তিনি এতোই নিঃসংশয় ছিলেন? না, এবিষয়ে তাঁহার ভুল হইয়াছিল।)[২] বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খৃস্টান ধর্ম, সবগুলিই সংখ্যায় ও গুণের দিক হইতে বাড়িয়াছে। (তাহাছাড়া বিজ্ঞানের মুক্তির ও মানবিক সংঘবদ্ধতার ধর্ম-ও বাড়িতেছে।) মানুষের মধ্যে যাহা কমিতেছে,

১ ইহা সুইজারল্যাণ্ডের কৃষকদের দ্বারা ব্যবহৃত একপ্রকার সেচ ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক কৃষক পালা করিয়া মাঠে ছাড়ে।

২ গত কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত মনোরম ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি'-তে (জানুয়ারি, ১৯২৯) ডাঃ জে, জি, এস, তারাপুরওয়ালার একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লেখক "এণীয়

তাহা হইল মানসিক মৃত্যু, প্রগাঢ় অন্ধকার, চিন্তার অস্বীকার, আলোকের অনুপস্থিতি : ক্ষীণতম রশ্মি হইল বিশ্বাস। যদি-ও এ সম্পর্কে উহার চেতনা নাই। ধর্ম বা ধর্মেতর সকল শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসের রীতিই "বিশ্ব সত্যের একটি অংশকে প্রকাশ করে এবং সেই সত্যকে একটি বিশেষ ধরণে রূপান্তরিত করিবার জন্য উহার শক্তিকে ব্যয় করে। সুতরাং প্রত্যেক বিশ্বাসের উচিত অপর বিশ্বাসের সহিত মিলিত হওয়া…অপর বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করা নয়। কিন্তু, প্রধানত অজ্ঞানতার কারণেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অহংকার পুরোহিত শ্রেণীর স্বার্থ ও দম্ভের সাহায্যে সকল দেশে ও সকল কালে সর্বদা অংশকেই সমগ্র বলিয়া দাবী করিতে চাহিয়াছে। "ভগবানের এই জীবশালারূপ জগতে মানুষ একটি খাঁচা হাতে আসিয়া ঢুকে" এবং ভাবে যে, সে তাহার খাঁচার মধ্যে সব কিছুকেই পুরিয়া আটক করিতে পারিবে। বয়স্ক শিশু উহারা। উহারা আবোল-তাবোল বকুক ও পরস্পরকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করুক। উহাদের ঐ নিবুর্দ্ধিতা সত্ত্বেও প্রতেক দলের মধ্যে স্পন্দমান সজীব হৃদয় রহিয়াছে, উদ্দেশ্য রহিয়াছে, এবং ধ্বনির ঐক্যতানে নিজ নিজ সুর রহিয়াছে : প্রত্যেকেই তাহার অপূর্ণ হইলে-ও অপূর্ব আদর্শকে গড়িয়া তুলিয়াছে : খৃস্টান ধর্ম তাহার নৈতিক শুদ্ধিকে গড়িয়া তুলিয়াছে; হিন্দু ধর্ম গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার আধ্যাত্মিকতা; ইসলাম গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার সমাজ, সাম্য;…ইত্যাদি[১]। এবং প্রত্যেকটি দল পৃথক পৃথক মানসিক অবস্থা অনুসারে পৃথক পৃথক পরিবারে বিভক্ত হইয়াছে। সে মানসিক অবস্থাগুলি হইল : যুক্তিবাদ, শুদ্ধিবাদ, সংশয়বাদ, মন বা

সংস্কৃতিতে ইরানের স্থান" প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং জরথুস্ত্রবাদের উদ্বর্তনের ও উহার উপর ভিত্তি করিয়া কেবল প্রাচ্যের নহে, পাশ্চাত্যের বহু সম্প্রদায় কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ধারাটি আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে মনে হয় যে, খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কয়েকটি স্রোত-ধারা সেগুলির উৎস হইতে এশিয়া মাইনরে আসিয়া পড়ে। এশিয়া মাইনরে তখন অহুর মাজদার সংস্কৃতিটি সংরক্ষিত ছিল। পম্পির যুগে ঐগুলির একটি উন্নতি লাভ করিয়া 'মিথরা' সংস্কৃতিরূপে পাশ্চাত্যকে প্রায় জয় করিয়া ফেলে। অন্য একটি স্রোত মিশর ও আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় এবং 'নস্টিক' বা 'জ্ঞানবাদী' সম্প্রদায়ের প্রারম্ভকে প্রভাবিত করে। খৃস্টান অধিবিদ্যায় এই 'জ্ঞানবাদী' সম্প্রদায়ের গুরুত্ব-পূর্ণ স্থানটি সকলেই জানেন। এই স্রোতটিই আরবের একটি অতীন্দ্রিয়বাদী সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়; এই সম্প্রদায়ের সহিত মহম্মদের পরিচয় ছিল। মুসলমান সুফীরা জরথুস্ত্রবাদ ও ইসলামের এই মিশ্রণ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন। সুতরাং এই ধর্মীয় জীবাণুগুলির মধ্যে যে জৈবশক্তি ছিল, তাহা নিশ্চিহ্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হইলে-ও তাহা প্রকট হইয়া উঠে।

১ বলাই বাহুল্য যে, তিনি এখানে চিন্তার বহুগুণে বিশাল ও জটিল কাঠামোগুলির মূল দিকগুলির উপরেই জোর দিয়াছেন। এইরূপ সরলীকরণের জন্য বিবেকানন্দই দায়ী।

অনুভূতির উপাসনা।…সেগুলির সমস্তই হইল পরম সত্তার অবিরাম অগ্রযাত্রার পথে দিব্য মিতব্যয়ে বিচিত্র ও বিভিন্ন স্তরের শক্তিমাত্র। বিবেকানন্দ এই গম্ভীর উক্তিটি করিয়াছিলেন :

"মানুষ কখনো ভুল হইতে সত্যে অগ্রসর হয় না, মানুষ অগ্রসর হয় সত্য হইতে সত্যে, অল্পতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।"

এই উক্তিটি পাঠ করিলে, লক্ষ্য করিলে, শিক্ষা করিলে, এবং অন্তরে গ্রহণ করিলে আমরা ভালোই করিব।

আমরা যদি তাঁহাকে ঠিকভাবে বুঝি, তবে আমাদের মন্ত্র হইবে বর্জন নহে—"গ্রহণ"। "এমন কি সহন-ও নহে ; কারণ, সহন হইল অবমাননা, ধর্মনিন্দা : কারণ, প্রত্যেক মানুষই নিজের সাধ্যমতো সত্যকে জড়াইয়া ধরে। তাহাকে সহ্য করিবার কোনো অধিকার তোমার নাই ; এবং তোমাকে বা আমাকে সহ্য করিবার তাহারও কোনো অধিকার নাই। সত্যে আমাদের সকলের সমান অধিকার, সকলের সমান অংশ। আমরা সহকর্মী ; আমাদের ভাই-ভাই হইয়া থাকিতে হইবে।

"অতীতের সকল ধর্মকেই আমি গ্রহণ করি, এবং তাঁহাদের সকলের সহিত মিলিয়া আমি উপাসনা করি ; আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত ভগবানের পূজা করি।…ভগবানের গ্রন্থ রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, না, তাহাতে সত্যের উদ্‌ঘাটন অবিরাম চলিতেছে ? অপূর্ব এই গ্রন্থ—অপূর্ব এই বিশ্বের আধ্যাত্মিক উদ্‌ঘাটন-গুলি। বাইবেল, বেদ, কোরান, অন্যান্য সকল শাস্ত্র এই গ্রন্থের কতকগুলি পৃষ্ঠামাত্র ; এখনো অসীম সংখ্যক পৃষ্ঠা অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়া গিয়াছে।…আমরা বর্তমানে দাঁড়াইয়া আছি ; কিন্তু আমরা আমাদিগকে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি অসীম বিশ্বের কাছে। অতীতে যাহা ছিল, তাহার সমস্ত কিছুকেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আমরা বর্তমানের আলোক উপভোগ করিতেছি, এবং আমরা ভবিষ্যতে যাহা কিছু আসিবে, তাহার জন্যে আমাদের হৃদয়ের বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। অতীতের সকল ভবিষ্যৎদ্রষ্টাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সকল মহাপুরুষকে !"[১]

---

১ "সার্বজনীন ধর্মকে বাস্তব করিয়া তুলিবার উপায়।"

এই মতগুলি রামকৃষ্ণের মতেরই অনুরূপ। অগ্রদূতদের অন্যতম কেশবচন্দ্র সেন-ও এইরূপ মত পোষণ করিতেন। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে "মহামানবদের" সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতায় তিনি বলেন :

সার্বজনীনতার ও আধ্যাত্মিক সৌভ্রাত্রের এই ভাবগুলি আজ আকাশে-বাতাসে সঞ্চারিত হইতেছে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ অজ্ঞাতে বা অনজ্ঞাতে সেগুলিকে নিজেদের সুবিধামত ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। আদর্শের অপব্যবহার ও বিরাট ভণ্ডামি এই আধুনিক যুগে জেনেভায়, প্যারিসে, লণ্ডনে, বের্লিনে, ওয়াশিংটনে এবং তাহাদের শত্রু-মিত্র সকল অনুবর্তীদের মধ্যে এক চূড়ান্ত আকার ধারণ করিতেছে। অথচ আদর্শের এই অপব্যবহার ও বিরাট ভণ্ডামির মুখোস খুলিয়া ধরিবার জন্য এই অবিস্মরণীয় "স্বাধিকার ও স্বাধীনতা যুদ্ধের" যুগে বিবেকানন্দের বাঁচিয়া থাকিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "দেশপ্রেম হইল অর্ধ-ধর্ম-বিশ্বাসের প্রকাশের স্তর মাত্র।" কিন্তু দেশপ্রেম প্রায়ই স্বার্থসিদ্ধির মুখোস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। "প্রেম, শান্তি, সৌভ্রাত্র্য প্রভৃতি আমাদের কাছে নিতান্ত শব্দমাত্রে পরিণত হইয়াছে।... প্রত্যেকেই চেঁচাইতেছে: 'আমরা সার্বজনীন সৌভ্রাত্র্য চাই! আমরা সকলেই সমান।...' কিন্তু পরক্ষণেই বলিতেছে, 'এস, আমরা একটা সম্প্রদায় গড়িয়া তুলি!'"

"হিন্দু ভাইগণ! আপনারা আপনাদের ঋষিদিগকে যেমন শ্রদ্ধা করেন, তেমনি আপনারা খৃস্টান জগতের বিখ্যাত সংস্কারক ও মহামানবদিগকে-ও শ্রদ্ধা করুন।......আমার খৃস্টান ভাইগণ, আপনা-দিগকে-ও আমি সবিনয়ে বলি যে, আপনারা আপনাদের ঋষিদিগকে যেভাবে শ্রদ্ধা করেন, প্রাচ্যের ঋষিদিগকে-ও সেইভাবে শ্রদ্ধা করুন।

"দুনিয়ার সকল মানুষই একটি ধর্মকে স্বীকার করিবেন।...তবু প্রত্যেক জাতির বিশেষ ও স্বাধীন কর্মপন্থা থাকিবে।...এইভাবে জগতের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিগুলি, বিভিন্ন নেশন, তাহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট কণ্ঠে ও সংগীতে তাঁহারই জয়গান গাহিবে; তাহাদের সংগীতের বিভিন্ন ধ্বনি ও ঢং একত্রে মিশ্রিত হইয়া একটি সুমধুর ও সুস্ফীত ঐক্যতানে—একটি সার্বজনীন জয়ধ্বনিতে—পরিণত হইবে।"

ইংল্যাণ্ডে (১৮৭০ খৃস্টাব্দে) তাঁহার প্রদত্ত সকল বক্তৃতারই ইহাই ছিল মূল সুর: সকল দেশ ও জাতিকে একই সংগে মিলিত করা, সুতরাং একটি সার্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা—কেননা প্রত্যেক ধর্ম অপর ধর্মের মধ্যে যাহা কিছু ভালো আছে তাহাকে গ্রহণ করিবে—এইভাবে ভবিষ্যতে যথাসময়ে জগতের ভাবী ধর্ম-প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিবে।"

সর্বশেষে, "আমার ভারতীয় ভ্রাতাদের নিকট পত্রে" (১৮৮০) এই কথাগুলি আছে, যেগুলি বিবেকানন্দের নিকট হইতে বা রামকৃষ্ণের আত্মা হইতে উৎসারিত হইতে পারিত:

"আত্মার অসীম অগ্রযাত্রার বাণীই তোমাদিগকে পরিচালিত করুক! তোমাদের বিশ্বাস সকল কিছুকেই গ্রহণ করুক, কিছুকেই যেন তাহা পরিত্যাগ না করে! সার্বজনীন বদান্যতাই হউক তোমাদের প্রেম!...নূতন কোনো সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিও না! সকল ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সংগতি বিধান করো!..."

পৃথক হইয়া থাকিবার মতবাদের প্রয়োজনটা দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িতেছে। তাহাতে ধর্মান্ধতার উত্তেজনাকে যেমন ভালোভাবে গোপন করা যায় নাই, তেমনি তাহার মধ্যে মানুষের দুর্বলতার কাছে প্রচ্ছন্ন একটি আবেদন-ও রহিয়াছে। "উহা একটি ব্যাধি।"[১] সুতরাং শব্দে প্রতারিত হইও না! "শব্দের মধ্যে প্রচুর আস্ফালন রহিয়াছে।" যাঁহারা মানুষের সৌভ্রাত্র্যকে প্রকৃত অনুভব করেন, তাঁহারা উহা লইয়া "জাতি সংঘের" নিকট বক্তৃতা করেন না বা সংঘ গড়িয়া তুলেন না। তাঁহারা কাজ করিয়া যান ও ভাবিয়া থাকেন। ক্রিয়া-কাণ্ড, কাহিনী-কিম্বদন্তী, বা (ধর্মপ্রতিষ্ঠানগত বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত) মতবাদ লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামান না। সকল মানুষের মধ্য দিয়া যে-সূত্র চলিয়া গিয়াছে, যে-সূত্র প্রবালগুলিকে গ্রথিত করিয়া মাল্য রচনা করিয়াছে, কেবল তাহাকেই তাঁহারা অনুভব করেন।[২] অপর সকলের মতোই তাঁহারা নিজ নিজ পাত্র হস্তে লইয়া কূপ হইতে জল তুলিতে যান; জল তাঁহাদের বিভিন্ন পাত্র অনুসারে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। কিন্তু ঐ আকার লইয়া তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কলহ করেন না। উহা একই জল মাত্র।[৩] কিন্তু যে জনতা কূপের চারিদিকে দাঁড়াইয়া কলহ করিতেছে, তাহাদিগকে কি উপায়ে নীরব করা যায়, কি উপায়ে তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়? প্রত্যেকে তাহার নিজের জল পান করুক এবং অন্যকে অন্যের নিজের জল পান করিতে দিক্! প্রত্যেকের জন্য প্রচুর জল রহিয়াছে। সকলে একই পাত্র হইতে ভগবানকে পান করুক, ইহা চাওয়া নির্বুদ্ধিতা মাত্র। বিবেকানন্দ এই কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন এবং বিবাদীদিগকে দুইটি নিয়ম মানিয়া চলিবার কথা বলিতে চাহিলেন:

প্রথমটি হইল: "ধ্বংস করিও না!" যদি গড়িতে সাহায্য করিতে পারো, তবে গড়ো। যদি না পারো, তবে হস্তক্ষেপ করিও না। খারাপ কিছু করিবার অপেক্ষা না করা-ও ভালো। কোনো অকপট বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু বলিও না! তোমার যদি কোনো বিশ্বাস থাকে, সেই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করো, তবে

১ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশগুলির জন্য "সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ" তুলনীয়।

২ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন: "সূত্রাকারে আমি সকল ভাবের মধ্যেই রহিয়াছি; প্রত্যেকটি ভাব হইল এক-একটি মুক্তা।" (বিবেকানন্দ তাঁহার "মায়া ও ভগবৎ-ধারণার ক্রমবিকাশ" সম্পর্কে বক্তৃতায় ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।)

৩ এই সুন্দর কল্পনাটিকে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ উহাকে আরো বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত করিয়াছিলেন।

অপর কোনো বিশ্বাসীর কাজের ক্ষতি করিও না। তোমার নিজের যদি কোনো বিশ্বাস না থাকে, চুপ করিয়া দেখিয়া যাও, দর্শকের ভূমিকাতেই খুশী হইয়া থাকো।

দ্বিতীয়টি হইল : মানুষ যেখানেই রহিয়াছে, তাহাকে সেখানে সেই [illegible] গ্রহণ করো এবং সেখান হইতেই তাহার নিজের পথে তাহাকে আগাইয়া দাও। তাহার পথ তোমাকে তোমার পথ হইতে বিচ্যুত করিবে, এমন ভয় করিও না। সকল ব্যাসার্ধেরই কেন্দ্র হইলেন ভগবান, আমাদের প্রত্যেকেই ব্যাসার্ধগুলির কোনো একটিকে ধরিয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া চলিয়াছি। সুতরাং, টলস্টয় যেমন বলিয়াছেন, "আমরা যখন গিয়া পৌঁছিব, তখন আমাদের সকলের আবার দেখা হইবে।" সকল পার্থক্য—কেন্দ্রে—এবং কেবল কেন্দ্রেই—অন্তর্হিত হইবে। প্রকৃতির পক্ষে পার্থক্য একটি প্রয়োজনীয় বস্তু, পার্থক্য না থাকিলে জীবন বলিয়া কিছু থাকিবে না। সুতরাং প্রকৃতিকে সাহায্য কর, কিন্তু এই ধারণা তোমার মাথায় ঢুকাইও না যে, তুমি প্রকৃতিকে উৎপাদন কবিতে পারো বা পথ দেখাইতে পারো! তুমি কেবল কচি উদ্‌ভিদের চারিদিকে রক্ষার উপযোগী বেড়া তৈয়ার করিয়া দিতে পারো। উহার বাড়িবার পথে যে সকল অন্তরায় আছে, সেগুলিকে সরাইয়া দাও, প্রচুর স্থান ও বাতাসের সংকুলান করো, কিন্তু আর কিছুই করিও না। উহার বৃদ্ধি ভিতর হইতেই আসিবে। তুমি অপরের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আনিয়া দিতে পারো, এই ধারণা পরিত্যাগ করো।[১] প্রত্যেক মানুষের শিক্ষক হইবে তাহার নিজের আত্মা। প্রত্যেককে নিজেকে শিখিতে হইবে। অপরের একমাত্র কর্তব্য হইল এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি এই শ্রদ্ধাটি সুন্দর। অন্য কোনো ধর্মে উহা এই পরিমাণে নাই; কিন্তু উহা বিবেকানন্দের ধর্মের একটি মূল অংশ। তাঁহার ভগবান সকল জীবের সমষ্টি অপেক্ষা অল্পতর কিছু নহেন, সুতরাং প্রত্যেক জীবকে বিকাশের স্বাধীনতা দিতে হইবে। সুপ্রাচীন উপনিষদগুলির একটি বলিয়াছেন :

১ আমার মনে হয় এই কথাগুলির সহিত নিম্নলিখিত সংশোধনটি জুড়িয়া দেওয়া দরকার—উহার সহিত বিবেকানন্দের চিন্তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে :

"আধ্যাত্মিকতা প্রত্যেকের মধ্যেই আছে; কোথাও তাহা কম-বেশি সুপ্ত ও চাপা, কোথাও বা তাহা উন্মুক্ত, উচ্ছ্বসিত। যিনি নিজে একটি নির্ঝর, কেবল তিনিই তাঁহার উপস্থিতির দ্বারা, তাঁহার উৎসারিত স্রোতের সংগীতের দ্বারা, আহ্বানের দ্বারা, এই সুপ্ত নির্ঝরগুলিকে, যেগুলি নিজেদের অস্তিত্বের কথা জানে না বা স্বীকার করিতে ভয় পায়, সেগুলিকে জাগাইয়া তুলেন। এই অর্থে নিঃসন্দেহে ইহাতে একটি দানের ভাব আছে—আছে আধ্যাত্মিকতার একটি জীবন্ত যোগাযোগ।"

"এই বিশ্বে যাহা কিছুই আছে, তাহাকেই ভগবানের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে হইবে।" এবং বিবেকানন্দ এই বাণীর এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :

"আমাদিগকে ভগবানের দ্বারা সকল কিছুকেই আচ্ছন্ন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কোনো অলীক আশাবাদের দ্বারা বা অশুভের প্রতি চক্ষুকে আবৃত রাখিয়া করা চলিবে না। তাহা করিতে হইবে সমস্ত কিছুর মধ্যে—ভালে ও মন্দের মধ্যে, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে, সুখ ও দুঃখের মধ্যে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে—"ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া।" "তোমার যদি স্ত্রী থাকেন, তবে ইহার অর্থ এই নহে যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে; ইহার অর্থ এই যে, তুমি তোমার স্ত্রীর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবে।" ভগবান তোমার স্ত্রীর মধ্যে আছেন, তোমার মধ্যে আছেন, তোমার সন্তানের মধ্যে আছেন, তিনি সর্বত্রই আছেন।

এই ধরণের মনোভাব জীবনকে তাহার কোনো ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করে না। তাহা জীবনের সকল ঐশ্বর্য ও সকল দারিদ্র্যকে এক করিয়া দেয়। "কামনা এবং অমঙ্গলের-ও উপযোগিতা আছে। সুখের মধ্যে গৌরব আছে, দুঃখের মধ্যেও গৌরব আছে।...আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, আমি কিছু ভালো করিয়াছি এবং অনেক কিছু খারাপ করিয়াছি, তাহাতেই আমি খুশী। আমি খুশী যে, আমি অনেক ভুল করিয়াছি, কারণ, সেগুলির প্রত্যেকটিই আমার নিকট এক একটি মহান শিক্ষা হইয়াছে।...তোমার সম্পত্তি থাকিবে না, তাহা নহে।.. তুমি যাহা চাও, তাহা লও, কেবল সত্যটিকে জানো এবং সত্যটিকে উপলব্ধি করো।...সকল কিছুই ভগবানের, ভগবানকে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে স্থাপন করো।...সমস্ত দৃশ্যই বদলাইয়া যাইবে। জগৎকে আর দৈন্যে-দুঃখে পূর্ণ মনে হইবে না। জগৎকে মনে হইবে স্বর্গ।"

"স্বর্গরাজ্য তোমার মধ্যেই রহিয়াছে।" কিন্তু এই মহান উক্তির অর্থই হইল এই যে, স্বর্গ পরপারে নহে। স্বর্গ এখানেই, এখনই। সমস্ত কিছুই স্বর্গ। কেবল চোখ খুলিয়া দেখিতে হইবে।[১]

„উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর।
অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে
সত্যাগ্রহী, সত্যের আশ্রয়ে,
মিশি সত্যে যাও এক হ'য়ে,

১ পূর্বোক্ত অংশ "জ্ঞানযোগ" প্রসংগে "সর্বভূতে ভগবান" শীর্ষক (১৮৯৬-এর ২৭শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডনে প্রদত্ত) বক্তৃতায় আছে।

মিথ্যা কর্ম-স্বপ্ন ঘুচে যাক—
কিংবা থাকে স্বপ্নলীলা যদি,
হের সেই, সত্যে গতি যার,
থাক স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার
আর থাক প্রেম নিরবধি।"

তিনি অন্যত্র মন্তব্য করেন:[১] "প্রত্যেক আত্মার মধ্যে দিব্য শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে। ভিতরের ও বাহিরের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অন্তর্নিহিত এই দিব্য শক্তিকে প্রকাশ করাই লক্ষ্য। কর্মের দ্বারা, উপাসনার দ্বারা, মানসিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বা দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা[২]—এগুলির একটির দ্বারা বা সবগুলির দ্বারা—তাহা কর এবং মুক্ত হও। ইহাই সমগ্র ধর্ম। মতবাদ, ক্রিয়া-কাণ্ড, শাস্ত্র, মন্দির বা মূর্তি, এগুলি গৌণ খুঁটিনাটি মাত্র।"

বিবেকানন্দ অন্তরে ছিলেন মহান শিল্পী।[৩] তিনি বিশ্বকে চিত্রের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। ক্রয়-বিক্রয়ের স্বার্থপ্রণোদিত ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া যে লোক চিত্রকে দুই চক্ষু দিয়া গ্রাস করিয়াছে, সে যেমন চিত্রকে উপভোগ করে, ইহাকে-ও সেই ভাবে উপভোগ করিতে হইবে:

"'ভগবান মহা কবি, সুপ্রাচীন কবি। বিশ্ব তাঁহার কাব্য, ছন্দে ও মিলে তাহার উৎপত্তি, অসীম আনন্দের মধ্যেই তাহা রচিত।' ভগবান সম্পর্কে এমন সুন্দর ভাব আমি আর কোথাও পড়ি নাই।"[৪]

১ "রাজযোগ", সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১ম খণ্ড।

২ তাই কর্ম, ভক্তি, রাজ, জ্ঞান—এই চারি যোগের একটির দ্বারা বা সবগুলির দ্বারা।

৩ মিস্ ম্যাক্লেয়ডকে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, সবার আগে আমি কবি?"—এ কথাগুলিকে ইউরোপীয়ানরা ভুল বুঝিতে পারেন; কারণ তাঁহারা কবিতার প্রকৃত অর্থটিকে—বিশ্বাসের ঊর্ধ্বলোক প্রয়াণকে—যাহা ছাড়া পক্ষীরা প্রাণহীন কলের পুত্তলীমাত্রে পরিণত হয়—ভুলিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে বিবেকানন্দ বলেন: "শিল্পী হইলেন সুন্দরের দ্রষ্টা। শিল্পই জগতে আনন্দের সর্বাপেক্ষা স্বল্প স্বার্থপর রূপ।"

আবার তিনি বলেন: "তুমি যদি প্রকৃতির মধ্যকার সংগতিকে গ্রহণ করিতে না পারো, তবে তুমি কেমন করিয়া সকল সংগতির যিনি সমষ্টি সেই ভগবানাক গ্রহণ করিবে?"

এবং অবশেষে বলেন: "সত্যই, শিল্প ব্রহ্ম।"

৪ "সর্বভূতে ভগবান।"

তবে ইহাতে এই ভয় আছে যে, অতিশয় সৌন্দর্যপ্রিয় এবং শিল্পী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যদের পক্ষে এই ধরণের ভাব বোধগম্য হইবে না। এবং শিল্পের অজস্র স্রোতধারা বাংলার জাতিগুলিকে সিঞ্চিত করিয়া শিল্পী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে যেরূপ অকৃপণভাবে সৃষ্টি করিয়াছে, আমাদের বিবর্ণ ধূমধূসরিত সূর্য তেমনটি করে নাই। তাহা ছাড়া আরেকটি বিপদ আছে—সেটি হইল উহার ঠিক বিপরীত—যে সকল জাতি এই ভাবোন্মাদনা উপভোগ করিবার আদর্শ লাভ করিবে, তাহারা *Summus Artifex*[১] বা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দ্বারা অভিভূত ও বশীভূত হইয়া উহার নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র হইয়া থাকিবে। রোম সম্রাট এই ভাবেই তাঁহার প্রজাদিগকে ক্রীড়াকৌতুকের···*Circenses*-এর (সার্কাসের)···দ্বারা শক্তিহীন ও বশীভূত করিয়া রাখিতেন।

এই পর্যন্ত যাঁহারা আমার বক্তব্যের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা বিবেকানন্দের প্রকৃতিকে যতোখানি বুঝিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারেন যে, তিনি শিল্পানন্দে বা ধ্যানধারণার মধ্যে কাহার-ও আত্মহারা হইবার অধিকার আছে, এইরূপ দাবীকে সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার প্রকৃতি তাঁহাকে এক বেদনাময় করুণার বন্ধনে বিশ্বের সকল দুঃখদৈন্যের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল; তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে ছিল কর্মের এক ক্ষিপ্ততা, এই ক্ষিপ্ততার সংগে তিনি বিশ্বকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

তিনি নিজের ও তাঁহার সংগীদের ক্ষেত্রে এই পরম ক্রীড়ার[২] বিপজ্জনক আকর্ষণের কথা জানিতেন। তাই যাঁহারা পথ নির্দেশের জন্য তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে সর্বদাই এ পথ হইতে বিরত করিতেন এবং তিনি

১ স্মরণ থাকিতে পারে, নেরো আপনাকে "পরমতম শিল্পী" এই আখ্যা দিয়াছিলেন এবং যদি তিনি 'রুটি ও সার্কাসের' ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে তাঁহার সকল রকম অত্যাচার মানিয়া লইতে জনসাধারণ রাজী ছিল।

২ লীলা—ভগবানের খেলা।

তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, "আমাদের একটি তত্ত্ব আছে যে, ভগবান কৌতুকপরবশ হইয়া যে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তাহাই এই বিশ্ব, অবতারগণ কেবল কৌতুকের বশবর্তী হইয়াই" আসেন ও যান। খেলা—কেবল খেলা। যিশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন কেন? সে ছিল কেবল খেলা। ···প্রভুর খেলা মাত্র। বল না: ইহা (জীবনটাও) খেলা, কেবল খেলা।"

তাঁহাদের স্বপ্নাতুর দৃষ্টিকে, তিনি যাহাকে "প্রয়োগমূলক বেদান্ত" বলিয়াছেন, তাহার প্রতিই ফিরাইতেন।[১] "ব্রহ্মজ্ঞানই মানবের চরম ও ঊর্ধ্বতম লক্ষ্য," ইহা বিবেকানন্দের নিকট সত্য ছিল। কিন্তু মানুষ ব্রহ্মের মধ্যেই কেবল নিমগ্ন থাকিতে পারে না।"[২] কেবল বিশেষ মুহূর্তেই এই ভাবে নিমগ্ন হওয়া যায়। কিন্তু মানুষ

সকল শ্রেষ্ঠ হিন্দুর চিন্তার তলদেশে এই গভীর ও ভয়ংকর মতবাদটি রহিয়াছে, সকল দেশের ও সকল কালের বহু অতীন্দ্রিয়বাদীর মধ্যে-ও ঐ মতবাদটিকে দেখা যায়। প্লটিনাসের মধ্যে-ও কি এই মতবাদকে দেখা যায় না? প্লটিনাস জীবনকে রঙ্গমঞ্চরূপে দেখিতেন, যে রঙ্গমঞ্চে "অভিনেতারা ক্রমাগতই পোশাক বদলাইতে থাকে," যে রঙ্গমঞ্চে সাম্রাজ্য ও সভ্যতার উত্থান পতন কেবল দৃশ্যান্তর, কেবল ব্যক্তির পরিবর্তন, কেবল অভিনেতাদের কান্নাকাটি, চেঁচামেচি মাত্র।

কিন্তু বিবেকানন্দ ও তাঁহার চিন্তা সম্পর্কে আলোচনাকালে তাঁহার শিক্ষাদানের স্থান ও কালের কথা ভুলিলে চলিবে না। তিনি যে সব ভাবপ্রবণতাকে দর্শকদের ব্যাধি বলিয়া মনে করিতেন, তিনি সকল সময়েই সেই সকল প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কাছে সংগতিই শেষ সত্য হইলেও তিনি আতিশয্যের বিরুদ্ধে আতিশয্য ব্যবহার করিতেন।

এই সময়ে অবশ্য বিবেকানন্দ নিবেদিতার আবেগপ্রবণতায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিবেদিতাকে বলিলেন: "হাসিমুখে বিদায় লও না কেন? দুঃখকে তুমি পূজা কর।"......এবং তাঁহার এই ইংরেজ বান্ধবীকে—যিনি সকল কিছুকেই গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করিতেন, তাঁহাকে—এই খেলার যুক্তিটি দেখাইয়াছিলেন।

বিষণ্ণ ভক্তির প্রতি, আত্মপীড়ক বেদনার মনোভাবের প্রতি, তাঁহার যে বিরাগের ভাবটি ছিল, তাহার ব্যাখ্যা নারদ সংক্রান্ত অদ্ভুত উপমাটিতে পাওয়া যায়:

"দেবতাদের মধ্যে বড়ো বড়ো যোগী আছেন। নারদ তাঁহাদের একজন। একদিন তিনি বন দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, একটি লোক এতকাল ধরিয়া ধ্যান করিতেছে যে, তাহার চারিদিকে উই ঢিপি গড়িয়া উঠিয়াছে। আরো কিছুদূর গিয়া তিনি আর একটি লোককে দেখিলেন, লোকটি আনন্দ পাইবার জন্য একটি গাছের তলায় লাফাইতেছে। নারদ স্বর্গে গেলে তাঁহাকে সেখানে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাদের মধ্যে কে কখন মুক্তিপাইবেন? উই ঢিপিপরিবেষ্টিত মানুষটিকে দেখাইয়া নারদ বলিলেন, "চারি জন্ম পরে।" লোকটি শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর যে লোকটি আনন্দের জন্য লাফাইতেছিল, তাহাকে নারদ বলিলেন, "যে গাছের তলায় তুমি লাফাইতেছিলে, তাহাতে যতোগুলি পাতা আছে, ততো জন্ম পরে।" খুব শীঘ্রই মুক্তি পাইবে ভাবিয়া লোকটি আনন্দে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।...সংগে সংগেই সে মুক্তি পাইল। ("রাজযোগের" উপসংহার দ্রষ্টব্য।)

১ ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে প্রদত্ত "জ্ঞানযোগের" চারিটি বক্তৃতার নাম। ঐ সংকলনের তাঁহার অন্যান্য বক্তৃতাগুলি-ও তুলনীয়—"প্রকৃত ও প্রতীয়মান মানুষ;" "সিদ্ধি", "সর্বভূতে ভগবান," (বেলুড়ে, ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত) "কথোপকথন ও সংলাপ"; সম্পূর্ণ রচনাবলীর ৭ম খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা ও তৎপরে।

২ মুক্তির পথ প্রসংগে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার। সম্পূর্ণ রচনাবলীর, ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃঃ ও তৎপরে।

যখন সেই বিশ্রামের মহাসমুদ্র হইতে নামহীন হইয়া বাহিরে আসে," তখন আবার তাহাকে তাহার বন্যায় গিয়া আশ্রয় লইতে হয়। উহাতে *Carpe diem* ! (দিনটি উপভোগ করো!) এই অহঙ্কার অপেক্ষা *Memento quia pulvis es* (তুমি ধূলিকণা মাত্র একথা মনে রাখিও); এই কথা এবং জলের উপর ভাসিয়া থাকায় যে নিরাপত্তা আছে, তাহার বিবেচনাই অধিকতর প্রবল থাকে।

"কেহ যদি সত্য না জানিয়া সংসারের বুদ্ধিহীন বিলাসের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তবে সে তাহার দাঁড়াইবার স্থানটুকুও হারায়।...আবার কেহ যদি সংসারকে তিরস্কার করিয়া বনে গিয়া নিজের দেহকে কষ্ট দেয় এবং অনাহারে তিলে তিলে আত্মহত্যা করিতে থাকে, নিজের হৃদয়কে অনুর্বর করিয়া তোলে, অনুভূতিকে হত্যা করে, নিজে কর্কশ, কঠোর ও শুষ্ক হইয়া উঠে, তবে সে-ও তাহার পথ হারায়!"[১]

যে-আলোকোদ্‌ভাসগুলি আমাদের নিকট মুহূর্তের জন্য—পরিপূর্ণ এবং বাইবেলে প্রচলিত অর্থে—সত্তার মহাসমুদ্রকে উদ্‌ঘাটিত করে, সেগুলি হইতে যে মহান বাণী আমরা সংসারে বহিয়া আনিব, তাহাই উচ্চতম নৈতিক নিয়মের-ও বাণী—সেই বাণীই আমাদিগকে অবিলম্বে বা বিলম্বে আমাদের শেষ লক্ষ্যে গিয়া পৌছিতে দিবে। এই বাণী হইল:

"আমি নয়, তুমি!"

এই "আমি" গোপন অসীমের বাহ্য প্রকাশের ক্রিয়া হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের ঐ পথকে আমাদের অসীমতার আদিম অবস্থার অভিমুখে অন্তর্মুখী করিয়া পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এবং প্রতিবার আমরা যখনই বলি, "আমি নয়, ভাই, তুমি!" তখনই আমরা এক পা অগ্রসর হই।[২]

---

১ "সর্বভূতে ভগবান।"

২ ধর্মীয় সিদ্ধিই জগতের সকল মঙ্গল সাধন করে। লোকে ভয় করে যে, যখন তাহারা ইহা লাভ করিবে, যখন তাহারা উপলব্ধি করিবে যে, একমাত্র তিনিই রহিয়াছেন, তখন ভালোবাসার নির্ঝরগুলি শুকাইয়া যাইবে, তখন তাহাদের জীবনের সব কিছুই চলিয়া যাইবে, তখন তাহারা যাহা কিছুকে ভালোবাসে, তাহা সবই অন্তর্হিত হইবে।...তাহারা একথা ভাবিতে থাকে না যে, যাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে স্বল্পতম চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী হইয়াছেন। মানুষ যখন দেখে যে, সে যাহাকে ভালোবাসে তাহা এক ডেলা মৃত্তিকা মাত্র নয়, তাহা নিঃসংশয়ে স্বয়ং ভগবান, কেবল তখনই সে ভালোবাসে। স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে...এবং মাতা তাঁহার সন্তানকে ততোই বেশি ভাল-বাসিবেন, তাঁহারা যতোই উপলব্ধি করিবেন যে, স্ত্রী ও সন্তান ভগবান স্বয়ং।...তখন মানুষ তাহার

একজন স্বার্থপর শিষ্য ইহার প্রতিবাদ করিলে সেদিন বিবেকানন্দ দেবোপম ধৈর্যের সহিত (ইহা তাঁহার অভ্যাসবিরুদ্ধ) তাহার জবাব দিয়াছিলেন। ঐ শিষ্য বলিয়াছিলেন, "কিন্তু আমি যদি সকল সময়ে মানুষের কথাই ভাবি, তবে আমি আত্মার কথা ভাবিব কখন ? আমি যদি সকল সময়েই কোনো বিশেষ ও আপেক্ষিক বস্তু লইয়াই ব্যস্ত থাকি, তবে আমি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিব কিরূপে ?"

স্বামীজী সুমিষ্ট কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "বৎস, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, অপরের মঙ্গলের কথা তীব্রভাবে চিন্তা করিলে, অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে, তাহার দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ঘটিবে এবং তাহার দ্বারাই তোমরা সর্বজীবে যে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার দিব্যদর্শন পাইবে। তারপর আর কি পাইতে বাকী থাকে ? তোমরা কি চাহ যে, একটি প্রাচীর বা একখণ্ড কাষ্ঠের মতো নিষ্ক্রিয় অবস্থার মধ্যেই আত্মসিদ্ধি থাকে ?"[১]

শিষ্য তবুও প্রতিবাদ করিতে থাকেন, "কিন্তু তাহা হইলেও, শাস্ত্রে যাহাকে আত্মার প্রকৃত স্বকীয় স্বভাবের মধ্যে প্রত্যাহার বলা হইয়াছে, তাহা সকল মানসিক ক্রিয়ার এবং সকল কর্মের বিরতি বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।"

বিবেকানন্দ উত্তর দেন, "হ্যাঁ, কিন্তু সেরূপ অবস্থা কচিৎ আয়ত্ত করা যায়ঃ এবং আয়ত্ত করা খুব কঠিন। তাহা অধিকক্ষণ থাকেও না। সুতরাং বাকী সময়টা কিভাবে কাটাইবে ? এই কারণেই সাধুরা ঐ জ্ঞানলাভ করিবার পর সর্বভূতে আত্মাকে দেখিতে থাকেন এবং ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা দেহের দ্বারা করিবার মতো যে সকল কর্ম অবশিষ্ট থাকে, সেগুলিকে এইভাবেই ব্যবহার করিয়া শেষ করেন। এই অবস্থাকে শাস্ত্রে 'জীবন-মুক্তি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[২]

একটি প্রাচীন পারসিক গল্পে সুন্দরভাবে দিব্যোন্মাদের এই অবস্থাটিকে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ অবস্থায় লোকে জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হইয়া নিজেকে অপরের

সর্বাপেক্ষা বড়ো শত্রুকেও ভালোবাসিবেঃ...সেই মানুষের কাছে তাহার নিজের ক্ষুদ্র সত্তা মরিয়া গিয়াছে এবং ভগবান সেই ক্ষুদ্র সত্তায় স্থান অধিকার করিয়াছেন। মানুষই দুনিয়াকে আগাইয়া লইয়া চলে, এই জগতের সকল নরনারীর দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ-ও যদি কেবল বসিয়া কয়েক মিনিট বলে যে, "হে সকল মানব ও সকল প্রাণী, তোমরা সকলেই ভগবান, তোমরা সকলেই সেই এক জীবন্ত দেবতার প্রকাশমাত্র!" তবে আধ ঘণ্টাতেই সমস্ত দুনিয়া বদলাইয়া যাইবে।" ("প্রকৃত ও প্রতীয়মান মানুষ")

১ আমি সংলাপটি সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

২ সম্পূর্ণ রচনাবলীর সপ্তম খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা ও তৎপরে।

সেবায় এমন স্বাভাবিকভাকে নিয়োগ করে যে, সেই সকল অপরের মধ্যে আর কিছুর কথা তাহার মনে থাকে না। এক প্রেমিক তাহার প্রেমিকার ঘরের দরজায় আসিয়া আঘাত করিলে প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" প্রেমিক বলিল, "আমি"। কিন্তু দরজা খুলিল না। আবার ঘা পড়িল। প্রেমিক বলিল, "আমি, অমিগো!" দরজা তবু খুলিল না। ভিতর হইতে তৃতীয় বার প্রশ্ন আসিল, "কে?" উত্তর আসিল, "তুমি।" এবার দরজা খুলিয়া গেল।[১]

এই সুন্দর রূপক কাহিনীটির সৌন্দর্যকে বিবেকানন্দ অন্যান্য অনেকের অপেক্ষা ভালো করিয়াই বুঝিতেন। কিন্তু ইহাতে ভালোবাসার একটি অতি-নিষ্ক্রিয় আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা কোনো জাতির দুরন্ত সৃজনশীল নেতাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, বিবেকানন্দ কিরূপ কঠোরভাবে ভক্তদের ভাবাবেশ-লালসাকে তিরস্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট ভালোবাসা ছিল সক্রিয় ভাবে ভালোবাসা, সেবা করা, সাহায্য করা। এবং ভালোবাসার পাত্রকে-ও বাছিয়া লওয়া চলিবে না, যাহাকে কাছে পাওয়া যাইবে, তাহাকেই ভালোবাসিতে হইবে —এমন কি শত্রুকে, যে তোমাকে আঘাত করিতেছে তাহাকে, দুর্বৃত্তকে, হতভাগ্যকে—বিশেষ করিয়া হতভাগ্যকে, কারণ, তাহার প্রয়োজনই সর্বাধিক।[২]

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের এক যুবক নিজের বাড়িতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া মানসিক শান্তি পাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। তাহাকে বিবেকানন্দ বলেন, "বৎস, সর্বপ্রথমে তোমাকে তোমার ঘরের দরজা খুলিয়া তোমার চারিদিক দেখিতে হইবে।...তোমার বাড়ীর আশেপাশে অনেক গরীব দুঃখী আছে। তুমি যথাসাধ্য তাহাদের সেবা করিবে। কাহার-ও অসুখ করিলে তাহার শুশ্রূষা করিবে। কেহ অনাহারে আছে: তাহাকে খাদ্য দিবে। কেহ বা মূর্খ হইয়া আছে: তাহাকে শিক্ষা দিবে। যদি মনের শান্তি চাও, তবে অপরের সেবা করো! আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"[৩]

১ প্রয়োগমূলক বেদান্ত সম্পর্কে দ্বিতীয় বক্তৃতায় বিবেকানন্দ কর্তৃক উদ্‌ধৃত।

২ "বাইবেলের সেই কথাগুলি কি আপনাদের মনে নাই: 'তোমরা তোমাদের যে ভাইকে দেখিয়াছ, তাহাকে যদি ভালোবাসিতে না পারো, তবে তোমরা যে ভগবানকে দেখ নাই, তাহাকে ভালোবাসিবে কিরূপে?'...আপনারা যেদিন নরনারীর মধ্যে ভগবানকে দেখিতে আরম্ভ করিবেন, কেবল সেদিনই আমি আপনাদিগকে ধার্মিক বলিব। ডান গালে চড় মারিলে বাঁ গালটি ফিরাইয়া দেওয়া কাহাকে বলে, কেবল তখনই আপনারা বুঝিতে পারিবেন।" (প্রয়োগমূলক বেদান্ত, ২)

টলস্টয় তাঁহার ডায়েরিতে এই কথাগুলিই শেষ কয়েক বছরে বারে বারে বলিতে থাকেন।

৩ পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ সালে তিনি বলেন:

বিবেকানন্দের শিক্ষার এই দিকটি সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে বলিয়াছি, আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আর একটি দিক আছে, সেটি আদৌ ভুলিলে চলিবে না। সাধারণত ইউরোপীয় চিন্তায় "সেবা" কথাটিতে স্বেচ্ছায় নিজেকে নীচে নামাইয়া আনার একটি ভাব আছে। কিন্তু বিবেকনন্দের বেদান্তবাদে ঐরূপ ভাব বিন্দুমাত্র নাই। সেবা করা, ভালোবাসা হইল যাহাকে সেবা করা হইতেছে, ভালোবাসা হইতেছে তাহার সমান হওয়া। নীচে নামিবার কথা দূরে থাক, বিবেকানন্দ উহাকে সর্বদা জীবনের পূর্ণতা বলিয়া মনে করেন। "আমি নয়, তুমি!" এই কথার অর্থ আত্মনিধন নহে, ইহার অর্থ হইল বিরাট এক সাম্রাজ্যকে জয় করা। আর আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশীর মধ্যে ভগবানকে দেখি, আমাদের মধ্যে ভগবান আছেন, এই চেতনা আছে বলিয়াই আমরা তাহা দেখি। ইহাই ছিল বেদান্তের প্রথম শিক্ষা। উহা আমাদিগকে বলে না যে, "লুটাইয়া পড়ো।" উহা আমাদিগকে বলে, "মাথা উঁচু করো! কারণ, তোমাদের মধ্যে ভগবান আছেন। তাঁহার যোগ্য হও! তাঁহার জন্য প্রস্তুত হও!" বেদান্ত শক্তিমানের খাদ্য। ইহা দুর্বলকে বলে: "দুর্বল বলিয়া কিছু নাই। তুমি দুর্বল হইতে চাও বলিয়াই তুমি দুর্বল।[১] তুমি নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। তোমরা নিজেরাই তো ভগবানের প্রমাণ।[২] 'তুমিই সেই!'—আমাদের রক্তের প্রতিটি স্পন্দনে এই সংগীত ধ্বনিত

"সকল মঙ্গলের মূল মন্ত্র হইল···আমি নহে, তুমি। স্বর্গ-নরক আছে কিনা, আত্মা আছে কিনা, অপরিবর্তনীয় কোনো ভগবান আছেন কিনা, তাহাতে কাহার কি আসে যায়? জগৎ আছে, এবং তাহা দুঃখপূর্ণ হইয়া আছে। বুদ্ধের মতো এই জগতে যাও এবং এই দুঃখকে হ্রাস করিবার জন্য সংগ্রাম করো, বা সংগ্রাম করিয়া মরো! তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো বা না করো, তুমি জ্ঞানবাদী হও বা বেদান্তবাদী হও, তুমি খ্রস্টান হও বা মুসলমান হও, তোমার সর্বপ্রথম শিক্ষা হইল—নিজেকে ভুলিয়া যাও।" (প্রয়োগমূলক বেদান্ত, ৪র্থ অধ্যায়, ৩৫০ পৃঃ)

১ যখনই তুমি বল যে, "আমি ক্ষুদ্র মরণশীল জীব," তখন তুমি নিজেকে প্রতারণা করো, তখন তুমি এমন কিছু বলো যাহা সত্য নহে, তখনই তুমি নিজেকে ঘৃণ্য, দুর্বল ও দুর্ভাগ্য কিছুতে সম্মোহিত করিয়া ফেলো।" (প্রয়োগমূলক বেদান্ত, ১) শরৎচন্দ্রের সহিত শেষ সাক্ষাৎকারটি তুলনীয়:

"নিজেকে বলো, 'আমি শক্তিমান, আমি সুখী, আমি ব্রহ্ম।'···যাহার আত্মমর্যাদা বোধ নাই, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম কখনো জাগ্রত হন না।"

২ "আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, শাস্ত্র আপনাকে সত্য শিক্ষা দেয়? কেননা আপনি নিজেই সত্য, এবং ইহা আপনি অনুভব করেন।···আপনার দেবত্বই স্বয়ং ভগবানকে প্রমাণিত করে।" (প্রয়োগমূলক বেদান্ত, ১)

হইতেছে। এবং বিশ্ব তার কোটি কোটি সূর্য লইয়া একই কণ্ঠে ঐ বাণীই উচ্চারিত করিতেছে: 'তুমিই সেই'।"

বিবেকানন্দ সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন:

"যাহার আত্মবিশ্বাস নাই, সে ভগবানে অবিশ্বাসী।"[১]

কিন্তু সেই সংগে তিনি একথাও বলেন:

"কিন্তু ইহা স্বার্থান্ধ আত্মবিশ্বাস নহে।…ইহার অর্থ সকলে বিশ্বাস। কারণ, তোমারই সব। তোমাদের নিজেদের প্রতি ভালোবাসার অর্থ হইল সকলের প্রতি ভালোবাসা, কারণ তোমরা সকলে এক।"[২]

এবং এই ভাবটি সকল নীতিশাস্ত্রের গোড়ার কথা: "ঐক্যই সত্যের পরীক্ষা। যাহাই ঐক্যের জন্য সাহায্য করে, তাহাই সত্য। প্রেম সত্য, ঘৃণা অসত্য। কারণ, ঘৃণা অনৈক্যের সৃষ্টি করে। উহা ভাঙনের শক্তি।"

প্রেম তাই পুরোভাগে থাকে।[৩] কিন্তু, এখানে ভালোবাসা হইল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, রক্তের প্রবাহ, যাহাভিন্ন দেহের অংগগুলি পঙ্গু হইয়া পড়ে। প্রেম প্রচ্ছন্নভাবে শক্তির অর্থ প্রকাশ করে।

সুতরাং প্রত্যেকের মূলে রহিয়াছে শক্তি, ঐশী শক্তি। সে শক্তি সর্ব বস্তুর মধ্যে, সর্ব মানবের মধ্যে, রহিয়াছে। উহা মণ্ডলের কেন্দ্রে রহিয়াছে, উহা পরিধির বিন্দুতে বিন্দুতে রহিয়াছে। এবং কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে প্রত্যেক

---

১ বশী সেন আমার নিকট কতকগুলি দুঃসাহসিক উক্তি উদ্‌ধৃত করিয়াছিলেন, সেগুলি বিবেকানন্দের ধর্মকে অনেকখানি ব্যাখ্যা করে। খৃস্টানদের যে ধারণা আছে যে, আমাদিগকে পরলোকে স্বর্গ পাইবার জন্য ইহলোকে নরক ভোগ করিতে হইবে, এই উক্তিগুলি তাহার প্রতিবাদ করে:

"যে ভগবান আমাকে এখানে দুমুঠা অন্ন দেন না, তিনি স্বর্গে আমাকে চির আনন্দ দিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসীর মধ্যে ভগবান সম্পর্কে নির্ভীকতাটিকে কখনো ভুলিলে চলিবে না। যে পাশ্চাত্য জগৎ প্রাচ্য জগৎকে নিষ্ক্রিয় প্রতিপন্ন করিতে চায়, তাহা ভগবানের সহিত ব্যবহারে প্রাচ্যের অপেক্ষা বহুগুণে নিষ্ক্রিয়। ভারতীয় বেদান্তবাদী বিশ্বাস করেন যে, আমার মধ্যে ভগবান আছেন। ভগবান যদি আমার মধ্যে থাকেন, তবে জগতের এই অবমাননাকে স্বীকার করিয়া লইব কেন? বরং আমার কর্তব্য হইবে এই সকল অবমাননাকে দূর করা।

২ প্রয়োগমূলক বেদান্ত, ১।

৩ এখানে বুদ্ধিকে দ্বিতীয় স্থানে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "বুদ্ধির প্রয়োজন আছে,…কিন্তু তাহা কেবল ঝাড়ুদার বা চৌকিদারের কাজ করে।" ভালোবাসার স্রোত যদি না প্রবাহিত হয়, তবে ঐ পথ শূন্য পড়িয়া থাকিবে। তারপর ঐ বেদান্তবাদী শঙ্কর হইতে এবং "খৃস্টের অনুকরণ" (The Imitation of Christ) হইতে উদ্‌ধৃতি দেন।

ব্যাসার্ধ উহাকে সঞ্চারিত করিতেছে। পথ হইতে প্রাঙ্গণে যে প্রবেশ করে, সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু যে পৌঁছিতে পারে, সে শত গুণ শক্তি লইয়া ফিরিয়া আসে; এবং ধ্যানের মধ্যে যে উহাকে উপলব্ধি করে, সে কর্মের মধ্যেও উহাতে সিদ্ধ হয়।[১] দেবতারা হইলেন উহার অংশ। কারণ, ভগবান সর্বশক্তিমান। যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি সকলের জন্য বাঁচিবেন।[২]

১ এখানেই আবার খৃস্টান অতীন্দ্রিয়বাদ একই ফল লাভ করিয়াছে। ভগবানের সহিত মিলন উপলব্ধি করিবার পরে আত্মা জীবনের অন্যান্য কর্মগুলির একটিকেও লঙ্ঘন না করিয়া তাহার অপর কর্মগুলিকে পরিচালিত করিবার সর্বাধিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইলেন সপ্তদশ শতাব্দীর তুরাঙ্গেল, আমাদের ফ্রান্সের সেণ্ট টেরেসা মাদাম মার্টিন—আবে ব্রেম ইঁহার সম্পর্কে তাঁহার সুবৃহৎ *Histoire litteraire du sentiment religieux en France* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের সুন্দরতম কতকগুলি পৃষ্ঠায় (প্রায় অর্ধেকখানিতে), বিশেষ করিয়া *La vie intense des mystique*" শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণনা দিয়াছেন। এই মহিলা মহাত্মা খৃস্টান পরিবেশের কঠোরতার মধ্যে থাকিয়াও রামকৃষ্ণের মতোই অনুভূতি, প্রেম, বুদ্ধি (উচ্চতম বুদ্ধিজাত প্রজ্ঞা পর্যন্ত) প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় মিলনের সকল স্তরগুলির মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং রামকৃষ্ণের মতোই তিনি তাঁহার উপলব্ধ ভগবানের সহিত ক্ষণেকের জন্য যোগাযোগ না হারাইয়াও হাতে-কলমে কাজ করিবার জন্য নামিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন:

"সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ঐক্যের দ্বারা ভগবান ও আত্মার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।...মানুষটির যদি করিবার মতো কিছু কাজ থাকে, তবে ভগবান তাহার মধ্যে যাহা করিতেছিলেন, সে অবিরামভাবে তাহারই অনুশীলন করিতে থাকিবে। উহাই তাহাকে আনন্দ দিবে, কারণ, তাহার ইন্দ্রিয়গুলি কাজে ব্যস্ত থাকায়, তাহার আত্মা সেগুলি হইতে মুক্ত থাকিবে।...নিষ্ক্রিয় উপাসনার তৃতীয় স্তরটি সর্বাপেক্ষা সুগভীর।...তখন ইন্দ্রিয়গুলি এমন মুক্ত থাকিবে যে, যে আত্মা ঐ মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা পরিপার্শ্বের প্রয়োজন অনুসারে বিক্ষিপ্ত না হইয়া-ও কর্ম করিতে পারিবে।...ভগবান তাহার আত্মার গভীরে কিরণ দিতে থাকেন।..."

সেণ্ট টেরেসার পুত্র ডন ক্লদ, তিনি-ও একজন 'সেণ্ট' ছিলেন, তিনি সেণ্ট টেরেসা সম্পর্কে বলেন:

"তাঁহার ক্ষেত্রে বাহিরের কর্মব্যস্ততা যেমন কখনো অন্তরের ঐক্যকে বিন্দুমাত্র-ও বিচ্ছিন্ন করে নাই, তেমনি অন্তরের ঐক্যবোধ-ও বাহিরের কর্মব্যস্ততাকে ব্যাহত করে নাই। মার্থা এবং মেরী-ও কখনো তাঁহাদের কর্মের মধ্যে ইহার অপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্য লাভ করেন নাই। তাঁহাদের একের ধ্যান কখনো অপরের কর্মের পথে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি করে নাই।..."

আমি আমার ভারতীয় বন্ধুগণকে (এবং আমার ইউরোপীয় বন্ধুগণকে, যাঁহারা সাধারণত এই সম্পদের কথা জানেন না) এই সুন্দর লেখাগুলি সযত্নে পড়িতে বলি। ত্রয়োদশ লুইএর রাজত্বকালে 'লয়ার' উপত্যকার এই বুর্জোয়ার জীবনে যেমনটি ঘটিয়াছিল, তেমনভাবে কোনো অতীন্দ্রিয়বাদেই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিখুঁত প্রতিভার সহিত সহজ অনুভূতিজাত জ্ঞানের মিলন হইয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

২ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সম্মিলনে (১লা এপ্রিল, ১৯২৬) বেলুড় মঠের মহান অধ্যক্ষ শিবানন্দ

সুতরাং পূর্ণ জ্ঞানের অসীম আত্মা এবং মায়ার খেলায় নিহিত আছে যে অহম্, তাহাদের মধ্যে অবিরাম আনাগোনার ফলেই আমরা জীবনের সকল শক্তির মিলনকে রক্ষা করিয়া চলি। ধ্যানের গভীরেই আমরা প্রেমের জন্য, কর্মের জন্য, কর্মে বিশ্বাস ও আনন্দের প্রয়োজনীয় যে শক্তি, তাহাকে আমাদের দিনগুলির কাঠামো রূপে পাই। কিন্তু প্রত্যেক কর্মকে উহা চিরন্তনের ঘাটে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। তীব্র কর্মের অন্তরে সনাতন শান্তি[1] বিরাজ করিতে থাকে এবং আত্মা একই সংগে জীবনের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে ও সংগ্রামের উর্ধ্বে ভাসিয়া থাকে। সার্বভৌম ভারসাম্য অধিগত হয়। এই সার্বভৌম ভারসাম্যই ছিল গীতার ও হেরাক্লিটাসের আদর্শ।

এইরূপ বলিয়াছিলেন :

"যদি ব্যক্তিগত আত্মা ও বিশ্বগত আত্মার মধ্যকার সকল পার্থক্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলাই সর্বোচ্চ আলোকলাভের উদ্দেশ্য হয়, এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সহিত ব্যক্তিগত আত্মার পরিপূর্ণ ঐক্য-স্থাপনই যদি উহার আদর্শ হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে স্বাভাবিকভাবে এই সিদ্ধান্ত আসে যে, তবে সাধকের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তাহাকে সকলের মঙ্গলের জন্যে আত্মোৎসর্গের আনন্দময় অবস্থায় ভিন্ন অন্য কোথা-ও লইয়া যাইতে পারে না। বিশ্বের সীমাগুলি কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত। সাধক এই সীমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গন করেন এবং এইভাবেই তিনি সর্বশেষে আপনাকে ভগবানের নিকট উৎসর্গ করেন।"

১ গীতা তুলনীয়। উহাই এখানে প্রয়োগমূলক বেদান্তের ১ম অধ্যায়ের প্রেরণা দিয়াছে।

৪

মানবের মহানগরী

ভারসাম্য ও সমন্বয়, এই তুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন-প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারিটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম—এই সমস্ত মানস পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সকল পথের কথা তিনি বলিয়াছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকটিরই স্ব স্ব সীমা ছিল, কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকটি পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চার ঘোড়ার গাড়ীর মতো সত্যের চারিটি পথের বল্গাকে তিনি ধরিয়া থাকিয়া একই সংগে সেই চারিটি পথের ঐক্যের[১] দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।

কিন্তু এই সামঞ্জস্যের সিদ্ধিকে রামকৃষ্ণের সংগিতময় ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ না করিলে এই "বিচারকের" দৃপ্ত বিচার-বুদ্ধিও ঐ সামঞ্জস্যের সূত্রকে আবিষ্কার করিতে পারিত না। এই দেবোপম গুরুদেব তাঁহার সহজ অনুভূতির মধ্য দিয়াই জীবনের সকল অসংগতিকেই মোৎসার্টের মতোই অপূর্ব এক মহাসংগতির মধ্যে সমন্বিত করিয়াছিলেন—সে সমন্বয় ছিল গ্রহলোকের সংগীতের মতোই সুমধুর ও সমৃদ্ধ। তাই এই মহান্ শিষ্যের সকল কর্ম ও চিন্তা রামকৃষ্ণের স্বাক্ষর লইয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

"এমন একজনের জন্মের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল, যাহার একই দেহের মধ্যে শংকরের দৃপ্ত বুদ্ধি এবং চৈতন্যের অপূর্ব উদার হৃদয় একত্রিত হইবে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একই মনোভাবকে, একই ভগবানকে, যে কাজ করিতে দেখিবে; যে সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিবে, যে গরীবের জন্য, দুর্বলের জন্য, নির্যাতিতের জন্য, ভারতের ভিতরে ও ভারতের বাহিরে জগতের সকলের জন্য কাঁদিবে; সেই সঙ্গে যাহার দৃপ্ত সুমহান বুদ্ধি এমন সকল সুমহৎ চিন্তার জন্ম দিবে, যাহা কেবল

১ তাঁহার ঠিক এই গুণটিই রামকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ঠিক এই গুণটির জন্যই তাঁহার সম্পর্কে পরে গিরিশ ঘোষ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন: "তোমাদের স্বামীজী যেমন পণ্ডিত ও জ্ঞানী, তেমনি ভগবৎ-প্রেমিক, মানবপ্রেমিক।" বিবেকানন্দ ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান ও শক্তির চারি প্রকার যোগেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং সেগুলির মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

ভারতে নহে, ভারতের বাহিরেও সকল বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইবে।...সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল, এইরূপ একটি মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল।...এইরূপ একজন মানুষের পদতলে বসিবার সৌভাগ্য আমি করিয়াছিলাম।...ভারতীয় ঋষিদের অমর কীর্তি উপনিষদগুলির ভাবের মূর্ত প্রকাশ, আধুনিক কালের মহর্ষি,...মূর্তিমান সংগতি, তিনি আসিয়াছিলেন।"[১]...

বিবেকানন্দ এই সংগতিকে, যাহা এক বিশেষ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে সফল হইয়াছিল, যাহা মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত মানুষ মাত্র উপভোগ করিতেছিলেন, সমস্ত ভারতময়, পৃথিবীময় প্রসারিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেখানেই ছিল তাঁহার সাহস ও স্বকীয়তা। তিনি নূতন কোনো চিন্তার সৃষ্টি করিতে না পারেন : তিনি ছিলেন মূলত ভারতের গর্ভজাত সন্তান, সেই অক্লান্ত রাণী পিপীলিকা যুগ যুগ ধরিয়া যে সকল ডিম্ব প্রসব করিয়াছিল, তিনি ছিলেন সেগুলিরই একটি। কিন্তু ভারতের সেই বিভিন্ন পিপীলিকারা কখনো মিলিত হইয়া একটি পিপীলিকার ঢিপি তৈয়ার করে নাই। তাহাদের পৃথক পৃথক চিন্তাগুলি রামকৃষ্ণের মধ্যে সংগতিময় রূপ লাভ না করা পর্যন্ত সেগুলি একত্রিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় নাই।[২] এইভাবেই বিবেকানন্দের নিকট সেগুলির দিব্য স্বরটিকে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, এবং বিবেকানন্দ সেই কঠিন ভিত্তির উপর মহানগরী—মানব নগরী—গড়িয়া তুলিতে বাহির হইয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল মহানগরী গড়িয়া তুলিলেই তাঁহার চলিবে না, তাহার অধিবাসীদের আত্মাগুলিকেও তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

১ "ভারতের ঋষিগণ" সম্পর্কে বক্তৃতা। (আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর) "ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ" সম্পর্কে বক্তৃতাগুলি এবং "বিভিন্ন স্তরে বেদান্ত" বিষয়ে (কলিকাতায় প্রদত্ত) বক্তৃতাগুলি দ্রষ্টব্য। এইগুলি হইতে আমি কতকগুলি বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং সেগুলিকে মূল রচনার মধ্যে বসাইয়া দিয়াছি।

২ "আমার এমন একটি মানুষের সহিত থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, যিনি ছিলেন যেমন উৎসাহী অদ্বৈতবাদী, তেমনি উৎসাহী ভক্ত, তেমনি উৎসাহী জ্ঞানী। এবং এই লোকটির সহিত থাকিতে গিয়াই সর্বপ্রথমে আমার উপনিষদগুলিকে টীকাকারদিগকে অনুসরণ না করিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বুঝিবার কথা মাথায় আসে।...আমি একটি জিনিস আবিষ্কার করি যে, সেগুলি দ্বৈতবাদী ধারণা লইয়া আরম্ভ করিয়াছে এবং শেষ করিয়াছে অদ্বৈতবাদী ধারণাসমূহের উচ্চ প্রশস্তির মধ্য দিয়া। ভারতের সকল ধর্মবিশ্বাসের পশ্চাতে যে সংগতি রহিয়াছে, এবং তাহার দুই রকম যে প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা দেখিতে পাই।—এই দ্বিবিধ ব্যাখ্যা হইল জ্যোতির্বিদ্যার ভূকেন্দ্রিক ও সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের মতো। ("ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ।" "বিভিন্ন স্তরে বেদান্ত"-ও দ্রষ্টব্য ১)

তাঁহার চিন্তা সম্পর্কে প্রামাণ্য-স্থানীয় ভারতীয় প্রতিনিধিরা স্বীকার করিয়াছেন যে, বিবেকানন্দ সংগঠন বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক শৃংখলা ও সুব্যবস্থিত প্রয়াস এবং প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ সংঘবদ্ধতার[১] দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, যাহার কেন্দ্রীয় মঠ, মাতৃমন্দির, আগামী বহু শতাব্দী ধরিয়া "রামকৃষ্ণের বস্তুগত দেহের প্রতিনিধিত্ব"[২] করিবে।

এই মঠ দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করিবেঃ "পুরুষরা জগতের উন্নতির জন্য নিজেদিগকে প্রস্তুত করিবে এবং সেই উদ্দেশ্যে মঠ তাহার মুক্তিলাভের" উপায় করিয়া দিবে। অপর একটি মঠ থাকিবে। সেটি স্ত্রীলোকদের জন্য উক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিবে। এই দুইটি মঠ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া থাকিবেঃ কারণ, বিবেকানন্দ পৃথিবীময় ভ্রমণ করিয়া এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা লাভ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, বর্তমানে পৃথিবীময় মানুষের উচ্চাশা ও প্রয়োজন একই রূপ। তাঁহার মনে হইয়াছিল, প্রাচীন "মহাভারতের" সেই প্রাচীন আদর্শকে, বিশ্বময় ধর্ম প্রচারের আদর্শকে, গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। অতীত কালে "ভগবানের নির্বাচিত জাতিগুলি" তাঁহাদের কর্তব্যকে একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদের সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করিতেন, এবং তাঁহাদের একই ধরণের সংকীর্ণ খাপের মধ্যে সকলকে ঢুকাইয়া ফেলিতে চাহিতেন। কিন্তু এই বৈদান্তিক প্রচারক সেরূপ কিছুই করিলেন না; তিনি তাঁহার নিজের নিয়ম অনুসারেই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিলেন। তিনি কেবল "ব্যক্তি ও জাতিকে তাহাদের স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ পন্থায় নিজ নিজ অন্তর-রাজ্য অধিকার করিবার জন্য পরিচালিত করিলেন।" মানুষের আত্মাকে পুনরায় জাগ্রত করিতে চাহিলেন। তাহার মধ্যে এমন কিছুই রহিল না, যাহাতে গর্বিততম জাতির দর্প-ও ক্ষুণ্ন হইতে পারে। কোনো জাতিকেই তাহার নিজস্ব পথ পরিত্যাগ করিতে বলা হইল না।[৩] বরং তাহাদের মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাঁহাকে মুক্ততম, উচ্চতম রূপে বিকশিত করিতে বলা হইল।

---

১ ইহা বেদের-ও আদর্শ ছিল: "সত্য এক, তবে উহা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।"

২ স্বামী শিবানন্দের মতে। ঠিক হুবহু এই কথাগুলিই মঠাধ্যক্ষ শিবানন্দ বলিয়াছিলেন এবং এগুলির সহিত খৃস্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠানের যে ভাবগত নৈকট্য রহিয়াছে তাহা-ও সুস্পষ্ট।

৩ "এমন কি যদি কোনো জাতির চরিত্র কেবল দোষগুলি দিয়াই গঠিত হয়, "তাহা হইলে-ও সেই জাতির চারিত্রিক দিকগুলিকে বাদ দেওয়ার কথা এমন কি মনে আনা-ও উচিত নয়।" (বিবেকানন্দ, ১৮৯৯-১৯০০)।

বিবেকানন্দ টলস্টয়ের চিন্তার কথা জানিতেন না। টলস্টয়ের চিন্তাগুলি সদয় হৃদয় এবং সৎ বুদ্ধি হইতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু টলস্টয়ের মতোই বিবেকানন্দ দেখিলেন যে, তাঁহার সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল তাঁহার সর্বপেক্ষা নিবটবর্তী প্রতিবেশীর প্রতি, তাঁহার আপন জাতির প্রতি। তাঁহার মধ্যে ভারতের যে স্পন্দন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বারে বারে তাহা এই পুস্তকে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাত্মার মূল ছিল মানবের মাটিতে; তাই উহার ভাবহীন দেহের সামান্যতম বেদনা-ও সমগ্র বৃক্ষটির মধ্যে গিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে।

বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত শতেক জাতি লইয়া গঠিত একটি মহাজাতির ঐক্যের মূর্ত প্রকাশ ছিলেন তিনি। ঐ মহাজতির মধ্যে প্রত্যেকটি জাতি আবার বহু বর্ণে ও উপবর্ণে বিভক্ত ছিল। রুগ্‌ণ ব্যক্তির রক্ত যেমন অতীব তরল থাকে এবং ঘনীভূত হয় না, তেমনি ছিল ঐ সকল জাতি। এবং বিবেকানন্দের আদর্শ ছিল কর্মে ও চিন্তায় ঐ জাতিগুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা। তিনি কেবল যুক্তি দিয়া ভারতের ঐ ঐক্যকে প্রমাণিত করেন নাই, তিনি আলোকের চকিত উদ্‌ভাসের মধ্য দিয়া ঐক্যকে ভারতের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতেই নিহিত ছিল তাঁহার মহানত্বের দাবী। চিত্তাকর্ষক এবং উদ্দীপনাময় শব্দগুলিকে চিত্তের চুল্লীতে পুড়াইয়া পিটাইয়া গড়িয়া তুলিবার একটি প্রতিভা ছিল তাঁহার—ঐ সকল শব্দ হাজার হাজার মানুষের হৃদয় ভেদ করিয়া পৌছিত। তাঁহার একটি বিখ্যাত কথা, যাহা সর্বপেক্ষা গভীরভাবে রেখাপাত করিত, তাহা হইল "দরিদ্র-নারায়ণ"।..."যে একমাত্র ভগবান আছেন, যে একমাত্র ভগবানে আমি বিশ্বাস করি...তিনি হইলেন সকল জাতির দীনদুঃখী ভগবান, দরিদ্র ভগবান।" সংগত-ভাবেই ইহা বলা চলে যে, ভারতের ভাগ্যকে বিবেকানন্দ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

উহার চিহ্ন—একটি ক্ষতের চিহ্ন—গত বিশ বৎসর ভারতে যে সকল সর্বাপেক্ষা অর্থময় ঘটনা ঘটিয়াছে, সেগুলির মধ্যে দেখা যায়। ঐ চিহ্ন ছিল ক্রুশে বিদ্ধ মানবপুত্রের হৃদয়ভেদী অস্ত্রের আঘাত-চিহ্নের মতো। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (একটি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান) স্বরাজ দল যখন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে জয়লাভ করিলেন, তখন তাঁহারা সমাজ সেবার জন্য একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করিলেন, তাঁহারা তাহার নাম দিলেন 'দরিদ্র-নারায়ণ সূচী'। ঐ হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি পুনরায় গান্ধীজী গ্রহণ করেন এবং সেগুলিকে তিনি অবিরাম ব্যবহার করিতে থাকেন। একই সময়ে একই সংগে ধর্মীয় ধ্যানধারণার সহিত

নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সেবাকে গ্রন্থিবদ্ধ করা হইয়াছিল। "তিনি সেবাকে এক দিব্য জ্যোতি দিয়া ঘিরিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাহাকে ধর্মের মহিমা দিয়াছিলেন।" ঐ ভাবটি ভারতের কল্পনাকে পাইয়া বসিয়াছিল। দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, অগ্নিকাণ্ডে ও মহামারীতে সাহায্য দান, সেবাশ্রম ও সেবাসমিতি সমস্ত দেশময় হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছিল। অথচ ত্রিশ বৎসর পূর্বে উহা দেশে এক রকম অজ্ঞাতই ছিল। বিশুদ্ধ ধ্যানধারণাগত ধর্ম-বিশ্বাসের স্বার্থপরতায় একটি কঠিন আঘাত পড়িয়াছিল। করুণাময় রামকৃষ্ণের একটি উক্তি আমি পূর্বেই উদ্‌ধৃত করিয়াছি——"খালি পেটে ধর্ম হয় না।" এই কঠোর কথাগুলির মধ্যে এই শিক্ষাই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতাকে জাগাইবার ইচ্ছাটাকে তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া, তাহাদিগকে খাদ্য আনিয়া দেওয়াই যথেষ্ট নহে; কি ভাবে তাহারা নিজেরা খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে, খাদ্যের জন্য কাজ করিতে পারে, তাহাও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। সেজন্য তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপে ইহা বিবেকানন্দের ইচ্ছা অনুসারে—তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দল হইতে কঠোরভাবে দূরে থাকিলে-ও—সমাজ সংস্কারের একটি পরিপূর্ণ সূচীকে গ্রহণ করিয়াছে। অন্য পক্ষে, ইহাই ছিল ভারতের অধ্যাত্ম জীবন ও কর্ম জীবনের মধ্যে যুগ-যুগব্যাপী এক সংগ্রামের সমাধান। দরিদ্রের সেবা কেবল দরিদ্রকে সাহায্য করে না, তাহা আরও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে সাহায্যকারীকে। প্রাচীন প্রবচন রহিয়াছে, "যে দেয়, সে লয়।" সেবা যদি সত্যকার পূজার মনোভাবে লইয়া করা হয়, তবে তাহা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পক্ষে সর্বপেক্ষা ফলপ্রসূ হয়। কেননা, "মানুষ নিঃসংশয়ে ভগবানের উচ্চতম প্রতীক এবং মানুষের পূজাই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা।"[১]

"মুমূর্ষুর জীবন রক্ষার জন্য জীবন দিয়া কাজ আরম্ভ কর; ইহাই ধর্মের কথা।[২]

১ মঠাধ্যক্ষ শিবানন্দ তাঁহার ১৯২৬ খৃস্টাব্দের সভাপতির অভিভাষণে এই কথাগুলি স্মরণ করেন।

২ ১৮৯৯ সালের এক মহামারীর সময়ে এক পণ্ডিতকে বিবেকানন্দ এই কথাগুলি বলেন। এই পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন; তিনি বিবেকানন্দের সহিত ধর্মালোচনা করিতে পাইলেন না বলিয়া অনুযোগ করেন। উত্তরে বিবেকানন্দ বলেন:

"আমার দেশের একটি কুকুর-ও যখন অনাহারে থাকিবে, তখন আমার সমগ্র ধর্মের কর্তব্য হইবে তাহাকে খাইতে দেওয়া।"

ঊষর চিন্তার চোরাবালিতে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরিয়া নিমজ্জিত ছিল। সেই চোরাবালি হইতে ভারতবর্ষকে তাহার একজন সন্ন্যাসীই টানিয়া তুলিলেন। তাহার ফলে অতীন্দ্রিয়বাদের ভাণ্ডারে এতোদিন যে শক্তি সুপ্ত ছিল, তাহা সকল বাধার বাঁধ ভাঙিয়া কর্মে তরঙ্গের পর তরঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল। এই ভাবে যে প্রচণ্ড শক্তি মুক্তিলাভ করিল, তাহার সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের সচেতন থাকা উচিত।

জগৎ তাহার মুখামুখি দেখিয়াছে এক জাগ্রত ভারতকে। এক বিশাল অন্তরীপের সমগ্র আয়তন ভরিয়া শায়িত ভারতের বিরাট দেহ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করিয়া তাহার বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করিতেছে। গত শতাব্দীর তিন পুরুষ ধরিয়া তূর্যবাদকরা এই নবজাগৃতিতে যে ভূমিকাই গ্রহণ করুন না কেন—(তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃত অগ্রদূত ছিলেন রামমোহন রায়, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি) চূড়ান্ত তূর্যনিনাদ হইয়াছিল কলম্বো এবং মাদ্রাজে প্রদত্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলিতে। এবং সে ঐন্দ্রজালিক ধ্বনি ছিল ঐক্যের ধ্বনি। ভারতের প্রত্যেক নরনারীর ঐক্য (সেই সংগে বিশ্বের ঐক্য-ও), স্বপ্ন, কর্ম, যুক্তি, প্রেম—সকল মানস-শক্তির ঐক্য; ভারতের শত জাতির এবং তাহাদের ভাষার, এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের অন্তঃস্থল, এক ধর্মীয় কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত শতসহস্র দেবতার ঐক্য।[১] হিন্দু ধর্মের সহস্র সম্প্রদায়ের ঐক্য।[২] ধর্মীয় চিন্তায় মহাসমুদ্রের অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সকল স্রোতস্বতীর ঐক্য। কারণ,—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জাগরণের সহিত রামমোহন ও ব্রাহ্ম সমাজের জাগরণের পার্থক্য এখানেই নিহিত আছে—এখন ভারত পাশ্চাত্যের এই উদ্ধত সভ্যতার প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহে না, সে তাহার নিজস্ব চিন্তাগুলিকে রক্ষা করিতে চাহে, সে দৃঢ় পদক্ষেপে তাহার যুগব্যাপী অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে তাহার কিছুমাত্র ত্যাগ করিবে না, তবে সে তাহার ঐতিহ্য হইতে জগৎকে উপকৃত হইতে দিবে এবং তাহার বিনিময়ে গ্রহণ করিবে পাশ্চাত্য যাহা তাহার

১ তাঁহার অন্তিম সময়ে তিনি আবার বলিয়াছিলেন: "ভারত যদি তাহার ভগবৎ-সন্ধান চালাইয়া যায়, তবে সে মরিবে না। সে যদি রাজনীতির জন্য ইহাকে পরিত্যাগ করে, তবে সে মরিবে।" ভারতের প্রথম জাতীয় আন্দোলন—স্বদেশী আন্দোলন—ভারতের কর্তব্যকে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল এবং এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা অরবিন্দ ঘোষ বিবেকানন্দের এই কথাগুলিকে সমর্থন করিয়াছিলেন।

২ বিবেকানন্দের কীর্তির প্রধান ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক দিকগুলির একটি হইল হিন্দু ধর্মের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করা ও তাহা ঘোষণা করা।

বুদ্ধির দ্বারা জয় করিয়াছে, তাহাকে। কোনো অসম্পূর্ণ ও আংশিক সভ্যতার প্রাধান্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে। এশিয়া ও ইউরোপ, এই দুই অতিকায় পুরুষ, এই সর্বপ্রথম সমানভাবে পরস্পর মুখামুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে তাহারা একত্রে কাজ করিবে, তাহাদের পরিশ্রমের ফসল সকলে এক সংগে ভোগ করিবে।

এই 'মহত্তর ভারত', এই নূতনতর ভারত—যাহার বিকাশের কথা রাজনীতি-করা ও পণ্ডিতরা উট পাখীর মতো আমাদের নিকট এতোদিন লুকাইয়া আসিয়াছেন এবং যাহার বিস্ময়কর প্রভাব এখন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—রামকৃষ্ণের আত্মায় তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। পরমহংসের এবং যে বীর পরমহংসের চিন্তাকে কর্মে পরিণত করিয়াছিলেন তাঁহার যুগল নক্ষত্র বর্তমানে ভারতকে প্রভাবিতও পরিচালিত করিতেছে। তাঁহাদের উষ্ণ জ্যোতি ভারতের মৃত্তিকার মধ্যে ময়ানের মতো কাজ করিয়া তাহাকে উর্বর করিতেছে। ভারতের বর্তমান নেতারা, —মনীষীদের রাজা, কবিদের রাজা, মাহাত্মা—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী—এই রাজহংস ও ঈগলের যুগ্ম নক্ষত্রের আলোকে বিকশিত, কুসুমিত ও ফলভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অরবিন্দ এবং গান্ধী প্রকাশ্যে একথা স্বীকার-ও করিয়াছেন।[১]

১ গান্ধী প্রকাশ্যভাবেই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, বিবেকানন্দের রচনাগুলি হইতে তিনি প্রচুর সাহায্য পাইয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে আরো ভালোবাসিতে ও আরো ভালো করিয়া বুঝিতে সেগুলি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। তিনি "রামকৃষ্ণের জীবন" পুস্তকের একটি ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের স্মৃতি বার্ষিকী উৎসবের কয়েকটিতে যোগ-ও দিয়াছিলেন।

স্বামী অশোকানন্দ আমাকে লিখিয়াছেন যে, "অরবিন্দ ঘোষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক জীবন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। তিনি সর্বদাই অক্লান্তভাবে বিবেকানন্দের ধারণাগুলির গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।"

এবং যাঁহার গ্যেটে-সদৃশ প্রতিভা ভারতের সকল নদীর সঙ্গম-স্থলে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একথা ধরিয়া লওয়া চলে যে, তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের (ইহা তাঁহার মধ্যে তাঁহার পিতা মহর্ষি কর্তৃক সঞ্চারিত হইয়াছিল) এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নয়া বেদান্তবাদের দুই স্রোতধারা মিলিত হইয়া সংগতিলাভ করিয়াছিল। তিনি উভয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া এবং উভয় হইতে মুক্ত থাকিয়া তাঁহার নিজের মানসলোকে প্রশান্তচিত্তে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটাইয়াছিলেন। সমাজ ও জাতির দিক হইতে বিচার করিলে তিনি তাঁহার নিজস্ব ধারণাগুলিকে প্রকাশ্যভাবে—আমার যদি ভুল না হয়—সর্বপ্রথম ঘোষণা করিয়াছিলেন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভের সময়ে, ১৯০৬ সালে, বিবেকানন্দের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে। বিবেকানন্দের মতো একজন অগ্রদূতের প্রভাব যে তাঁহার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

কতিপয় বিচ্ছিন্ন অ্যাংলো-স্যাকসন দল ছাড়া এই বিস্ময়কর আন্দোলন সম্বন্ধে অবশিষ্ট জগত অন্ধকারেই রহিয়াছে। আমার মনে হয়, এই আন্দোলনের দ্বারা তাহাদের উপকৃত হইবার সময় আসিয়াছে। এই পুস্তকে যাঁহারা আমার বক্তব্য উপলব্ধি করিয়াছেন, এই ভারতীয় স্বামী এবং তাঁহার আচার্য দেবের চিন্তাগুলির সহিত আমাদের অন্তরের অনেক চিন্তার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে, তাহা তাঁহারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন। কেবল আমার নিজের দিক হইতে নহে, বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার যে শত শত মানুষ আমাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের মনের কথা জানাইয়াছেন, তাঁহাদের বুদ্ধিগত স্বীকৃতির ফল হিসাবেও এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। ভারতীয় ভাবধারার অনুপ্রবেশের ফলে তাহার দ্বারা নির্বোধের মতো তাঁহারা বা আমি সংক্রামিত হইয়াছি বলিয়া যে ইহা ঘটিয়াছে, এমন নহে। ভারতীয় ভাবধারার প্রভাবের কথা রামকৃষ্ণ মিশনের কোনা কোনো প্রতিনিধি অবশ্য বিশ্বাস করেন। আমি এ বিষয়ে স্বামী অশোকানন্দের সহিত আলোচনা করিয়াছি। অশোকানন্দের ধারণা এইরূপ যে, বৈদান্তিক ভাবধারা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং সেজন্য বিবেকানন্দ ও তাঁহার মিশন অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে দায়ী। আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। বিবেকানন্দের কর্ম, চিন্তা, এমন কি, নাম সম্পর্কে-ও পাশ্চাত্য জগৎ প্রায় অন্ধকারেই ছিল।[১] (সে ত্রুটি আমি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছি।) এবং ইউরোপ ও আমেরিকার দগ্ধ মৃত্তিকাকে সজীব ও উর্বর করিয়া তুলিবার জন্য যে সকল ভাবের বন্যা আসিয়াছিল, তাহাদের একটিকে যদি "বৈদান্তিক" আখ্যা দেওয়া যায়, তবে তাহা ঠিক সেইভাবে ঘটিয়াছিল, যে-ভাবে মসিয়ে ঝুরদেঁর স্বাভাবিক ভাষা[২] তাহার অজ্ঞাতসারে "গদ্যই ছিল, কারণ, গদ্যই ছিল মানুষের চিন্তার স্বাভাবিক মাধ্যম।"

এই তথাকথিত মূলত বৈদান্তিক ভাবগুলি কি? আধুনিক রামকৃষ্ণপন্থী বেদান্ত-বাদীদের একজন শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক মুখপাত্রের মতে বৈদান্তিক ভাবগুলিকে দুইটি মূলনীতিতে বিভক্ত করা যায়ঃ

---

১ সর্বাপেক্ষা অর্থপূর্ণ বিষয়গুলির অন্যতম হইল এই যে, ইউরোপ-ভ্রমণকালে তিনি যে সেকল দার্শনিক ও পণ্ডিত মহলে ঘুরিয়াছিলেন, সেই সকল মহলে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শোপেনহাউয়ের গেসেলশাফ্‌টের মহলে আমিই পল ডিউসেনের শিষ্য ও উত্তরাধিকারীদিগকে বিবেকানন্দের নাম শিখাইয়াছিলাম বলা চলে। অথচ বিবেকানন্দ পল ডিউসেনের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন এবং পল ডিউসেনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

২ ফরাসী দেশের একটি জনপ্রিয় চরিত্র। এটি মলিয়েরের হাস্যরসাত্মক নাটক "ল্য বুর্জোয়া জাঁতিলোম"-এর ("শহুরে বাবু-র") মধ্যে রহিয়াছে।

১। মানুষের দেবত্ব।

২। জীবনের অপরিহার্য আধ্যাত্মিকতা।

এবং তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তগুলি অচিরে আসে :

১। মানুষের মধ্যে যে সর্বশক্তিমান সত্তা সুপ্ত রহিয়াছে, তাহারই ভিত্তিতে প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং প্রত্যেক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত।

২। এবং, সে বিষয়ে সফল হইবার জন্য, মানুষের সকল কার্যকে জীবনের আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত ভাব অনুসারে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।[1]

এই ভাবগুলি এবং আদর্শগুলি পাশ্চাত্যের নিকট অপরিচিত নহে। আমাদের এশিয়াবাসী বন্ধুরা, যাঁহারা আমাদের রাজনীতিবিদ্‌দিগকে, আমাদের ব্যবসায়ী-দিগকে, আমাদের সংকীর্ণমনা রাজকর্মচারীদিগকে, আমাদের "হিংস্র নেকড়ে-দিগকে, যাহাদের দংষ্ট্রাই হইল বাণী", আমাদের সমগ্র ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে (তাহার ব্যক্তি ও চিন্তাধারাকে)—আমাদের দেউলিয়াদিগকে—দেখিয়া ইউরোপের বিচার করেন, আমাদের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে তাঁহাদের সংশয় পোষণ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহা হইলে-ও এই আধ্যাত্মিকতা গভীর ও বাস্তব, উহা আমাদের পাশ্চাত্যের মহান জাতিগুলির মৃত্তিকার তলদেশকে সিঞ্চিত করিতে কখনো বিরত হয় নাই। ইউরোপের মহামহীরুহের চতুর্দিকে যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, মৃত্তিকার নিঃশব্দ ভাণ্ডার হইতে এই শক্তিমান আধ্যাত্মিকতার রসধারা যদি অবিরাম উত্থিত না হইত, তবে বহু পূর্বেই সে মহীরুহ ভূলুণ্ঠিত হইত। তাঁহারা আমাদিগকে কর্ম-প্রতিভা বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু অন্তর্নিহিত অগ্নিকে বাদ দিয়া যুগব্যাপী কর্মের অক্লান্ত উত্তেজনা কখনোই সম্ভব নহে। ঐ অগ্নি দেব-দাসীদের দীপালোক ছিল না, উহা ছিল সাইক্লোপের অগ্নিকুণ্ড, যেখানে দাহ্য সকল বস্তুই অবিরত সঞ্চিত এবং দগ্ধ হইতেছে। বর্তমান পুস্তকের লেখক ঐ আগ্নেয় গিরির ধূম ও অগ্নিহীন অঙ্গারকে—ইউরোপের বাজারকে[2]—কঠোরভাবে নিন্দা করিয়াছে, তাই তাহার পক্ষে আমাদের অফুরন্ত আধ্যাত্মিকতার সেই অগ্নিময় উৎসের কথা বলা সম্ভব হইয়াছে। এই আধ্যাত্মিকতার অস্তিত্বের কথা, "শ্রেষ্ঠতর

১ আমি এখানে স্বামী অশোকানন্দের উল্লেখযোগ্য একটি পত্রের (১১ ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭) উপর নির্ভর করিয়াছি। গুরুত্ব ও মূল্যের দিক হইতে এই পত্রটিকে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি ঘোষণা বলা চলে। উহা আমার জবাবগুলির সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

২ রোমাঁ রোলাঁ-রচিত জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাসের একটি খণ্ডের নাম। উহাতে রোলাঁ পাশ্চাত্যের ক্ষণজীবী প্রতিভাদের ও তাঁহাদের নয়া মতবাদগুলির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।—অনুঃ।

ইউরোপের" অপরাজেয় অনিবার্যতার কথা, যাঁহারা নীরব থাকেন, যাঁহারা তাহাকে বুঝিতে ভুল করেন, সেই ইউরোপের বাহিরের লোকের কাছে, এবং ইউরোপের লোকের কাছে, ক্রমাগত বলিয়া আসিয়াছে। *"Silet sed loquitur!"*[১] কিন্তু ইউরোপের নীরবতা হাতুড়েদের অর্থহীন প্রলাপের অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট। উপরিভাগে প্রতি দিনের ও প্রতি ঘণ্টার আবর্তে ভোগ ও শক্তির উন্মত্ততায় ইউরোপ নিজেকে মগ্ন করিলে-ও তাহার তলদেশে ত্যাগের, আত্মদানের, আধ্যাত্মিক মনোভাবের অবিরাম বিরাট এক ঐশ্বর্য সর্বদাই বর্তমান আছে।

মানুষের দেবত্ব সম্পর্কে বলা চলে, খৃস্টান ধর্ম ও গ্রীক-রোমীয় সংস্কৃতিকে পৃথক ভাবে বিচার করিলে এই ভাবটি সম্ভবত তাহাদের অন্যতম ফসল নয়।[২] ভগবানের পুত্রের শোণিত যাহার স্বর্ণাভ রসধারা সেই দ্রাক্ষালতার সহিত গ্রীক-রোমীয় শৌর্যের বৃক্ষকে জোড়-কলমে জুড়িয়া দিলে তাহা হইতে যে ফসল ফলিবে, উহা তাহাই।[৩] উহা খৃস্টান ধর্মের দ্রাক্ষা লতাকে বা দ্রাক্ষা নিষ্পেষণের যন্ত্রকে স্মরণ রাখুক বা না রাখুক, আমাদের মহান গণতন্ত্রগুলির শৌর্যময় আদর্শের মধ্যে

---

১ "সে নীরব হইলে-ও মুখর।"

২ স্বামী অশোকানন্দ আমাকে লিখিয়াছিলেন: "এই সকল ধারণা পাশ্চাত্য কিভাবে পাইল? খৃস্টান ধর্ম বা গ্রীক-রোমীয় সংস্কৃতি সেগুলির পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল বলিয়া আমি মনে করি না।..."

কিন্তু ইউরোপ যে কেবল গ্রীক-রোমীয় সংস্কৃতি দিয়া গঠিত নয়, এই তথ্যটি দেখাইয়া স্বামী অশোকানন্দের প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব। ভূমধ্যসাগরীয় একদল লোক ঐ কথা বলিয়া গর্ব করেন বটে, কিন্তু আমরা উহা স্বীকার করি না। উহাতে পাশ্চাত্যের আদিম জাতিগুলির প্রাথমিক কীর্তি-গুলিকে অস্বীকার করা হইয়াছে। যে সকল বিরাট অভিযানের স্রোত তাহাদের উর্বর পলিমাটি লইয়া ফ্রান্স ও "মিটেল ইউরোপকে" প্লাবিত করিয়াছিল, সেগুলিকে-ও উহাতে ধরা হয় নাই। মাইস্টার একহার্ট ও শ্রেষ্ঠ পথিকদের নিম্নলিখিত বাণীকে বিস্মৃত হইতে দেওয়া হইয়াছে:

"আমি যখন ভগবানের সেই অতল গভীরে দাঁড়াইয়া থাকি, তখন আমার মধ্য দিয়াই ভগবান সকল কিছুকে সৃষ্টি করেন।"

এবং এই ঘটনা হইতে কি প্রমাণিত হয় না যে, পাশ্চাত্যের আত্মার সুগভীরে-ও এই সকল ক্ষণপ্রভ স্বজ্ঞাগুলি অসাধারণ ভাবেই বর্তমান ছিল এবং সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফিক্‌টের সংগে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং এই ফিক্‌টে ছিলেন হিন্দু চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ? ফিক্‌টে এবং শঙ্করের দুই-একটি রচনাংশ পাশাপাশি রাখিয়া সেগুলির পরিপূর্ণ ভাবসাদৃশ্য দেখানো সম্ভব। (রুডল্‌ফ্ অটো-কৃত "ফিক্‌টে ও অদ্বৈত" সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

৩ আমি ইতিপূর্বেই দেখাইয়াছি যে, গ্রীস ও ইহুদি-খৃস্টান ধর্মের দুইটি উৎস হইতে পাশ্চাত্যের মহান চিন্তাধারা শুরু হইবার সময়ে পাশ্চাত্যের ও বেদান্তের চিন্তাধারা একই ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বা তাহাদের নেতাদের মধ্যে এই দ্রাক্ষার স্বাদ ও গন্ধ আজিও বর্তমান।[১] যে ধর্মের ভগবান ইউরোপের জনসাধারণের কাছে উনিশ শতাব্দী ধরিয়া "মানব-পুত্র" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, মানুষ যে সে ধর্মের কথাকে মানিয়া লইবে এবং নিজের উপর দোষারোপ করিবে, তাহাতে সেই ধর্ম বিস্মিত হইতে পারে না। যে বিজ্ঞান গত অর্ধ শতাব্দীতে পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে, তাহার বিস্ময়কর বিজয় কাহিনী ইউরোপবাসীর শক্তির নূতন চেতনাকে এবং তরুণ মুক্তির উন্মাদনাকে আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। ভারতের বিনা সাহায্যেই সেখানে মানুষ নিজেকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে।[২] নিজের কাছে নতজানু হইয়া নিজের পূজা করিতে সে অতি-বেশী প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার শক্তির এই অত্যধিক মূল্যবোধ ১৯১৪ খৃস্টাব্দের মহাসঙ্কটের ঠিক পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ঐ মহাসংকট তাহার সমস্ত ভিত্তিমূলগুলিকেই বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং ঐ সংকটমুহূর্ত হইতেই তাহার উপর ভারতীয় চিন্তার আকর্ষণ ও প্রভাব আবিষ্কার করা যাইতেছে। কিভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা যায়?

খুব সহজ ভাবেই। তাহার নিজের পথগুলিই পাশ্চাত্যবাসীকে তাহার যুক্তি, তাহার বিজ্ঞান ও তাহার অতিকায় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চৌমাথায় পৌছাইয়া দিয়াছিল; সেখানেই সে বৈদান্তিক চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাইয়াছে। এই চিন্তা ছিল আমাদের একই মহান পূর্ব-পুরুষদের, আর্য অর্ধ-দেবতার সন্ততি। এই আর্য অর্ধ-দেবতারা তাঁহাদের বীর্যবান্ যৌবনের বিকশিত অবস্থায়, ইতালি জয় শেষে বোনাপার্তের মতোই, হিমালয়ের শিখরভূমি হইতে তাঁহাদর পদতলে বিস্তৃত সমস্ত পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শক্তির পরীক্ষা আসিল, তখন পাশ্চাত্যবাসীরা তাঁহাদের নির্বাচনে ভুল করিলেন। (এই পরীক্ষার কথা সকল দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের যিশুর জীবন ও বাণীতে উহা পর্বতে যিশুর প্রলোভন নামে বর্ণিত হইয়াছে।) প্রলুব্ধকারী পাশ্চাত্যবাসীকে তাহার পদতলে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সাম্রাজ্য দিতে

১ সেন্ট য্যুস্তের মতো শ্রেষ্ঠ করাসী বিপ্লবীদের শক্তিমান উক্তিগুলি ইহার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ঐগুলিতে অদ্ভুতভাবে বাইবেল ও প্লুতার্ক, উভয়ের, ছাপ সুস্পষ্ট।

২ মিশ্লের মতো ভাববাদী মনীষীরা যে তাঁহাদের স্বরচিত "মানবতার বাইবেলের" বিস্মৃত পূর্ব-পুরুষদিগকে ভারতে দেখিতে পাইয়া আনন্দ-উত্তেজনা অনুভব করিয়াছেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। আমার ক্ষেত্রে-ও অনুরূপটি ঘটিয়াছিল। ('মানবতার বাইবেল' মিশ্লে রচিত একখানি পুস্তক। এই পুস্তক হইতেই একটি উদ্ধৃতি আমার 'রামকৃষ্ণের জীবন' গ্রন্থের মুখবন্ধরূপে আমি ব্যবহার করিয়াছি।)

চাহিল। পাশ্চাত্যবাসী এই প্রলুব্ধকারীর কথাতেই কান দিল। সে নিজের উপর যে দেবত্ব আরোপ করিয়াছিল, তাহা হইতে সে বস্তুগত শক্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখিল না বা খুঁজিল না। এই বস্তুগত শক্তিকে ভারতীয় জ্ঞানিগণ যে অন্তরতর শক্তি মানুষকে তাহার লক্ষ্যে লইয়া যায়, তাহার গৌণ ও বিপজ্জনক দিক বলিয়াছেন।[১] তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ইউরোপের ঐ "শিক্ষার্থী যাদুকর" নিজে[২] যে আদিম শক্তিগুলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিল, সেগুলির হস্তেই সে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, সেগুলিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, তাহার সাঙ্কেতিক অক্ষর ছাড়া আর কিছুই তাহার জানা ছিল না। ঐ দিকটি সে ভাবিয়া দেখে নাই। আমাদের সভ্যতা তাহার ভয়ঙ্কর সংকটের দিনে স্বাধিকার, স্বাধীনতা, সহযোগিতা, ওয়াশিংটনে বা জেনেভায় শান্তি সম্মিলন—এই সকল বড় বড় কথা মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করিয়াছে। কিন্তু এই সকল কথা হয় শূন্যগর্ভ, নয় বিষাক্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ। কেহ ঐ সকল কথায় বিশ্বাস করে না। বিস্ফোরককে মানুষ অবিশ্বাস করে। ঐ সকল কথার পশ্চাতে অমঙ্গল আসে এবং বিভ্রান্তিকে বিভ্রান্ততর করিয়া তোলে। বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতে মানুষ যে মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগিতেছে, আমরা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝিয়াছি। এবং এই ভুল বোঝার ফলেই সমাজের হীন শ্রেণীর লোকেরা ঐ অবস্থাটাকে কাজে লাগাইতেছে এবং অস্ফুট স্বরে বলিতেছে: "আমরা এবং আমাদের পরেই মহাবন্যা!" কিন্তু লক্ষ লক্ষ অসুখী মানুষ মারাত্মকভাবে তাড়িত হইয়া পথের চৌমাথায় আসিয়া পৌছিয়াছে। সেখানে তাহারা হয় তাহাদের স্বাধীনতার অবশেষটুকু ত্যাগ করিবে—এই ত্যাগের অর্থ হইল নিরুৎসাহ আত্মাকে নিষ্প্রাণ শৃংখলার খোঁয়াড়ে

১ আমি আমার পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, এই সকল গুণের কথা, এই সকল শক্তির কথা, বিবেকানন্দ কখনো অস্বীকার করেন নাই। একজন খৃস্টানসাধক যেমনই করিতে পারিতেন, সেভাবে তিনি ঐগুলিকে খাটো করিয়া দেখেন নাই। দেহ ও আত্মার দুর্বলতাকে তিনি সর্বদাই নিন্দা করিয়াছেন। ঐরূপ দুর্বলতাজনিত হীন শান্তির অপেক্ষা ঐ সকল শক্তি উচ্চতর ছিল। কিন্তু যে প্রাসাদশীর্ষ হইতে সমস্ত প্রাসাদ ও দিকবলয় দৃষ্টিগোচর হয়, সেখান হইতে ঐগুলি ছিল নিম্নতর। ঐ প্রাসাদশীর্ষে পৌছিতে হইলে অবিরাম উঠিতে হইবে। আমি রাজযোগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যাহা বলিয়াছি তাহা দ্রষ্টব্য।

২ গ্যেটের একটি বিখ্যাত কবিতার নাম—"শিক্ষার্থী জাদুকর।" এই কবিতাটি প্রায়ই উদ্‌ধৃত হয়। শিক্ষার্থী জাদুকর তাহার গুরুর অনুপস্থিতিতে জাদু শক্তিগুলিকে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু সেগুলিকে সে পুনরায় বশে আনিতে পারে না, ফলে সেগুলির কবলে পড়ে।

আবদ্ধ করা, যেখানে তাহা অন্যান্যদের সহিত ঠাসাঠাসি হইয়া উত্তাপে থাকিতে পারিবে—নয় সে রাত্রির মহাশূন্যতাকে গ্রহণ করিবে, যে শূন্যতা তাহাকে অবরুদ্ধ আত্মার অন্তঃস্থলে লইয়া যাইবে এবং এই অবরুদ্ধ আত্মার মধ্যে তখনো যে শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে তাহার সহিত মিলিত হইয়া আত্মার অটল দুর্গে (*Feste Burge*)[১] নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

এখানেই আমরা আমাদের বন্ধুদের, ভারতীয় মনীষীদের, প্রসারিত হস্ত দেখিতে পাই : কারণ, তাঁহারা বিগত বহু শতাব্দী ধরিয়া এই অটল দুর্গে কিভাবে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিতে হয়, কিভাবে এই অটল দুর্গকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা শিখিয়াছেন। আর ঐ সময়ে আমরা, তাঁহাদের "মহান আক্রমণের" সহযাত্রীরা, বাকী জগৎকে জয় করিয়া আমাদের শক্তি ক্ষয় করিয়াছি। এখন আমাদের থামিয়া দম লইতে হইবে! আমাদের ক্ষতগুলি ধৌত করিতে হইবে! আমাদিগকে সেই হিমালয়ের ঈগলের নীড়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে! সে নীড় আমাদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, কারণ, সে নীড় আমাদের-ই। আমাদের, ইউরোপের ঈগলদের, স্বভাবের কোনো অংশকেই বিসর্জন দিতে হইবে না। আমাদের প্রকৃত স্বভাব ঐ নীড়েই রহিয়াছে। কারণ, ঐ নীড় হইতেই একদিন আমরা আকাশে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমাদের স্বভাব তাঁহাদের মধ্যেই বাস করিতেছে, যাঁহারা সেই পরম সত্তার চাবি কাঠিটি রাখিতে জানিয়াছেন। আমরা কেবল আমাদের ক্লান্ত দেহকে বিশ্রামের জন্য এই মহান অন্তরতর হ্রদে ভাসাইয়া দিব। বন্ধুগণ, পরে যখন তোমাদের জ্বরের উত্তাপ কমিবে, তোমাদের পেশীতে নূতন শক্তি প্রবাহিত হইবে, তখন যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তখন তোমরা তোমাদের 'আক্রমণ' আবার নূতন করিয়া শুরু করিও। যদি ইহাই 'নিয়ম' হইয়া থাকে, তবে নূতন চক্রের আবর্তন শুরু হোক্। কিন্তু আবার নূতন করিয়া উড়িবার আগে এখন আন্টিয়ুসের মতো[২] মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার সময় আসিয়াছে। মৃত্তিকাকে আলিঙ্গন কর! তোমাদের চিন্তাগুলি 'মাতার' নিকটে ফিরিয়া যাক্! মাতৃস্তন্য পান কর! পৃথিবীর সকল জাতিকে পালন করিবার মতো শক্তি এখনো মাতার অধিকারে আছে। ইউরোপের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক ধ্বংসস্তূপের

১ "নিশ্চিত দুর্গ" (লুথারের বিখ্যাত ধর্ম-সংগীতে এই কথাগুলি আছে।)

২ গ্রীক উপকথায় বর্ণিত বীর। যতোক্ষণ সে মৃত্তিকাকে স্পর্শ করিয়া থাকিত, ততক্ষণ সে ছিল অমর, অজেয়।—অনুঃ।

মধ্যে "ভারত মাতা" তোমাদিগকে তোমাদের মহানগরীর অটল ভিত্তিকে খুঁড়িয়া বাহির করিতে শিক্ষা দিবেন। তাঁহার কাছে "মহান শিল্পীর"[১] আনুমানিক ব্যয়ের ফর্দ ও নক্সাগুলি সঞ্চিত রহিয়াছে। এস, আমাদের নিজেদের মালমসলা দিয়া আমরা আমাদের নিজ গৃহ পুনরায় নির্মাণ করি।

১ "মহা শিল্পী" কথাগুলি আমাদের গথিক ক্যাথেড্রেলের স্থপতিদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত।

৫

কুকুর সম্পর্কে সাবধান!

ভারতের এই মহান শিক্ষা যে একেবারে নিরাপদ নহে, একথা আমি গোপন করিতে চাহি না। উহার যে কতকগুলি নিজস্ব বিপদ আছে, এই ব্যাপারটিকে স্বীকার করিতেই হইবে। আত্মার (পরম সত্তার) ধারণাটিতে এমন উন্মাদনা আছে যে, উহাতে দুর্বল মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া যাইবার আশংকা আছে। বিবেকানন্দও যে তাঁহার প্রথম বয়সে মাঝে মাঝে উহার ফেনিল উচ্ছ্বাসে মাতাল হন নাই, একথা বলিতে পারি না। যেমন, তাঁহার কৈশোরের আস্ফালনগুলি, সেগুলির কথা দুর্গাচরণ লিখিয়া গিয়াছেন, সেগুলিকে রামকৃষ্ণ ক্ষমাশীল অবহেলার সহিত শুনিতেন এবং মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেন। ধর্মপ্রাণ নাগবাবু একবার খৃস্টান-সুলভ বিনয়ের সহিত বলিয়াছিলেন: "সব কিছুই মায়ের ইচ্ছায় ঘটিতেছে। মা-ই বিশ্বের ইচ্ছাশক্তি। তিনিই চালান। মানুষ মনে করে, তাহারাই চলিতেছে।"

আবেগপ্রবণ নরেন জবাব দিয়াছিলেন:

"আমি তোমার ঐ বাবা বা মা সম্পর্কে তোমার সংগে একমত হইতে পারি না। আমিই আত্মা। আমার মধ্যেই বিশ্ব রহিয়াছে। আমার মধ্যেই উহা জন্মে, উহা ভাসিয়া বেড়ায়, উহা অন্তর্হিত হয়।"

নাগ: "একটি কালো চুলকে-ও শাদা করিবার ক্ষমতা তোমার নাই, তবু তুমি বিশ্বের কথা বল! ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া একটা ঘাস-ও মরিতে পারে না!"

নরেন: "আমার ইচ্ছা ছাড়া চন্দ্র-সূর্য-ও নড়ে না। আমার ইচ্ছাতেই বিশ্বটা যন্ত্রের মতো চলে।"[১]

১ রামকৃষ্ণ তাঁহার এই তরুণসুলভ দর্প দেখিয়া মৃদু হাসিয়া নাগবাবুকে বলেন: "সত্যি, নরেন ওকথা বলতে পারে। ও যেন একটা খাপ খোলা তলোয়ার।" তখন ধর্মপ্রাণ নাগবাবু মায়ের ঐ তরুণ পুত্রের উদ্দেশ্যে মাথা নত করেন। ("সাধু দুর্গাচরণ নাগ: আদর্শ-গৃহীর জীবনকথা" নামে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন হইতে ১৯২০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তক দ্রষ্টব্য।)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সহিত এই দুই মল্লবীরের বর্ণনা দিয়াছেন: "মহামায়া যদি ইঁহাদিগকে তাঁহার জালে ধরিতে চাহিতেন, তবে বড়োই বেগ পাইতেন; নরেনকে ধরিতে গেলে নরেন নিজেকে বড়ো, আরো বড়ো করিতেন, শেষে এতো বড়ো করিতেন যে, তাঁহাকে

এই দম্ভের সহিত ম্যাটামোরের[১] আস্ফালনের সামান্য পার্থক্য মাত্র আছে। কিন্তু তবু উহাতে পার্থক্য আছে প্রচুর—কারণ, এইকথাগুলি যিনি বলিতেছিলেন, তিনি ছিলেন চিন্তাবীর বিবেকানন্দ, যিনি তাঁহার স্পর্ধিত উক্তিগুলির যথাযথ অর্থ ওজন করিয়াই সেগুলি বলিতেন। ইহার মধ্যে কোনো মূর্খের আত্মম্ভরিতা নাই, উহা কোনো "অতিমানবের" প্রলাপোক্তি-ও নহে। এই আত্মা, এই অহম্ কেবল আমার ক্ষণস্থায়ী দেহের আবরণে আবদ্ধ কিছু নহে। এই আত্মা, এই অহম্, আমার মধ্যে আছে, তোমার মধ্যে আছে, সকলের মধ্যে আছে, অনাদি অনন্ত সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আছে। আত্মবুদ্ধি হইতে নির্লিপ্ত হইতে পারিলেই কেবল উহাকে আয়ত্ত করা সম্ভব। "সমস্ত কিছুই আত্মা, ইহাই একমাত্র সত্য," কথাগুলির অর্থ এই নয় যে, তুমি মানুষটা-ই সব কিছু। যে হিম উৎস হইতে সকল ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, সেখানে তোমার আবদ্ধ জলের বোতলটাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে কিনা, তাহা সম্পূর্ণরূপে তোমার উপরই নির্ভর করে।[২] কেমন করিয়া বোতলটাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা যদি তুমি জান, তবে উৎস তোমার মধ্যেই রহিয়াছে, তুমিই সে উৎস। সুতরাং ইহা দম্ভের নহে, চূড়ান্ত নির্লিপ্তিরই এক শিক্ষা।

বাঁধিবার মতো লম্বা শিকল আর পাওয়া যাইত না...আর নাগকে ধরিতে গেলে, নাগ নিজেকে ছোট, ছোট, আরো ছোট করিতেন, অবশেষে তিনি এতো ছোট হইয়া যাইতেন যে, জালের ফাঁসের ফাঁক দিয়া তিনি গলিয়া পলাইতেন।"

১ প্রাচীন স্পেন ও ফরাসী দেশীয় কৌতুকনাট্যের একটি চরিত্র: সে তূর্য বাজাইত এবং কাল্পনিক জয়ের বড়াই করিত।

কিন্তু ইহার সংগে "দ্বিতীয় ফাউস্ট" পুস্তকে যে তরুণ বাক্কালরিয়েট মেফিস্টফিলিসের দাড়ি ছিঁড়িয়া দিয়াছিল, তাহার আস্ফালনের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কথাগুলি প্রায় এক রকম; ফিক্‌টের রচনাকে গ্যেটে ব্যঙ্গ করিতেছিলেন, এই কথাগুলি মনে না রাখিলে এই সাদৃশ্যটি আরো বিস্ময়কর মনে হইবে। ফিক্‌টের রচনার মধ্যে, যদি-ও অজ্ঞাতসারে, ভারতীয় আত্মার সেই উন্মাদনার অনুরূপ একটি বস্তু আছে:

"আমি সৃষ্টি করিবার পূর্বে এই বিশ্বলোক ছিল না। আমিই সূর্যকে সমুদ্র হইতে উঠাইয়াছি। আমার সংগেই চন্দ্র তাহার কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের পথ-পরিক্রমা শুরু করিয়াছে। আমার পদতলেই দিবা জাগ্রত হয়। আমার সম্মুখেই বসুন্ধরা সবুজবর্ণ ধারণ করে, পত্রপুষ্পে সজ্জিত হয়। আমার ইঙ্গিতেই প্রথম রাত্রিতে নক্ষত্রের এই মহাসমারোহ আকাশময় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।"

২ "আমার পশ্চাতে যে মহাশক্তি বিদ্যমান আছে, তাহা বিবেকানন্দ নয়, তাহা তিনি, ভগবান।..." (বিবেকানন্দের পত্র, ৯ই জুলাই, ১৮৯৭, "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন", তৃতীয় খণ্ড, ১৭৮ পৃ:)

এই রকম সুনির্দিষ্টভাবে সীমারেখা টানিয়া দেওয়া সত্ত্বে-ও ব্রাহ্মসমাজীরা কয়েক বার বিবেকানন্দের দেবত্বের দাবীকে ধর্মনিন্দা হিসাবে বিচার করিয়াছেন। (বি. মজুমদার-রচিত পুস্তিকা *"Vivekananda, the Informer of Max Muller"* দ্রষ্টব্য।)

তাহা সত্ত্বে-ও ইহা সত্য যে, উহার মধ্যে এক উন্মাদকর শিক্ষা রহিয়াছে; উহাতে আত্মার ঊর্ধ্বগমনের যে বেগ সৃষ্টি করে, তাহার ফলে আত্মা তাহার প্রারম্ভের নিম্নতর স্থানটিকে সাধারণত ভুলিয়া যায়, এবং শেষ সাফল্য ছাড়া তাহার আর কিছুই মনে থাকে না, সাফল্যের দিব্য পালক[১] সম্পর্কেই সে গর্ব করিয়া বেড়ায়। অতি উচ্চ স্তরের বায়ুতে সতর্ক হইতে হয়। সমস্ত দেবতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পর "আত্মা" ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু সেই আবর্ত সম্পর্কে সাবধান![২] তাই বিবেকানন্দ যে সকল আত্মা এখনো তাঁহাদের ঊর্ধ্বগমনকালে পর্বতের পিচ্ছল পথ ও খাদ এবং গহ্বরের বায়ু সম্পর্কে অভ্যস্ত হন নাই, তাঁহাদিগকে তাড়াহুড়া করিয়া ঊর্ধ্বে পাঠাইবার বিষয়ে এতোই সতর্ক হইয়াছিলেন। তাই তিনি প্রত্যেককে ধীরে ধীরে নিজের ধর্মের বা নিজের দেশের ও কালের সাময়িক আদর্শের দণ্ডে ভর করিয়া উপরে উঠিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায়ই তাঁহার অনুসরণকারীরা অধীর হইয়া উঠিতেন এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও প্রস্তুতি না করিয়াই শিখরে পৌঁছিতে চাহিতেন। ফলে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই যে, তাঁহাদের অনেকে পতিত হইয়াছিলেন এবং নিজেদের পতনের ফলে কেবল তাঁহাদেরই বিপদ ঘটে নাই, যাঁহারা নিজেদিগকে খাটো ভাবেন, তাঁহাদেরও বিপদ হইয়াছিল। অন্তরতর শক্তির আকস্মিক উপলব্ধিতে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, তাহাতে যে সামাজিক আলোড়ন ঘটিতে পারে, সে আলোড়নের ব্যাপকতা ও ফলাফলের পরিমাণ পূর্ব হইতে নির্ধারিত করা সহজ নহে। সুতরাং বিবেকানন্দ এবং তাঁহার আশ্রমিক সম্প্রদায় যে দৃঢ়তার সহিত ক্রমাগত রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপ হইতে দূরে ছিলেন, তাহাতে সম্ভবত ভালোই

১ ফরাসী দেশের একটি জনপ্রিয় কথা, উহাতে "ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত দাঁড়কাক" নামে লা ফঁতেনের একটি নীতিমূলক কাহিনীর সম্পর্কে বলা হইয়াছে।

জ্ঞানী ও সরল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অপেক্ষা-ও অধিকতর গুরুত্বের সহিত আধ্যাত্মিক দম্ভের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন:

"আমিই তিনি", এই দাবীটি…যথাযথ মনোভাবের পরিচয় নহে। দৈহিক আত্মচেতনাকে পরাভূত করিবার পূর্বে এই আদর্শকে যে গ্রহণ করিবে, উহা তাহার ভয়ানক ক্ষতি করিবে, উহা তাহার অগ্রগমন রোধ করিবে এবং ধীরে ধীরে তাহাকে নীচে নামাইবে। নিজের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে তাহার পরিপূর্ণ অজ্ঞতা অপরকে এবং তাহাকে নিজেকে ঠকাইবে।…" ("রামকৃষ্ণের বাণী", ২য় খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ৬৭ পৃষ্ঠা, ১৯২৮ খ্রস্টাব্দের সংস্করণ দ্রষ্টব্য।)

করিয়াছিলেন। অবশ্য, ভারতীয় বিপ্লবীরা একাধিক বার তাঁহার বাণীকে স্মরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বাণী অনুসারে আত্মার সর্বশক্তিমত্তার কথা প্রচার করিয়াছেন।

সমস্ত মহান মতবাদই মারাত্মকভাবে বিকৃত হয়। প্রত্যেকটি মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য তাহার বক্র অর্থ করে। উহাকে বিকৃতির ও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, তাহা-ও সর্বদা উহার কণ্ঠরোধ করিতে চাহে এবং নিজের মালিকানা স্বত্বের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কোনো শ্রেষ্ঠ মতবাদকে তাহার অপরিবর্তিত মহানত্বের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাহা নৈতিক শক্তির এক অপূর্ব ভাণ্ডার। সমস্ত কিছুই আমাদের মধ্যে রহিয়াছে এবং আমাদের বাহিরে কিছুই নাই, সুতরাং আমাদের প্রত্যেকটি চিন্তায় ও কাজে সেখানে কোনো ভগবান বা কোনো নিয়তি আর থাকে না, যাহার উপর সে দায়িত্বকে আমরা হীনভাবে আরোপ করিতে পারি। আর জাভে নাই, আর ইউমেনিডিস নাই, আর "প্রেত"[১] নাই। এখন আমাদের প্রত্যেককেই নিজের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজ নিজ নিয়তির স্রষ্টা, আমাদের প্রত্যেকের একাকীর স্কন্ধেই সমস্ত ভারটা পড়িয়াছে। আমাদের প্রত্যেকেরই এই ভার বহন করিবার শক্তি আছে। "মানুষ কখনো তাহার সাম্রাজ্য হারায় নাই। আত্মা কখনো বাঁধা পড়ে নাই। স্বভাবতই উহা মুক্ত। উহার কারণ নাই। উহা কারণের অতীত। উহার উপর বাহির হইতে কিছুই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।…তুমি মুক্ত, একথা তুমি বিশ্বাস কর, তুমি মুক্ত হইবে।…"[২]

বাতাস বহিতেছে; যে সকল নৌকা পাল তুলিয়াছে, সেগুলি এই বাতাস ধরিতে পারিবে এবং আপনার পথে অগ্রসর হইবে; কিন্তু যেগুলি পাল তুলে নাই, সেগুলি এই বাতাস ধরিতে পারিবে না। তাহা কি বাতাসের দোষ?…লোককে দোষ দিও না, ভগবানকে দোষ দিও না, দুনিয়ার কাহাকেও দোষ দিও না। দোষ দাও নিজেকে এবং চেষ্টা করো আরো ভালোভাবে কাজ করিবার।…যে শক্তি ও সাহায্যে তোমার প্রয়োজন, তাহা তোমার ভিতরেই আছে। সুতরাং নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়িয়া তোলো।"[৩]

---

১ ইবসেন রচিত একটি নাটকের কথা বলা হইতেছে।

২ "আত্মার মুক্তি" (৫ই নভেম্বর, ১৮৯৬), সম্পূর্ণ রচনাবলীর ২য় খণ্ড।

৩ জ্ঞানলোক: "বিশ্বলোক" (২, পরমাণু)।

তোমরা কি নিজকে অসহায়, নিরুপায়, পরিত্যক্ত, সর্বহারা বলো ?…কাপুরুষ ! তোমাদের মধ্যেই শক্তি, আনন্দ, মুক্তি, সমগ্র অসীম সত্তা বর্তমান রহিয়াছে। কেবল তোমাকে তাহা পান করিতে হইবে।[১]

উহা হইতে তুমি সারা জগৎকে সিঞ্চিত করিতে পারো, কেবল এই শক্তির স্রোতধারাই তুমি পান করিবে না, ঐ স্রোতধারার জন্য তৃষাতুর জগতের তৃষ্ণাকে-ও পান করিবে এবং জগৎকে সিঞ্চিত করিবে। কারণ, "তোমার মধ্যে যিনি আছেন, তিনি সকলের হাত দিয়া কাজ করেন, তিনি সকলের পা দিয়া চলেন।" তিনি শক্তিমান ও বিনীত, পুণ্যাত্মা ও পাপী, ভগবান ও কৃমিকীট।" তিনি সমস্ত কিছু, এবং তিনি সর্বোপরি সকল শ্রেণীর, দীন ও দরিদ্র, সকল জাতির[২]। কারণ, "জগতের সকল বিরাট কাজ দরিদ্ররাই করিয়াছে।"[৩]

আমরা যদি এই বিরাট ভাবের কণা মাত্র উপলব্ধি করিতে পারি, "যদি জগতের নর-নারীর এক নিযুতাংশ-ও কেবলমাত্র বসিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য বলে যে, হে সকল মানব, হে সকল প্রাণী, তোমরা সকলেই ভগবান, তোমরা সকলেই এক প্রাণময় দেবতার প্রকাশ মাত্র", তবে সমস্ত জগৎ আধ ঘণ্টার মধ্যেই বদলাইয়া যাইবে। ঘৃণার প্রচণ্ড বিস্ফোরককে দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার স্রোতকে চতুর্দিকে না ছড়াইয়া সকল দেশের মানুষ চিন্তা করিবে, এ সমস্তই কেবল 'তিনি'-ই।[৪]

* * * * *

ইহা যে নূতন কোনো ভাব নহে, তাহা আবার বলিবার প্রয়োজন আছে কি ? (এবং উহার প্রাচীনতার মধ্যেই উহার শক্তি নিহিত আছে!) মানবাত্মার বিশ্বের ধারণা এবং উহাকে কার্যত পরিণত করিবার ইচ্ছা বিবেকানন্দেরই সর্বপ্রথম হয় নাই (একথা বিশ্বাস করা-ও ছেলেমানুষি হইবে)। তবে তিনিই সর্বপ্রথম উহাকে সকল ব্যতিক্রম ও সীমা হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণতম রূপে ভাবিয়াছিলেন।

১ "একটি মাত্র 'অসীম অস্তিত্ব' রহিয়াছে, তাহা সেই সঙ্গে সৎ, চিৎ, আনন্দ-ও, এবং তাহাই মানুষের অন্তরতর প্রকৃতি। এই অন্তরতম প্রকৃতি মূলত চিরমুক্ত এবং চিরদিব্য।" (১৮৯৮ সালের ৯ই জুলাই তারিখে লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা।) বিবেকানন্দ আরো বলেন, "মুক্তিবাদী ধর্মের উপর ইউরোপের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে।"

২ পত্র, ৯ই জুলাই, ১৮৯৭।

৩ ১১ই মার্চ, ১৮৯৮, কলিকাতা।

৪ "জ্ঞানযোগ" : "প্রকৃত ও প্রতীয়মান মানুষ।"

তবে তাঁহার সম্মুখে যদি রামকৃষ্ণের অসাধারণ দৃষ্টান্ত না থাকিত, তবে তাঁহার পক্ষে-ও উহা ভাবা সম্ভব হইত না।

মাঝে মাঝে সম্মিলন বা সংঘগুলিতে বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ ধর্মের কিছু কিছু প্রতিনিধি ধর্মের বিভিন্ন শাখাকে পরস্পরের নিকট টানিয়া আনিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এবং ইহা আজকাল কচিৎ-দৃষ্ট ঘটনা-ও নহে। ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত মনীষীরা-ও উহার সহিত সমান্তরাল ভাবে ঐক্যের সূত্রটিকে পুনরায় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ সূত্রটি একটি অন্ধ উদ্বর্তনের মধ্য দিয়া ধাবিত হইয়াছে, ব্যর্থ ও সার্থক যুক্তির বিভিন্ন পৃথক প্রয়াসকে সংযুক্ত করিয়াছে, বহুবার বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, আবার বহুবার নূতন করিয়া রচিত হইয়াছে। মানব সত্তায় যে শক্তি ও আশার ঐক্য আছে, তাহাকে তাঁহারা বারে বারে ঘোষণা করিয়াছেন।[১]

কিন্তু এই সকল প্রয়াস পৃথকভাবেই হইয়াছে (সম্ভবত এজন্যই এগুলি ব্যর্থও হইয়াছে)। এবং এগুলির কোনটিই এখনো ঐহিক চিন্তার সর্বাপেক্ষা ধর্মীয় অংশটুকুকে ধর্মীয় চিন্তার সর্বাপেক্ষা ঐহিক অংশটির সহিত সংযুক্ত করিবার মতো অবস্থায় আসিয়া পৌছিতে পারে নাই। এই প্রয়াসগুলির মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা উদার, সেগুলি-ও যেসকল মানসিক কুসংস্কার নিজেদের আধ্যাত্মিক পরিবারের— এই পরিবার যতোই বিরাট ও মহান হউক—শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা জন্মায়, সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে কখনো সফল হয় নাই। অপর প্রয়াসগুলি-ও সেগুলির স্ব স্ব বংশমর্যাদা দাবী করায় ঐগুলিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে বাধ্য হয়। মিশ্‌লের মহান হৃদয়-ও ইহা "প্রতিরোধ করে নাই, প্রতিবাদ করে নাই" এই কথা বলিতে পারে নাই; এমন কি তাঁহার 'মানবতার বাইবেল' গ্রন্থে-ও তিনি আলোকের মানুষ এবং অন্ধকারের মানুষ—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। ফলে, স্বভাবত, তিনি নিজের জাতিকে, নিজের ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ভূমধ্যসাগরকে, শ্রেষ্ঠতর ভাবিয়াছেন। ১৮২৮ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে উদার রামমোহন রায় যখন হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টানকে মিলিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার

১ মিশ্‌লের অপেক্ষা উচ্চতর হৃদয় আর ছিল না: "*Omnia sub magna labentia flumina terra*···এক বিশ্ব সংগীত।···মানব জাতির চিরন্তন কথা।···"

(তাঁহার *Origines du Droit Francais* 1837, এবং তাঁহার সম্পর্কে ঝাঁ জ্যয়েনো-রচিত সুন্দর পুস্তক: *L' Evangile Eternale*, 1292, দ্রষ্টব্য।)

সমুন্নত "সার্বজনীনতার" সূত্রপাত করিলেন, তখনো তিনি ছিলেন অনেকেশ্বরবাদের শত্রু, তিনি "ভগবান এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়" এই একেশ্বরবাদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করিয়াছিলেন। এই কুসংস্কারকে ব্রাহ্ম সমাজ এখনো আকঁড়াইয়া আছে; এবং উহাকে আমি আবার রবীন্দ্রনাথের মহলের সর্বাপেক্ষা স্বাধীনচেতা বন্ধুদের মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য যাঁহারা দুঃসাহসিক অভিযান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ্য করিতেছি। যেমন, চার পাঁচ বৎসর আগে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘ' (*Federation of International Fellowships*)। উহাতে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিঃস্বার্থ ইংগ-ভারতীয় প্রতিনিধিরা এবং বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম, জৈন ধর্ম ও প্রেততত্ত্বের প্রতিনিধরা-ও আছেন, কিন্তু ভারতের জনপ্রিয় ধর্মগুলিকে উহা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, কয়েক বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সভা-সমিতির বিবরণে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের নাম দেখা যায় নাই। (এই বাদ পড়াটি উহার পক্ষে চরিত্রগতই হইয়াছে) এ বিষয়ে নীরব থাকাই উচিত : অন্যথায় উহা বিব্রত করিয়া তুলিতে পারে···

আমি ইহা বেশ কল্পনা করি[illegible] পারি যে, আমাদের যুক্তির ইউরোপীয় ভক্তরা-ও ঠিক ঐরূপই করিবেন। যুক্তি এবং বাইবেলের বা কোরানের অদ্বিতীয় ভগবানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের পক্ষে বহু দেবতাকে বোঝা এবং সেগুলিকে তাহাদের মন্দিরে স্থান দেওয়া তত সহজ নহে। ঐক্যে[১] বিশ্বাসীরা একটু তাড়া দিলেই স্বীকার করিবেন যে, ঐ 'ঐক্য'—কোনো ভগবান-প্রেরিত মানব-ও হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা অদ্বিতীয় ভগবানের বহুধা বিভক্তিকে স্বীকার করিবেন না; কারণ হিসাবে দেখাইবেন, ঐরূপ কিছু করা লজ্জা ও ঘৃণার ব্যাপার! আমার যে সকল প্রিয়তম ভারতীয় বন্ধু তাঁহাদের গৌরবের বস্তু রামমোহনের মতো বিশুদ্ধ বেদান্তবাদ এবং শ্রেষ্ঠতম পাশ্চাত্ত্য যুক্তিতে পুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে-ও আমি ঐরূপ ব্যাপারের চিহ্ন লক্ষ্য করিতেছি। বহু বেদনা ও সংগ্রামের পর তাঁহারা অবশেষে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের সকল শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিন্তার সহিত শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য যুক্তিকে মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন! কিন্তু তারপর রামকৃষ্ণ ও তাঁহার তূর্যবাদক বিবেকানন্দ আসিলেন এবং তাঁহারা অসাধারণ ও সাধারণ সকল ব্যক্তিকে নির্বিশেষে সকল প্রকার আদর্শকেই ভালো-

[১] অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ঐক্য—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ঐক্য

বাসিতে ও পূজা করিতে বলিলেন।...তাঁহাদের কাছে উহা মানসিক পশ্চাদপসরণ মাত্র ছিল। কিন্তু আমার কাছে উহা ছিল এক পদ অগ্রসর হওয়া—উহা যেন হনুমানের লম্ফ দিয়া দুই ভূভাগের মধ্যবর্তী প্রণালী পার হওয়া।[১] হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে, পরমহংসের পরম প্রেমে ও বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ বাহুতে মানব জাতির মধ্যে বিদ্যমান সকল দেবতার, সত্যের সকল দিকের, মানব স্বপ্নের সমগ্র রূপের, যে উদ্ঘাটন হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা নূতনতর, সজীবতর, বলিষ্ঠতর আর কিছু আমি সকল কালের সকল ধর্মীয় ভাবের মধ্যে দেখি নাই। তাঁহারা সকল ধর্মবিশ্বাসীর কাছে, সকল দিব্য দ্রষ্টার কাছে, যাঁহাদের বিশ্বাস বা দিব্য দৃষ্টি নাই, অথচ যাঁহারা অকপটভাবে সেগুলির সন্ধান করিতেছেন তাঁহাদের সকলের

১ সেই সংগে আমি ইহা-ও চাহিনা যে, নিম্নতম হইতে উচ্চতম সকল ধর্মীয় ভাবের সকল রূপের এই বিশাল সর্বগ্রাহিতাকে আমার ভারতীয় বন্ধুরা নিম্নতর ও অল্পতর অপেক্ষা উন্নততরের প্রতি অধিকতর প্রীতি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাহার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বিপরীত দিক্‌টি প্রচ্ছন্ন আছে। নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধ ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাবের ফলে যে বৈরী ভাবটি দেখা দিয়াছে তাহার দ্বারা সে বিবাদের সম্ভাবনা আরো বাড়িয়াছে। মানুষ সকল সময়ে চূড়ান্ত দিকগুলিকেই ভালোবাসে। নৌকা যখন একদিকে খুব বেশী কাত হইয়া পড়ে, তখন মানুষ লাফ দিয়া অপর দিকে যায়। কিন্তু আমরা চাই ভারসাম্য। তাই বিবেকানন্দ যে ধর্মীয় সংগতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত অর্থ কি তাহা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে যে মনোভাবটি ছিল তাহা নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল:

"যাঁহারা তাঁহাদের কুসংস্কারগুলিকে আমার জাতির হাতে ফিরাইয়া দিতেছেন, আমি তাঁহাদের সহিত একমত নহি। মিশর সম্পর্কে মিশরতাত্ত্বিকদের কৌতূহলের মতোই ভারত সম্পর্কে কৌতূহল অনুভব করাটা-ও বিশুদ্ধ স্বার্থপরতা হইতে পারে। কেহ কেহ নিজের বিদ্যার, শাস্ত্রের বা কল্পনার অনুরূপ করিয়া ভারতকে আবার দেখিতে চাহিতে পারেন। কিন্তু আমি চাই যে, দেশের প্রশংসনীয় দিকগুলি যুগের প্রশংসনীয় দিকগুলির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া স্বাভাবিকভাবেই আরো সবল ও শক্তিশালী হইয়া উঠুক। নূতন অবস্থাটা ভিতর হইতেই বিকাশ লাভ করিবে।" (১৮৯৯ খৃস্টাব্দে শেষ বার ভারত হইতে ইউরোপ-যাত্রা-কালে ভগিনী নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎকারগুলি দ্রষ্টব্য।)

এখানে অতীতে ফিরিয়া যাইবার কোনো কথা নাই। এবং যদি-ও গুরুদেবের কোন অন্ধ ও অতি-বড় ভক্ত এ বিষয়ে আত্মপ্রতারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে-ও বিবেকানন্দের মনোভাবের প্রকৃত উত্তরাধিকারী যাঁহারা, রামকৃষ্ণ মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা, এই রকম গোঁড়া প্রতিক্রিয়ার গুপ্ত সামুদ্রিক শিলাগুলিকে এড়াইয়া সেগুলির মধ্য দিয়াই ঠিক পথে তরণী বাহিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এ দুই প্রতিক্রিয়াই একটি অতীত চিন্তার কঙ্কালকে নূতন করিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে। অপরটি হইল যুক্তিবাদী তথাকথিত প্রগতি, তাহা ভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন বিভিন্ন জাতির সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকতার একটি রূপ মাত্র। কিন্তু প্রকৃত প্রগতি হইল বৃক্ষের রসধারার মতো, তাহা তলদেশে মূল হইতে সঞ্চারিত হইয়া সমস্ত বৃক্ষময় উত্থিত হয়।

কাছে, সকল শুভেচ্ছা-প্রণোদিত মানুষের কাছে, সকল যুক্তিবাদীর কাছে, সকল ধার্মিকের কাছে, যাহারা শাস্ত্রে বা মূর্তিতে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের কাছে, যাহারা আগুনের চুল্লীতে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের কাছে, সংশয়ীদের কাছে, অন্ধ-প্রাণিতদের কাছে, মনীষীদের কাছে, অশিক্ষিতদের কাছে, তাঁহারা সৌভ্রাত্রের মহাবাণী বহিয়া লইয়া গিয়াছেন। এই ভ্রাতৃত্ব জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃত্ব নহে, যে ভ্রাতৃত্ব কনিষ্ঠকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া রাখে। এই ভ্রাতৃত্ব সমান অধিকার ও সমান সুযোগের ভ্রাতৃত্ব।

আমি আগেই বলিয়াছি, যে-"সহিষ্ণুতা" কথাটিকে পাশ্চাত্ত্য-দেশীয়দের কাছে বিরাট উদারতা মনে হয় (পাশ্চাত্ত্য এমন বৃদ্ধ কৃপণ কৃষকই বটে!), তাহা-ও বিবেকানন্দের বিবেকবুদ্ধিতে এবং গর্বিত সূক্ষ্ম সুরুচিতে সঙ্কোচের কারণ হইত। কারণ, উহা ছিল বিবেকানন্দের নিকট অপমানকর দয়া-প্রদর্শন মাত্র। উহাতে যেন কোনো সবল জ্যেষ্ঠ তাহার দুর্বল কনিষ্ঠকে রক্ষা করিতেছে, যে কনিষ্ঠকে তিরস্কার করিবার অধিকার তাহার আছে। জনসাধারণ "সহিষ্ণুতা" দেখাক, ইহা বিবেকানন্দ চাহেন নাই। বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন, তাহারা "গ্রহণ" করুক। পাত্রগুলির চেহারা যাহাই হউক না কেন, সেগুলিতে যে জল থাকে, তাহা সর্বদা একই জল, একই ভগবান। সমুদ্র যেমন পবিত্র, তাহার এক বিন্দু জল-ও তেমনি পবিত্র। বস্তুতপক্ষে, নিম্নতম ও উচ্চতমের এই সাম্য সম্পর্কে ঘোষণাটির আরো অধিক গুরুত্ব ছিল এই কারণে যে, এই ঘোষণাটি একজন উচ্চতমের নিকট হইতে—যিনি বিশ্বের সকল পর্বতমালার সর্বোচ্চ শিখর অদ্বৈতবাদে আরোহণ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই মানসিক অভিজাতের নিকট হইতে—আসিয়াছিল। তিনি কর্তৃত্বের সহিত কথা বলিতে পারিতেন, কেননা, তিনি তাঁহার গুরুদেব রামকৃষ্ণের মতোই পথের সকল সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ যখন নিম্নতম হইতে উচ্চতম পর্যন্ত সকল সোপান নিজের শক্তিতে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তখন বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সাহায্যে উচ্চতম হইতে নিম্নতম সোপানে অবতরণ করিতে এবং সেগুলিকে অদ্বৈতের চক্ষু হিসাবে—ঐ চক্ষুগুলির পাতায় অদ্বৈত রামধনুর মতো প্রতিফলিত হন—চিনিতে শিখিয়াছিলেন।

তবে আপনারা মনে করিবেন না যে, এই বিপুল বৈচিত্র্য অরাজক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিল। আপনারা যদি যোগ সম্পর্কে বিবেকানন্দের শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন, তবে চারিদিকে সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা, সুন্দর পরিপ্রেক্ষিত,

উপর্যুপরি স্তরসজ্জা হইয়া দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবেন। এই পরিপ্রেক্ষিত ও স্তরসজ্জার মধ্যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নাই। আছে স্থাপত্যের প্রস্তর-সজ্জা বা সংগীতের সুরসজ্জা, যাহা স্তরে স্তরে উপরের দিকে উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে রহিয়াছে এক মহা সংগতি, যে মহা সংগতি মহাশিল্পীর করস্পর্শে সুরযন্ত্রের ঘাটগুলি হইতে উত্থিত হয়। প্রত্যেকটি খণ্ড সুর ঐ ঐকতানের মধ্যে আপনার ভূমিকা করিয়া যায়। কোন সুরের দলকে চাপিয়া দেওয়া চলিবে না, কাহার-ও নিজের অংশটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর, এই অজুহাতে ঐ বহুধ্বনিকে একটি মাত্র সুরে পরিণত হইতে দেওয়া চলিবে না! ছন্দে লয়ে নির্ভুল নিখুঁত হইয়া নিজের অংশটি তুমি নিজে করিয়া যাও এবং অপরের যন্ত্রগুলির সুর নিজের কান পাতিয়া শোনো এবং সেই সকল সুরে তোমার নিজের সুরকে মিশাইয়া দাও! যে বাদ্যকার তাহার নিজের অংশটিকেই বাজাইতে থাকে, সে নিজের-ও ক্ষতি করে, কাজের-ও ক্ষতি করে, ঐকতানটিকে নষ্ট করিয়া দেন। যাঁহার উপর 'ডাবল-ব্যাস' (বৃহদাকার বেহালা) বাজাইবার ভার আছে, তিনি যদি ছোট বেহালার অংশটি কেবলই বাজাইতে চান, তবে তাঁহাকে কি বলিব? কিম্বা যে যন্ত্রটা বলে যে, "বাকীগুলিকে চুপ করাইয়া দাও! যে আমার মতো বাজিতে শিখিয়াছে, কেবল সে-ই বাজুক!" তাহাকেই বা কি বলিব? প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা সকলে একই সুরে একই বানান করিতে শিক্ষা পায়। কিন্তু ঐকতান তো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু-শিক্ষা নয়!

যাহা অপরের মস্তিষ্ককে নিজের মস্তিষ্কের ছাঁচে (ইহার নিজের ঈশ্বরের আদর্শে বা নিজের নিরীশ্বরের আদর্শে—নিরীশ্বর-ও ছদ্মবেশী ঈশ্বর মাত্র) গড়িয়া তুলিতে চাহে, সেরূপ ধর্মপ্রতিষ্ঠানগত বা ধর্মপ্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত সকল প্রকার প্রচারের মনোভাবকেই এই শিক্ষা ঘৃণা করে। ইহা এমন একটি তত্ত্ব, যাহা আমাদের সকল প্রকার পূর্ববর্তী বদ্ধমূল ধারণাকে, আমাদের যুগব্যাপী সকল ঐতিহ্যকে, উলট-পালট করিয়া দেয়। যাহারা এইরূপ করিতে আমাদের বলে না, তাহাদিগকে সেবা করিবার উপযুক্ত কারণ আমরা, কি ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লোকেরা, সর্বদাই আবিষ্কার করিয়া থাকি, এবং যে ক্ষেত্র হইতে তাহারা খাদ্য পায়, তাহা হইতে "আগাছাগুলিকে (সেই সংগে শস্যগুলিকে-ও) উপাড়াইয়া ফেলি। মানুষের নিজের এবং তাহার প্রতিবেশীর—বিশেষতঃ তাহার প্রতিবেশীর—হৃদয় হইতে ভুলের আগাছাগুলিকে বা কাঁটাগাছগুলিকে তুলিয়া ফেলা মানুষের সর্বাপেক্ষা পবিত্র কর্তব্য নয় কি? আর ভুল নিশ্চয় আমাদের নিকট অসত্য ছাড়া কিছুই নয়? খুব কম লোকই আছেন, যাঁহারা এই ধরণের

আত্মকেন্দ্রিক মানবপ্রীতির উর্ধ্বে উঠিতে পারেন। আমি আমার যুক্তিবাদী এবং ঐহিক বৈজ্ঞানিক-বাহিনীর কর্তা ও সহকর্মীদের মধ্যে—তাঁহারা যতোই শৌর্যবান, বীর্যবান ও উদারমনা বলিয়া প্রতিয়মান হউক না কেন—এই রকমের একটি লোককে-ও দেখি নাই। কারণ, তাঁহারা যে শস্য নিজে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের দুই হাত ভরিয়া গিয়াছে, এবং সেগুলিকে তাঁহারা ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারেন না!…"হয় স্বেচ্ছায় লইয়া খাও, নয় জোর করিয়া লওয়াইব, খাওয়াইব! আমার পক্ষে যাহা ভালো, তোমার পক্ষে-ও তাহা ভালো হইবে! আমার এই ব্যবস্থামতো চলিতে গিয়া তুমি যদি ধ্বংস হও, তবে তাহা তুমি তোমার নিজের দোষেই হইবে, আমার ব্যবস্থার দোষে নয়।" মলিয়েরের ডাক্তাররা-ও[১] এই ধরণের কথা বলিতেন। ফ্যাকাল্টির[২] ভুল হইতেই পারে না। অন্যপক্ষে খৃস্টান ধর্মপ্রতিষ্ঠানের শিবিরগুলি আরো খারাপ, তাঁহাদের আবার চিরকালের জন্য আত্মাকে রক্ষা করিবার প্রশ্ন আছে। মানুষের সত্যিকার ভালোর জন্য কোনো রকম পবিত্র পীড়নই তাঁহাদের কাছে অবৈধ নয়!

গান্ধীর মেজাজটি রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের বিপরীতধর্মী ছিল। তবু তিনি খুব সম্প্রতি "আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘের" মিতাদিগকে, যাঁহারা ধর্মপ্রচারের পবিত্র উৎসাহটা অত্যধিক পরিমাণে দেখাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে, ধর্মীয় "গ্রহণের" মূলনীতির কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।[৩] ইহাতে আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলাম। ঐ মূলনীতিটি বিবেকানন্দ-ও প্রচার করিয়াছিলেন। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, "সুদীর্ঘ পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতালাভের পর আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছি:

(১) সকল ধর্মই সত্য। (আমি, এই গ্রন্থের রচয়িতা, সকল ধর্ম বলিতে যুক্তি ও ভগবৎ-বিশ্বাস, উভয়কেই বুঝি।)

(২) সকল ধর্মের মধ্যে কিছু কিছু ভ্রান্তি আছে।

(৩) আমার নিজের হিন্দুধর্মের মতোই অন্যান্য সকল ধর্ম-ও আমার প্রিয়।

১ ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের নাটকে বর্ণিত ডাক্তাররা।—অনু:

২ ফ্যাকাল্টি—ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন। (এই অংশটি মলিয়েরের অনুকরণে লেখা হইয়াছে।)

৩ ১৯২৮ খৃস্টাব্দের ১৩–১৫ই জানুয়ারিতে শবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে মিলিত আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘের সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত সংক্ষিপ্ত অনুলিপি।

আমার নিজের ধর্মের প্রতি আমার যেমন শ্রদ্ধা আছে, অপর সকল ধর্মের প্রতি-ও আমার তেমনি শ্রদ্ধা আছে। তাই ধর্মান্তর গ্রহণের কথাও ভাবা অসম্ভব। মৈত্রী সংঘের লক্ষ্য হইবে হিন্দুকে আরো ভালো হিন্দু হইতে, মুসলমানকে আরো ভালো মুসলমান হইতে, খৃস্টানকে আরো ভালো খৃস্টান হইতে সাহায্য করা। অপরকে ত্রাণ করিবার মনোভাবটি আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘের মনোভাবের বিরোধী। আমার ধর্মটিই সর্বাপেক্ষা সত্য এবং অন্যান্য ধর্মগুলি অপেক্ষাকৃত কম সত্য, এরূপ সামান্য সন্দেহও যদি আমার অন্তরের গভীরে আমি অনুভব করি, তবে অন্যের সহিত আমার কোনো রকম সম্পর্ক থাকিলে-ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘ যে ধরণের সম্পর্ক দাবী করে, তাহা হইতে উহা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। অপরের প্রতি আমাদের মনোভাবটি সম্পূর্ণরূপে উদার ও অকপট হওয়া চাই। 'ভগবান! তুমি আমাদিগকে যে আলো দিয়াছ, উহাদিগকে-ও সেই আলো দাও'—আমাদের প্রর্থনা এইরূপ হইলে চলিবে না। আমাদের প্রার্থনা হইবে—'উহাদের পূর্ণতম বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আলোক ও সত্য উহাদিগকে দাও!"

সর্বপ্রাণবাদ ও অনেকেশ্বরবাদ শ্রেষ্ঠ একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির কাছে মানবিক সোপানের নিম্নতম ধাপ বলিয়াই মনে হয়। এই সর্বপ্রাণবাদ ও অনেকেশ্বরবাদের অপকর্ষের কথা প্রতিপক্ষ উল্লেখ করিলে গান্ধীজী কোমলভাবে তাহার জবাব দেন:

"এগুলি সম্পর্কে আমাদের বিনীত হওয়া, এবং বিনীততম ভাষার মধ্য দিয়া ঔদ্ধত্য যাহাতে কখনো কখনো প্রকাশিত হইয়া পড়িতে না পারে সেজন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। একজন ভালো হিন্দু, ভালো খৃস্টান বা ভালো মুসলমান হইবার জন্য জীবনের সকল সময়টুকু ব্যয় করিতে হয়। আমার সমস্ত সময়টুকু ভালো হিন্দু হইবার জন্য লাগিয়াছে, এবং সর্বপ্রাণবাদীদের ধর্মান্তরিত করিবার মতো সময় আমার নাই: সে যে আমার অপেক্ষা খাটো সাটো, সত্যই ইহা আমি ভাবিতে-ও পারি না।[১]"

১ একজন সহকর্মী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন: "ভগবান সম্পর্কে আমার ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কি আমি আমার বন্ধুকে দিতে চাহিতে পারি না?" তাহার উত্তরে গান্ধীজি বলেন: "একটি পিপীলিকা কি তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একটি হস্তীকে দিতে পারে? কিম্বা উহার বিপরীত? তাহার অপেক্ষা প্রার্থনা করুন, ভগবান যেন আপনার বন্ধুকে পূর্ণতম আলোক ও জ্ঞান দান করেন—তিনি আপনাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা যে তাহাই হইবে, এমন কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই।"

আর একজন প্রশ্ন করেন, "আমরা কি আমাদের অভিজ্ঞতাকে ভাগ করিয়া লইতে পারি না?"

গান্ধীজী কেবল প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সকল প্রকার ধর্মীয় প্রচারণাকেই অন্তরে ঘৃণা করিতেন না, এমন কি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ধর্মান্তর গ্রহণ-ও তাঁহার নিকট বিরক্তিকর ছিল: "কেহ কেহ যদি তাহাদের ধর্মীয় কায়দা-কানুনগুলি পরিবর্তন করা উচিত মনে করেন, তাঁহাদের তাহা করিবার স্বাধীনতা আমি অস্বীকার করি না—তবে তাহা দেখিয়া আমি বেদনাবোধ করি।"

ইহার অপেক্ষা কি ইহলৌকিক, কি পারত্রিক, উভয়বিধ চিন্তায় আমাদের পাশ্চাত্ত্য রীতির বিপরীত আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেই সংগে ইহার অপেক্ষা অন্য কিছু হইতে পাশ্চাত্ত্য বা অবশিষ্ট আধুনিক জগৎ অধিক উপযোগী কিছু লাভ-ও করিতে পারে না। মানব জাতির ক্রমবিকাশের এই স্তরে, যেখানে অন্ধ এবং সচেতন উভয়বিধ শক্তিই সমস্ত প্রকৃতিকে "হয় সহযোগিতা নয় মৃত্যুর" দিকে টানিতেছে, সেখানে যতোক্ষণ না এই অপরিহার্য মূলনীতিটি মূল মন্ত্রে পরিণত হয়, ততোক্ষণ মানবিক চেতনাকে এই শিক্ষার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। ঐ মূলমন্ত্রটি হইবে: প্রত্যেক ধর্মের বাঁচিবার সমান অধিকার আছে; প্রতিবেশী যাহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার সমান দায়িত্ব-ও প্রত্যেক মানুষের রহিয়াছে। আমার মতে, গান্ধীজী যখন এমন অকপটভাবে এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন তিনি নিজেকে রামকৃষ্ণেরই উত্তরাধিকারী রূপে প্রকাশ করিতেছিলেন।[১]

গান্ধীজি উত্তর দেন: "আমরা জানি, আমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অংশ অবশ্য অপরে গ্রহণ করে (বা অপরকে জানান হয়)। তবে তাহা আমাদের মুখের কথার দ্বারা হয় না, তাহা হয় আমাদের জীবনের দ্বারা (বা আমাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা)। মাধ্যম হিসাবে মৌখিক ভাষা খুবই ত্রুটিপূর্ণ।... আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা চিন্তা অপেক্ষাও গভীরতর। ... (আমরা যে বাঁচিয়া আছি, ইহা হইতেই) আমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা উপচাইয়া পড়িবে। কিন্তু যেখানে অংশ লইবার বা দেওয়ার চেতনা আছে (আধ্যাত্মিকভাবে কর্ম করিবার ইচ্ছা আছে), সেখানে স্বার্থ-ও আছে। আপনারা খৃস্টানরা যদি চান যে, অপরে আপনাদের খৃস্টীয় অভিজ্ঞতার অংশ গ্রহণ করুক, তবে আপনারা একটি মানসিক বাধার সৃষ্টি করিবেন। তাঁহাদের ধর্ম যাহাই হউক, আপনাদের বন্ধুরা যাহাতে উৎকৃষ্টতর মানুষ হইতে পারেন, সেইজন্য কেবল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন।"

১ রামকৃষ্ণের শিষ্যদের উপযুক্ত আদর্শটি আমার কাছে ঠিক এইরূপ বলিয়া মনে হইয়াছে—তাঁহার যে বিরাট হৃদয় জগতের সকল অকপট উদার হৃদয়ের নিকট, তাঁহাদের প্রেম ও বিশ্বাসের সকল রূপের নিকট, উন্মুক্ত ছিল, তাহা যেন যেখানে অন্যান্য "পবিত্র হৃদয়ের বিশেষ বিশ্বাসের স্বীকৃতির" ছাড়পত্রের দ্বারা প্রবেশ লাভ করা যায়, এমন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের বেদীতে সীমাবদ্ধ না থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। রামকৃষ্ণ সকলের জন্যই হওয়া উচিত। সকলেই তাঁহার। তাঁহার 'লওয়া' উচিত নয়। তাঁহার 'দেওয়া' উচিত।

আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি ইহাকে অন্তরে গ্রহণ না করিয়া পারেন। এই কথাগুলির লেখক—যে তাহার সমস্ত জীবন ধরিয়া এই ব্যাপক সর্বগ্রাহিতার জন্য অস্পষ্ট উচ্চাশা অনুভব করিয়া আসিয়াছে—এখন, কেবল এই মুহূর্তে, অতিশয় গভীরভাবেই অনুভব করিতেছে যে, তাহার ঐ উচ্চাশা সত্ত্বে-ও তাহার বহু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। তাই গান্ধীপ্রদত্ত এই মহান শিক্ষা—এই শিক্ষাই বিবেকানন্দ এবং আরো অধিকতর ভাবে রামকৃষ্ণ-ও দিয়া গিয়াছেন—তাহাকে তাহার উচ্চাশায় কৃতকার্য হইতে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া সে কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছে।

কারণ, যিনি লন, তাঁহার কপালে অতীতের গ্রহীতাদের, আলেকজান্দারের, দিক্‌বিজয়ীদের, কপালে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই ঘটিবে। ঐ সকল বিজয়ীর, বিজয়গুলি তাঁহাদের সহিত কবরেই গিয়াছে। যিনি প্রতিদান পাইবার কথা না ভাবিয়া 'দান করেন' নিজের সমস্তটুকুই দেন, তিনিই কেবল স্থান ও কালকে জয় করেন।

উপসংহার

কিন্তু গান্ধী ও বিবেকানন্দের মধ্যে এই পার্থক্য চিরদিনই থাকিবে যে, বিবেকানন্দ ছিলেন বিরাট মনীষী—আর মনীষা গান্ধীজীর সামান্য মাত্রও ছিল না। তাই বিবেকানন্দ গান্ধীজীর মতো নিজেকে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা উভয়েই সমস্ত ধর্মের সত্যতা স্বীকার করিলেও বিবেকানন্দ তাহাকে তাঁহার মতবাদের এবং শিক্ষার বিষয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়টির থাকিবার তাহাও অন্যতম কারণ। তিনি অকপটভাবেই সকল প্রকার আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব হইতে দূরে থাকিতে চাহিয়াছিলেন।[১] কিন্তু সূর্য তাহার কিরণমালার উত্তাপ বড় একটা কমাইতে পারে না। বিবেকানন্দের দীপ্ত চিন্তা, কেবল আছে এই কারণেই, সক্রিয় হইয়া উঠিত। এবং বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ সম্প্রসারণবাদী ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারিলেও, ভ্রাম্যমাণ আত্মাগুলি যাহার চারিদিকে আসিয়া

১ যাঁহারাই তাঁহাকে চিনিতেন, তাঁহারা সকলেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সকলের—অন্ততঃপক্ষে তাঁহারা যতোদিন দীক্ষার দ্বারা তাঁহার মঠের সহিত বা তাঁহার সহিত আনুষ্ঠানিক ভাবে সংযুক্ত না হইতেন—মানসিক স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁহার শ্রদ্ধার কথা স্বীকার করিয়াছেন।

নিম্নে যে মনোজ্ঞ অংশটি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে সংগতিময় স্বাতন্ত্র্যের কথা প্রকাশিত হইয়াছে:

"নিষ্ঠাই সিদ্ধির আরম্ভ। সকল ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করো। সকলের সহিত বসিয়া সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হও; সকলকে বলো: 'হ্যাঁ, ভাই, হ্যাঁ ভাই,' কিন্তু তুমি তোমার নিজের পথে অটল থাকো। উচ্চতর স্তর হইল বাস্তবিক ভাবে অপরের অবস্থাকে আয়ত্ত করা। আমি যদি সকল কিছুই হই, তবে আমি আমার ভাইয়ের মতো অনুভব করিতে বা সে যে চোখে জিনিসটিকে দেখিতেছে, সে চোখে দেখিতে পারিব না কেন? আমি যতোক্ষণ দুর্বল, ততোক্ষণ আমি একটি মাত্র পথে লাগিয়া থাকিব (নিষ্ঠা)। কিন্তু আমি যখন সবল হইব, তখন আমি অপর সকলের মতোই অনুভব করিতে পারিব। অপরের ভাবগুলির সহিত সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতিশীল হইতে পারিব। আগে বলা হইত: অন্যান্য ধারণাগুলির বিনিময়ে একটি মাত্র ধারণাকে বিকশিত করিয়া তোলো। কিন্তু এখনকার রীতি হইল, সামঞ্জস্যময় বিকাশ লাভ।' তৃতীয় পন্থা হইল তোমার মনটিকে পরিণত করো ও নিয়ন্ত্রিত করো', তারপর তাহাকে যেথা ইচ্ছা রাখো, দ্রুত ফল পাইবে। ইহাই হইল তোমার নিজেকে সব চেয়ে সত্যিকার ভাবে উন্নত করা। অভিনিবেশ করিতে শেখো, এবং একটি দিকে উহাকে ব্যবহার করো। তাহাতে তোমার কোনো ক্ষতি নাই। যে সমস্তটুকুকে পায়, সে অংশগুলিকেও পায়। ("প্রবুদ্ধ ভারত", মার্চ, ১৯২৯, দ্রষ্টব্য)

সমবেত হইতে পারিতেন, এমন একটি মহান অগ্নিশিখা হইয়া উঠাকেই যথেষ্ট মনে করিত। নায়কত্বের পদ পরিত্যাগ করিবার অধিকার সকলের থাকে না। এমন কি বিবেকানন্দের মতো লোকেরা যখন নিজের উদ্দেশ্যে-ও কিছু বলিয়া থাকেন, তখন তাহা সমস্ত মানব-জাতির উদ্দেশ্যেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। তাঁহারা চুপিচুপি কিছু বলিতে চাহিলেও পারেন না, আর বিবেকানন্দ তো চান নাই। আকাশ পূর্ণ করিবার জন্যই এই মহা কণ্ঠধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছিল। সমস্ত পৃথিবীই ছিল ইহার রণন-যন্ত্র।[১] বিবেকানন্দের রীতি ছিল গান্ধীজি হইতে স্বতন্ত্র। গান্ধীজির স্বাভাবিক আদর্শ ছিল তাঁহার স্বভাবের অনুপাতে মুক্ত, সংগত, পরিমিত ও সাধারণ। রাজনীতির মতোই ধর্মে-ও শুভেচ্ছা-প্রণোদিত মানুষের লইয়া একটি যুক্ত রাষ্ট্র গঠনের দিকে ছিল তাঁহার প্রবণতা। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বে-ও বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন সম্রাটের মতো। তাঁহার লক্ষ্য ছিল—স্বতন্ত্র অথচ মহান আধ্যাত্মিক অধিরাজ্যগুলিকে "একের" অধীনে সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা। এবং তিনি যে কর্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই পরিকল্পিত পথেই অগ্রসর হইয়াছে।

তাঁহার স্বপ্ন ছিল বেলুড়ের জননী সদৃশ মহান আশ্রমটিকে মানবিক "জ্ঞানের মন্দিরে" পরিণত করা।[২] আর তাঁহার নিকট "জানা-র" ও "করা-র" অর্থ ছিল এক। তাই জ্ঞানের দপ্তরকে তিন তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন: (১) দান (অন্নদান, অর্থাৎ খাদ্য ও শরীরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেওয়া), (২) বিদ্যা (বিদ্যাদান অর্থাৎ বুদ্ধিগত জ্ঞান দান), (৩) ধ্যান (জ্ঞানদান, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান)। আর এই তিন প্রকার শিক্ষার সমন্বয় ছিল মানুষ গড়িয়া তোলার পক্ষে অপরিহার্য। ধীরে ধীরে শুদ্ধিলাভ ও প্রায়াজনমতো অগ্রসরণের ব্যবস্থা-ও ছিল। মানুষের দেহে পুষ্টি ও সাহায্যের প্রয়োজন।[৩] এই দেহের

১ "অদ্বৈতের জ্ঞান সুদীর্ঘকাল অরণ্যে ও গিরিগুহায় লুকায়িত ছিল। উহাকে নির্জনতা হইতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অন্তঃস্থলে বহিয়া আনিবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। আমরা পর্বতে, প্রান্তরে, নগরে সর্বত্র অদ্বৈতের দামামা নির্ঘোষ করিব। (বিবেকানন্দের শিষ্য—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত "বিবেকানন্দের সহিত সংলাপ গ্রন্থ," ১ম ভাগ।)

২ "আমাদের কাছে বেদান্ত পাঠের উপযোগিতা কি? আমরা বেদান্তকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিব।" (পূর্বোক্ত পুস্তক।)

৩ বিজ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে সমাজ সেবা বিষয়ে (দাতব্য চিকিৎসালয়, দাতব্য লঙ্গরখানা, ইত্যাদিতে) পাঁচ বৎসর এবং ঠিক আধ্যাত্মিক দীক্ষা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার জন্য মানসিক বিষয়ে পাঁচ বৎসর শিক্ষানবীশীর নিয়ম বিবেকানন্দ প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন।

দুর্নিবার প্রয়োজনগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া "ঐক্যের" মধ্যে নিবিষ্ট নির্লিপ্ত আত্মাকে জয় করা পর্যন্ত এই অগ্রসরণ চলিবে।

বিবেকানন্দের মতো লোকের পক্ষে আগুন গোপন করিয়া লুকাইয়া রাখা সম্ভব নয়। তাই আত্মোন্নতির সকল প্রকার উপায়কেই সকলের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। নিজের একার জন্য কিছু রাখিবার অধিকার কাহারও নাই।

"তুমি বা আমি মুক্তি পাইলে তাহাতে জগতের কি আসে যায়? আমাদের কাজ হইল সমস্ত জগৎকে আমাদের সহিত মুক্তিতে লইয়া যাওয়া। সকল জীবের মধ্যে, বিশ্বের সকল অণু-পরমাণুর মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করা। তাহাই আমাদের অতুলনীয় পরমানন্দ।"[১] তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের স্থাপনার জন্য ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের মে মাসে সর্বপ্রথম যে খসড়াটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে "যে সকল সত্যকে মানুষের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সত্যকে প্রচার করা এবং সেগুলি অপরের জীবনে তাহাদের ঐহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োগ করিতে সাহায্য করা এই সংঘের উদ্দেশ্য।"

এই কারণেই "সমস্ত ধর্মই এক এবং সেগুলি অবিনশ্বর সনাতন ধর্মের বিভিন্ন রূপ মাত্র, এই কথা জানিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলীর মধ্যে সৌভ্রাত্র্য স্থাপনই" যে মতবাদের মূল কথা ছিল, তাহাতে-ও প্রচারের মনোভাবটি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

তাহার নিজের সত্য ও নিজের মঙ্গল যে অপরের সত্য এবং অপরের মঙ্গল, এই কথাটিকে বলিবার প্রয়োজন-বোধকে মানুষের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করা কতো-ই না কঠিন!—এ কথাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, দূর করা সম্ভব হইলে, তাহা "মানবিক" থাকিত কি না। প্রেমিক রামকৃষ্ণের সকল মনের প্রতি সর্বগ্রাহী আসক্তির মতোই গান্ধীজির আধ্যাত্মিক নির্লিপ্ত-ও অমূর্তই রহিয়া গিয়াছে, যদিও রামকৃষ্ণ বিপরীত পথে গিয়া উহাতে উপনীত হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দ ঐ অবস্থায় কখনো উপনীত হন নাই। তিনি রক্তমাংসের মানুষই রহিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চেহারা হইতেও এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে, তাঁহার মানসিক শিক্ষাগুলি পরিপূর্ণ নির্লিপ্তির আলোকে উদ্‌ভাসিত হইলেও তাঁহার অবশিষ্ট দেহ জীবনে ও কর্মেই নিমজ্জিত ছিল। তাঁহার সমগ্র সৌধটিতেই এই দ্বিবিধ চিহ্ন দেখা যায়: যাঁহারা জনসাধারণের জীবন এবং সমসাময়িক

১ "বিবেকানন্দের সহিত সংলাপ গ্রন্থ।"

আন্দোলনের সহিত আপনাদিগকে মিশাইয়া দিয়াছেন সেই সত্য ও সমাজ-সেবার বাণী-প্রচারকদের আশ্রয়স্থল রহিয়াছে ভিত্তিভূমিতে ; এবং শীর্ষদেশে রহিয়াছে সেই *Ara Maxima*, মন্দির-শিখরের সেই আলোক-বর্তিকা—সকল আশ্রমের আশ্রম, হিমালয় শীর্ষে নির্মিত সেই অদ্বৈত, যেখানে সকল মানবের সংগম-তীর্থে "পরিপূর্ণ ঐক্যের" মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই অর্ধ জগৎ আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

এই মহা স্থপতি তাঁহার নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন সংক্ষিপ্ত হইলেও মৃত্যুর আগেও তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের কথায়, "যন্ত্রটা বেশ সবল ও সচল অবস্থায় আছে!" তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতের বিপুল যন্ত্রের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য যে শক্তিপ্রদ লৌহদণ্ডটি ঢুকাইয়া দিয়াছেন, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহাকে ব্যাহত করিয়া ফিরাইয়া দেয়।"[১]

ভারতীয় ভ্রাতাদের সহিত একযোগে আমাদের কর্তব্য হইল ইহাকে সমর্থন করা। আগামী বহু শতাব্দীর জন্যে পাপ ও অপরাধের প্রথম ও শেষ কারণ, মানব-জাতির এই জগদ্দল নিষ্পেষক নিষ্ক্রিয়তাকে ভুলিয়া ফেলা সম্ভব হইবে, একথা আমরা যদি ভাবিতে না পারি, তবে শতাব্দীতেই বা কি আসে যায়? তবু আমরা নাড়া দিতে থাকিব। "*E pur si muove*"[২] ক্লান্ত পুরাতন দলের স্থান পূরণ করিবার জন্য সর্বদাই নূতন দল আসিবে। দুইজন ভারতীয় গুরু যে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের অন্যান্য অংশের অন্যান্য মানস-কর্মীদের দ্বারা চলিতে থাকিবে। পর্বতের তলদেশে যে লোকই সুরঙ্গ কাটুক না কেন, পর্বতের অপর দিকের খননের ধ্বনিও তাহার কানে আসিবে।

আমার ইউরোপীয় বন্ধুরা, আমি আপনাদিগকে প্রাচীরের অন্তরালে আসন্ন এশিয়ার আঘাতের শব্দ শুনাইয়াছি।......যান, আপনারা তাহার সহিত মিলিত হউন! সে আমাদের জন্য কাজ করিতেছে। ইউরোপ ও এশিয়া আত্মার দুই অর্ধাংশ। মানুষ এখনও আসে নাই। মানুষ আসিবে। ভগবান এখন বিশ্রাম[৩]

১ পত্র, ৯ই জুলাই, ১৮৯৭।

২ "কিন্তু তবু ইহা চলে।" পৃথিবীর গতি আছে, একথা গ্যালিলিওকে অস্বীকার করিতে বাধ্য করা। তখন তিনি এই কথা বলেন।

৩ বাইবেলের "সৃজন-পর্বে" ("জেনেসিস") বর্ণিত সৃষ্টির সেই ছয় দিনের কথা বলা হইতেছে।

করিতেছেন এবং তাঁহার সর্বাপেক্ষা মনোরম সৃজনের, সপ্তম দিবসের সৃজনের ভার আমাদের হাতেই দিয়াছেন। বন্দী আত্মার সুপ্ত শক্তিগুলিকে জাগ্রত ও মুক্ত করিতে হইবে! মানুষের মধ্যে ভগবানকে জাগ্রত করিতে হইবে; "সত্তাকে" নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে।

৯ই অক্টোবর, ১৯২৮ র. র.